দেশের কথা

(প্রথম ভাগ)

"অহ! কে কহিবে এ সুদীর্ঘ কথা।
সম সিন্ধু অপার অগাধ ব্যথা ॥"

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর-প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ

(পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত)

কলিকাতা।

আশ্বিন, ১৩১৪ সাল।

উৎকৃষ্ট বাঁধাই রাজ-সংস্করণ—মূল্য ১।০ টাকা।

গার্হস্থ্য সংস্করণ—মূল্য ১৲ এক টাকা।

সুলভ সংস্করণ—মূল্য ৸০ বার আনা।

1st impression : 1904

প্রথম সংস্করণ, ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ সাল—১,০০০ খণ্ড।

দ্বিতীয় „ ১৫ই আশ্বিন ১৩১২ সাল—২,০০০ খণ্ড।

তৃতীয় „ ২৪শে মাঘ ১৩১২ সাল—৫,০০০ খণ্ড।

চতুর্থ „ ২২শে আশ্বিন ১৩১৪ সাল—২,০০০ খণ্ড।

কলিকাতা।

২২১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—

গুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত।

১৯০৭।
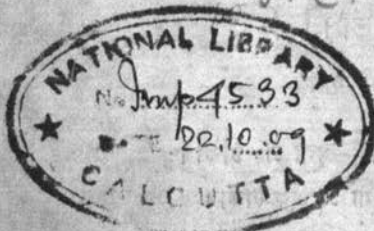
চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

জাতীয় মহাসমিতির আরব্ধ কার্য্যে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে "দেশের কথা" প্রচারিত হইল। মিঃ উইলিয়াম ডিগ্‌বী, সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই. ই, ভারতের দারিদ্র্য ও শিল্প-বাণিজ্যের বিনাশ প্রভৃতির সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান পুস্তকের সংকলনে তাহাই আমার প্রধান অবলম্বন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ-চতুষ্টয়—মিঃ ডিগবীর The Prosperous British India, শ্রীযুক্ত নৌরোজীর Poverty and un-British Rule in British India এবং দত্ত মহাশয়ের The Economic Histry of British India ও India in the Victorian Age প্রত্যেক ভারত-সন্তানের অবশ্যপাঠ্য। অনেকেই এই সকল গ্রন্থের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসমূহ পাঠ করিবার সুবিধা অতি অল্প লোকেরই আছে। অবকাশের অভাবেও অনেকে এই অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে পারেন না। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের অসুবিধা আরও অধিক। এই সকল শ্রেণীর পাঠকেরা যাহাতে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ-নিচয়ের সার মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন, তজ্জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তক সর্ব্বজন-বোধগম্য-ভাষায় রচিত হইল। বিবিধ সরকারি রিপোর্ট, ইংরাজী বাঙ্গালা মাসিকপত্র এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়-সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

যাঁহারা জাতীয় মহাসমিতির কার্য্য-কলাপে অনাদর প্রকাশ-পুরঃসর রাজ-পুরুষদিগের আনুকুল্য-নিরপেক্ষ হইয়া দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি-সাধনে অগ্রসর, তাঁহাদিগেরও এই পুস্তক খানি পাঠ করা উচিত। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে হইলে দেশীয় পণ্যজাতের ব্যবহারে দৃঢ়-সঙ্কল্প হওয়া যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ রাজ-শক্তির প্রতি-কুলতা-নিবারণের জন্য রাজনীতিক আন্দোলনের স্রোত দিন দিন প্রবল করাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই পুস্তক পাঠে যদি অনুকূল রাজ-শক্তির সহিত শিল্প-বাণিজ্যোন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হয় ও রাজনীতি-চর্চ্চায় সাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে লেখকের পরিশ্রম সফল হইবে।

পাঠকগণের নিকট উৎসাহ পাওয়ায় "দেশের কথার" দ্বিতীয় সংস্করণ

পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ করা হয়। আলোচ্য বিষয়গুলি পরিস্ফুট করিবার জন্য প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়েই অনেক নূতন তথ্য ও উদাহরণাদি সংকলিত করিয়া দিবার চেষ্টা করি। বাঙ্গালীর জাহাজ নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও কতিপয় নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হয়। পরিশিষ্টে "বঙ্গের অঙ্গ-চ্ছেদ" বিষয়ে প্রসিদ্ধ "হিতবাদী" ও সঞ্জীবনী" হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য-সমূহ সংকলিত করিয়া সন্নিবিষ্ট করি। বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে এরূপ নীরস বিষয়-পূর্ণ পুস্তকের যে সমাদর হইবে, তাহা পূর্ব্বে আমি কল্পনা করিতে পারি নাই। তথাপি কতিপয় সুহৃদের চেষ্টায় এই গ্রন্থের প্রচারে বিশেষ সহায়তা ঘটে। তাঁহাদিগেরই অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্কারণে গ্রন্থের আকার বহুলরূপে বৃদ্ধি করিয়াও মূল্য পূর্ব্ববৎ রাখা হয়। পরন্তু বার আনা মূল্যে "দেশের কথা"র একটি 'সুলভ সংস্করণ'ও প্রকাশ করিতে সাহসী হই।

লর্ড কর্জ্জনের যথেচ্ছাচারে দেশবাসীর চিত্ত বৈদেশিক মোহ-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বদেশের অভিমুখীন হয়, দেশের কথা জানিবার জন্য লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ফলে "দেশের কথার" দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন পুস্তকের আকার বৃদ্ধি-পূর্ব্বক তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করি। ঐ সংস্করণের ৫ সহস্র খণ্ড পুস্তক দেড় বৎসরের মধ্যে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

এবার চতুর্থ সংস্করণও পূর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল। এবারও সময়োপযোগী বহু নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়াছি। অনেক ইংরাজী অংশের বঙ্গানুবাদ নূতন সংযোজিত করিয়া দিয়াছি। দেশের আয় ব্যয় প্রভৃতি বিষয়ে যথাসম্ভব নূতন সালের হিসাবও দেওয়া গিয়াছে। এবার প্রায় ৫০ পৃষ্ঠপরিমিত নূতন বিষয় সংযোজিত করিয়াও গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করা হইল না। গ্রন্থখানিকে সময়োপযোগী করিবার জন্য শারীরিক অসুস্থতা-সত্ত্বেও যত্ন ও শ্রমের ত্রুটি করি নাই। আশা করি, পাঠ সমাজে ইহা পূর্ব্ববৎ আদরণীয় হইবে।

করোঁ গ্রাম,
করমাটাঁড়।
২২শে আশ্বিন
১৩১৪ সাল।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সূচী-পত্র।

আমাদের দেশ।

ইংরাজ-শাসনের দোষ-গুণ।

দেশের অবস্থা।

কৃষকের দুর্গতি।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

রেল ও খাল।

দেশের আয়-ব্যয়।

প্রতিকারের উপায়।

সম্মোহন—চিত্ত-বিজয়।

পরিশিষ্ট।

ভ্রম-সংশোধন—১৭৪ পৃষ্ঠে ৯ম পংক্তিতে "রাজা নবকৃষ্ণ" স্থলে "রাজা বিনয়কৃষ্ণ" হইবে। এবং ২০৮ পৃষ্ঠে ২৮শ পংক্তিতে "তিনশত কোটি টাকারও অধিক" স্থলে ৩৪৮ কোটি হইবে।

দেশের কথা।

আমাদের দেশ।

দেখ নাকি চেয়ে জগত উজ্জ্বল, এই সে ভারত হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী যমুনার জল, সিন্ধু গোদাবরী সরযূ সাজে!
জান নাকি সেই অযোধ্যা কোশল, এইখানে ছিল কলিঙ্গ পঞ্চাল,
মগধ কনোজ সুপবিত্র ধাম, সেই উজ্জয়িনী, নিলে যার নাম,
ঘুচে মনস্তাপ, কলুষ হরে?

এই রঙ্গভূমে করেছিলা লীলা, আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা, সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে!
এই আর্য্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল, ধরিয়া কৃপাণ কামিনী সকল,
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে,
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া, ধনুদণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া,
সমর উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে! (হেমচন্দ্র)

আমাদের দেশ প্রকৃতি দেবীর প্রিয়তম লীলা-নিকেতন। এই পুণ্যভূমিতে কি গগন-স্পর্শী পর্ব্বতশ্রেণী, কি উত্তাল-তরঙ্গময় নীলাম্বুপূর্ণ অপার সমুদ্র, কি বহুদূর-প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী, কি অনন্ত-বালুকাময়ী মৃত্যু-ভীষণা মরুভূমি, কি বৃক্ষ-লতা-পুষ্প-বিচিত্রা উদ্যান-ভূমি, কি শ্বাপদ-সমাকুল গহন কানন, কি সৌধমালা-পরিশোভিত সমৃদ্ধিশালী জনপদ, কি মরকত-প্রভা-শ্যামায়মান কৃষিক্ষেত্র, কি তাল-তমাল-কদলী-নারিকেল-পরিবেষ্টিতা পল্লিভূমি, কি সিদ্ধ-সন্ন্যাসিগণের যোগাশ্রম,—কোনও দৃশ্যেরই অভাব নাই। এক কথায় ভারতবর্ষ জগতের প্রদর্শনা-গার; ভারতভূমি জগতের জ্ঞান, সভ্যতা ও ধর্ম্ম-তত্ত্বের আদি জননী। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলেন,—বহুপুণ্যফলে লোকে এই পবিত্র কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। বহুসংখ্যক ইস্‌লাম-ধর্ম্মা-বলম্বী মহাপুরুষের সমাধি এবং মোসলেম শক্তি, মোসলেম সভ্যতা ও মোসলেম

গৌরবের অসংখ্য উজ্জ্বল চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া এই ভারতভূমি মুসলমানদিগের নিকটেও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এই সমুদ্র-বলয়াঙ্কিতা, হিমাদ্রি-কৃত-শেখরা ভারত-ভূমির বিস্তার ১৩,৮৮,৯৭২ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৭২ বর্গ মাইল স্থান ইদানীং ইংরাজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন রহিয়াছে। এই অংশকে 'বৃটিশ ভারত' বলে। সরকারি কাগজ-পত্রে ব্রহ্মদেশ ও বেলুচিস্থানকেও বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশের পরিমাণ ১,৬৮,৫৫০ বর্গ মাইল। বৃটিশ বেলুচিস্থান আয়তনে ২২,৪০০ বর্গ মাইলের অধিক নহে। ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্বসমেত ২১৩টি করদ রাজ্য আছে। করদ দেশীয় রাজ্যগুলির পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধ ৫,৯৫,০০০ বর্গ মাইল।

বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত ২৮,৪২,৩৪,৭০০ লোকের বাস। এই জন-সংখ্যা সমগ্র ভূ-মণ্ডলের লোক-সংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ। পূর্ব্বোক্ত ২৮॥০ কোটী লোকের মধ্যে ২২,১০,৫৩,১৩২ জন বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ও অবশিষ্ট ৬,৩১,৮১,৫৭০ জন দেশীয় হিন্দু মুসলমান করদ নৃপতিদিগের অধীনতায় বাস করে। ব্রহ্মদেশ ও বৃটিশ বেলুচিস্থানের লোক-সংখ্যা ১ কোটি ৩২ হাজার। ভারতবর্ষে ২০,৭১,৪৭,০২৬ জন হিন্দু, ৬,২৪,৫৮,০৭৭ জন মুসলমান ও ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ইউরোপীয়ের বাস।* বৃটিশ ভারতে ২২,০৯,২৮,১০০ হিন্দু মুসলমান (১১,২২,৪৪,৯০০ পুরুষ এবং ১০,৮৭,৬৩,২০০ স্ত্রীলোক) বাস করে। এই ২২ কোটি ৯ লক্ষাধিক হিন্দু মুসলমানের সুখ-দুঃখের কথাই এই পুস্তকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে।

---

* সমগ্র ভারতে হিন্দুর সংখ্যা ২০,৭১,৪৭,০২৬ (১০,৫১,৮৮,৯৫৫ জন পুরুষ ও ১০,১৯,৫৮,০৭১ স্ত্রীলোক)। তন্মধ্যে দেশীয় করদ রাজ্যসমূহে ৪,৮৭,২৬,৫৪৫ হিন্দুর বাস। মুসলমানের সংখ্যা ৬,২৪,৫৮,০৭৭ (৩,২২,৫৭,৬১০ পুরুষ ও ,০২,০০,৪৬৭ স্ত্রীলোক)। ইহাদিগের মধ্যে ৩,৩৯,৪৪৬ জন ব্রহ্মদেশের, ৮৬,০৮,২৩৭ জন দেশীয় রাজ্যের ও ২,৭৯,১৫৪ জন বৃটিশ বেলুচিস্থানের অধিবাসী। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ৯৪,৭৬,৭৫৯; তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশেই ৯১ লক্ষ ৮৪ হাজার বৌদ্ধের বাস। আর্য্য সমাজের মতাবলম্বী ৯২,৪২৯ জন, শিখ ২২ লক্ষ, ব্রাহ্ম ৪০৫০ জন, দেশীয় খৃষ্টান ২৩৵০ লক্ষ ইউরেশিয়ান ৮৯।০ হাজার এবং সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতির সংখ্যা প্রায় ৮৬লক্ষ।

ইংরাজ-শাসনের দোষ-গুণ।

"It is better to follow the real truth of things than an imaginary view of them."—

Machiavelli.

ভারতবাসী এককালে সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও দৈবের বিড়ম্বনায় ও আত্ম-কর্ম্ম-দোষে আজ পরাধীন, পরানুগ্রহ-জীবী। কবি গাহিয়াছেন,—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে!"

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক লর্ড মেকলে বলিয়াছেন,—

The heaviest of all yokes is the yoke of the stranger.

ফলতঃ পর-বশতার অপেক্ষা গুরুতর দুঃখ আর নাই। কিন্তু মূর্খের প্রভু হওয়া অপেক্ষা পণ্ডিতের গোলামি করা ভাল, ইহাও এ দেশের চিরন্তন প্রবাদ। ইংরাজ-রাজত্বে আমরা এ প্রবাদের সত্যতা পদে পদে উপলব্ধি করিতেছি। ভারতবর্ষ আজ বহু শতাব্দী "পর-দাস-দশায়" যাপন করিতেছে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে ভারতবাসী যেরূপ দাসত্বে কাল-ক্ষেপ করিতেছে, তাহা এক হিসাবে বহুলাংশে বরণীয়। ইংরাজ বৈদেশিক রাজা হইলেও বহুগুণে গুণবান্ ও সভ্যজাতি-নিচয়ের শীর্ষস্থানীয়। অন্ততঃ ভারতবাসীর পক্ষে যে সকল গুণ শিক্ষা করা বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ আবশ্যক, ইংরাজের সে সকল গুণ যথেষ্ট আছে। সুতরাং ইংরাজের সাহচর্য্যে ভারতবাসী যে একদিকে বিশেষ লাভবান্ হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে বলিতেন, ইংরাজের সংস্পর্শে যাহাতে ভারতবাসী সময়োপযোগী জ্ঞান, বিজ্ঞান, চরিত্রবল ও জাতীয় অভ্যুদয়ের অনুকূল গুণাবলী লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই ভগবান্ এই উভয় জাতির অপূর্ব্ব সংযোগ সাধন করিয়াছেন। ফলতঃ যতদিন ভারতবাসী পরাধীন অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইবে, ততদিন যেন তাহাদিগকে ইংরাজের অধীন হইয়াই থাকিতে হয়।

শ্বেতদ্বীপবাসী ইংরাজ সমগ্র ভারতবর্ষের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া এই বিশাল ভূমিখণ্ডবাসী জনসমাজের মধ্যে শান্তি-স্থাপন করিয়াছেন, দেশীয় দস্যু তস্করের হস্ত হইতে লোকের ধন-প্রাণ-রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন, বহিঃশত্রুর আক্রমণ-ভীতি দূর করিয়াছেন, প্রজাকুলের ন্যায়-বিচার-লাভের পথ বহু পরিমাণে পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিতরণে ভারতবর্ষ-বাসীর বহুল কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষার প্রভাবে এদেশবাসী, বৃটিশ প্রজার প্রকৃত অধিকার কি, ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। তাহাদিগের ন্যায্য অধিকার হইতে কেহ তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিলে, তাহারা প্রতিপক্ষকে আন্দোলনাদি বিধি-সঙ্গত উপায়ে নিরস্ত করিতে শিক্ষা করিয়াছে। ভারত-গবর্ণমেণ্ট যথোচিত সুবিধা প্রদান করিলে তাহারা স্বদেশের শাসন-কার্য্যে নানাপ্রকারে রাজপুরুষদিগের সহায়তা ও দেশের মঙ্গলের জন্য আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিবে, এ আকাঙ্ক্ষা শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে। ইংরাজ রাজ্যে তাহাদিগের এই আকাঙ্ক্ষা কখনই অপূর্ণ থাকিবে না, এ বিশ্বাসও পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। এই দেশের সমস্ত রাজনীতিক আন্দোলনই এই ধারণার প্রাবল্য বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে। বার্ক, মেকলে, ব্রাডল, ব্রাইট, ফসেট, কেন্, ডিগ্‌বী, কটন, স্মীটন, হিউম, ওয়েডারবরণ প্রভৃতি উদার-প্রকৃতি ইংরাজ রাজনীতিকেরা ভারতবাসীর এই মনোভাবের পুষ্টি-সাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। পক্ষান্তরে ম্যাক্‌স্‌মূলার, ম্যাক্‌ডোনেল, কাওয়েল, কোল-ব্রুক, জোন্স, প্রিন্সেপ প্রভৃতি মনীষিগণ ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন-পূর্ব্বক ভারতবাসীর পূর্ব্ব-গৌরবের লুপ্ত-প্রায় স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

ইংরাজের অনেক গুণ নীতিবাদীদিগের চক্ষে নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু পররাষ্ট্র-বিজয় ও সাম্রাজ্য-রক্ষা-কার্য্যে সে সকল গুণের আবশ্যকতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইংরাজের সাহায্যে যদি আমরা সেই সকল গুণের অধিকারী হইতে পারি, তাহা হইলে ভারতবর্ষের এই ত্রিশ কোটী বুদ্ধিমান, শ্রমশীল ও মিতাচারসম্পন্ন

অধিবাসীর দুঃসাধ্য কার্য্য বোধ হয় জগতে আর কিছুই থাকিবে না। ইংরাজ অধ্যাপকের টোলে অধীনতা, অন্ন-কষ্ট ও অপমানাদি ভোগ করিয়াও যদি আমরা তাঁহাদিগের প্রদত্ত সেই উৎকৃষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি, যদি উপযুক্ত গুরুর যোগ্য শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমাদের এই কষ্ট-বহুল গুরু-গৃহ-বাস সম্পূর্ণ সার্থক হইবে। উদার-চরিত ইংরাজও শিষ্যের যোগ্যতা-দর্শনে প্রীতিলাভ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইংরাজ জাতির চরিত্রে গুণের ন্যায় কতিপয় গুরুতর দোষও বিদ্যমান। কুটিলতা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ও বিজাতীয়ের প্রতি ঘৃণা প্রভৃতি তাঁহাদিগের দোষ, সর্ব্বত্র বিশ্রুত। ইংরাজ-চরিত্রের এই সকল দোষেও আমাদিগের সামান্য উপকার সাধিত হয় নাই। ভারতবাসীর সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও ধর্ম্মগত বিশেষত্ব রক্ষার পক্ষে ইংরাজের এই সকল দোষ বিশেষ সহায়তা করিতেছে। বিজেতার সহিত সম্পূর্ণ সম্মিলন, কখনই বিজিতদিগের পক্ষে মঙ্গলকর নহে। আকবরের সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাহাদি প্রচলিত হওয়ায় শৌর্য্যশালী রাজপুত জাতির কিরূপ অধোগতি হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। হিন্দু-ইউরোপীয়ানের মধ্যে শোণিত-সম্বন্ধ-স্থাপন মঙ্গলকর হইবে বলিয়া পূর্ব্বে অনেকে মনে করিয়াছিলেন; অনেক অনুকরণ-প্রিয় সংস্কারক এই প্রথার প্রবর্ত্তনের জন্য নাচিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদিগের অনেকেরই চক্ষুঃ ফুটিতেছে। ইংরাজ-চরিত্রের বিজাতি-বিদ্বেষই যে এরূপ ঘটনার কারণ, তাহা বলা বাহুলামাত্র। অও-রঙ্গজেবের বিধর্ম্মি-পীড়নের ফলে সেকালের হিন্দুগণ অধিকতর স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ও মহম্মদীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি বীত-শ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, স্থানে স্থানে শক্তি-সংগ্রহ করিয়া হিন্দু-রাজা-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালেও ইংরাজদিগের অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ও 'নেটিব'-বিদ্বেষের জন্য হিন্দু মুসলমানের মনোভাবের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষেরা ভারতবাসীর ধর্ম্মে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না বটে, কিন্তু তাঁহা-দিগের হস্তে অনেকস্থলে ব্যক্তিগতভাবে ভারতবাসীকে পদে পদেই লাঞ্ছিত হইতে হইতেছে। ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, চারিদিকে এই অপমান ও লাঞ্ছনার দৃশ্য ভারতবাসী সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছে। ইহার উপর পাদরি

গণও হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া তাঁহাদিগের বিদ্বেষ-ভাজন হইতেছেন। এ সকলের ফল ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ জাতীয় ইতিহাসে কোন না কোন আকারে নিশ্চিত পরিদৃষ্ট হইবে। এখনই পরিবর্ত্তনের সূচনা পরিলক্ষিত হইতেছে। পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষা ও জীবন-যাপন-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি ভারতবর্ষ-বাসীর পূর্ব্বে যেরূপ অনুরাগ দৃষ্ট হইত, এক্ষণে আর সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বরং নানাস্থলে বিপরীত ভাবই দেখা যাইতেছে। যাঁহারা পূর্ব্বে বিলাতী বেশভূষায় সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সাহেব সাজিয়া থাকিতেন, তাঁহারাও এখন ধুতি চাদর ধরিতেছেন এবং বিলাতী দ্রব্য আর স্পর্শ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। ইংরাজ জাতির চরিত্রগত যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছি, এ সকল যে তাহারই অনিবার্য্য ফল, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এই রূপে ইংরাজের দোষে গুণে আমাদের জাতীয় জীবনে অভিনব পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে। ইংরাজের সংসর্গে এই প্রাচীন মেধাবী জাতি জরা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্রমশঃ নবযৌবনের বল-লাভে অগ্রসর হইতেছে। এই বিশাল ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘর্ষে সর্ব্বত্র নব-জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। এক দিকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতি-যোগিতা, অন্য দিকে দারিদ্র্য, নৈরাশ্য ও উদ্বেগ, এক দিকে জ্ঞানা-লোকের বিস্তারে কুসংস্কারের উচ্ছেদ, অন্য দিকে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অভাবে সহিষ্ণুতার হ্রাস, একদিকে সংবাদ-পত্র, গ্রন্থ-প্রচার ও সভাসমিতির প্রতিষ্ঠাদ্বারা স্বদেশের মঙ্গল-সাধনে দেশবাসীর যত্ন, অপর দিকে মত-ভেদ ও সুযোগ্য নেতার অভাবে সে চেষ্টার বিফলতা প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতবর্ষের নিদ্রাভঙ্গ সূচিত হইতেছে।

ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে,ইংরাজের ন্যায় সহৃদয় সুসভ্য জাতির দোষ-গুণের আশ্রয়ে ভারতবাসী যে নূতন জাতীয় শিক্ষা লাভ করিতেছেন, জাপান ভিন্ন এসিয়ার কোনও দেশের ভাগ্যে তাহা অদ্যাপি ঘটে নাই। নবজীবন-লাভ-ক্ষেত্রে অধুনা ভারতবর্ষই বিস্তীর্ণ এসিয়া খণ্ডের মধ্যে, এক জাপান ভিন্ন, সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে সুসভ্য ইংরাজের ইহাই অক্ষয় মহাকীর্ত্তি। যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজ হইতে দাসত্ব-প্রথার উন্মূলন করিয়াছিলেন, এই মহান্ গৌরব তাঁহাদিগেরই যোগ্য। প্রায়

সপ্ততি বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 'রিফরম বিলের' আলোচনা-কালে মহামতি মেকলে ভারতীয় সমাজে এবম্প্রকার নব-জীবন-সূচনার সম্ভাবনা অনুভব করিয়া সদর্পে পার্লামেণ্ট মহাসভায় বলিয়াছিলেন,—

We are free, we are civilised, to little purpose, if we grudge to any portion of the human race an equal measure of freedom and civilisation. Are we to keep the people of India ignorant in order that we may keep them submissive? Or do we think that we can give them knowledge without awakening ambition? Or do we mean to awaken ambition and to provide it with no legitimate vent? Who will answer any of these questions in the affirmative?.........I have no fears. The path of duty is plain before us and it is also the path of wisdom, of national prosperity, of national honour. ......It may be that the public mind of India may expand under our system till it has out-grown the system,......they may in some future age demand European institutions. Whether such a day will ever come I know not. But never will I attempt to avert or to retard it. Whenever it comes, *it will be the proudest day in English history. It would indeed be a title to glory all our own.*

আমরা যদি মানব-সমাজের অংশ-বিশেষকে আমাদিগের সভ্যতা ও স্বাধীনতার সমান অধিকার-প্রদানে কুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে অকারণে আমরা সভ্যতা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। ভারতবাসিগণকে চিরকাল ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাধীন রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন রাখা কি আমাদিগের উচিত? অথবা আমরা তাহাদিগকে জ্ঞানালোক প্রদান করিব, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের মনে উচ্চাভিলাষ উদ্দীপ্ত হইতে দিব না, ইহাই কি আমাদিগের অভিপ্রায়? কিংবা উচ্চাভিলাষ উদ্দীপ্ত হইলেও ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাহার পূরণ করিব না, ইহাই কি আমাদিগের মনোগত ভাব? কে এই সকল প্রশ্নের একটিরও উত্তরে "হাঁ" বলিতে পারেন? * * * আমার মনে এ বিষয়ে কোনই আশঙ্কা হয় না। আমাদিগের সরল কর্ত্তব্য পথ পুরোভাগে প্রসারিত রহিয়াছে। এই পথই জাতীয় ঙ'ন, জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় সম্মানের পক্ষে প্রশস্ত। হয়ত আমাদিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষ. দান-পদ্ধতির ফলে কাল-ক্রমে ভারতবাসী জনসাধারণের চিত্তের এরূপ বিকাশ ঘটিবে যে, এই শাসন-পদ্ধতিতে তাহারা আর সন্তুষ্ট থাকিবে না। ভবিষ্যতে হয়ত তাহারা সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তনই প্রার্থনা করিতে পারে। এরূপ দিন কখনও উপস্থিত হইবে কি না, আমি জানি না। কিন্তু আমি কখনও এরূপ সময়ের আগমনে বাধা প্রদান করিব না। যেদিন সত্য সত্য ভারতে সেই অবস্থা উপস্থিত হইবে, ইংলণ্ডের ইতিহাসে সেই দিন সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে। বস্তুতঃ আমরাই সম্পূর্ণভাবে সেই গৌরবের অধিকারী হইব।

এই মহীয়সী বাণী উদার-হৃদয় তেজস্বী ইংরাজেরই উপযুক্ত। ভারতীয় সমাজের নবজীবন-লাভ-সম্বন্ধে মেকলের এই ভবিষ্যদ্বাণী এত দিনে সফল হইয়াছে। দীর্ঘকালের নিদ্রা-মগ্ন ভারতবাসী অজ্ঞান ও

আলস্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পাশ্চাত্য-জ্ঞানালোকদীপ্ত কর্ত্তব্য-মার্গে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠায় সেই যোগ্যতার প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জাতীয় মহাসমিতির জন্ম-গ্রহণের পর হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন-প্রদেশবাসী শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ক্রমেই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইতেছে, ভারতের শুভাশুভ সম্বন্ধে মতভেদ দূরীভূত হইয়া ক্রমশঃ তাঁহাদিগের ঐকমত্য সংঘটিত হইতেছে। কংগ্রেসের আদর্শে সামাজিক সমিতি, শিল্প-প্রদর্শনী, প্রাদেশিক সমিতি, প্রভৃতি অভিনব সভা-সমিতি সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। কায়স্থ, জৈন, বৈশ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরাও আপনাদিগের সামাজিক উন্নতি-সাধনের জন্য সভা-সমিতি স্থাপন করিতেছেন। মুসলমানদিগের শিক্ষা-সমিতিও কংগ্রেসেরই অন্যতর ফল। এক জাতীয় মহা-সমিতির প্রভাবে সমগ্র ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে নূতন কর্ম্ম-স্রোতের প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই ভারতে ইংরাজ-শাসনের প্রধান সুফল; এল্‌ফিন্‌ষ্টোন, বেণ্টিঙ্ক ও রিপণ প্রভৃতি মনীষী শাসন-কর্ত্তাদিগের ইহাই অক্ষয় কীর্ত্তি, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মেকলে প্রভৃতি দূরদর্শী রাজ-নীতিকগণ ভারতবর্ষ-শাসনের যে প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, ভারতবর্ষস্থিত সকল শ্বেতাঙ্গ রাজ-পুরুষ যদি তাহার অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে আজ বৃটিশ ভারতীয় প্রজাবৃন্দের সুখ-সমৃদ্ধির সীমা থাকিত না। যদি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রণীত পার্লামেণ্টের বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইত, তাহা হইলে বৃটিশ-শাসন ভারতবর্ষে নানা প্রকারেই সর্ব্ব-জন-প্রিয় হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইল না। পার্লামেণ্ট মহাসভার প্রণীত বিধানে আদিষ্ট হইয়াছিল,—

And be it enacted that no native of the said territories nor any natural born suboject of His Majesty, resident therein, shall by reason of his religion, place of birth, descent, colour or any of them, be disabled from holding any place, office or appointment under the said Company.

এই বিধানে ভারতবাসী বর্ণ ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বৃটিশ ভারতের সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার উচ্চপদ লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এখান-কার রাজপুরুষেরা যদি কুটিলতা অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে এই বিধানের বলে আমরা আমাদের দেশের লাটসাহেবের পদে পর্য্যন্ত

নিযুক্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু প্রভুত্ব-প্রিয় রাজপুরুষেরা পার্লামেন্টের এই আদেশ-পালনে কখনও মনোযোগ করেন নাই। এ বিষয়ে ভারতের বড়লাট সাহেবের সভার আইন বিষয়ক সদস্য মিঃ হে ক্যামারণ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বিলাতের অনুসন্ধান-সমিতির সমক্ষে সাক্ষ্য-প্রদান-কালে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,—

Not a single native that I am aware of, has been placed in any better position in consequence of that clause in the statute(of 1833 A. D.) than he would have been in, if no such clause had been enacted.

আমি যতদূর জানি,তাহাতে ১৮৩৩ সালের পার্লামেন্টের আইন অনুসারে এপর্য্যন্ত একজন ভারতবাসীকেও উচ্চ পদে নিযুক্ত করা হয় নাই। ঐ আইন পাস হইবার পূর্ব্বে তাহারা যে সকল পদে নিযুক্ত হইত, এখনও সেই সকল পদেই নিযুক্ত হইয়া থাকে—পূর্ব্বোক্ত আইনের জন্য তাহাদের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই।

ভারতবাসী যে যোগ্যতার অভাবে উচ্চপদ লাভ করিতে পারে নাই, তাহা নহে। এদেশের অর্থ-শোষণ করিবার উদ্দেশ্যেই গবর্ণমেণ্ট সমস্ত মোটা বেতনের পদে ইংরাজদের নিয়োগ করিয়া থাকেন। এদেশে এক এক জন সিবিলিয়ানের পোষণের জন্য গড়ে প্রায় ১৭০০ জন ভারতবাসীর সংবৎসরের উপার্জ্জন ব্যয়িত হইয়া যায়! ইহার পরিণাম সম্বন্ধে মিঃ আর, এন, কষ্ট নামক জনৈক সহৃদয় সিবিলিয়ান বলিয়াছেন,—

There is a constant drawing away of the wealth of India to England, as Englishman grows *fat* on accumulations made in India while the Indian remains as *lean* as ever. It is the jealousy of the middle Briton, the hungry Scot, that wants his salary, that shuts out all Native aspirations.

ইংরাজেরা ভারতে চাকরি করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ-পূর্ব্বক ইংলণ্ডে লইয়া যান। ফলে ভারতবাসী দিন দিন দরিদ্র ও ইংরাজেরা ধনশালী হইয়া উঠিতেছে। পরশ্রী-কাতর মধ্যবিত্ত ইংরাজেরা ও ক্ষুধিত স্কচেরা এ দেশের সব বড় বড় চাকরিগুলি চায়—কাজেই ভারতবাসীর সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির পথই রুদ্ধ হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন বাহাদুর তাঁহার একখানি গোপনীয় মন্তব্য পত্রে লিখিয়াছেন,—

No sooner was the Act passed than the Government began to devise means for practically avoiding the fulfilment of it. * * * We all know that these claims and expectations never can or will be fulfilled. We have had to choose between prohibiting them and cheating them, and *we have chosen the least straightforward course.*

এই আইন পাস হইতে না হইতে (ভারতবর্ষীয়) গবর্ণমেণ্ট উহা প্রতিপালনের দায় হইতে অব্যাহতি-লাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা

সকলেই জানি যে, ভারতবাসীর উচ্চপদ ও অধিকতর শাসনাধিকার-লাভ-বিষয়ক দাবী ও আকাঙ্ক্ষা কখনই পূর্ণ হইবে না—হইতে পারে না। এই কারণে প্রত্যক্ষ-ভাবে ভারতবাসীর নিয়োগে বাধা দান বা প্রবঞ্চনা দ্বারা তাহাদিগের গতিরোধ ভিন্ন আমাদিগের অন্য উপায় ছিল না। এতদুভয়ের মধ্যে আমরা কুটিল উপায়ের অবলম্বনই সঙ্গত মনে করিয়াছি।"

এই বলিয়া লর্ড লিটন বাহাদুর উদাহরণ-স্বরূপ সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থী ভারতীয় যুবকদিগের বয়স-হ্রাস-বিষয়ক নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় ইংরাজ-শাসনের ইতিহাসে এই প্রকার কুটিলতাপূর্ণ ঘটনা বিরল নহে। ডিউক অব আর্জ্জিল ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই সকল প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

We have not fulfilled our duty or the promises and engagements which we have made.

আমরা (ভারতবর্ষ সম্বন্ধে) আমাদিগের কর্ত্তব্য-পালন করি নাই; আমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা রক্ষা করি নাই।

এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত গুপ্তপত্রে লর্ড লিটনও এই কথাই বলিয়াছেন,—

Since I am writing confidentially, I do not hesitate to say that both the Governments of England and of India appear to me, up to the present moment unable to answer satisfactorily the charge of having taken every means in their power of breaking to the heart the words of promise they had uttered to the ear."

খৃঃ ১৮৮৩ অব্দে লর্ড নর্থব্রুক মহোদয়, ১৮৩৩ সালের পার্লামেণ্টের প্রদত্ত আদেশ ও ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণা-পত্রের প্রতিশ্রুতি-সমূহ কার্য্যে পরিণত করা হইতেছে না বলিয়া অভিযোগ করিলে ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব লর্ড সলসবরি (ইনি তিনবার সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন) ঐ সকল আদেশ ও প্রতিশ্রুতিকে সর্ব্বজন-সমক্ষে অম্লান-বদনে political hypocrisy বা "রাজনীতিক কপটতা" বলিয়া উড়াইয়া দেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ রাজপুরুষই বলিয়াছিলেন,——

India must be bled.

"ভারতবাসীর শোণিত অবশ্যই শোষিত হইবে!"

পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা এম, এ, মহোদয় গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে নানা সূত্রে ভারতবাসীর নিকট হইতে ইংলণ্ডের প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ,

বালক বালিকা গড়ে বার্ষিক ১৫৲ টাকা করিয়া গ্রহণ করিতেছে! শোণিত-শোষণ আর কাহাকে বলে?

লর্ড সল্‌সবরি মহারাণীর যে ঘোষণা-পত্রকে 'রাজনীতিক কপটতা প্রসূত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার একাংশ এইরূপ—

We desire no extension of our teritorial possessions; * * we shall respect the rights, dignity and honour of Native Princes as our own:

We hold ourselves bound to the Natives of our Indian territories by the same obligations of duty which bind us to all our other subjects, and those obligations, by the blessing of Almighty God, we shall faithfully and conscientiously fulfil.

And it is our further will, that, so far as may be, our subjects, of whatever race or creed, be freely and impartialiy admitted to offices in our service, the duties of which they may be qualified, by their education, ability and integrity, duly to discharge.

We know and respect, the feelings of attachment with which the Natives of India regard the land inherited by them from their ancestors, and we desire to protect them in all rights connected therewith, subject to the equitable demands of the estate and we wish that generally in framing and administering the law, due regard be paid to the ancient rights, usages and customs of India

When by the blessing of Providence internal tranquility shall be restored, it is our earnest desire to stimulate the peaceful industry of India, to promote works of public utility and improvements, and to administer its government for the benefit of all our subjects resident therein. In their prosperity will be our strength; in their contentment our security and in their gratitude our best reward. And may the God of all power grant to us and to those in authority under us, strength to carry out these our wishes for the good of our people.

ইহার ভাবার্থ এই যে—আমরা ভারতবর্ষে আমাদের বর্ত্তমান রাজ্যের আর বিস্তার কামনা করি না। আমরা ভারতীয় রাজন্যবর্গের স্বত্ব, অধিকার ও মান-সম্ভ্রমকে আমাদিগের নিজের স্বত্ব, অধিকার ও মান-সম্ভ্রমের ন্যায় মনে করিব। রাজ-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার জন্য আমরা আমাদের অন্য সকল প্রজার নিকট যে প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ রহিয়াছি, আমাদের ভারতবর্ষস্থ প্রজাদের নিকটেও সেই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ রহিলাম। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের প্রসাদে আমরা সরলচিত্তে ও বিশ্বস্তভাবে সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিব। পরন্তু আমাদিগের ইহাও বাসনা যে, আমাদের প্রজা-দিগের মধ্যে যাহারা সুশিক্ষা, কার্য্যদক্ষতা ও বিশ্বস্ততাদি গুণে রাজ-কার্য্য-নির্ব্বাহের যোগ্যতা লাভ করিবে, তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বিনা পক্ষ-পাতে আমাদের অধীন রাজকার্য্যে অবাধে নিযুক্ত করা হইবে।

উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত পৈতৃক ভূমির প্রতি ভারতবাসীর কিরূপ মায়া, তাহা আমরা জানি এবং তাহাদিগের এই মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করি। ভূমি-

সম্বন্ধে তাহাদিগের যে সকল স্বত্ব আছে, আমরা তাহা রক্ষা করিবার বাসনা করি, অবশ্য রাজার প্রাপ্য ন্যায্য কর-গ্রহণের অধিকার আমাদের থাকিবে, কিন্তু আইন কানুন প্রণয়ন ও পরিচালন করিবার সময় আমরা ভূমি সম্বন্ধে ভারতবাসীর প্রাচীন স্বত্ব ও ভারতীয় প্রাচীন রীতি ও প্রথার অনুমোদিত অধিকারাদির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রকাশ করিব। যখন ভগবানের অনুগ্রহে ভারতবর্ষে অভ্যন্তরীণ শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন ভারতের শান্তিপূর্ণ শিল্পাদির উন্নতি-বিধান, জন-হিতকর পূর্ত্ত-কার্য্যাদির বিস্তার ও সংস্কার এবং ভারত-বাসীর মঙ্গলকর শাসন-পদ্ধতির অবলম্বন করিবার আমাদের আন্তরিক বাসনা আছে। ভারতবাসীর সুখসমৃদ্ধির উপর আমাদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাদের সন্তোষেই আমাদের রাজ্যের নির্ব্বিঘ্নতা সম্পাদিত হইবে। তাহাদের কৃতজ্ঞতাই আমাদের চরম পুরস্কার-স্বরূপ হইবে। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমাদিগকে এবং আমাদের কর্ম্মচারীদিগকে আমাদের এই সকল প্রজা-হিতকর বাসনা পূর্ণ করিবার শক্তি দান করুন।

লর্ড কর্জ্জন একদা বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহারাণীর এই ঘোষণা-পত্রকে impossible charter বা অসম্ভব সনন্দ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে তিনি প্রতি কার্য্যে ঐ পবিত্র ঘোষণাপত্রের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিয়াছেন। ঘোষণা-পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, "আমরা ভারতে আর রাজ্য-বিস্তারের বাসনা করি না," কিন্তু লর্ড কর্জ্জন সে রাজঘোষণা অমান্য করিয়া কৌশলে নিজামের বেরার প্রদেশ বৃটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। রাজ-ধর্ম্মপালন-বিষয়ে ঘোষণাপত্রে মহারাণী তাঁহাদের অন্যান্য প্রজার ন্যায় ভারতবাসীরও নিকট সমান কর্ত্তব্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইলে বিলাতে রাজপুরুষেরা যেরূপ লোকমতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কার্য্য করিতে বাধ্য হন, এদেশেও সেইরূপ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু লর্ড কর্জ্জন ভারতীয় জন সাধারণের মতামতকে পদদলিত করিতে এক দিনের জন্যও যত্নের ত্রুটী করেন নাই। সুতরাং মহারাণীর রাজধর্ম্মপালনের প্রতিজ্ঞা কতদূর পালিত হইতেছে, সকলেই বুঝিতে পারেন। লর্ড কর্জ্জনের আমলে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভারতবাসীকে অবাধে রাজপদে নিযুক্ত করা দূরে থাকুক, রাজকার্য্যে যথাসম্ভব ফিরিঙ্গী ও শ্বেতাঙ্গনিয়োগের ব্যবস্থাই হইয়াছে। পরন্তু প্রতিযোগী পরীক্ষার বিলোপ-সাধন করিয়া যোগ্যতার আদর কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর ভূমিস্বত্বের কথা। সেক্ষেত্রেও প্রাচীন রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, ভারতের নানাস্থানে প্রজাদিগের জমি দান বা বিক্রয় করিবার সনাতন অধিকার হইতে

তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। আর স্বদেশী দ্রব্য-ব্যবহারের আন্দোলন দমন করিবার জন্য ছাত্র-দলনের চেষ্টা, জমিদার-দিগকে ভয়-প্রদর্শন, দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে স্পেশ্যাল কনষ্টেবল-শ্রেণীভুক্ত করণ ও মুসলমান ভ্রাতাদিগকে ভুলাইয়া বিপথগামী করিবার চেষ্টায় পরলোকগতা মহারাণীর দেশীয় শিল্পাদির উন্নতি-সাধনের "আন্তরিক বাসনা" কিরূপ কার্য্যে পরিণত হইতেছে, তাহা এস্থলে বিস্তারিত-রূপে বিবৃত না করিলেও চলিতে পারে। পরিশেষে প্রজার যে কৃতজ্ঞতাকে মহারাণী আপনার চরম পুরস্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, লর্ড কর্জ্জন সে কৃতজ্ঞতা-লাভের বিশেষ কোনও চেষ্টা করেন নাই। নানা-কারণে রাজকোষে আশাতীত অর্থ উদ্বৃত্ত হওয়ায় আয়কর ও লবণের শুল্ক কিঞ্চিৎ কমাইয়া তিনি প্রজার যে উপকার করিয়াছেন, তাঁহার নানা কার্য্যে প্রজার তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিই সাধিত হইয়াছে। তাঁহার কার্য্যে মহারাণীর ঘোষণা-পত্র "অসম্ভব সন্দেহই" পরিণত হইয়াছে।

এখানকার এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ ওয়ালেস তাঁহার "বৃটিশ ইণ্ডিয়া রেকর্ড" পত্রে লর্ড কর্জ্জনের এই প্রকার দুই একটি ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারত-সচিব ও রাজ-প্রতিনিধির কুটিলতায় মহারাণীর ঘোষণা-বাণী এদেশে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহার উক্তিটি এই,—

"The proclamation of queen victoria, though virtually a pure and lovely document is an etherial myth, moribund as a corpse. It has been left to Lord George Hamilton and to Lord Curzon to break the Victorian proclamation, to mar its beauty, to cloth it with a large garment of duplicity and to convert a solemn Heaven born pledge into a hollow mockery."

এখানকার যথেচ্ছাচার রাজপুরুষেরা এইরূপে পার্লামেণ্টের আদেশ ও মহারাণীর ঘোষণাবাণীর লঙ্ঘন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা বলেন, ভারতের শাসন-ব্যাপারে পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপ অশেষ অনিষ্টের নিদান; ভারত গবর্ণমেণ্টকে যথেচ্ছভাবে শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কর্জ্জন বিলাতে স্পষ্টাক্ষরে এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে পার্লামেণ্টের ভূত-পূর্ব্ব সদস্য মিঃ জে, এম, ম্যাকলীন ইংলিশম্যান-পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের বড় লাটেরা কি সম্রাটের ন্যায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতারই পরিচালনা করেন না? পার্লামেণ্ট কবে ভারতের শাসন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

করিয়াছেন? যখন লর্ড সল্‌সবরি ভারত-সচিব ছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, যখন পার্লামেণ্টে ভারতের কোন প্রতিনিধি নাই, তখন ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের প্রতি মহাসভার বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। কিন্তু পার্লামেণ্ট সাধারণতঃ এই কর্ত্তব্য পালন করেন না, নিতান্ত গুরুতর বিষয় না হইলে ভারতের শাসন-সংক্রান্ত কোন কথারই আলোচনা করেন না। যখন বিলাতে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন যাহাতে ভারতের সিবিলিয়ান ও সামরিক কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তিগণ ঐ কাউন্সিলে স্থান প্রাপ্ত হন, সেই চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ভারত-সচিব এরূপ স্বাধীন-প্রকৃতি সহযোগীদিগকে লইয়া কার্য্য করিতে অসম্মত হইলেন। কাজেই ক্রমে ক্রমে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে ভারত-সচিবের মনোনীত "ধামাধরা" সদস্যগণই স্থান প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। সুতরাং এক্ষণে কর্ত্তারা সর্ব্ব বিষয়েই এক প্রকার নিরঙ্কুশ হইয়াছেন।

"পূর্ব্বে চিফ জষ্টিস প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরা গবর্ণমেণ্টের শাসন-প্রণালীর সমালোচনা করিতে পারিতেন, তাহাতে কিছু সুফল ফলিত। কিন্তু এখন আর সে রীতি নাই। বড় লাটের মন্ত্রণা-সভাতেও স্বাধীন-চিত্ত লোকের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত বহু পরিমাণে বিলুপ্ত করা হইয়াছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগের সুযোগ্য ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ অবাধে সংবাদ-পত্রে রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেন। তাহাতে লেখকেরাও যশস্বী হইতেন, গবর্ণমেণ্টেরও যথেষ্ট সহায়তা হইত, তাঁহারা আপনাদিগের কার্য্যের দোষ গুণ বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু এখন কেহ ঐরূপে মত-প্রকাশ করিলে তাঁহার চাকরী থাকে না! এমন কি, প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রের সম্পাদক-দিগকেও, গোপ্য-প্রচার নিবারণী ব্যবস্থার মাহাত্ম্যে কখন কারাগারে যাইতে হয়, এই ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইতেছে। ইহা কি জুলুম ও যথেচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা নহে? লর্ড কর্জ্জনের কঠোর শাসনে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা রুষীয় প্রজার স্বাধীনতা দেখিয়া হিংসা করিতে পারে।"

বিলাতের "ট্রুথ্‌" পত্রের সম্পাদক একবার দেখাইয়াছিলেন, যে, মধ্যএসিয়ার রুষীয় শাসন-পদ্ধতি কয়েকটি বিষয়ে ইংরাজের ভারত-শাসনের পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এখন আর যথেচ্ছাচার শাসনপদ্ধতির উদাহরণস্বরূপ কেহই রুষীয় শাসনপ্রণালীর উল্লেখ করিতে পারিবেন না। রুষীয় প্রজাকুল দীর্ঘকালের চেষ্টার পর বহুলাংশে ইংলণ্ডের ন্যায় সভ্যতাসঙ্গত প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র লাভ করিয়াছে। সুতরাং সভ্যজগতে এখন এক ভারতবর্ষ ভিন্ন যথেচ্ছাচার-মূলক শাসন-প্রণালী পৃথিবীর আর কুত্রাপি বিদ্যমান রহিল না, একথা "ইংলিশম্যান্‌"-পত্রের সম্পাদককেও সংপ্রতি স্বীকার করিতে হইয়াছে।

ফলকথা, পার্লামেণ্ট ও বৃটিশ মনীষিগণ ভারতবাসীর উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলেও বহুসংখ্যক কুটিল-প্রকৃতি ও অবৈধ-ক্ষমতা-প্রিয় রাজ-পুরুষ বহুদিন হইতে ভারতবাসীদিগের উন্নতি-মার্গে সযত্ন কণ্টকারোপ করিয়া আসিতেছেন। এই কারণে ভারতবাসী বৃটিশ-শাসনে বাঞ্ছিত সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিল না। তাহারা বৃটিশ প্রজার প্রকৃত অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিল। ভারতে বৃটিশ-শাসনের সুফলের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ শান্তি-প্রতিষ্ঠা, ন্যায়-বিচার ও জ্ঞান-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, দুর্নীতিপরায়ণ রাজ-পুরুষদিগের দুর্ব্ব্যবহারে যে প্রজাকুলের স্বাস্থ্য, সম্পত্তি ও চরিত্র-গত অবনতির সূত্রপাত হইবে, একথা দূরদর্শী নীতি-বিশারদ ব্যক্তিগণ বহুপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

"The consequence of the conquest of India by British arms would be, in place of raising, to debase the whole people."—*Sir Thomas Munro.*

বৃটিশ জাতির দ্বারা ভারতবর্ষ-বিজয়ের ফলে, উন্নতির পরিবর্ত্তে সমগ্র ভারত-বাসীর অধোগতি সাধিত হইবে।

স্যার টমাস মনরোর এই ভবিষ্যদ্বাণী অদ্য বহু অংশে ফলবতী হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল স্যার জন শোর মহোদয় বলিয়াছেন,—

There is reason to conclude that the benifits are more than counter-balanced by evils inseparable from the system of a remote foreign dominion."

ইংরাজ-শাসনে ভারতবাসীর উপকার অপেক্ষা অপকার যে বহুগুণে অধিক হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ আছে। দূরস্থিত বৈদেশিক রাজশক্তির শাসন-ফলে, এরূপ অপকার অনিবার্য্য।

মিঃ মেরিডিথ টাউনসেণ্ড প্রণীত Asia and Europe নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত মন্তব্য দৃষ্টিগোচর হইবে,—

"It is the active classes who have to be considered, and to them our rule is not, and can not be a rule without prodigious drawbacks....The greatest one of all is the loss of the interestingness of life. It would be hard to explain to average Englishman how interesting Indian life must have been before our advent; how completely open was every career to the bold, the enterprising or the ambitious... Life was full of dramatic changes. I firmly believe that to the immense majority of the active classes of India the old time was a happy time.

"ভারতের কর্ম্মশীল জন-সাধারণের উন্নতির পক্ষে আমাদিগের শাসন ভয়ঙ্কর বিঘ্ন-সঙ্কুল; আমাদিগের শাসনের এই বিঘ্ন তিরোহিত হইতে পারে না। ইংরাজ-শাসনে, তাহাদিগের জীবনে সরস-ঘটনা-বৈচিত্র্যের অভাব ঘটিয়াছে; ইহাই তাহাদের

সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি। আমাদিগের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবাসীর জীবন কিরূপ মনোহর বৈচিত্র্যময় ছিল, সাহসী, উৎসাহ-পরায়ণ ও উচ্চাভিলাষ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে সাফল্য-লাভ কিরূপ সহজ ছিল, তাহা সাধারণ শ্রেণীর ইংরাজকে বুঝান কঠিন। ভারতবাসীর জীবন তখন নাটকের ন্যায় ঘটনা-বহুল ও পরিবর্ত্তনশীল ছিল। (এস্থলে গ্রন্থকার শিবাজী, রণজিৎ সিংহ ও হায়দার আলির অভ্যুদয়ের উল্লেখ করিয়াছেন) আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অন্ততঃ কর্ম্মশীল ভারতবাসীর অধিকাংশ ইংরাজের আগমনের পূর্ব্বে পরম সুখে দিনযাপন করিত।

বর্ত্তমান কালের রাজ-পুরুষেরা যে এ কথা বুঝিতে পারিতেছেন না, তাহা নহে। ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব লর্ড জর্জ হ্যামিণ্টনও একথা স্বীকার করিয়াছেন,—

"Our Government never will be popular in India." "Our Government never can be popular in India." (The Times 16-6-99.)

অর্থাৎ আমাদিগের শাসন ভারতবর্ষে কখনও জন-প্রিয় হইবে না—কখনও জন-প্রিয় হইতে পারে না।

ভারতীয় প্রজার বিধাতৃ-পুরুষের মুখে এইরূপ নিষ্ঠুর বাণী শ্রবণ করিলে হৃদয়ে স্বভাবতই বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন রিফরম বিল বা ভারতীয় শাসনের সংস্কার বিষয়ক বিধান প্রণীত হয়, তখন ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরিণামদর্শনে বিচলিত হইয়া ইংলণ্ডীয় রাজনীতি-বিশারদেরা ভারতের শাসন-সম্বন্ধে যে সকল উদার নীতির নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এবং সিপাহী বিদ্রোহের পর ভয়-বিহ্বল চিত্তে যে নীতি পুনর্ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে আজ ভারতবাসী লর্ড মেকলের বর্ণিত স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়া পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত। কিন্তু রাজপুরুষদিগের কুটিলতায় ও যথেচ্ছাচারে তাহা হইল না। পক্ষান্তরে তাঁহারা এই প্রাচীন শৌর্য্য-বীর্য্যশালী জাতিকে কিরূপ দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা লর্ড কর্জ্জনের একটি বক্তৃতাংশ উদ্ধৃত করিলেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিলাতের ইউ- নাইটেড ক্লবে বক্তৃতাকালে তিনি বলিয়াছেন,—

We must remain in India, because if we were to withdraw, *the whole system of Indian life and politics would break up like a pack of cards.* We are absolutely necessary in India. I can not myself concieve of a time as remotely possible in which it would be either practical or desirable that we should take our hand from the Indian plough."

আমাদিগকে (ইংরাজদিগকে) ভারতে থাকিতেই হইবে। কারণ, যদি আমরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাই, তাহা হইলে এই বিশাল ভারতীয় সমাজ তাসের ঘরের ন্যায় দেখিতে দেখিতে বিনষ্ট হইবে। অতএব ইংরাজের ভারতে থাকা নিতান্ত দরকার। আমরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব—এমন দিন যে সুদূর ভবিষ্যতেও কখনও আসিবে, তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না; সেদিন কখনও আসুক অর্থাৎ ভারতবাসী নিজ পদভরে কখনও দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হউক, ইহা আমি কখনও প্রার্থনীয় বলিয়াও মনে করি না।

লর্ড কর্জ্জনের ন্যায় শাসন-কর্ত্তাদিগের শাসনে ও শোষণে ভারতবাসী কিরূপ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, মেকলের আশা কিরূপ নির্ম্মূল হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শুদ্ধ মেকলে নহেন, মনস্বী ঐতিহাসিক হণ্টার মহোদয়ও ভারতের শাসন-নীতি এবং ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—

The whole aim of British policy in India should be to prepare and fit the people of India for self government, to lift India to the position of a series of self-governing colonies, like the colonies of Australia or Canada.

"অর্থাৎ ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্য করিয়া ভারতবর্ষকে অষ্ট্রেলিয়া, কানেডা, প্রভৃতি উপনিবেশের সমশ্রেণীস্থ করিয়া তোলা ভারতে বৃটিশ-রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

কিন্তু হায়! কোথায় আমরা স্বায়ত্ত-শাসনে অধিকার ও দক্ষতা দিন দিন অধিক মাত্রায় লাভ করিব, না, লর্ড কর্জ্জনের আমলে আমাদের পূর্ব্বলব্ধ স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনেরও সংকোচ সাধিত হইল! দুঃখের বিষয়, ঔদারনীতিক ভারত-সচিব মিঃ জন মর্লি ও ১৯০৪।৫ সালের বজেট বিচার কালে বক্তৃতায় পার্লামেণ্ট মহাসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"For as long a time as my poor imagination can pierce through, for so long a time, our Government in India must partake, and in no small degree of the personal and absolute element."

ভাবার্থ এই যে, আমার ক্ষুদ্র চিন্তাশক্তির সাহায্যে আমি যতদিনের ভবিষ্যৎ বিষয়ে কল্পনা করিতে পারি, ততদিন ভারতবর্ষে আমাদের শাসন-প্রণালীকে বহুল পরিমাণে ব্যক্তিনিষ্ঠ ও অবাধ রাখিতে হইবে বলিয়া আমার মনে হয়।

এস্থলে "বহুল পরিমাণে ব্যক্তিনিষ্ঠ ও অবাধ শাসন-প্রণালী" অর্থে যে যথেচ্ছাচার শাসন-প্রণালী বুঝাইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য ফল কথা, ইংরাজের শাসন প্রণালী যে সকল দোষে দুষ্ট হওয়ায় ভারতীয় প্রজাকুলের অবনতির কারণ-স্বরূপ হইয়াছে, তৎসমূহের নিরাকরণ না

ঘটিলে বৃটিশ-শাসন কখনও এদেশবাসীর সুখকর হইবে না। এই কারণে বৃটিশ শাসন-পদ্ধতির দোষগুণের ও তৎফলাফলের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। আন্দোলন আলোচনা ভিন্ন কখনও কোনও দোষের সংশোধন হয় না।

আর এক কথা; স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু সাম্য"শীর্ষক পুস্তকে বলিয়াছেন—

যদি পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও কথা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সেই কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজ এবং রাজ-নিয়ন্তা না হইলে, রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না অবনতি হয় যদি কেহ কিছু না বলে, তবে রাজপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই আত্ম-সুখে রত, কার্য্যে শিথিল ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী ও অলস, সেই স্থানেই রাজপুরুষদিগের ঐরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। * * * যে দেশে প্রজার অবস্থা ভাল, সেদেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ দুর্গতি ঘটে না। তাহারা রাজার দুর্ম্মতি দেখিলে তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। রাজপুরুষগণও প্রজার অনর্থক অসন্তোষের ভয়ে সতর্ক থাকেন। এইরূপ পরস্পরের উপরোধেই উভয় পক্ষের উন্নতি হয়; তদ্ভিন্ন রাজকার্য্যের অপক্ষপাত সমালোচনায় মানসিক গুণসকলের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়। অভাবে তৎসমূহের লোপ হয়।

পুরাকালে ঋষিমুনিগণ রাজকার্য্যের সমালোচক ও নিয়ন্তা ছিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্র প্রজার সমালোচনা শুনিয়া জানকীদেবীকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মধ্যযুগে রাজন্যবর্গ নিরঙ্কুশ-প্রায় হইয়া এরূপ দুষ্ক্রিয়ান্বিত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠেন যে, মুসলমানদিগের হস্তে তাঁহাদিগের বিলোপ ঘটে! পক্ষান্তরে রোমে প্লিবিয়ানদিগের বিবাদে ও ইংলণ্ডে "কমন"দিগের বিবাদে রাজা ও রাজপুরুষদিগের স্বভাবিক উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল! ভারতে প্রকৃতিপুঞ্জের নির্ভীক সমালোচনায় ইংরাজ রাজপুরুষদিগেরও চরিত্রের উন্নতি ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায়

দেশের অবস্থা।

"কহিতে বুক চায় দু'ভাগ হ'তে।
নয়নে উথলে জল-স্রোত শতে॥"

ইংরাজ ত্রিবিধ সংগ্রামে ভারতবর্ষ জয় করিয়া নির্ব্বিঘ্নে শাসনদণ্ডের পরিচালন করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের সংগ্রামকে আমরা

"বাহু-যুদ্ধ" নামে অভিহিত করিতে পারি। রাজনীতিক কূট কৌশলে, ও অভিনব অস্ত্র-শস্ত্রের বলে, ইংরাজ এদেশে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তাহা এই প্রকার সংগ্রামের ফল। অতি প্রাচীন কাল হইতে ইংরাজের আগমন-কাল পর্য্যন্ত এদেশে এইরূপ সংগ্রামই রাজ্য-লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া পরিগণিত ছিল। দেশবাসীর বাহুবল বিনষ্ট বা বিনত হইলেই এতদিন বিজেতারা সন্তুষ্ট হইতেন। এই কারণে এই প্রকার যুদ্ধকে "বাহু-যুদ্ধ" নামে অভিহিত করিয়াছি। ইহাকে "শারীর যুদ্ধ" নামেও আখ্যাত করিতে পারা যায়।

ইংরাজের এদেশে পদার্পণের পর হইতে ভারতবাসী এক অভিনব সংগ্রামের পরিচয় প্রাপ্ত হইল। এই সমরে আহূত হইয়া তাহারা আপনাদিগের ধন-বল হারাইল। পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা "বাণিজ্য-সংগ্রামের" কথা বলিতেছি। বণিগ্‌রাজ ইংরাজের সহিত বাণিজ্য-যুদ্ধে আমরা কতদূর বিপন্ন হইয়াছি, তাহা অনেকেরই সুবিদিত আছে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষ অশেষ-শিল্প-পণ্যের প্রধান উৎপত্তি-স্থান ছিল, এসিয়া ও ইউরোপের বিপণী-শ্রেণী যাহার শিল্পসামগ্রীতে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিয়া বৈদেশিকদিগের বিস্ময় ও অসূয়া উৎপাদন করিত, সেই ভারতবর্ষের অধিবাসীরা এখন সামান্য সূচী-সূত্র-ক্রীড়নক হইতে যন্ত্র-যানাদির উপকরণ পর্য্যন্ত,—জীবনযাত্রা ও সমাজযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যের জন্য নিতান্ত দীনের মত পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। এদেশে এক্ষণে ইংরাজের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভারতবাসীর বাহু-বল ও অস্ত্র-বল হ্রাসের সহিত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজের "বাহু-যুদ্ধ" ইদানীং স্থগিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদিগের বাণিজ্য-সংগ্রামের অদ্যাপি বিরাম হয় নাই; কখনও হইবে কি না, ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন। বাষ্পীয় শকট, তাড়িত বার্ত্তাবহ, পণ্যবাহী অর্ণব-পোত ও অবাধ-বাণিজ্য-নীতি এই সমরের প্রধান অস্ত্র। প্রবল রাজ-শক্তির দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত শ্বেতাঙ্গ বণিক্-সমাজ এই সমরের যুযুৎসু। দুর্ব্বল ভারতবাসীর ধন-হরণ ও ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যাদির বিনাশ ইহার প্রধান লক্ষ্য। এই সংগ্রামে দিন দিন আমাদিগের ধন বল হ্রাস পাইতেছে। দুর্ভিক্ষ আমাদিগের নিত্য-সহচর হইয়াছে। দেশবৎসল কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

"নিজ অন্ন পরে কর-পণ্যে দিলে।
পরিবর্ত্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে॥"

ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে নেত্রপাত করিলে, দুর্ভিক্ষের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই কিরূপ ঘনিষ্ঠ হইতেছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইবে। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এক প্রকার অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, ইংরাজী ইতিহাসে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ শত বৎসরের মধ্যে ভারতে চারি বারের অধিক দুর্ভিক্ষ-পাত হয় নাই। দুর্ভিক্ষের বিক্রমও এক একটি প্রদেশেই আবদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে ইংরাজের শাসন ক্রমশঃ বিস্তার-লাভ করিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসও আপনার আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। বিগত শতাব্দীর প্রথম পাদে বা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কালে সমগ্র বৃটিশ ভারতে দশ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষ-জনিত অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। উহার দ্বিতীয় পাদে পাঁচ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এদেশে সিপাহী-বিদ্রোহ সংঘটন ও পরিণামে সমগ্র ভারতে ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেই পঞ্চবিংশ বৎসরে দুর্ভিক্ষও আপনার শাসন এদেশে সুদৃঢ় করিয়াছে। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, খ্রীষ্টীয় ১৮৫০ অব্দ হইতে ১৮৭৫ অব্দের মধ্যে বৃটিশ ভারতে ছয় বার দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে পঞ্চাশ লক্ষ ভারতবাসী জঠর-যন্ত্রণায় ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের দুর্ভিক্ষ-কাহিনী অধিকতর শোকাবহ। এই পঞ্চবিংশ বর্ষের মধ্যে এদেশে অষ্টাদশ বার দুর্ভিক্ষ-দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই মহানলে প্রায় ২ কোটী ৬০ লক্ষ মহাপ্রাণী ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শুদ্ধ বিগত দশবৎসরেই এক কোটী ৯০ লক্ষ ভারত-সন্তান "হা অন্ন! হা অন্ন!" করিয়া বিষম যন্ত্রণায় প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়াছে! এই হৃদয়-বিদারক দুর্ঘটনার বর্ণনা-প্রসঙ্গে, "দুর্ভিক্ষ-নিহত" হতভাগ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া মহামতি উইলিয়ম ডিগ্‌বি সি, আই, ই, মহোদয় গভীর খেদ সহকারে বলিয়াছেন,—

You have died. You have died uselessly.

"তোমরা মরিয়াছ। তোমরা অনর্থক মরিয়াছ!"

সাধারণের বিশ্বাস, যুদ্ধে যেরূপ লোক-ক্ষয় হইয়া থাকে, সেরূপ

আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে এই ধারণার ভ্রমাত্মকতা প্রতিপন্ন হইবে। ডিগ্‌বী মহাশয় দেখাইয়াছেন, বিগত ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এক শত সাত বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহে সর্ব্বসমেত ৫০ লক্ষের অধিক লোক নিহত হয় নাই। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ভারতে ৩ কোটী ২৫ লক্ষ লোক অনশনে পঞ্চত্ব-লাভ করিয়াছে। তৃণা-ভাবে গো-মেষ-মহিষাদি যে কত মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ফলতঃ ভারতের দুর্ভিক্ষ সর্ব্ব-লোকের ভয়প্রদ মহাসমর অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পশ্চিম ভারতে, মান্দ্রাজ অঞ্চলে ও বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষপাত হইয়াছে। ১৯০৬ সালের ২০শে জুলাই মিঃ ওগ্রাডি নামক জনৈক সদস্য পার্লামেণ্ট সভায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিগত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে সর্ব্ব-শুদ্ধ আটবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। ১৩১৩ সালে বঙ্গদেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তাহার বিষময় ফল আমরা অদ্যাপি ভোগ করিতেছি।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "ভারতীয় দুর্ভিক্ষের সহিত ইংরাজের বাণিজ্য-সংগ্রামের সম্বন্ধ কি? দেবতা বৃষ্টি না দিলে ক্ষেত্রের শস্য ক্ষেত্রে পুড়িয়া যায়। দেবতা বিরূপ হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে।" যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা এ বিষয়ের সম্যক্ তত্ত্ব অবগত নহেন। এই বিশাল ভারত-ভূমির সর্ব্বত্র কখনও এককালে অনাবৃষ্টি হয় না—অন্ততঃ বিগত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে এরূপ অভাব-নীয় ঘটনা কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। ভারতের এক অংশে অনাবৃষ্টি হইলেও অন্য অংশে সুবৃষ্টির কখনও অভাব হয় না। সুবৃষ্টি হইলে ভারতবর্ষের এক চতুর্থাংশ ভূমিতে এত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে যে, তাহাতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশসমূহের অধিবাসীদিগের অনশন-মৃত্যু অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে। দেশের সর্ব্বত্র রেলপথের বিস্তার হওয়ায় এক প্রদেশের অন্ন অল্প সময়ের মধ্যে অন্য প্রদেশে প্রেরণ করাও এখন আর কষ্ট-সাধ্য নহে। রাজপুরুষেরা বলেন, দুর্ভিক্ষকালে অন্ন-বহনের সৌকর্য্য-বিধানের উদ্দেশ্যেই বহু ব্যয় ও ক্ষতি-স্বীকার করিয়া এ দেশের সর্ব্বত্র রেলপথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, ইহা সত্ত্বেও ভারতে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আসল কথা এই যে, শস্যাভাব ভারতীয় দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ

নহে। পৃথিবীতে এরূপ অনেক দেশ আছে যে, সেখানে জনসংখ্যার অনুপাতে শস্যোৎপাদন-যোগ্য ভূমির পরিমাণ অতি সামান্য। বিলাতেই কৃষি-যোগ্য ভূমির অভাব অত্যন্ত অধিক। তথায় যে শস্যাদি উৎপন্ন হয়, তাহাতে সমগ্র ইংলণ্ডবাসীর ৯১ দিনের অধিক উদর-পূর্ত্তি হওয়া অসম্ভব। তথাপি বৎসরের অবশিষ্ট ২৭৪ দিন ইংলণ্ডবাসীকে অনশনে যাপন করিতে হয় না। জার্ম্মণির অবস্থাও অনেকাংশে এইরূপ। তত্রত্য লোকদিগকে যদি স্বদেশোৎপন্ন শস্যের উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে বৎসরের মধ্যে ১০২ দিন তাহাদিগের অন্নাভাব ঘটে। হল্যাণ্ড, মার্কিণ প্রভৃতি দেশে সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি ঘটিয়া কৃষিকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তথাপি সে সকল দেশে কখনও দুর্ভিক্ষপাত হইয়াছে, এরূপ কথা শুনা যায় না।

সুতরাং দেশে শস্যাভাব ঘটিলেই যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, এমন কথা বলা অসঙ্গত। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায় বা দৈবের বিড়ম্বনায় অন্নকষ্টের সম্ভাবনা হইলে সভ্যজাতিমাত্রেই দূরদেশ হইতে শস্য আনয়ন করিয়া আপনাদিগের প্রয়োজন-সিদ্ধি করিয়া থাকেন। আমাদিগের ভারতবর্ষ হইতেই প্রতি বৎসর প্রায় ১৬৷৷০ কোটী টাকার গোধূম ও তণ্ডুলাদি সমুদ্রপথে ঐ সকল দেশে গমন করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের ক্ষুধানিবৃত্তি করে। ইউরোপীয় দেশসমূহের লোকেরা সহস্র-যোজন-দূরবর্ত্তী দেশ হইতে শস্য-সংগ্রহপূর্ব্বক সুখ ও স্বচ্ছন্দতা-সহকারে কালযাপন করে, আর ভারত-সন্তান গৃহপার্শ্বে বিশাল শস্যশ্যামল ক্ষেত্র থাকিতেও দলে দলে অনশনে প্রাণত্যাগ করে!

ভারতবাসীর ধনবলের অভাবই এদেশে ঘনঘনদুর্ভিক্ষ-ঘটনার প্রধান কারণ। ভারতে অন্নাভাব অপেক্ষা অর্থাভাব সমধিক প্রবল। ইংরাজের বাণিজ্য-সংগ্রামে জর্জ্জরিত হইয়া আমরা এইরূপ কপর্দ্দক-শূন্য হইয়া পড়িয়াছি যে, এক বৎসর দৈব দুর্ব্বিপাকে ক্ষেত্রের শস্য ক্ষেত্রে মরিয়া গেলে আমাদের আর আত্ম-রক্ষার উপায় থাকে না। দেশের শিল্পবাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় কৃষিই এখন শতকরা ৮৫ জনের একমাত্র উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। অনাবৃষ্টিহেতু কৃষি নিষ্ফল হইলে লোকে এখন একেবারে সম্বল-শূন্য হইয়া পড়ে। অন্যস্থান হইতে শস্য-ক্রয় করিবার জন্য যেরূপ অর্থ-বলের প্রয়োজন, সেরূপ অর্থ-বল অনেকেরই নাই। দেশবাসীর

নিকট যদি শস্য-ক্রয়োপযোগী অর্থ থাকিত, তাহা হইলে ঘোর দুর্ভিক্ষের বৎসরেও আমাদের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ গোধূম-তণ্ডুলাদি বিদেশে রপ্তানি হইত কেন? লোকের তণ্ডুল কিনিবার শক্তি থাকিলে দুর্ভিক্ষ-কালে কখনই রাজানুগ্রহ-জীবীর (পুওর হাউস বা সরকারি অন্ন-সত্রে ও রিলিফে আশ্রয়-গ্রহণ-কারীর) সংখ্যা এত অধিক হইত না। পূর্ব্বে দেশে শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হেতু লোকের অর্থোপার্জ্জনের বহু পথ উন্মুক্ত ছিল, অর্থ-সঙ্গতি অধিক ছিল। তখন কৃষকের সংখ্যা অল্প ও কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকায় কৃষিকার্য্যেও যথেষ্ট অর্থাগম হইত। এই সকল কারণে, সেকালে দেশে দুর্ভিক্ষ-পাত হইলেও তাহার পরিণাম এখানকার মত ভয়াবহ হইত না।

বিগত আদম সুমারির রিপোর্টে দেখা যায়, ১৮৯১ সালে এদেশে যত লোক কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত, এক্ষণে তদপেক্ষা দুই কোটি অধিক লোক কৃষিকার্য্য করিতেছে। অর্থাৎ ১০ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল লোক ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, এক্ষণে সে সকল ব্যবসায়ের পথ রুদ্ধ হওয়ায় তাহারা নিরুপায় হইয়া কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। আদম সুমারির রিপোর্ট অনুসারে ঐ দশ বৎসরে ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা ৭০ লক্ষ ১৯ হাজারের অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং জন-সংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে কৃষিজীবীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, এমন কথা বলিতে পারি না। পক্ষান্তরে একদিকে যেমন গত দশ বৎসরে লোক-সংখ্যা ৭০ লক্ষ বাড়িয়াছে, তেমনই বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগের পরিচালিত অনেক কল কারখানাও এদেশে বাড়িয়াছে। এই সকল কারখানায় ঐ বর্দ্ধিত লোক-সংখ্যার অধিকাংশ মজুরী করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে। সুতরাং ১৮৯১ হইতে ১৯০১ সালের মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যা যে দুই কোটি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার সহিত দেশে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সম্বন্ধ অতি অল্প। আদম সুমারির রিপোর্টেই প্রকাশ যে, ১৮৯১ হইতে ১৯০১ সালের মধ্যে ১৪ লক্ষ জন চটের ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছে। স্বর্ণকার, কাংস্যকার ও জহুরীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ৬১৯ কমিয়াছে। কার্পাসবস্ত্র-বয়নকারী তন্তুবায়ের সংখ্যাও পূর্ব্বাপেক্ষা ১১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৫০ কম হইয়াছে। মাংস, তৈল, গুড় ও শর্করা-ব্যবসায়ীরও সংখ্যা-হ্রাস ঘটিয়াছে। এই সকল লোক পূর্ব্ব-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়াছে।

ইহাদিগের অনেকেই যে কৃষিকার্য্যের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে,তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকে পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া কৃষি-কর্ম্ম-গ্রহণে বাধ্য হওয়ায় কৃষকদিগের সংখ্যা দশ বৎসরে দুই কোটী বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপে দেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কৃষিযোগ্য উৎকৃষ্ট ভূমির পরিমাণ সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। অন্য-দিকে ইংরাজের সহিত বাণিজ্য-সংঘর্ষে বিপন্ন হওয়ায় লোকের ধন-বল দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। ফলে, দেশে দুর্ভিক্ষের ভীষণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে অর্থের দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইলেই অন্নের দুর্ভিক্ষও বিরল হইবে!

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আর্ল ক্রোমার মহোদয় গবর্ণমেণ্টের আদেশে ভারত-বাসীর আয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, গড়ে ভারতবাসীর আয় প্রতি জনে বার্ষিক ২৭ টাকা মাত্র! সেই সময়ে পার্শী-প্রবর শ্রীযুক্ত দাদা-ভাই নৌরোজী মহাশয় প্রতিপন্ন করেন যে, বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদিগের বার্ষিক আয় গড়ে জন প্রতি ২০৲ টাকার অধিক নহে! ইহার পর লর্ড ডফরীণের আদেশ-ক্রমে এদেশবাসীর আর্থিক অবস্থা-সম্বন্ধে একবার অনুসন্ধান হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাসত্ত্বেও, সে অনুসন্ধানের বিবরণ ও ফল এদেশের কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই। কিছুদিন হইল, মিঃ ডিগ্‌বী মহোদয়ের চেষ্টায় উহার কতিপয় অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল অংশে এদেশের লোকের দুরবস্থার যে শোচনীয় চিত্র প্রকটিত হই-য়াছে, তাহা পাঠ করিলে কোনও হৃদয়বান্ ব্যক্তিই অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, গত ১৯০১ সালের মার্চ্চ মাসে লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর বক্তৃতা- প্রসঙ্গে বলেন যে, বিগত দশ বৎসরের দুর্ভিক্ষাদি-জনিত অসীম ক্ষতি-সত্ত্বেও ইদানীং বৃটিশ ভারতীয় প্রজার বার্ষিক আয় গড়ে জন প্রতি অন্যূন ৩০ টাকা হইয়াছে। কিন্তু ডিগবী মহোদয় অশেষ শ্রম-সহকারে তাঁহার মতের বিশেষ ভাবে সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সরকারি গণনায় বহুল ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে। মিঃ ডিগবীর গণনামতে এক্ষণে বৃটিশ শাসনাধীন ভারত-সন্তানের বার্ষিক আয় গড়ে প্রতিজনে উর্দ্ধ সংখ্যায় আঠার টাকা নয় আনা মাত্র।

এই আয়ের অধিকাংশই কৃষি-লব্ধ। ইহার প্রায় এক সপ্তমাংশ বা

২।৶০ রাজকর প্রদানে ব্যয়িত হয়। আয়ের অনুপাতে ইংলণ্ডবাসীকে প্রতি পাউণ্ডে ১ শিলিং ৮পেন্স বা ১।০ টাকা ও ভারতবাসীকে (বার্ষিক আয় গড়ে ৩০ টাকা বলিয়া স্বীকার করিলে) দুই শিলিং ৪ পেন্স বা ১৸০ টাকা করিয়া ট্যাক্স দিতে হয়। সে যাহা হউক, মিঃ ডিগবীর হিসাবে এদেশের ধনী, দরিদ্র, বালক, বৃদ্ধ সকলের বার্ষিক আয় (ট্যাক্স বাদে) গড়ে প্রতি জনে ১৫।১৬ টাকার অধিক নহে। সঞ্চিত অর্থের হিসাব করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতবাসীর সঞ্চিত ধনের পরিমাণ নগদ ও অলঙ্কারাদিতে গড়ে জনপ্রতি ১৪ টাকা মাত্র!

ইহার সহিত একবার শিল্প-বাণিজ্য-প্রধান পাশ্চাত্য দেশসমূহের অধিবাসি-বৃন্দের আয়ের তুলনা করুন,—

দেশ	বার্ষিক আয়	দেশ	বার্ষিক আয়
রুশিয়া প্রতি জনে	১১ পাউণ্ড	জর্ম্মাণি প্রতি জনে	২২ পাউণ্ড
ইটালি „ „	১২ „	ক্যানেডা „ „	২৬ „
অষ্ট্রীয়া „ „	১৫ „	ফ্রান্স „ „	২৭ „
স্পেন „ „	১৬ „	বেলজিয়ম „ „	২৮ „
সুইজারল্যাণ্ড „	১৯ „	যুক্তরাজ্য (মার্কিন)	৩৯ „
নরওয়ে „ „	২০ „	অষ্ট্রেলিয়া „ „	৪০ „
হল্যাণ্ড „ „	২২ „	স্কটল্যাণ্ড „ „	৪৫ „

ইংলণ্ড-বাসীর বার্ষিক আয় ও সঞ্চিত ধনের পরিমাণ গড়ে জন প্রতি যথাক্রমে ৪২ ও ৩০০ পাউণ্ড। (১৫ টাকায় এক পাউণ্ড হয়।)

উল্লিখিত আয়ের সহিত তুলনা করিলে লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের নির্দ্দিষ্ট ভারতবাসী শিল্পজীবীদিগের (বার্ষিক ত্রিশ টাকা) আয়ও অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে জীবিকা-নির্ব্বাহ ভারতবর্ষের ন্যায় স্বল্প-ব্যয়সাধ্য নহে, এ কথা স্বীকার করি। তথাপি ভারতবাসীর বর্ত্তমান আয় যে স্বচ্ছন্দতার সহিত জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী নহে, এ কথাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। লর্ড কর্জ্জনের মতে ভারতীয় কৃষকের আয় গড়ে বার্ষিক ২০ টাকা। এই আয়ে তাহাকে চাষের খরচ ও খাজনা দিয়া সংবৎসরের অন্নসংস্থান করিতে হয়। সরকারি জেলখানার কয়েদীদিগের কেবল খোরাকির জন্য সরকারবাহাদুর বৎসরে প্রতিজনে গড়ে ২৪ টাকা করিয়া খরচ করিয়া থাকেন। সুতরাং

ভারতবর্ষে যাহারা জাল-জুয়াচুরি, চুরি, ডাকাতি করিয়া জেলে যায়, তাহাদিগের অপেক্ষা অন্নবস্ত্র-বিষয়ে কৃষকদিগের অবস্থা অধিকতর হীন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ হণ্টার সাহেব বরমিংহাম নগরে বক্তৃতা-কালে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে চারিকোটি লোক নিত্য অর্দ্ধাশনে জীবন যাপন করে। সে সময়ে বৃটিশ ভারতের লোক-সংখ্যা বিংশতি কোটিরও ন্যূন ছিল। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের সেটেলমেণ্ট আফিসাররূপে কার্য্য করিবার সময় দেশবাসীর অবস্থা পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—

"I do not hesitate to say that half our agricultural population never know from year's end to year's end what it is to have their hunger fully satisfied."

অর্থাৎ বৃটিশ ভারতীয় কৃষিজীবী প্রজার অর্দ্ধাংশ সংবৎসরের মধ্যে এক দিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তিতে যে কিরূপ সুখ, তাহা ইহারা কখনও জানিতে পারে না।

বৃটিশ ভারতে প্রায় বিংশতি কোটি লোক কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন-ধারণ করে। স্যার চার্ল স্ ইলিয়টের উক্তি অনুসারে এই বিংশ কোটির মধ্যে দশ কেটি লোক চিরকাল অর্দ্ধাশনে যাপন করে! ইলিয়ট মহোদয় যখন এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন এদেশে বিশ কোটি লোক কৃষিজীবী ছিল না সত্য; কিন্তু এলাহাবাদের অর্দ্ধসরকারি সংবাদ-পত্র "পাইওনীয়ার" ১৮৯৩ সালের মে মাসে ভারতীয় দারিদ্র্য-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দশ কোটি ভারত-প্রজার অর্দ্ধাশনের কথাই সপ্রমাণ হয়। উক্ত পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—

Nearly one hundred millions of people in British India are living in extreme poverty.

বৃটিশ ভারতে প্রায় দশ কোটী লোক ঘোর দারিদ্র্যে কাল-যাপন করে।

যে সমাজ এইরূপ ঘোর দারিদ্র্যে নিপীড়িত, সে সমাজে আধি-ব্যাধির প্রকোপ সহজেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বৃটিশ ভারতেও নিত্য নব রোগের সঞ্চার হইতেছে। ভারতবাসীর শরীর ক্রমেই ব্যাধি-মন্দিরে পরিণত হইতেছে। প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর কারণ যে, অন্নকষ্ট ও দারিদ্র্য, এ কথা বিজ্ঞ চিকিৎসকমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যে সকল দেশের লোকের পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্য-রক্ষার উপকরণ-সংগ্রহে অর্থের অভাব হয় না, সে

সকল দেশে প্লেগের প্রকোপ দেখিতে পাই না। পূর্ব্বে ইউরোপে ঘন ঘন প্লেগের আবির্ভাব হইত ও তাহাতে সহস্র সহস্র নরনারী প্রাণত্যাগ করিত! কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্যে পাশ্চাত্য ভূ-খণ্ডের দারিদ্র্য দূরীভূত হইবার পর হইতে আর তথায় প্লেগের বিক্রম প্রকাশ পায় না। ফল কথা, সমাজের ধন-বল যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে, মহামারীর প্রকোপও সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকে। *

দারিদ্র্য বশতঃ জ্বরের প্রভাবও ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারি মেডিকেল রিপোর্টে প্রকাশ যে,—

Fever is a euphemism for insufficient food, scanty clothing and unfit dwelling.

পুষ্টিকর খাদ্য ও পর্য্যাপ্ত বস্ত্রের অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানই জ্বর রোগের প্রধান কারণ। প্রতিবৎসর বৃটিশ ভারতে অন্যূন পাঁচ কোটী লোক জ্বরের যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এই পাঁচ কোটীর মধ্যে ৫০ লক্ষের অধিক লোক ইহধাম পরিত্যাগ করে। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে জ্বর রোগে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা এখনকার অপেক্ষা প্রায় ১৫ লক্ষ কম ছিল। ভারতবাসীর অন্নবস্ত্রের কষ্ট কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, এই দুর্ঘটনা হইতেও তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বঙ্গদেশে জ্বররোগে প্রতি বৎসর ১৭ লক্ষ জনের মৃত্যু হয়, আর কত লোক যে দুরন্ত ম্যালেরিয়ায় কষ্ট পায়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। †

---

* বিগত ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্লেগের সূত্রপাত হয়। কিন্তু প্রথম বর্ষ উহার রীতিমত হিসাব রক্ষিত হয় নাই। তথাপি ঐ বৎসরের আনুমানিক মৃত্যুসংখ্যা ধরিয়া ১৮৯৬ সালের শেষ পর্য্যন্ত বৃটিশ ভারতে ২॥০ হাজার লোকের প্লেগে মৃত্যু হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বর্ষে দেশীয় রাজ্যেও প্লেগ প্রবেশ করে। ঐবৎসর সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যে প্লেগে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৫৬ হাজার হয়। ১৮৯৮ সালে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ও ১৮৯৯ সালে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮ শত জন প্লেগে মরে! তাহার পর ১৯০০ সালে ৯৩ হাজার ১৫০ জন, ১৯০১ সালে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬৭৯ জন, ১৯০২ সালে ৫৸০ লক্ষের অধিক, পরবর্ষে ৮॥০ লক্ষের অধিক, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ১০ লক্ষ ২২ হাজার ২৯৯ জন, ১৯০৫।৬ সালে ১২ লক্ষ ৮৩ হাজার জন ও, ১৯০৬ সালে ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ও ১৯০৭ সালের ১লা জুন পর্য্যন্ত প্রায় ৯॥০ লক্ষ জন ভারতবাসী এই ভীষণ রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত ১১ বৎসরে ৫৬॥০ লক্ষ জনকে প্লেগের জন্য ইহধাম ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

† বঙ্গের কতিপয় বিশেষ বিশেষ জেলা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ক্রমশঃ জনশূন্য

অর্থাভাব, অন্ন-কষ্ট, ও আধি-ব্যাধির পরিমাণ-বৃদ্ধির সহিত ভারতবাসীর আয়ুঃক্ষয়ও ঘটিতেছে। ইংলণ্ডবাসীর জীবনকালের পরিমাণ গড়ে ৪০ বৎসর বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ভারতবাসীর আয়ুষ্কাল যে ইদানীং গড়ে ২৩ বৎসরের অধিক নহে, মহামতি ডিগবী তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতাকালে সরকারি রিপোর্ট অবলম্বনে দেখাইয়াছেন যে, বিগত বিংশতি বৎসর হইতে ক্রমাগত ভারতবাসীর মৃত্যুর সংখ্যা

হইতেছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বস্তুতই বিস্ময় ও ভীতির উদ্দীপক।

গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের লোক-গণনায় যশোহর জেলার লোকসংখ্যা ১৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮৭২ হইয়াছিল, কিন্তু ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারিতে ঐ জেলার লোকসংখ্যা ১৮ লক্ষ ১৩ হাজার ১৩৫ জন স্থির হইয়াছে। অর্থাৎ দশ বৎসরের মধ্যে ৭৫ হাজার ৭৩৭ জন কমিয়াছে। ১৯০১ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসরে ঐ জেলায় ওলাউঠা রোগে ২৩ হাজার ১২৬ জনের ও জ্বর রোগে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮৭০ জনের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। অর্থাৎ ওলাউঠায় প্রতি বৎসরে প্রায় ছয় হাজার ও জ্বরে বৎসরে প্রায় ৬ হাজার জন মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে। কিঞ্চিদধিক আঠার লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে এই মৃত্যুসংখ্যা যে কিরূপ গুরুতর, তাহা বুঝাইয়া বলা অনাবশ্যক। ইহার উপর আবার জন্ম-সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। আলোচ্য চারি বৎসরে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা ৪০ হাজার ১১৩ অধিক হইয়াছে।

নদীয়া জেলার অবস্থাও মোটের উপর যশোহরেরই অনুরূপ। কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, মেহেরপুর, চাকদহ, কুষ্টিয়া, ও কুমারখালি নদীয়া জেলার এই সাত স্থানেই জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা অধিক পরিদৃষ্ট হইয়াছে। নাটোর সবডিবিসনের অবস্থাও ঐরূপ শোচনীয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে এই সব-ডিবিসনের লোকসংখ্যা ২২ হাজার ৩৬জন কম হইয়াছে। ১৯০১ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসরে নাটোর মহকুমায় মৃতের সংখ্যা জাতের অপেক্ষা প্রায় ৮ হাজার অধিক হইয়াছে। মালদহ, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, প্রভৃতি বহু নগরের জন্ম-মৃত্যুর তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেও আমাদিগকে বিষাদে ম্রিয়মাণ হইতে হয়। একদিকে ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠা অধিবাসীদিগের জীবন-নাশ করিতেছে, অন্যদিকে জন্ম-সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপ প্রজা-নাশ দেখিয়াও গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত চৌধুরী মহাশয়ের প্রশ্নে আলোচিত জেলাগুলির স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করেন নাই।

বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ শাসনাধীন প্রদেশে গড়ে হাজার করা ২৩ জন মরিয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীঃ প্রতি সহস্র জনের মধ্যে ২৬ জন, ১৮৮৯ খ্রীঃ ২৮ জন, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ৩২ জন, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫ জন, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩৮ জন ও ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে! পক্ষান্তরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের মৃত্যুসংখ্যা কিরূপ কমিয়াছে, তাহা দেখুন,—১৮৮৩ খ্রীঃ হাজার করা ২১ জন, ১৮৮৯ খ্রীঃ ১৮ জন, ১৮৯৩ খ্রীঃ ১৭জন, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৬জন। ১৯০৩ সালেও ভারতে হাজার করা ৩৫জন মরিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডে ঐ সালে ১৬জনের অধিক মরে নাই।

বৃটিশ ভারতীয় প্রজাগণের দিনদিন কিরূপ বংশ ক্ষয় হইতেছে, তাহা নিম্নের তালিকায় নেত্রপাত করিলে উপলব্ধ হইবে,—

১৮৭০ সালে——১৮,৫৫,৩৭,৮৫৯ লোক-সংখ্যা।
১৮৮১ " ——১৯,৮৭,৯০,৮৫৩ "
১৮৯১ " ——২২,১১,৭২,৯৫২ "
১৯০১ " ——২৩,১০,৮৫,১৩১ "

ইংলণ্ডীয় যুক্ত রাজ্যে ও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতি বৎসরে গড়ে প্রতি সহস্রে ২৮ জন এবং ইটালি জর্ম্মাণিতে যথাক্রমে ৩৫ ও ৩৬ জন করিয়া লোক বৃদ্ধি পায়। তথাপি ঐসকল দেশে ভারতের ন্যায় সকলে বিবাহ করিয়া দাম্পত্য-জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয় না, রমণীগণও গর্ভ-ধারণ ও সন্তান-পালনের ক্লেশ-স্বীকারে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৮৮৪ খ্রীঃ অনুমান করিয়াছিলেন, বৃটিশ ভারতের প্রকৃত-পুঞ্জের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে প্রতি বৎসর গড়ে প্রতি সহস্রে ১০ হইতে ১৫ জন পর্য্যন্ত লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহ-হীন দাম্পত্য-জীবনপ্রিয়, শান্তিপূর্ণ উর্ব্বর দেশে শতকরা বৎসরে ১॥০ হিসাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া কিছুই অধিক নহে। এতদনুসারে ১৯০১ সালের লোক-গণনায় বৃটিশ ভারতীয় অধিবাসীর সংখ্যা ২৮ কোটী ২১ লক্ষ, ৭৯ হাজার ৮৮৬ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাহা হয় নাই। তদপেক্ষা ৫ কোটী ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৫৪ কম হইয়াছে। ১৮৮১ সালের লোক-গণনার সময় ব্রহ্মদেশ বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই, ব্রহ্মদেশের লোক সংখ্যা ৯২।০ লক্ষ। এই জন-সংখ্যা বাদ দিলে ১৮৯১ ও ১৯০১ সালের লোক-সংখ্যার পরিমাণ আরও কমিয়া যাইবে। *

---

* ১৯০১ সালের লোক-গণনায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, গত দশ বৎসরে ভারতবর্ষে

সমগ্র ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা বিগত দশ বৎসরে, শতকরা গড়ে ২॥০ জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরে (১৮৮১—১৮৯১ খ্রীঃ) কেবল বৃটিশ ভারতেই জন-সংখ্যা শতকরা ১১।০ হারে বাড়িয়াছিল; দেশীয় রাজ্যসমূহের বৃদ্ধির হার এতদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। বঙ্গদেশের লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির হারও বিগত ত্রিশ বৎসরে অনেক কমিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ, প্রথম দশ বৎসরে শতকরা ১১॥০ জন, পরবর্ত্তী দশ বৎসরে ৭।০ জন ছিল। শেষ দশ বৎসরে উহা ৫ জনে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ বঙ্গদেশে ত্রিশ বৎসরে বৃদ্ধির হার অর্দ্ধেক কমিয়াছে।

কেবল যে জনসংখ্যাই দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, তাহা নহে। গৃহ-পালিত পশুর সংখ্যাও ভারতবর্ষে ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার লোক-সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ মাত্র, অথচ তত্রত্য পশুর সংখ্যা ১১ কোটী ৩৫॥০ লক্ষেরও অধিক। তদনুপাতে ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষি-প্রধান ও জন-বহুল দেশে ২৬,২৮০ কোটী গৃহপালিত পশু থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সমগ্র বৃটিশ ভারতে এক্ষণে গো-মেষ-মহিষ-অশ্ব-অশ্বতর-ছাগাদিতে পূর্ণ দশ কোটী পশুর অধিক বিদ্যমান নাই। গৃহ-পালিত ও কৃষি-কার্য্যোপযোগী পশুর বংশ যে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, বিগত দশ বৎসরের সরকারি রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলেও তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

অর্থাভাবে যেমন কৃষিকার্য্যোপযোগী পশু-কুলের হ্রাস হইতেছে, সেই-রূপ কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ও উৎকর্ষ কমিয়া যাইতেছে। বৃটিশ ভারতে গোধূম, ইক্ষু, কার্পাস, পাট, নীল ও সর্ষপাদির আবাদ বিগত ১৫

হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটির অধিক কমিয়াছে। কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৮।৯ বাড়িয়াছে। আদম সুমারির মতে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসের কারণ এই—১ম, মধ্যপ্রদেশে, বোম্বাই, রাজপুতনা, মধ্যভারত প্রভৃতি হিন্দু-প্রধান স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ যেরূপ অধিক হইয়াছিল, মিরাট, রোহিলখণ্ড, সিন্ধু, পশ্চিম পঞ্জাব প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান স্থানে তেমন হয় নাই। ২য়, যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হয় নাই, সে সকল স্থানেও হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়াছে। অথচ মুসলমান প্রায়ই হিন্দুর অপেক্ষা দরিদ্র। এস্থলে মুসলমানের বংশ-বৃদ্ধির কারণ বিধবা-বিবাহ। হিন্দু সমাজে অনেক গর্ভধারণ-ক্ষমা রমণী নিঃসন্তান থাকিতে বাধ্য হন; ৩য়, হিন্দুসমাজে বাল্য-বিবাহ। ৪র্থ, অনেক হিন্দুর ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ। গত দশ বৎসরে ৬ লক্ষের অধিক হিন্দু খ্রীষ্টান হইয়াছে।

বৎসর হইতে কমিতেছে। ১৮৯১ সাল হইতে ইক্ষুর অবনতি ঘটিয়াছে। ঐ সালে ৯৩ লক্ষ ৪৫ হাজার বিঘা জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল, গত ১৯০৩।৪ সালে ৭২ লক্ষ ৫১ হাজার বিঘার অধিক চাষ হয় নাই। ১৮৯৯ সালে সংযুক্ত বঙ্গে ২৬ লক্ষ ১৯হাজার বিঘা জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল, গত ১৯০৩।৪ সালে ১৯ লক্ষ ৩৬॥০ হাজার বিঘায় মাত্র চাষ হয়। খর্জ্জুরাদির চাষও বঙ্গদেশে কমিতেছে।

বঙ্গে যে কেবল ইক্ষুরই অবনতি হইয়াছে তাহা নহে, বিগত ১৮৯৯ সাল হইতে ১৯০৩।৪ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে ধান্যের চাষ ১ কোটী ৪২ লক্ষ ৬০ হাজার বিঘা কমিয়া গিয়াছে, কার্পাস ১ লক্ষ ৩২ হাজার বিঘা, সর্ষপাদি প্রায় ২॥০ লক্ষ বিঘা, গোধূমের চাষ ৯৮।.০ হাজার বিঘা কমিয়াছে। ১৮৯৩ হইতে বৃটিশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কার্পাস ও সর্ষপাদির চাষ কমিয়া গিয়াছে। আজকাল ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর যে তূলা বিদেশে রপ্তানি হয়, তাহা পাঁচ ভাগের চারিভাগ দেশীয় করদ রাজ্যসমূহে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৮৯০। ৯১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮ কোটী ৩২ লক্ষ ৪০ হাজার বিঘা ভূমি কর্ষিত হইয়াছিল। ১৮৯৯ সালে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ৫৮ কোটী ৯৪ লক্ষ ৬২ হাজার বিঘা হয়। ইহার মধ্যে ব্রহ্ম দেশ, সিন্ধু, আসাম, কুর্গ ও আজমীর প্রভৃতি প্রদেশে ১ কোটী ৬০ লক্ষ ২০ হাজার বিঘা নূতন ভূমিতে চাষ হইয়াছে। এই নূতন আবাদী জমির পরিমাণ বাদ দিলে দৃষ্ট হইবে যে, বৃটিশ ভারতীয় পুরাতন প্রদেশগুলিতে বিগত দশ বৎসরে ৯৭,৮০,০০০ বিঘা জমি কমিয়াছে অর্থাৎ কৃষিকার্য্যের অযোগ্য হইয়াছে, মাননীয় অধ্যাপক গোখলে ইহা ১৯০২ সালে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উহার পরবর্ত্তী বৎসরসমূহের হিসাবে দৃষ্টি করিলেও জানা যায় যে, পুরাতন প্রদেশনিচয়ে বিবিধ শস্যের চাষ আবাদ কমিয়া আসিতেছে।

মিঃ ডিগ্‌বী বলেন, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পর বৃটিশ ভারতে ৪ কোটী ৮০ লক্ষ বিঘা জমি বাড়িয়াছে; তথাপি ভারতের কৃষিলব্ধ আয় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বের আয়ের অপেক্ষা ৬৪,১১,৬৫,৪৩৮৲ টাকা কম হইয়াছে। লোকের যদি পূর্ব্ববৎ অর্থ-বল থাকিত, প্রতিবৎসর সার দিয়া ভূমির উৎকর্ষ-রক্ষা করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে কৃষিযোগ্য ভূমির এরূপ অপকর্ষ ও বিলোপ কখনই ঘটিত না। ঐতিহাসিক হণ্টার বলেন, পশ্চি-

মোত্তর প্রদেশে আকবরের আমলে প্রতি বিঘায় গড়ে ৪ মণ ৩০ সের গোধূম উৎপন্ন হইত। সরকারি রিপোর্টে দৃষ্ট হয়, ইদানীং ঐ অঞ্চলে বিঘা প্রতি ৩॥০ মণের অধিক ফসল হয় না। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের প্রতি বিঘায় ৭ মণের অধিক ফসল হইয়া থাকে! বেলজিয়মে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করায় সেখানকার জমিতে বিঘা প্রতি ৩২ মণ গোধূম উৎপন্ন হইতেছে!

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ স্যামুয়েল স্মিথ বিলাতের পার্লামেণ্ট মহাসভায় বক্তৃতা-কালে বলিয়াছিলেন,—"ভারতীয় আয়-করের তালিকায় দৃষ্টি-পাত করিলে জানা যায় যে, সেখানে প্রতি সাত শত জনের মধ্যে একজন মাত্র লোকের আয় বার্ষিক পাঁচ শত টাকা" স্মিথ মহোদয় যদি জানি-তেন যে, এ দেশের এসেসার মহাশয়েরা সরকারের আয় বাড়াইয়া আপনাদিগের পদোন্নতি ঘটাইবার আশায় কত স্বল্পবিত্ত লোকের নিকট হইতে অন্যায় ভাবে আয়কর আদায়ের চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বলিতেন যে, ভারতবর্ষে প্রকৃত পক্ষে হাজারকরা একজনের আয় পাঁচ শত টাকা। এদেশে ধনীর সংখ্যা কিরূপ বিরল, ইহা হইতেই তাহা সকলের বোধগম্য হইবে।

ভারতবাসীর দারিদ্র্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে পার্লামেণ্টের অন্যতর সদস্য মিঃ জে, সেমুর (Mr. J. Seymour Keay) মহোদয়ের সংগৃহীত আর একটি তালিকার প্রতি মনোযোগ করিতে হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ সেমুর দেখাইয়াছিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে ধনবানের সংখ্যা এইরূপ,—

সংখ্যা	পদ	বার্ষিক আয়।	
১০,০০০	রাজা, মহারাজ জমিদার আদি	৫০,০০০	টাকা।
৭৫,০০০	ব্যবসায়ী মহাজন আদি	১০,০০০	"
৭,৫০,০০০	দোকানদার আদি	১,০০০	"

(এই ৮,৩৫,০০০ জনের মোট আয় ২০০ কোটী টাকা।)

এই সকল ধনশালী ব্যক্তির অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী। যে সকল রাজা, জমিদার ও মহাজন বৃটিশ ভারতে বাস করেন, তাঁহা-দিগের আয় ধরিয়া ডিগ্‌বী মহোদয় দেখাইয়াছেন যে, বৃটিশ শাসনাধীন

ভারতবাসীর আয় প্রতিজনে গড়ে বাৎসরিক ১৮৷৵০ মাত্র; এক্ষণে বড় লোকদিগের (অর্থাৎ যাঁহাদিগের আয় বাৎসরিক সহস্র মুদ্রার অধিক) আয় বাদ দিলে ভারতীয় সাধারণ প্রজার আয় গড়ে ১৮৷৵০ আনার অপেক্ষা অনেক কম হইবে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

এই প্রসঙ্গে ট্যাক্সের কথাও একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভারতবাসীকে গড়ে প্রতি-জনে বার্ষিক ২৷৴০ কর দিতে হয়। ইহা অবশ্য সরকারী পক্ষের কথা। কিন্তু এই দুই টাকা সাত আনায় কয়েকটি "ছোট খাটো" অপ্রত্যক্ষ করের সমাবেশ করা হয় নাই! বিগত ১৯০২ সালের নবেম্বর মাসে বিলাতের এক স্থানে বক্তৃতাকালে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত দেখাইয়াছেন যে, বৃটিশ-শাসিত ভারতের অধিবাসীকে গড়ে জনপ্রতি বার্ষিক সর্ব্ব-সমেত ৩৷০ টাকা কর দিতে হয়! ইংলণ্ডে এইরূপ আয়ে ১৷০ টাকার অধিক কর দিতে হয় না। সামান্য আয়ে রাজাকে এরূপ উচ্চ হারে কর দিতে হইলে সকল দেশেই প্রজার অন্ন-কষ্ট বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

আসামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার কটন সাহেব তাঁহার 'নব-ভারত' (New India) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

The resources of India will vie with those of America itself. The dimensions of Indian trade are already enormous and yet *no country is more poor than this.*

ভারতের নৈসর্গিক সম্পদ্ (খনি, অরণ্য ও কৃষিজাত ধন) আমেরিকার অপেক্ষাও অধিক। এখানকার বাণিজ্যও বহুবিস্তৃত; তথাপি ভারতের অপেক্ষা অধিকতর দরিদ্র দেশ পৃথিবীতে আর নাই।

কেন এরূপ হইয়াছে? ভারত-ভূমি রত্নগর্ভা হইলেও কেন তাহার সন্তানগণ ঘোর-দারিদ্র্য-ভোগ করিতেছে? ইহার কারণ নির্দ্দেশ-স্থলে মিঃ ডিগ্‌বী বলিয়াছেন,—

Because among other things we have destroyed native industries, and besides, have taken from India since 1834–5 (according to a calculation made by that sane and moderate journal, the *Economist*, in 1898.)

more than ten thousand millions of Rupees.

India on the other hand, has entirely lost her much more than ten thousand millions; this, with interest, and if circulated in the ordinary way among her people, at 5 p.c. interest value only, would, by this time, have been of the value at least of

fifty thousand millions of Rupees.

ভারতবাসীর দারিদ্র্যের অন্যান্য কারণের মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথম, ভারতীয় শিল্পের বিনাশ ও দ্বিতীয়, ভারতের ধন-শোষণ। আমরা (ইংরাজেরা), ভারতবর্ষীয়

শিল্পের বিনাশ-সাধন করিয়াছি ও ১৮৩৪।৩৫ সাল হইতে ১৮৯৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত (ইকনমিষ্ট পত্র-সম্পাদকের গণনানুসারে) এক সহস্র কোটী মুদ্রা ভারতবাসীর নিকট হইতে আদায় করিয়াছি। এই সহস্র কোটী মুদ্রা যদি ভারতবর্ষেই থাকিত ও শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা সুদে ভারতবাসী কৃষক ও শিল্পীদিগকে ধার দিতে পারা যাইত, তাহা হইলে এতদিনে উহার পরিমাণ সুদসহ ন্যূনকল্পে পঞ্চ সহস্র কোটী মুদ্রা হইত।

এতদ্ভিন্ন এদেশে বিলাতী মহাজনদিগের বহু শত কোটী টাকা খাটিতেছে। উহার সুদ ও লভ্যাংশ-স্বরূপে এত দিনে কত টাকা বিদেশে গিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ সাধ্য নহে। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে নগদ প্রায় এক সহস্র কোটী মুদ্রা প্রেরিত হইয়াছে! আজকাল এদেশ হইতে যে টাকা বিদেশে যাইতেছে, তাহার পরিমাণ শ্রবণ করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। এই বিষয়ের তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, রাজস্বে ও বিলাতী মহাজনের লাভে এদেশ হইতে বৎসরে পঞ্চশত কোটী মুদ্রা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে! যে দেশ হইতে প্রতি বৎসর এরূপ অজস্র ধারায় বিদেশের অভিমুখে অর্থ-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, সে দেশে দশ কোটী লোক অর্দ্ধাশনে দিনযাপন করিতে বাধ্য হইবে, ইহা বিচিত্র নহে! দুর্ভিক্ষও বা সেই দেশবাসীর নিত্য-সহচর না হইবে কেন? অধ্যাপক সিলি তাঁহার Expansion of England নামক গ্রন্থে ভারতীয় দরিদ্র জন-সাধারণের দুরবস্থা-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

Their (The Indians') susceptibilities dulled and their very wishes crushed out by want.

অর্থাৎ তাহাদিগের বোধ-শক্তি অবসন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বাসনা পর্য্যন্ত অভাবের পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে! সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ মহাশয় জাতীয় মহাসমিতির ঊনবিংশ অধিবেশন-কালে সভাপতিরূপে বলিয়াছেন,—

We cannot forget that there is another side of the balance sheet. After all it makes but little difference whether millions of lives are lost on account of war and anarchy or whether the same result is brought about by famine and starvation.

মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপতন-কালে এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক অন্তর্ব্বিগ্রহ ও অরাজকতার জন্য প্রাণ হারাইত, এখন লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষ-জনিত অনশন-ক্লেশে জীবন-বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেছে। ফলতঃ জন সাধারণের ভাগ্যে এবিষয়ে সেকাল ও একালে বিশেষ কিছুই প্রভেদ ঘটে নাই।

মানসিক অবনতি।

নীতি-শাস্ত্রবিদেরা বলিয়াছেন,—

"বভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং
ক্ষীণা জনা নিষ্করুণা ভবন্তি ॥"

বৃটিশ ভারতের অধিবাসিগণ দিন দিন যেরূপ "অন্নের কাঙ্গাল" হইয়া উঠিতেছে, কদর্য্য অন্ন-ভক্ষণে ও অতি শ্রমে ক্রমশঃ যেরূপ ক্ষীণ-কায় ও হীনবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ধর্ম্মনীতি-বিষয়ে তাহাদিগের যে ক্রমে উন্নতি ঘটিবে, এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র। তথাপি সুখের বিষয় এই যে, পূর্ব্বকালীন ঋষিদিগের পুণ্য-ফলে এখনও ভারতবাসীর মধ্যে পৃথিবীর অপর সকল দেশের অধিবাসী অপেক্ষা সমধিক সাত্ত্বিকভাব লক্ষিত হয়।

পাশ্চাত্য দেশের অপরাধের তালিকার সহিত তুলনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, ভারতে অপরাধের ও অপরাধীর সংখ্যা অতি সামান্য। এদেশে অপরাধের প্রকৃতিও পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় পৈশাচিক নহে। ধনশালী ইংলণ্ডে বাৎসরিক চৌর্য্যাপরাধের সংখ্যা গড়ে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অন্যূন ৫ গুণ অধিক। বিগত ১৯০৩ সালের পুলিশ রিপোর্টে দৃষ্ট হয় যে, ঐ সালে এক লণ্ডন নগরেই ৩৫,২৬২ টি মানুষ চুরি হয়! ইহার মধ্যে প্রায় ১৭॥০ হাজার জনের কোনও সন্ধানই পুলিশ করিতে পারে নাই! বিলাতে "মামলাবাজ" লোকও কম নাই। সেখানে প্রতি ২৪ জনের মধ্যে একজন মামলা করিবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে, এদেশে ১৪০ জনের মধ্যে একজন করে। নর-হত্যাদির ন্যায় গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত হইয়া যাহারা এদেশ হইতে আণ্ডামান দ্বীপে নির্ব্বাসিত হয়, তাহাদিগের মুখশ্রী দর্শনে বিস্মিত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ ডারউইন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের বদনমণ্ডলে মহানুভবতার (such noble-looking persons) ছায়া পরিদৃষ্ট হয়। অপিচ তিনি লিখিয়াছেন,—

These men are quiet and well conducted, from their outward conduct, their *cleanliness* and faithful observance of their strange religious rites. It is impossible to look at them with the same eyes as on our wretched convicts.—*Voyage Round the World, PP. 448.*

যে দেশের নির্ব্বাসিত কয়েদীদিগের মধ্যেও সুনীতির এরূপ সদ্ভাব পরিদৃষ্ট হয়, সে দেশের সাধারণ জন-সমাজের নীতিজ্ঞান ও চরিত্রবল কিরূপ অধিক, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। (১) ফলতঃ ধর্ম্ম-প্রাণ ভারতবাসীর বুভুক্ষা ও ক্ষীণতা দূরীভূত হইলে তাহাদিগের চরিত্র-বল নিঃসন্দেহ অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে।

দারিদ্র্য বহু অনর্থের মূল। নির্ধন অবস্থায় মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি-নিচয়ের অবনতি ঘটে, সমাজের সঙ্ঘ-শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, বাহুবলের হ্রাসের সহিত পরশ্রীকাতরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জীবন-সংগ্রাম তীব্রতর হইলে নীচতা, মিথ্যাচরণ, অসাধুতা প্রভৃতি দোষের প্রাবল্য ঘটে, বুদ্ধিবৃত্তির বিশিষ্টরূপ বিকাশ বা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া হয় না, অধ্যাপক হক্স্‌লি, কিড্‌ ও রোমানিস্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য

(১) দুঃখের বিষয়, একথা অনেকে আজকাল স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। জাতীয় মহাসমিতির দশম অধিবেশনের সভাপতি মিঃ আলফ্রেড ওয়েব মহোদয়ের যত্নে সংগৃহীত ও বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র আনন্দ রাও বি, এ, মহাশয়ের চেষ্টায় প্রকাশিত "The people of India" নামক পুস্তকে ভারতবাসীর নীতিজ্ঞান ও চরিত্রবল-বিষয়ে প্রায় ৭৫ জন বিভিন্ন শ্রেণীর সুপ্রসিদ্ধ শ্বেতাঙ্গের মতামত উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার প্রথম ৭ পৃষ্ঠা হইতে এস্থলে কয়েকটি মত উদ্ধৃত হইল,—

Judged by any truthful standard the people of India are on a far higher level of morality than Englishman—*Sir Lepel Griffin.* Their whole social system postulates an exceptional integrity,—*W. C. Bennett.* I find among my acquaintances who have long resided in India, that after travelling over Europe they have reason to think more highly of the natives of India every day.—*General J. Briggs.* No set of people among the Hindu are so depraved as the dregs of our great towns. Including the Thugs and Dacoits the mass of crime is less in India than in England.—*M. Elphinestone.* I should say that the *morality* among the higher classes of the Hindus was of a high standard, and among the middling and lower classes remarkably so; there is *less of immorality* than you would see in many countries in Europe. *Sir G, B, Clark G,C,S.I*

There is simply no comparison between Englishmen and Hindus with respect to the place occupied by family interests and family affections in their minds. The family in the old sense of the word, still exists in India: in England it is a very different institution. The romance of Indian life is the romance not of the individual but of the family. But in England there is a widespread belief that large numbers of *children are destroyed* by their parents in order to be given a paltry *insurance money;* and many persons are anxious, for that reason, to put a stop to child insurance. Again we have a society for the prevention of cruelty for children and it has much more work to do than it can take. *Dr. W. W. Hunter.*

অপর মতগুলিও এতদপেক্ষা কোন অংশে ভারতবাসীর স্বল্প-প্রশংসাসূচক নহে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুবিজ্ঞ দাদা ভাই নৌরোজী তাঁহার "Moral Poverty of India" নামক প্রসিদ্ধ নিবন্ধে লিখিয়াছেন,—

For the same cause of the deplorable drain, besides the material exhaustion of India, the *moral loss* to her is no less sad and lamentable. With material wealth go also the wisdom and experience of the country.

ইংরাজের ধনহরণ-নীতির ফলে ভারতবর্ষের কেবল আর্থিক ক্ষতিই সাধিত হয় নাই, ধনক্ষয়ের পরিণামে দেশবাসীর সুনীতিরও হানি হইয়াছে। সকল দেশেই অর্থ-নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর জ্ঞান ও বহুদর্শিতা বিলোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রবন্ধান্তরে তিনি বলিয়াছেন,—

All the talent and nobility of the intellect and soul which Nature gives to every country, is to India a *lost treasure*. There is, thus, a triple evil —loss of wealth, wisdom and work, to India under the present system of administration.

অর্থাৎ প্রকৃতি দেবী সকল দেশের অধিবাসীকেই স্বভাবতঃ যে বুদ্ধি-বৈভব ও মহানুভবতা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা ভারতবাসীর পক্ষে "বিনষ্ট সম্পত্তির" ন্যায় (পরহস্তগত ধনের ন্যায়) হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর দোষে ভারতবাসীর অর্থ-বল, জ্ঞান-বল ও কার্য্যদক্ষতা, এই ত্রিবিধ শক্তির যুগপৎ বিলোপ ঘটিয়াছে।"

বৃদ্ধ নৌরোজীর এই আক্ষেপ-পূর্ণ উক্তি পাঠ করিলে স্যার টমাস্ মনরোর ভবিষ্যদ্বাণী (পত্রাঙ্ক ১৫ দেখুন) ফলবতী হয় নাই, এ কথা কে বলিতে পারে? ইংরাজ যদি ভারতবর্ষকে মোগলদিগের ন্যায় স্বদেশে পরিণত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতবাসীকে এই প্রকার বাণিজ্য-সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া সর্ব্বস্ব হারাইতে হইত না। ইংরাজের সভ্যতানুমোদিত শাসন ভারতবাসীর নিকট নিঃসন্দেহ অধিকতর প্রীতিকর (popular) হইত।

ধনবল, বুদ্ধিবল ও কার্য্য-দক্ষতার বিনাশ ঘটায় বৃটিশ ভারতীয় প্রজা যেরূপ শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে, দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ এখনও সেরূপ হয় নাই। মিঃ ডিগ্‌বী বলেন,—

The Feudatory states are greedy absorbers of the precious metals. The people in them are more prosperous than are the people of British provinces.

অর্থাৎ দেশীয় করদ-রাজ্য-সমূহের লোকেরাই বিদেশাগত বহুমূল্য রত্নাদির প্রধান ক্রেতা। কারণ তাহারা বৃটিশ ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের অপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধিশালী।

শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী ভারতের ভিন্ন ভিন্ন করদ রাজ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে। তিনিও ডিগ্‌বী মহোদয়ের মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাণিজ্য-প্রধান বোম্বাই নগরীতে কোটী কোটী টাকার ব্যবসায় চলিতেছে; কিন্তু তন্মধ্যে ভারতীয় মূলধনের পরিমাণ দশ কোটী টাকার অধিক নহে। এই দশ কোটী টাকার অধিকাংশই দেশীয় রাজ্যসমূহের বণিক্‌দিগের ধনভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত। বৃটিশ ভারতীয় বণিক্‌দিগের ধন-বল এরূপ সামান্য যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য আবশ্যক মূলধন সংগ্রহ করা তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

দেশীয় রাজ্য-বাসী প্রজাগণের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ লিট্‌নার বিলাতের "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন" সভায় বলিয়াছিলেন,

The joyous laughter of freemen you hear in the Native States—you do not hear it in our territory. I am very sorry to say so, but the truth is this—that our greater or more foreign civilisation is of a *crushing* kind. In a Native State a man feels he has his own Raja; there is something to look to, men may rise not only in their own states, but there are also openings in them for natives of every part of India.

অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যের স্বাধীন প্রজাবৃন্দের মুখে যে সদানন্দময় কলহাস্য শ্রুতি-গোচর হয়, তাহা আমাদিগের (ইংরাজদিগের) শাসিত প্রদেশে শুনিতে পাওয়া যায় না, একথা আমাকে অতীব দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমাদিগের এই বিরাট বা নিতান্ত বিদেশীয় সভ্যতা ভারতবাসীর পক্ষে সর্ব্বনাশকারী হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের প্রজারা এই ভাবিয়া গৌরবান্বিত হয় যে, তাহাদিগের নিজের রাজা আছে এবং রাজ্যমধ্যে তাহাদিগের অবধানের যোগ্য কিছু আছে। লোকে যে কেবল নিজের রাজার রাজ্যেই উন্নতি-লাভ করিতে পারে, তাহা নহে—দেশীয় রাজ্যে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকেরই উন্নতির দ্বার অবারিত রহিয়াছে।

এই সকল কারণে লোকে সুবিধা পাইলেই ইংরাজের শাসনাধিকার পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় রাজ্যে গিয়া বাস করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। লর্ড সল্‌স্‌বরি ১৭৬৭ সালের ২৪শে তারিখে এ বিষয়ে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার একাংশ এইরূপ,—

The British government has never been guilty of violence and illegality of Native sovereigns. But it has faults of its own, which though they are far more guiltless in intention, are *more terrible in effect*. The Native government has a fitness and a congeniality for them (the people) impossible for us adequately to realise, but which compensate them to an enormous degree for the material evils which its rudeness in a great many

cases produces. I may mention as an instance what was told me by Sir George Clark, a distinguished member of the Council of India representing the province of Kathiawad, in which the boundaries of English and the Native governments are very much intermixed.....He told me that the Natives were continually in the habits of migrating from the English into Native jurisdiction, but that he never heard of an instance of a native leaving his own to go into the English jurisdiction.

থ্যাকারের সাংঘাতিক নীতি।

পাশ্চাত্য সভ্যতা-সমুজ্জ্বল বৃটিশ ভারতে কৃষ্ণবর্ণ প্রজার উন্নতির দ্বার দেশীয় রাজ্যের ন্যায় অবারিত নহে। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যত্ন-প্রকাশ দূরের কথা, কৃষিলব্ধ ধনের সাহায্যেও যাহাতে এদেশের লোকে সমধিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে না পারে, সেদিকেও বৈদেশিক রাজপুরুষেরা লক্ষ্য রাখিয়া ভূমির রাজস্ব-বিষয়ক ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। এই স্বার্থ-মূলক ব্যবস্থার সমর্থন-কল্পে বিবিধ কাল্পনিক যুক্তির অবতারণা করিয়া মান্দ্রাজের রেভিনিউ বোর্ডের জনৈক ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ সদস্য পরিশেষে স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিয়াছেন যে,—

This quality of condition, in respect of wealth in land, this general distribution of the soil among a yeomanry, therefore, if it be not most adapted to agricultural improvement, is best adapted to attain improvement in the state of property, manners, and institution, which prevail in India: and it will be found still more adapted to the situation of the country, governed by a few strangers, where *pride, high ideas and ambitious thoughts must be stifled.* It is very proper that in England a good share of the produce of the earth should be appropriated to support certain families in affluence to produce senators, sages and heroes for the service and defence of the state or in other words that great part of the rent should go to an opulent nobility and gentry who are to serve their country in parliament, in the army and navy, in the department of science and liberal professions. *The leisure, independence, and high ideas which the enjoyment of this rent affords, has enabled them to raise Britain to the pinnacle of glory. Long may they enjoy it;—but in India, that haughty spirit, independence and deep thought which the possession of great wealth sometimes gives ought to be suppressed.* They are directly adverse to our power and interest...... *We do not want generals, statesmen and legislators; we want industrious husbandmen.*

Considering politically, therefore, the general distribution of land among a number of small proprietors, who cannot easily combine against Government, is an object of importance.

If the ryot is put on such a footing, that their lands are saleable, and that they ought to pay whether they cultivate or not, the revenue will be secure."—*Fifth Report of the Select Committee of Parliament on the Affairs of E. I. Co. pp 990—91. Appdx.*

লর্ড বেণ্টিঙ্ক যখন মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা, তখন তত্রত্য রেবিনিউ বোর্ডের সদস্য মিঃ থ্যাকারে ভূমি বিষয়ক ব্যবস্থার নির্দ্ধারণ-প্রসঙ্গে জমীদারী বন্দোবস্ত প্রথার বিরুদ্ধে উক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ও কৃষিজীবী প্রজার মধ্যবর্ত্তী প্রতিপত্তিশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব-লোপের আবশ্যকতা প্রতিপাদন-কালে তিনি এই সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তির ভাবার্থ এইরূপ,—

"দেশের সাধারণ কৃষকদিগের মধ্যে সমস্ত ভূমির বণ্টনের ব্যবস্থা করিলে, কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি ঘটিবার সুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার ও পদ্ধতির উপযোগিনী উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণেই হইবে। বিশেষতঃ স্বল্পসংখ্যক বিদেশীয়ের আধিপত্য-রক্ষণার্থ এই দেশের লোকের আত্ম-গৌরব, মহত্ত্বাব ও যশোলাভাকাঙ্ক্ষার সম্যক্ বিনাশ-সাধন যখন নিতান্ত আবশ্যক, তখন ভূমির উক্ত প্রকার বন্দোবস্তই এদেশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। ইংলণ্ডের ন্যায় দেশে স্ব-রাজ্যের সংরক্ষণ ও স্বদেশের সেবার জন্য যাহাতে রাজনীতিজ্ঞ, রণ-কুশল ও সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগের অভ্যুদয় ও পরিপোষণ হয়, তদুদ্দেশ্যে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত পরিবারকে ভূমিজাত সম্পদের অধিকাংশ গ্রহণ করিবার সুবিধা দেওয়া অতীব যুক্তি-সঙ্গত। এই ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে যখন পার্লামেণ্ট মহাসভার এবং সৈনিক ও নৌবিভাগের কার্য্যে যোগদান করিয়া বা ভদ্রজনোচিত উপজীবিকা ও বিজ্ঞানানুশীলনের দ্বারা দেশের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে, তখন ভূমির উপস্বত্বের বহুল অংশ ইঁহাদিগেরই হস্তগত হওয়া উচিত। এই ভূমিজাত সম্পদের কল্যাণে অন্ন-চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় ইঁহারা যে প্রচুর অবসর লাভ, চিত্তবৃত্তির স্বাধীনতা ও উন্নত চিন্তা-প্রণালীর অধিকারী হইয়াছেন, তাহাতেই বৃটেন আজ জাতীয় গৌরবের উচ্চ শিখরে স্থান লাভ করিয়াছে। চিরকাল বৃটেন এই উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকুক, ইহাই প্রার্থনীয়; কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। সম্পদ ও স্বচ্ছলতার আনুকূল্য ঘটিলে মানবের চিত্তক্ষেত্রে যে অদম্য তেজস্বিতা, স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা ও গভীর চিন্তাশীলতা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষে তাহার দমন করিতে হইবে। ভারতবাসীর এই সকল ভাব আমাদিগের আধিপত্য ও স্বার্থের নিতান্ত প্রতিকূল। ভারতবাসীর মধ্যে সমর-কুশল সেনাপতি, বিচক্ষণ রাজনীতিক, ও সুবিজ্ঞ ব্যবস্থা-প্রণেতার আবির্ভাব আমরা চাহি না, আমরা কেবল শ্রমশীল কৃষক-সম্প্রদায় চাই।

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের অধিকারী কৃষকগণ সহজে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমবেত হইতে পারে না। এই কারণে জমিদার-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি না করিয়া জনসাধারণের মধ্যে সমস্ত ভূমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া দেওয়াই রাজনীতি-সঙ্গত কার্য্য। ইহাতে নিয়মিতরূপে রাজস্ব আদায়ের কিছু অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে বটে; কিন্তু সে জন্য খাজানা বাকি পড়িলেই জমি বিক্রয় হইয়া যাইবে, কৃষক জমি আবাদ

করুক না করুক, সরকারকে খাজানা দিতেই হইবে—এরূপ নিয়ম করিলে সরকারি খাজানা বাকী পড়িবার আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মিঃ থ্যাকারে স্পষ্ট ভাষায় যেরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এই বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভকালে কোনও রাজপুরুষ সেরূপ ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে যে এই ভাব প্রবল নহে, এমন কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অন্তর্গত সীতাপুর বিভাগের অস্থায়ী কমিশনর মিঃ এচ্, এস্, বয় ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন,—

For some reason it is not desired for the present that the standard of comfort should be very materially raised,

অর্থাৎ কোন বিশেষ কারণে, ইদানীং প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

মিঃ ডিগ্‌বী বলেন, ভারতের প্রত্যেক বড় লাট, ছোট লাট, চীফ কমিশনর, ও তাঁহাদের অধীন রাজপুরুষগণ কার্য্যতঃ এই ভাবের—মিঃ থ্যাকারের এই কুটিল নীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদিগেরই কার্য্যফলে ভারতবাসীর এরূপ সামাজিক, মানসিক ও জাতীয় অবনতি ঘটিয়াছে! তিনি আরও বলিয়াছেন, থ্যাকারে ও তাঁহার মতানুগামী রাজপুরুষগণ এদেশবাসীকে কৃষক-সম্প্রদায়ে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ যত্নপ্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই বৃটিশ ভারতে সমর-কুশল সেনাপতি, বিচক্ষণ রাজনীতিক, সুবিজ্ঞ ব্যবস্থা-প্রণেতা প্রভৃতির আবির্ভাব হয় নাই। নচেৎ মোগলদিগের আমলে যে সমাজে বহুসংখ্যক রাজকার্য্য-ধুরন্ধর পুরুষ-রত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৃটিশ শাসনকালে সেই সমাজে অধিকাংশ স্থলেই 'ঘটিরাম' ভিন্ন অন্য কাহারও উদয় হইতেছে না কেন? বৃটিশ-ভারতে স্যর সালার জঙ্গ, স্যর টি মাধব রাও, স্যর দিনকর রাও, স্যর কে শেষাদ্রি আয়ার, শ্রীযুক্ত কৃপারাম (জম্মু), পণ্ডিত মনফল (আলোয়ার), ফয়েজ আলি খাঁ (কোটা), মাধব রাও বারবে (কোহ্লাপুর) প্রভৃতির ন্যায় জটিল-রাজকার্য্য-পরিচালনক্ষম ব্যক্তিও দেখিতে পাই না কেন? দেশীয় রাজ্যগুলি না থাকিলে ইঁহাদিগকে আমরা আদৌ দেখিতে পাইতাম কি

না, সন্দেহ। বৃটিশ রাজ্যে বাস করিতে বাধ্য হইলে, ইঁহাদিগকেও হয়ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট-গিরি করিয়াই জীবন-ক্ষয় করিতে হইত।

অধুনাতন কালের রাজপুরুষেরা আমাদিগকে রাজকার্য্যে অযোগ্য, উচ্চ-জ্ঞান মার্গে অনধিকারী ও শুকপক্ষিবৎ পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের যোগ্যতা সম্বন্ধে, পার্লামেণ্টের প্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধান-সমিতির প্রশ্নের উত্তরে মিঃ রবার্ট রিকর্ডস্ নামক জনৈক সদস্য বলিয়াছিলেন,—

> The improvement introduced by Europeans are *limited* in comparison with what might be the case if the natives of India were sufficiently encouraged; but in their present state of extreme poverty and almost slavery, it is not reasonable to expect that any great improvement can flow from them. One of the greatest improvements, however, of which the mind of man is susceptible, has been made by natives from their own exclusive exertions. Their acquirement of knowledge, and particularly of the English language, and English literature, is quite astonishing. It may even be questioned whether so great a progress in the attainment of knowledge has ever been made *under the circumstances in any of the countries of Europe*. (*Q. 2807*).

ভারতবাসীকে স্বদেশের উন্নতি করিবার যথোচিত অবসর ও উৎসাহ প্রদান করিলে ভারতের যে উন্নতি হইতে পারিত, তাহার তুলনায় ইউরোপীয়দিগের কৃত ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানাদিবিষয়ক উন্নতি অতি সামান্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে। ভারতবাসীর বর্ত্তমান অতি দরিদ্র ও দাসবৎ অবস্থায় তাহাদিগের নিকট কোনও প্রকার বিশেষ উন্নতিরই আশা করা যাইতে পারে না। মানুষ বুদ্ধি-বলে যে সকল উন্নতি করিতে সমর্থ, তৎসমূহের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ উন্নতি ভারতবাসী সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টাতেই করিয়াছে। জ্ঞানার্জ্জন বিষয়ে,—বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি-লাভ বিষয়ে তাহারা যে সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা অতীব বিস্ময়-কর। জ্ঞানোপার্জ্জন সম্বন্ধে এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় ইউরোপের কোনও জাতি ঈদৃশ উন্নতি-সাধন করিতে পারিত কি না, সন্দেহ।

যে সমাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও এইরূপ প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছে, যে সমাজে মহাত্মা শিবাজী, রাণা প্রতাপ, মহারাজ রণজিৎ সিংহ, বীরশ্রেষ্ঠ বাজীরাও, হোলকর, শিন্দে, নানা ফড়নবীস্, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, আলিবর্দ্দী খাঁ, হায়দার আলি, টিপু সুলতান, টোডর মল্ল, মানসিংহ প্রভৃতি যশস্বী পুরুষগণের সমুদ্ভব হইয়াছিল, যে সমাজে এখনও স্যর্ টি মাধব রাও, স্যর সালার জঙ্গ, স্যর কে শেষাদ্রি আয়ার (১) শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, ৺ কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির

ন্যায় রাজকার্য্য-বিশারদ ব্যক্তি ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের ন্যায় সেনানী দেশীয় ও বিদেশীয় রাজ্যের আশ্রয়চ্ছায়ায় প্রাদুর্ভূত হইতেছেন, সেই সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতা-দীপ্ত বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে হাইকোর্টের জজিয়তি অপেক্ষা উচ্চতর কার্য্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য লোকের অভাব-সংঘটন কি ইংরাজ-শাসনের পক্ষে ঘোর লজ্জাজনক ব্যাপার নহে? ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতীয় সমাজের নিকট যদি পাশ্চাত্য আদর্শ-সম্মত রণ-কুশল সেনাপতি, সুবিজ্ঞ ব্যবহার-বিশারদ পণ্ডিত ও বিচক্ষণ রাজনীতিক চাহিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই এত দিনে তাহা প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষীয় সমাজে এ সকলের আবির্ভাব কামনা করেন নাই; তাঁহারা চাহিয়াছেন, ভারতে শ্রমশীল কৃষক-সম্প্রদায়ের বাহুল্য; কাজেই ভারতের শতকরা ৮৫ জন আজ কৃষিজীবী—তাহারও অর্দ্ধাংশ চিরকাল অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট! কারণ—

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার ডবলিউ চ্যাপলিন সাহেব ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন,—

I am afraid the nature of our Government is not calculated for much improvement...It is, in fact, adverse to improvement.

আমাদিগের (ইংরাজদিগের) শাসনের প্রকৃতি বিশেষ উন্নতির অনুকূল নহে; বরং উহা উন্নতির প্রতিকূল।

মিঃ চ্যাপলিনের এই উক্তি এদেশের সঙ্কীর্ণ-চিত্ত রাজপুরুষগণের যত্নে কি বহুপরিমাণে বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইতেছে না? তাঁহারা উন্নতির অবকাশ-দান করিলে, কি এ দেশের অনেক সুযোগ্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রাজকার্য্যের উচ্চতর বিভাগে আপনাদিগের স্বাভাবিকী প্রতিভার বিস্ময়-কর বিকাশ দেখাইতে সমর্থ হইতেন না?

ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট উদারতা-প্রকাশ করিলে এদেশে রাজকার্য্য-পরিচালন-ক্ষম যোগ্য ব্যক্তির অভাব সহজেই দূর হইতে পারে। কিন্তু অনেক রাজপুরুষই যে এদেশীয় ব্যক্তিদিগকে উন্নতির অবকাশ দান

---

(1). In statesmanship, unhappily permitted to exsist only in the Feudatory States and not in the British Provinces, there are few in Europe, Asia and America to surpass the achievements of Sir Salar Jung the first, Sir T. Madhav Rau, Sir K. Sheshadree Ayer—to refer only to the departed.—*Prosperous British India.*

করিতে অনিচ্ছুক, রুড়কি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই কলেজ দেশীয়দিগের অর্থে স্থাপিত হইলেও ইহাতে দেশীয় যুবকদিগের প্রবেশের পথ রাজপুরুষেরা প্রথম অবধি যথাসাধ্য কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখন ত ঐ কলেজে বাঙ্গালী ও মহারাষ্ট্রীয় শিক্ষার্থীদিগের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপেই নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও যখন সকল শ্রেণীর দেশীয় যুবকের ঐ কলেজে শিক্ষালাভের অধিকার ছিল, তখনও গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের প্রতি যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই—তাহাদিগকে অবাধে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেন নাই।

প্রথমতঃ দেশীয়গণকে পরীক্ষায় যথারীতি পাস করাই হইত না। তাহার পর যাহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইত, তাহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক লোককেও চাকরী দেওয়া হইত না। শ্রীযুক্ত নৌরোজী মহাশয় দেখাইয়াছেন,যে সময়ের মধ্যে ৯৬ জন শ্বেতাঙ্গ যুবক পাস হইয়াছে ও তাহাদিগের ৮৬ জন বড় চাকরী পাইয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে দেশীয় যুবকদিগের ১৬ জনের ভাগ্যে পরীক্ষায় সাফল্য ও কেবল ৭ জনের ভাগ্যে চাকরী লাভ (তাহাও নিম্নশ্রেণীতে) ঘটিয়াছে! এ ক্ষেত্রে দেশীয় ছাত্রদিগের বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে রবার্ট রিকার্ডসের মন্তব্য কতদূর প্রযোজ্য, সে বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে, তাঁহাকে ঐ কলেজেরই তদানীন্তন অধ্যক্ষ ল্যাঙ্ সাহেবের ১৮৭০।৭১ সালের রিপোর্ট পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঐ রিপোর্টে তিনি বলিয়াছেন,—

That the Natives of this country, *under favourable conditions* are capable of excellence both as architects and builders, the beauty and solidity of many of the historical monuments of the country fully testify and that they could compete with European skill in the choice and composition of building materials, may be proved by comparing an old terrace roof at Delhi or Lahore with an Allahabad gunshed or many a recent barrack.

ভাবার্থ——যথোচিত আনুকূল্য বা উৎসাহ পাইলে এদেশীয় ছাত্রেরা যে ভাস্কর ও স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারে, তাহা এ দেশের ঐতিহাসিক স্মৃতি-স্তম্ভ ও মন্দিরাদির শিল্প-সুষমা ও দৃঢ়তা অবলোকন করিলে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয়। তাহারা যে হর্ম্ম্যাদির উপকরণ-নির্ব্বাচন ও তৎসমুদায়ের রাসায়নিক সংযোগ-বিষয়েও ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষতা করিতে সমর্থ, তাহা দিল্লী বা লাহোরের যে কোনও পুরাতন সৌধশিখরের সহিত এলাহাবাদের অস্ত্রাগারের বা অধুনাতনকালে নির্ম্মিত অধিকাংশ সেনানিবাসের তুলনা করিলেই সপ্রমাণ হইবে।

সহৃদয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই মন্তব্যে, কর্ত্তৃপক্ষের যে আনুকূল্যে এ দেশীয় ছাত্রদিগের বিশেষ উন্নতি ঘটিতে পারে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে আনুকূল্য লাভ এ পর্য্যন্ত এদেশবাসীর ভাগ্যে ঘটিল না। আনুকূল্য-লাভ দূরে থাকুক, এক্ষণে বোম্বাই ও বঙ্গদেশীয় যুবকদিগের রুড়কি কলেজে প্রবেশের পথও রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মিঃ থ্যাকারের (৩৯ পৃঃ) ও লর্ড লিটনের উক্তি (১০ পৃঃ) ভারতবাসীর স্মৃতিপথে পুনঃ পুনঃ উদিত হওয়া বিচিত্র নহে।

উচ্চপদে ভারতবাসী।

বৃটিশ ভারতীয় প্রজা কার্য্য-দক্ষতা-প্রকাশের কত অল্প অবকাশ প্রাপ্ত হয়, নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

১৯০৩ সাল।

বিভাগ	বেতন		ইংরাজ-ফিরিঙ্গী		হিন্দু মুসলমান।	
শাসন বিভাগ	৫০০৲ ও তদধিক		১৯৭	২৪	২৫	২
কৃষি	,,	,,	৩	—	—	—
আর্কিওলজি	,,	,,	৬	—	১	—
ট্যাক্স	,,	,,	১	—	১	—
পশু চিকিৎসা	,,	,,	১২	—	—	—
বাণিজ্য শুল্ক	,,	,,	৩১	৫	৩	১
ইকনমিক্ প্রডক্ট	,,	,,	২	—	—	—
শিক্ষা বিভাগ	,,	,,	১১৪	৪	২৩	১
ঐ ঐ	সহস্রাধিক মুদ্রা		৪৮	—	১	—
আবকারি	,,	,,	৫	—	২	—
পররাষ্ট্র বিভাগ	,,	,,	৮	১	—	১
বনবিভাগ	৫০০৲ তদধিক		১৩৬	—	১	—
জিওলজিক্যাল সার্ব্বে	,,	,,	৯	—	২	—
ইম্পিরিয়াল সার্ব্বিস সৈন্য	,,	,,	১৫	—	—	—
যাদুঘর	,,	,,	৩	—	—	—
জেলখানা		,,	৪১	—	৪	—
বিচার বিভাগ		,,	২৩৬	১৩	১৭৩	৩৪
ভূমি রাজস্ব		,,	৬৫৩	১৫	১৮০	৫১
চিকিৎসা (সিবিল)	,,	,,	১৮২	১	১০	—

বিভাগ	বেতন		ইংরাজ-ফিরিঙ্গী		হিন্দু মুসলমান।	
আবহবিদ্যা	"	"	৪	—	—	—
সামরিক হিসাব	"	"	৯	৫	—	—
সামরিক শাসন		"	৩	—	—	—
খনি	"	"	৩	৩	—	—
টাকসাল	"	"	১০	—	১	—
বিবিধ	"	"	৫	—	—	—
রাজনৈতিক	"	"	১৩৪	১	২	২
পোর্ট ব্লেয়ারে	"	"	৫	১	—	১
ডাক বিভাগ	"	"	২৭	--	২	—
পূর্ত্ত বিভাগ "	"	"	৩৩২	২৩	৫৭	২
ঐ ঐ	১২ শতাধিক মুদ্রা		৬১	—	—	—
অহিফেন	৫০০ ও তদধিক		৪১	১	১	১
তোপখানা	"	"	১৬	—	—	—
পাইলট	"	"	২১	—	—	—
পুলিশ	"	"	৩২১	২	৩	২
রেজেষ্ট্রি	"	"	১	—	২	—
মেরিন	"	"	১৪	—	—	—
লবণ	"	"	৩৫	২	১	—
বৈজ্ঞানিক	"	"	২	—	—	—
ষ্ট্যাম্প	"	"	২	—	৩	—
ষ্টেট রেলওয়ে	"	"	২২১	২৪	৯	—
ঐ ঐ	১২ শতাধিক মুদ্রা		৩২	২	—	—
ছাপাখানা	৫০০ ও তদধিক		৭	১	—	—
সপ্লাই ট্রান্সপোর্ট		"	২	—	—	—
সার্ভে	"	"	২৯	১৩	—	—
একুনে			২,৮৮৮	১৩৯	৫০৪	৯৮
১৮৯৭ সালে ছিল, একুনে			২,৮২৩	১২৫	৪৮৪	৮৩
৫ বৎসরে বৃদ্ধি			৬৫	১৪	২০	১৫

এই তালিকা মাননীয় গোখ্‌লে মহোদয় সরকারী কাগজপত্র হইতে প্রস্তুত করিয়া ১৯০৫ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের আলোচনা-কালে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সালের পর উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর সংখ্যা কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য ঐ সময়ে তিনি লাট সভায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজপুরুষেরা

তাঁহাকে সে বিষয়ের সংবাদ দান করিতে সম্মত হন নাই! সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত তালিকায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ১৮৯৭ সালের পর শিক্ষাবিভাগে সহস্রাধিক মুদ্রা-বেতনের যে দশটি পদ নূতন সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি হিন্দুকে ও নয়টি শ্বেতাঙ্গদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ত্ত বিভাগ ও সরকারী-রেলবিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ২৬টি বারশত টাকার অপেক্ষা অধিক বেতনের পদ সৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তাহার মধ্যে একটিও হিন্দু ও মুসলমানকে প্রদত্ত হয় নাই—কেবল দুইটী পদে ফিরিঙ্গী নিযুক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট চব্বিশটী পদই শ্বেতাঙ্গদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য বিভাগেও যে কয়জন হিন্দু মুসলমান উচ্চপদে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বারশত টাকার অপেক্ষা অধিক বেতন পান, এরূপ হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা একশত অপেক্ষা অল্প, ইহাও এই ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

বিগত ১৮৯৮ সালে ভারতবর্ষে, শুদ্ধ সিবিল বিভাগেই সর্ব্বসমেত ৮০০০ বৈদেশিক শ্বেতাঙ্গ উচ্চ বেতনের পদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহাদিগকে বার্ষিক ৮,০০,০০,০০০ টাকা দিতে হইত। অধুনা ইঁহাদিগের সংখ্যা ও বেতনের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সামরিক বিভাগের ব্যয় স্বতন্ত্র। উচ্চপদে অধিক সংখ্যক শ্বেতাঙ্গের নিয়োগ হওয়ায় এক দিকে দেশের রাশি রাশি অর্থ বিদেশীয়গণের হস্তগত হইতেছে, অপর দিকে দেশবাসীর বুদ্ধি-বৃত্তি-বিকাশের—উন্নতি ও অভিজ্ঞতা-লাভের পথ নিরুদ্ধ হইতেছে, কার্য্যে উৎসাহ কমিয়া যাইতেছে। ফলে দেশের যে ঘোরতর ক্ষতি হইতেছে, যেরূপ খরবেগে ভারতবাসীর মানসিক শক্তির হানি ঘটিতেছে, একটি দৃষ্টান্তে তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে। মনে করুন, আজ যদি ভারতবাসী কোনও প্রকারে মূলধন সংগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণভাবে আপনাদিগেরই তত্ত্বাবধানে একটি বৃহৎ রেলপথ খুলিবার সঙ্কল্প করে, তাহা হইলে কি কেবল অভিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ দেশীয়দের অভাবেই সে সঙ্কল্প অসম্পুর্ণ রাখিতে হয় না? সরকারি রেলবিভাগের উচ্চপদে যদি দেশীয়ের প্রবেশাধিকার থাকিত, যদি স্বদেশে রেল-নির্ম্মাণ ও পরিচালন-কার্য্যে তাহারা অভিজ্ঞতা-লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে কি তাহাদিগের সংকল্প বিফল হইতে পারিত? ফল কথা, রাজ-শক্তি এসব বিষয়ে দেশবাসীর অভিজ্ঞতা-

সঞ্চয়ের পথ নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সকল বিভাগেই আমাদিগের উন্নতির প্রতিকূলতা করিয়াছেন। কাজেই আমাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে মহৎ-বাসনা-সমূহ অঙ্কুরিত হইবার অবসর ঘটিতেছে না, আমাদিগের আর্থিক ও মানসিক শক্তির দিন দিন হ্রাস হইতেছে।

এই সকল কারণে মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখলে মহোদয় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় খেদপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে, কি আধুনিক কি প্রাচীন, কি সভ্য কি অসভ্য, কোনও রাজ্যেই পরাধীন জাতির প্রতি রাজশক্তির এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় না; দেশবাসীর বিরুদ্ধে উচ্চ রাজকার্য্যে প্রবেশের দ্বার এরূপ দৃঢ়-ভাবে রুদ্ধ করিবার প্রয়াস ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। মিঃ আর, এন, কষ্ট নামক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান যথার্থই বলিয়াছেন—

Akber made fuller use of the subject races, we make none; it is the jealousy of the middle-class Briton, the hungry Scot, that wants his salary, that shuts out all Native aspirations.—*Linguistic and Oriental Essays.*

ভাবার্থ—আকবর রাজ-কার্য্যে তাঁহার প্রজাবর্গের যথাসম্ভব নিয়োগ করিয়া তাহাদিগের প্রতিভার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাহা করি না। পরশ্রীকাতর মধ্যবিত্ত বৃটনেরা ও ক্ষুধিত স্কচেরা এদেশের বড় বড় চাকুরীগুলি চায়—কাজেই ভারতবাসীর সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির পথই রুদ্ধ হইয়াছে।

এরূপ ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, ভারত গবর্ণমেণ্ট উচ্চপদে ২১ জন ভারতবাসীকে নিযুক্ত করিয়া অস্বাভাবিক গর্ব্ব প্রকাশ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। লর্ড কর্জ্জন গত ১৯০৪ সালের আয়-ব্যয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তৃতা-কালে বলিয়াছিলেন, উচ্চপদে ভারত-বাসীর নিয়োগ-বিষয়ে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উদারতা প্রদর্শন করিতে-ছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না (a liberality unexampled in the history of the world)। ইতঃপূর্ব্বে উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদিগের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রতি নেত্রপাত করিলেই লর্ড কর্জ্জনের উক্তির অসারতা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।—

মুসলমান আমলে আমাদিগের আর যাহাই কষ্ট থাকুক, মানসিক শক্তি বিকাশের পথ এরূপ রুদ্ধ হয় নাই, বরং সে পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। আকবরের রাজ্যে ৪১৪ জন মনসবদারের মধ্যে ৫১ জন হিন্দু

ছিলেন। শাহজানের আমলে হিন্দু মনসবদারদিগের সংখ্যা ১১০ হইয়াছিল। তাঁহার মনসবদারের মোট সংখ্যা ৬০৯ ছিল। প্রায় মনসবদারেরই তুল্য-ক্ষমতা-বিশিষ্ট রাজ-কর্ম্মচারীর সংখ্যা ইদানীং ভারত-সাম্রাজ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ২ হাজার ৩ শত ৭৩টির কম নহে। ইহার মধ্যে কেবল ৯২টি পদে ভারতবাসীর নিয়োগ হইয়াছে! ১৮৬৭ সালে উচ্চ পদে ১২ জনের অধিক ভারতীয় কর্ম্মচারী ছিলেন না। বিগত ৩৫ বর্ষে এদেশে উচ্চ পদের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তদনুপাতে দেশীয়ের সংখ্যা ২৪ না হইয়া ৯২ হইয়াছে। ইহাতেই গবর্ণমেণ্ট উচ্চৈঃস্বরে আপনাদিগের জয় ঘোষণা করিতেছেন! ৯০ বৎসর কাল আন্দোলন, আলোচনা, আবেদন, নিবেদন, রোদন ও চীৎকারাদি করিয়া আমরা গড়ে বৎসরে একটি করিয়া উচ্চপদ লাভ করিয়াছি, ইহা চিন্তা করিলে আমাদিগের হৃদয়ে লজ্জার সঞ্চার হয়। শাহজাহান অযাচিতভাবে হিন্দুদিগকে ১১০টি মনসব দান করিয়াছিলেন, ইংরাজের আমলে তপ্ত শোণিতকে সলিলাকারে পরিণত করিয়াও হিন্দুরা ৭১টির অধিক উচ্চ পদ পায় নাই! অথচ রাজপুরুষেরা Unexampled liberality বা অতুলনীয় উদারতার গৌরব-ঘোষণায় গগন বিদীর্ণ করিতেছেন। এরূপ বিড়ম্বনা এই হতভাগ্য দেশেই সম্ভবপর।

মধ্য এসিয়া, চীন, কোচীন, টংকিন, যবদ্বীপ, প্রভৃতি দেশের সহিত লর্ড কর্জ্জন ইংরাজশাসনের তুলনা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা না করিয়া যদি তিনি ভারতীয় ফরাসীদিগের পণ্ডিচারীর সহিত তুলনা করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ দম্ভ-প্রকাশ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ-বোধ হইত। পণ্ডিচারীর ব্যবস্থাপক সভা "অতুলনীয় উদারতার" আধার-স্বরূপ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় প্রহসন-মাত্র নহে। তত্রত্য সভার নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে প্রজার পক্ষ হইতে একজন দেশীয় ফরাসী পার্লামেণ্টে প্রবেশের অধিকার পাইয়া থাকেন। আলজিরিয়াতেও ফরাসীদিগের এইরূপ ব্যবস্থা আছে। ভারতে ঐ উদার ব্যবস্থার অনুকরণ করিতে হইলে, লর্ড কর্জ্জনকে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে ২৮ জন নির্ব্বাচিত দেশীয় সদস্যকে এ দেশের প্রতিনিধিরূপে বিলাতের পার্লামেণ্টে প্রেরণ করিতে হইত; কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্ট একটিও দেশীয় সদস্যকে পার্লামেণ্টে না পাঠাইয়া ও সাম্রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদগুলি শ্বেতাঙ্গদিগের

জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া কেবল বাক্যকৌশলে জগতে অতুলনীয় উদারতার (Liberality unexampled in the world) অধিকারী হইবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে?

কিছুদিন হইল, এসিয়াখণ্ডে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকার শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শুনিতেছি, শীঘ্রই ফিলিপিনোদিগকে মার্কিনেরা স্বাধীনতা-রত্ন ফিরাইয়া দিবেন। সে যাহা হউক, ফিলি-পাইন-দ্বীপ-বাসীরা নিঃসন্দেহ আমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য বা বুদ্ধিমান্ নহে। তথাপি ঐ দ্বীপের মার্কিণ গবর্ণরের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার (Executive Council) ৮ জনের মধ্যে ৩ জন সদস্য বিশুদ্ধ ফিলিপাইনবাসী! কিন্তু বিশাল ভারতীয় সাম্রাজ্যের বড়লাট সাহেবের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় একজনও দেশীয় সদস্যের প্রবেশাধিকার নাই। অনুপম উদারতা বটে! এই অতুলনীয় উদারতার উদাহরণ-স্বরূপ কর্জ্জন বাহাদুর দেশীয়দিগের হাইকোর্টের জজিয়তি লাভের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের হাইকোর্টে ও চীফ কোর্ট সমূহে সর্ব্বশুদ্ধ ৪১ জন জজ আছেন। এই ৪১ জনের মধ্যে ৯ জনমাত্র দেশীয়—তাঁহাদিগের মধ্যে একজনও স্থায়িভাবে চীফ জষ্টিসের (প্রধান বিচারপতির) পদ লাভ করেন না। ইহার সহিত ফিলিপাইন দ্বীপের দেশীয় ও বৈদেশিক জজের তুলনা করিলেই সকলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উদারতা কিরূপ অতুলনীয়, তাহা বুঝিতে পারিবেন। ঐ দ্বীপের জন-সংখ্যা ৯০ লক্ষ মাত্র। সেখানকার উচ্চতম বিচারালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৬ জন জজ ও ১ জন প্রধান বিচারপতি আছেন। এই ৬ জন জজের মধ্যে দুই জন ফিলিপাইনবাসী, তদ্ভিন্ন প্রধান বিচারপতিও ফিলিপিনো। ভারতে ৪১ জন জজের মধ্যে ৯ জনমাত্র দেশীয়, ফিলিপাইনে ৭ জনের মধ্যে ৩ জন দেশীয়! ভারতের ৬ জন প্রধান বিচারপতির মধ্যে এক জনও দেশীয় নহেন, ফিলিপাইনে যে একজন প্রধান বিচারপতি আছেন, তিনি মার্কিণ নহেন—ফিলিপিনো (ফিলিপাইনবাসী)। তথাপি লর্ড কর্জ্জন বলেন, ভারতবর্ষে ইংরাজ যেরূপ উদারতা প্রকাশ করিতেছেন, জগতে কোথাও তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। লর্ড কর্জ্জন এইরূপে অলীক উক্তি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যাঁহারা ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজ্য-শাসন-নীতিকে অনুদার বা পক্ষ-পাত-দোষ-দুষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করেন, তিনি তাঁহাদিগকেই মিথ্যাবাদী

ও অতিরঞ্জন-প্রিয় বলিয়াও প্রকাশ্য সভায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন! দগ্ধ-ক্ষতে লবণ-প্রক্ষেপ আর কাহাকে বলে?

যাঁহারা রাজকার্য্যের উচ্চতর বিভাগে জীবন-যাপন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হন, সকল দেশেই তাঁহাদিগের উপার্জ্জিত অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার দ্বারা জাতীয় জ্ঞান- (National intellect) বৃদ্ধির সহায়তা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু দুর্দ্দৈব-পীড়িত ভারতবাসীর কষ্ট-সঞ্চিত অর্থে যে অষ্ট সহস্রাধিক শ্বেতাঙ্গ রাজ-পুরুষের আজীবন দেহ-পুষ্টি ঘটিয়া থাকে, তাঁহাদিগের জ্ঞান ও বহুদর্শিতায় ভারতীয় জনসমাজ অতি সামান্য পরিমাণেও উপকৃত হয় কি না, সন্দেহ। কারণ, যখন পরিণত বয়সে ইঁহারা রাজকার্য্য হইতে অবসর-লাভ করেন এবং সমাজ ইঁহাদিগের নিকট দীর্ঘকালের বহুদর্শিতা-সঞ্চিত জ্ঞানের অংশ-লাভ করিবার আশা করিতে থাকে, সেই সময়ে ইঁহারা বৃত্তি-গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বদেশে গমন করিয়া অকিঞ্চিৎকর আমোদ-প্রমোদে কাল-ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হন। যে দেশের কল্যাণে তাঁহাদিগের দারিদ্র্য দূরীভূত ও রাশি রাশি অর্থ সঞ্চিত হয়, সেই দেশের সম্বন্ধে বৃদ্ধ বয়সে যে কোনও কর্ত্তব্য আছে, এ কথা তাঁহাদিগের মনে স্বপ্নেও উদিত হয় না। এই দেশে বাসকালেও জন-সাধারণের সহিত মিশিবার চেষ্টা করা তাঁহাদিগের অনেকে পদ-মর্য্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করেন। কাজেই চিরকাল ইঁহাদিগকে শোণিত-দানে পোষণ করিয়াও ভারতবাসী ইঁহাদিগের নিকট জাতীয় জ্ঞান-বৃদ্ধি-বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য কোনও সহায়তা প্রাপ্ত হয় না। অবশ্য, মিঃ হিউম, কটন, ডিগ্‌বী, থরবরণ, ওয়েডারবরণ প্রভৃতি দুই চারি জন সহৃদয় ইংরাজ এবম্প্রকার ঘটনার ব্যভিচার-স্থল। কতিপয় মহানুভব ইংরাজ এদেশে কখনও পদার্পণ না করিয়াও ভারতবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্যের আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই উভয় শ্রেণীর মহাজনেরাই আমাদিগের ধন্যবাদ-ভাজন।

ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা-বিভাগের উচ্চ পদসমূহে যদি বহুসংখ্যক দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিয়োগ হইত, তাহা হইলে তাঁহারা আজীবন রাজ-সেবা করিয়া যে কার্য্য-কুশলতা, বহুদর্শিতা ও দেশের অবস্থাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেন, দেশের যুবক-সমাজ বহুপরিমাণে তাহার অংশভাগী হইতে পারিত, বৃদ্ধদিগের আজীবন সংগৃহীত

জ্ঞান নানা সূত্রে উত্তর-বংশীয়দিগের মধ্যে সঞ্চারিত হইত। সকল দেশেই এই নিয়মে সমাজের জ্ঞান ও বহুদর্শিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ ক্রমে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার দোষে ভারতীয় সমাজে এই নিয়মে জ্ঞান-বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হইয়াছে।

এ দেশের শিক্ষিত জন-সাধারণ সামান্য কেরাণীগিরি করিয়াই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতে বাধ্য হন, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আপনা-দিগের কার্য্য-দক্ষতা বা বুদ্ধিমত্তা-প্রদর্শনের যথোচিত অবসর প্রাপ্ত হন না। এরূপ অবস্থায় দেশের যুবক-সমাজ কেবল পুস্তকগতা বিদ্যার সাহায্যে যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে বা কার্য্যক্ষেত্রে নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে, এরূপ আশা করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ যে দেশের বিদ্যালয়-সমূহে ছাত্রদিগকে তেজস্বিতা বা অধ্যবসায় শিক্ষা দিবার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা নাই; বরং ক্ষীণজীবী কেরাণীকুল, এবং রেভিনিউ (রাজস্ব), জুডিশিয়াল (বিচার), ইঞ্জিনিয়ারিং (স্থাপত্য ও পূর্ত্ত) ও মেডিকেল (চিকিৎসা) বিভাগীয় নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীর দল সৃষ্টি করিবার দিকেই যে দেশের শিক্ষা-বিভাগীয় কর্ত্তৃ-পক্ষীয়গণের সমধিক দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়, সে দেশের যুবক-সমাজ যখন অযোগ্যতার জন্য তিরস্কৃত হয়, তখন ভূত-ধাত্রী ধরিত্রীকে দ্বিধা হইবার নিমিত্ত সকাতর প্রার্থনা করিতে স্বতই প্রবৃত্তি জন্মে। সুবিজ্ঞ দাদাভাই নৌরাজী অতি দুঃখেই একদা ভারত-সচিব-মহোদয়কে বলিয়াছিলেন,—

The young man (in India) has no place in his country.

অর্থাৎ স্বদেশে ভারতীয় যুবকদিগের স্থান নাই।

অবসর-প্রাপ্ত দেশীয় সিবিলিয়ানগণ যাহাতে দেশীয় রাজ্যে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে না পারেন, এবং আপনাদিগের অভিজ্ঞতার ফল দেশবাসীকে প্রদান করিবার সুবিধা না পান, গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি সে ব্যবস্থাও করিয়াছেন। অতঃপর গবর্ণমেণ্টের আদেশ না লইয়া কোনও দেশীয় নরপতি আর কোনও দেশীয় সিবিলিয়ানকে স্বরাজ্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না, এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের এই আদেশে দেশীয় রাজ্যবাসীদিগের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নিজেই বলেন যে, ভারতীয় সিবিলিয়ান-দিগের ন্যায় কর্ম্ম-কুশল শাসক-সম্প্রদায় পৃথিবীর আর কোনও দেশে

বিদ্যমান নাই। যদি তাহাই হয়, তবে এরূপ কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারীদিগের সহায়তা-লাভ করিয়া দেশীয় রাজারা স্বরাজ্যের উন্নতি-সাধন করিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আপত্তি করিবার কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। যাঁহারা সুখ্যাতির সহিত শেষ পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় কার্য্য করিয়া শাসন-কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দেশীয় রাজ্যে নিয়োগে গবর্ণমেণ্ট আপত্তি করেন কেন? আমরা যতদূর দেখিতেছি, তাহাতে বরোদা রাজ্যে অবসর-প্রাপ্ত সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের নিয়োগে বরং সুফলেরই উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহার নিয়োগের পর হইতে বরোদা রাজ্যের বাণিজ্য-বিষয়ক কতিপয় অত্যাচার-মূলক ব্যবস্থা ও করের বিলোপ ঘটিয়াছে। কৃষিজীবীদিগের রাজস্ব-দান-বিষয়ক নিয়মাদির কঠোরতাও আংশিকভাবে তিরোহিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন শাসন ও বিচার-বিভাগের পার্থক্যও সাধিত হইয়াছে, শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল সংস্কার-সত্ত্বেও রাজ্যের আয় কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই! তবে কেন গবর্ণমেণ্ট সহসা দেশীয় রাজ্যে দেশীয় সিবিলিয়ান-নিয়োগের বিরোধী হইলেন? তাঁহারা কি দেশীয় রাজ্যের শাসন-সংস্কার ও উন্নতি দেখিতে বাসনা করেন না? দেশীয় সিবিলিয়ানেরা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় কার্য্যকালে স্বেচ্ছামত আপনাদিগের বিদ্যা-বুদ্ধির বিকাশ দেখাইবার অবসর প্রাপ্ত হন না। দেশীয় রাজ্যে চাকুরি গ্রহণ করিলে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা সহকারে আপনাদের কার্য্য-কুশলতা প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা গবর্ণমেণ্টের নিকট আপত্তি-জনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাঁহারা বুদ্ধিমান্ দেশীয়দিগকে তাঁহা-দের বুদ্ধি-বৃত্তি-পরিচালনের স্বাধীন ক্ষেত্র প্রদান করিতে অনিচ্ছুক।

এইরূপে এক দিকে, কার্য্য-ক্ষেত্রে রাজ-শক্তির অনুকূলতা, পদোন্নতি, স্বদেশ-সেবার কার্য্য-মূলক শিক্ষা ও বহুদর্শিতা প্রভৃতি লাভের যথোচিত সুবিধা না পাওয়ায় ও অপর দিকে ঘোর দারিদ্র্যে নিপীড়িত হওয়ায় ভারতীয় জন-সমাজ দিন দিন জ্ঞান-সম্পদে ও চরিত্র-গৌরবে হীন হইতেছে। দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট তথাপি এ বিষয়ে প্রজাপুঞ্জের সহায়তায় অগ্রসর নহেন। ১৮৯২ সাল পর্য্যন্ত দেশীয়দিগের পদোন্নতি বিষয়ে যে অবস্থা ছিল, অদ্যাপি তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিগত পঞ্চদশ বৎসরে

শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাঁহাদিগের বিনিময়ের ক্ষতি-পূরণ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পক্ষান্তরে মাসিক ৪০।৫০ টাকার অধিক বেতনের পদ হইতেও কালা আদমিকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে। এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে মাসিক পঞ্চাশ টাকাই এখন সাধারণ ভারতবাসীর কঠোর পরিশ্রমের ও যোগ্যতার চরম পুরস্কারে পরিণত হইতেছে। এই সকল অসুবিধা-সত্ত্বেও যদি আমাদের উত্তর-বংশীয়-গণের জ্ঞান-বল, চরিত্র-বল, কার্য্য-কুশলতা ও যোগ্যতা না হ্রাস পায়, তাহা হইলে আর কিসে হ্রাস পাইবে?

দূরদর্শী রাজপুরুষেরাও এ সকল কথা অস্বীকার করেন নাই। স্যর হেনরি ষ্ট্রাচি সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়ে স্বীয় মত কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন—

We place the European beyond the reach of temptation. To the Native, a man whose ancestors perhaps bore high command, we assign some ministerial office, with a poor stipend of twenty or thirty rupees a month. Then we pronounce that the Indians are corrupt.

ভাবার্থ—আমরা ইউরোপীয়দিগকে মোটা বেতন দিয়া তাঁহাদিগের প্রলোভনে পতিত হইবার সম্ভাবনা দূরীভূত করিয়া থাকি। কিন্তু যে সকল দেশীয়ের পূর্ব্ব-পুরুষেরা পূর্ব্বে হয়ত বিশেষ প্রতিপত্তিশালী বা সর্দ্দার ছিলেন, তাহাদিগকে ২০।৩০ টাকা মাহিনায় সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত করি. এবং তাহার পর বলি,—ভারতবাসীরা উৎকোচগ্রাহী বা দুর্নীতি-পরায়ণ।

এখন discontented B As বলিয়া রাজপুরুষেরা এদেশের শিক্ষিত সমাজের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছেন। কিন্তু যে কারণে এই অসন্তোষের উৎপত্তি অনিবার্য্য হইবে, তাহা বহুদিন পূর্ব্বে কর্ণেল ওয়াকার নামক জনৈক রাজপুরুষ বুঝিতে পারিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন যে,—

It is vain to expect that men will ever be satisfied with merely having their property secured, while all the paths of honourable ambition are shut against them. *This mortifying exclusion stifles talents, humbles family pride, and depresses all but the weak and worthless.* By the higher classes of society it is considered as a severe injustice. So long as this source of hostility remains, the British administration will always be regarded as *imposing a yoke.*

ভাবার্থ—লোকের গৌরবকর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া,কেবল তাহাদিগের ধন-প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থা করিলেই যে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিবে, এরূপ আশা করা বৃথা। উচ্চ পদলাভের পথে কণ্টকারোপ করিলে মনুষ্যের স্বভাবতই মর্ম্মপীড়া

উপস্থিত হয়, প্রজ্ঞা নষ্ট হয়, বংশ-গৌরব হ্রাস পায় এবং নিতান্ত দুর্ব্বল ও অপদার্থ ব্যক্তি ভিন্ন সকলেরই চিত্তে ক্ষুণ্ণতা জন্মে। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা এই প্রকার ঘটনাকে ঘোরতর অন্যায় বলিয়া মনে করেন। যত দিন পর্য্যন্ত এইরূপ ভাব বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন বৃটিশ শাসন এদেশবাসীর নিকট দুঃসহ গুরু ভারের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে।

ওয়াকার মহোদয় একথাও বলিতে বিস্মৃত হন নাই যে, অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ রাজ-পুরুষ,—

Often undervalue the qualifications of the Natives from the motives of prejudice or interest.

হয় কুসংস্কারের বশীভূত, না হয়, স্বার্থপরতার দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভারতবাসীকে অযোগ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। বৃটিশ ভারতীয় রাজপুরুষদিগের অবৈধ ক্ষমতা-প্রিয়তা ও ভারত-বাসীর অসন্তোষের বিষয় অবগত হইয়া ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট মহাসভা উচ্চ রাজপদে ভারতবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধে এক আদেশ প্রচার করেন। সে আদেশ কর্ত্তব্য-পরায়ণ রাজপুরুষদিগের দ্বারা কিরূপে অবজ্ঞাত হইয়াছে, লর্ড লিটন মহোদয়ের গুপ্ত পত্র হইতে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি।

রাজার অবজ্ঞায় প্রজাকুলের নৈতিক চরিত্রের কিরূপ অবনতি হয়, বিজ্ঞবর স্যার টমাস মনরোর পশ্চাল্লিখিত মন্তব্যে মনোযোগ করিলে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।—

We profess to seek their improvement, but propose means the most adverse to success. The advocates of improvement do not seem to have perceived the great springs on which it depends, * * * * but they are ardent in their zeal for enlightening them by the general diffusion of knowledge.

No conceit more wild and absurd than this was ever engendered in the darkest ages; for what is in every age and in every country the great stimulus to the pursuit of knowledge, but the prospect of fame or wealth or power ?......Our books alone will do little or nothing; *dry simple literature will never improve the character of a nation.* To produce this effect it must open the road to wealth and honour and public employment. Without the prospect of such reward no attainments in science will ever raise the character of a people.

This is true of every nation as well as of India; it is true of our own. Let *Britain* be subjected by a foreign power tomorrow, let the people be excluded from all share in the government, from public honours, from every office of high trust or emoulment and let them in every situation be considered as unworthy of trust and all their knowledge and all their literature, sacred and profane, would not save them from becoming,

in another generation or two a low-minded, deceitful and dishonest race. * * * In proportion as we exclude them from higher offices, and a share in the management of public affairs, we lessen their interest in the concerns of community and degrade their character.

ভাবার্থ—আমরা (ইংরাজেরা) মুখে বলি, ভারতবাসীর উন্নতি চাই, কিন্তু কার্য্যতঃ এমন উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করি, যাহাতে সাফল্য লাভ সুদূরপরাহত হয়। যে মূল তত্ত্ব উন্নতির প্রাণস্বরূপ, উন্নতিবাদের পক্ষসমর্থক মহাশয়েরা তাহার সম্যক্ পরিচয় অবগত নহেন বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি ইঁহাদিগের সহানুভূতি ও বিশ্বাস নাই, অথচ উন্নতির কামনায় জন সাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোক-বিস্তারের জন্য ইঁহারা বিশেষ ব্যস্ত।

অতি অসভ্যতার যুগেও এতদপেক্ষা অধিকতর অদ্ভুত ও যুক্তিবিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া কেহ কখনও অহঙ্কৃত হয় নাই। ধন, যশঃ, ক্ষমতা বা উচ্চপদ-লাভের প্রত্যাশা ভিন্ন কোনও দেশে কোনও কালে কি সাধারণের জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্তি হইয়াছে?

কেবল ইংরাজি বই পড়িলে কোনও ফলোদয় হইবে না। শুষ্ক নীরস সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া কখনও কোনও জাতির চরিত্র উন্নত হয় না। সমাজের চরিত্র-বল বৃদ্ধি করিতে হইলে ধন, মান ও উচ্চ রাজকার্য্য-লাভের পথ সরল করিতে হইবে। এই প্রকার পুরস্কার-লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত চর্চ্চাতেও কোনও জাতির চরিত্রগত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য।

এমন কি, আমাদিগের নিজেদের সম্বন্ধেও একথা খাটে। ইংলণ্ডকেই যদি কল্য পরকীয় শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে দেওয়া যায়, তত্রত্য অধিবাসীদিগকে রাজ-কার্য্যনির্ব্বাহের অংশ-গ্রহণে, সাধারণের প্রদত্ত সম্মানলাভে ও উচ্চপদে বা লাভ-জনক কার্য্যে যদি বঞ্চিত করা যায়, প্রত্যেক বিষয়েই যদি তাহাদিগকে বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া অবহেলা করা যায়, তাহা হইলে, তাহাদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য যতই পবিত্র হউক না কেন, উহা তাহাদিগকে অধঃপতনের হস্ত হইতে কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না—দুই এক পুরুষেই তাহারা নীচ প্রকৃতি, প্রবঞ্চক ও অসাধু জাতিতে পরিণত হইবে। ফলতঃ যে পরিমাণে আমরা উচ্চপদ ও রাজকার্য্য হইতে ভারত-বাসীকে বঞ্চিত রাখিব, সেই পরিমাণে সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি কমিয়া যাইবে, তাহাদের চরিত্র-বলের হানি হইবে।

ভারতবাসী বুদ্ধি-বিকাশের অবসর-লাভে বঞ্চিত হওয়ায় যেরূপে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছে, তাহার বিষয় স্মরণ করিয়াই কটন সাহেব লিখিয়াছেন,—

It is not a spectacle which is likely to reconcile an Indian patriot to the loss of the subtle and refined Oriental arts, the very secrets of which has passed away, to the loss of innumerable weavers......or to the loss of that constructive genius and mechanical ability which designed the canal system of Upper India and the Taj at Agra.

আমাদিগের শাসনে এদেশের অতি সূক্ষ্ম ও সুসংস্কৃত প্রাচ্য শিল্পের বিনাশ ঘটিয়াছে, সমাজ হইতে সে সকল শিল্প-রচনার বিদ্যা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার ফলে অসংখ্য তন্তুবায় অন্নাভাবে গতাসু বা হীন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে প্রতিভা উত্তর ভারতের জল-প্রণালী নির্ম্মাণ-কৌশলের উদ্ভাবন করিয়াছিল,এবং আগ্রার তাজমহলে অপূর্ব্ব শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিল, আমাদিগের দোষে সে প্রতিভার বিলোপ সাধিত হইয়াছে। কোন দেশ ভক্ত ভারতবাসীরই নিকট এ দৃশ্য প্রীতিকর হইতে পারে না।

সূক্ষ্মদর্শী মেরিডিথ টাউন্‌সেণ্ড মহোদয় তাঁহার "এসিয়া ও ইউরোপ" গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

One of these (prodigious drawbacks of British rule), of which they are fully conscious, is the gradual decay of much of which they were proud, the slow death...of Indian culture, Indian military spirit. Architecture, engineering, *literary skill* are all perishing out, so perishing that Anglo-Indians doubt whether Indians have the capacity to be architects, though they built Benares or engineers though they dug the artificial lakes of Tanjore or poets, though the people sit for hours or days listening to raphsodists as they recite poem, which move them as Tennyson certainly does not our common people.

বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষের যে সকল অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতবাসীর বহু গৌরবের শিল্প জ্ঞান ও বীরভাবের ক্রমিক বিলোপ একটি উল্লেখের যোগ্য ঘটনা। ভারতের স্থাপত্য-বিদ্যা, হর্ম্ম্য-বিজ্ঞান, সাহিত্য-রচনা-কৌশল প্রভৃতি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। এখন এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে যে, ভারতবাসীর যে এ সকল বিষয় আয়ত্ত করিবার শক্তি আছে, তাহা ভারত প্রবাসী ইংরাজেরাও সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। অথচ ভারতবর্ষেরই হর্ম্ম্যবিদ্‌গণ বারাণসীর ন্যায় সুন্দর নগরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এদেশেরই ইঞ্জীনীয়ারেরা তাঞ্জোরের কৃত্রিম হ্রদ-সমূহ নিখাত করিয়াছেন, ভারতীয় কবিগণ এমন কবিতা-গীতি রচনা করিয়াছেন যে, তাহা অদ্যাপি লোকে বহুক্ষণ বা বহু দিবসপর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়াও ক্লান্তি অনুভব করে না। ইংলণ্ডে কবিবর টেনিসন স্বীয় রচনার দ্বারা জনসাধারণকে যে পরিমাণে মুগ্ধ করিতে পারিয়াছেন, ভারতের কবিগণ স্বদেশবাসীকে নিঃসন্দেহ তদপেক্ষা অধিকতর মোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এইরূপে ইংরাজের সংঘর্ষে আমাদিগের শিল্প-বুদ্ধি-বিকাশের পথ নিরুদ্ধ, কার্য্য-দক্ষতা-প্রকাশের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, শক্তি-চর্চ্চার স্বাভাবিক অবসর বিলুপ্ত এবং দারিদ্র্য-রোগ-শোক-দুশ্চিন্তাদির প্রকোপ বর্দ্ধিত হওয়ায়, আমাদের মানসিক শক্তির বিশিষ্টরূপ হানি ঘটিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইংরাজের চরিত্র-দোষও আমাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া বহু পরিমাণে আমাদের মানসিক অবনতি সংসাধিত করিতেছে।

ইংরাজ-সংসর্গের ফলাফল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজের সহিত ভারতবাসীর প্রথম পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়ের পরই ভারতবাসী ইংরাজের যে মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, রেভারেণ্ড এণ্ডার সন প্রণীত English in Western India নামক পুস্তকে তাহার এইরূপ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

As the number of adventurers increased, the reputation of the English did not improve. Too many committed deeds of violence and *dishonesty*. We can show that even the commanders of vessels belonging to the Company did not hesitate to perpetrate *robberies* on the high seas or on shore, when they stood in no fear of retaliation. * * *

Hindoos and Mussulmans considered the English a set of cow-eaters, and fire-drinkers, vile brutes, who *would cheat their own fathers*.

If a native dealer was offered much less for his articles than the price which he had named, he would be apt to say—What! dost thou think me a *Christian*, that I would go about to deceive thee?

ভাবার্থ—ভারতবর্ষে সাহস-ব্যবসায়ী ইংরাজের সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িতে লাগিল, ইংরাজের সুনাম সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল না। ইহাদিগের অনেকেই অসাধুতা ও অত্যাচার-মূলক কার্য্য করিত। বাধা পাইবার ভয় না থাকিলে, কোম্পানির জাহাজের নায়কেরা পর্য্যন্ত জলে স্থলে দস্যুতা করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। হিন্দু ও মুসলমানেরা ইংরাজদিগকে গো-খাদক, সুরাপায়ী, অধম নরপশু বলিয়া মনে করিতেন। তাহাদিগের কার্য্য-কলাপ-দর্শনে ভারতবাসীর এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, তাহারা নিজের পিতাকেও প্রতারিত করিতে পারে।

যদি কোনও ভারতবর্ষীয় ব্যবসায়ীকে কোনও দ্রব্যের মূল্য তাহার প্রার্থিত মূল্য অপেক্ষা কম দান করা যাইত, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ বলিত, "কি? তুমি আমাকে খ্রীষ্টান বলিয়া ভাবিয়াছ? আমি কি তোমাকে খ্রীষ্টানের মত ঠকাইতে যাইব?"

তদানীন্তন মহারাষ্ট্র কবি মুক্তেশ্বরের (জন্ম ১৬০৯ খৃঃ) কাব্যেও ইংরাজ-চরিত্রের এইরূপ বর্ণনাই দেখিতে পাওয়া যায়। এই ইংরাজ যখন ভারতবাসীর শাসন-কর্ত্তার আসন-গ্রহণ করিলেন, তখন অন্তঃসার-শূন্য নীতি-কথার দম্ভপূর্ণ ঘোষণার দ্বারা এদেশের অধিবাসীকে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া রাখিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। দূরদর্শী ব্যক্তিগণ কিন্তু সেই সময়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতার সুযোগ উপস্থিত হইলেই সংসর্গ-দোষে ভারতবাসীর চরিত্র-হানি ঘটিবে। লর্ড টেনমাউথ (স্যার জন শোর) বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে স্পষ্টাক্ষরেই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে অধিক সংখ্যায় ইউরোপীয়দিগের গতিবিধি ও ভারতবাসীর সহিত পরিচয়-সংঘটন হইলে, ভারতবর্ষীয়

সমাজের চরিত্র বল ও পাশ্চাত্যদিগের প্রতি তাহাদিগের শ্রদ্ধা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার উক্তি এই,—

There is one general consequence, which I should think likely to result from a general influx of Europeans into the interior of the country and their intercourse with the Natives, that without elevating the character of the Natives, it would have a tendency to depreciate their estimate of the general European character.

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষদিগের হৃদয়েও এই ভয় অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় শিল্পীদিগের নির্ম্মিত বহুসংখ্যক জাহাজ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে গমনাগমন করিত। এই দেশের লস্করেরা ঐ সকল জাহাজের পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সুতরাং বিলাতের জন-সাধারণের সহিত তাহাদিগের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিবার পথও সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু বিলাতী শিক্ষা ও সভ্যতার মোহময় উজ্জ্বল আদর্শ এই দেশবাসীর সমক্ষে স্থাপন করিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় সমাজের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিবার যে চেষ্টা করিতেছিলেন, এই পরিচয়ে তাহা বিফল হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই কারণে কোম্পানির ডিরেক্টারেরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতীকারের জন্য—ইংরাজ-চরিত্রের সুনাম-রক্ষার জন্য, অবশেষে তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষীয় লস্করের বিলাতে গমন নিষিদ্ধ করিতে হইল। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের নিজের উক্তি এই,—

But this is not all. The native sailors of India, who are chiefly Mohamedans, are, *to the disgrace of our national morals,* on their arrival here, led to scenes which soon divest them of the respect and awe they had entertained in India for the European character : they are robbed of their little property and left to wander, ragged and destitute in the streets... The contemptuous reports which they disseminate on their return, cannot fail to have a very unfavourable influence upon the minds of our Asiatic subjects whose reverence for our character, which has hitherto contributed to maintain our supremacy in the East, (a reverence in part inspired by what they have at a distance seen among a comparatively small society, mostly of better ranks, in India) will be gradually changed for most degrading conceptions ; and if an indignant apprehension of having hitherto rated us too highly or respected us too much, should once possess them, the effects of it may prove extremely detrimental—*Supplement to the Fourth Report E. I. Co.*

ভাবার্থ—ভারতবর্ষীয় লস্করদিগকে পোত-চালনার কার্য্য হইতে বিতাড়িত করিবার ইহাই একমাত্র কারণ নহে। আমাদিগের (ইংরাজের) জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক বা ধর্ম্ম-নীতি-জ্ঞানের অভাবও ইহার অন্যতম কারণ। আমাদিগের পক্ষে লজ্জার কথা হইলেও ইহা সত্য যে, ভারতবর্ষীয় মুসলমান নাবিকেরা এদেশে

আসিলে অতি বীভৎস দৃশ্য তাহাদের নয়ন গোচর হয়। ভারতবর্ষে অবস্থান-কালে ইউরোপীয় চরিত্রের প্রতি তাহাদিগের যে শ্রদ্ধা ও সম্মান জন্মিয়া থাকে, এখানে আসিলে তাহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহাদিগের সঙ্গে যে সামান্য অর্থ থাকে, এখানকার লোকে, তাহার সমস্ত অপহরণ করিয়া লয় এবং হতভাগ্যদিগকে বস্ত্রহীন নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য করে। তাহার পর লস্করেরা স্বদেশে ফিরিয়া গেলে এই বীভৎস কাণ্ডের বিষয় সকলের নিকট প্রকাশ করে। এইরূপ কলঙ্ক-জনক বিষয়ের প্রচার হইলে এসিয়া-নিবাসী প্রজাবৃন্দের চিত্তে আমাদিগের সম্বন্ধে প্রতিকূল ধারণার সঞ্চার না হইয়া থাকিতে পারে না। আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের মহত্ত্ব বিষয়ে তাহাদিগের অনুকূল ধারণা হইয়াছে বলিয়াই ঐ দেশে আমাদিগের শাসন-কার্য্য সহজে ও সুচারুরূপে চলিতেছে। দূরদেশে যে স্বল্পসংখ্যক সদ্বংশজাত ইংরাজ বাস করেন, তাঁহাদিগের ব্যবহার-দর্শনে আমাদিগের প্রতি ভারতবাসীর যে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাহা যদি বিলাত-ফেরত লস্করদিগের প্রচারিত সংবাদের ফলে নষ্ট হইয়া যায়, যদি আমাদিগের চরিত্রের হীনতা তাহাদিগের নিকট প্রকাশ পায়, তাহা হইলে অতি বিষময় ফলের উৎপত্তি হইবে।

সুখের বিষয়, ইংলণ্ডের ধনবৃদ্ধির সহিত ইংরাজ-চরিত্রের এই অপকৃষ্টতা কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। এখন ইংরাজের আয় প্রতি জনে গড়ে বার্ষিক অন্যূন ৬৩০৲ টাকা, গড়ে প্রত্যেকের সঞ্চিত ধন ৪৫০০ টাকা। সুতরাং দারিদ্র্যের তীব্র তাড়নায় ইংলণ্ডবাসীকে আর পূর্ব্বের ন্যায় পদে পদে নীচতা, মিথ্যাচরণ ও অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। ইহার উপর শিক্ষার বিস্তারেও কিছু সুফল ফলিয়াছে।

"সকলেই জানেন যে, আমাদিগের দেশের রেলে বেশ ভাল করিয়া প্যাক করিয়াও কোন জিনিস পাঠাইলে পথে তাহার অর্দ্ধেক চুরি যায়; কিন্তু বিলাতে দেখিয়াছি, বাক্সে চাবি বন্ধ না করিয়া জিনিস পাঠাইয়াও চুরি যায় নাই। ষ্টেশনে গিয়া লগেজ লইয়া মুটেদের কিংবা কেরাণী বাবুদের সঙ্গে কিছুই বকাবকি করিতে হয় না। কেহ একবার লগেজ ওজন করিতেও বলে না। (১) আপনি যদি বলেন যে, আমার লগেজ বিনা মাশুলে যাইবার যোগ্য নয়, তাহা হইলে আপনি ওজন করাইয়া মাশুল দিতে পারেন; নতুবা অবাধে লগেজ লইয়া গাড়িতে উঠিলেন। কোথাও টিকিট পরীক্ষা করা নাই। অনেক স্থলে ট্রাম গাড়িতে টিকিট দিবার নিয়ম নাই, কণ্ডাক্টারের কাছে ভাড়া দিলেন, হইয়া গেল। সঞ্জীবনী, ২৬শে চৈত্র ১৩০৯।

এ বর্ণনা সত্য হইলে, এতদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইংরাজ এখন আমাদের রাজা, নানা বিষয়ে আমাদিগের আদর্শ-স্থানীয়। ইংরাজের চরিত্র যত উন্নত হইবে, আমাদিগের ন্যায়

(১) সময়াভাব ও কার্য্য-বাহুল্য কি এরূপ ব্যবস্থার অন্যতম কারণ নহে?

অনুকরণ-প্রিয় প্রজার পক্ষে উহা ততই মঙ্গলকর হইবে। ইংরাজের ন্যায়-পরতা বৃদ্ধি পাইলে, বৃটিশ প্রজার সমস্ত অধিকার ও সুখ-সম্পদ আমাদের সুপ্রাপ্য হইবে।

কোম্পানি যে ভয়ে এদেশীয় লস্করদিগের ইংলণ্ডে গমন নিষিদ্ধ করিলেন, সে ভয় সম্যক্ দূরীভূত হইল না। ইংরাজের সুনাম রক্ষার জন্য লস্করদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় বিলুপ্ত করা হইল; কিন্তু অভীষ্ট সংকল্প সুসিদ্ধ হইল না। লর্ড টেন্‌মাউথের উপদেশ উপেক্ষিত হওয়ায় দলে দলে ইংরাজ এদেশে আসিতে লাগিলেন। ইংরাজ-চরিত্রের যে অংশ লোক-লোচনের অন্তরালে রাখিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ দেশীয় লস্কর-দিগের অঙ্গে ধূলিমুষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন, এই ঘটনায় সে অংশ ভারতবর্ষে আসিয়া আত্ম-প্রকাশ করিল! স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" পাঠ করিলে এই অংশের সুস্পষ্ট চিত্র পাঠকের নেত্র সমক্ষে উদ্ভাসিত হইবে।

ইংরাজ চরিত্রের এই অপকৃষ্ট অংশের সংঘর্ষে আমাদের স্বদেশবাসীর চরিত্র কতদূর অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নীলকরদিগের গোমস্তা ও দেশীয় অনুচরগণের চরিত্র আলোচনা করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। রাজ-জাতির সদ্ব্যবহারে প্রকৃতি-পুঞ্জের চরিত্র কতদূর উন্নত হয় এবং তাঁহাদিগের নিকট অসদ্ব্যবহার লাভ করিলে প্রজার তোষামোদ-প্রিয়তা কিরূপ বৃদ্ধি পায়, বিবিধ সদ্‌গুণের কিরূপ হ্রাস হইতে থাকে, ইতিহাসে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উল্লিখিত কারণে, ভারতীয়—বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় প্রজার মানসিক বলের কিরূপ হানি হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

নীলকরদিগের অত্যাচারের দমনে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ মনোযোগী হইয়া বঙ্গ-দেশবাসীর সম্মুখ হইতে ইংরাজ-চরিত্রের কুৎসিত অংশের আদর্শ ক্রমশঃ অপসারিত করিলেন। সাত্ত্বিকতা-প্রিয় বাঙ্গালী নরকের দৃশ্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। ইহার পর সর্ব্বজন-পূজ্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন-কাল সমাগত হইলে, উচ্চবংশীয় সদাশয় ইংরাজগণের আগমনে দেশের নৈতিক অবনতির স্রোত কিয়ৎপরিমাণে প্রতিরুদ্ধ হইল। কিন্তু দীর্ঘকাল অসৎ সংসর্গে যাপন করিলে সৎসঙ্গ লাভ করিয়াও লোকে সহজে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হয় না। আমাদিগের অবস্থা এক্ষণে অনেকাংশে সেইরূপ হইয়াছে।

বঙ্গ-বিভাগের নৈতিক কুফল।

বঙ্গবিভাগ-বিষয়ক সরকারি মন্তব্যের উপসংহারে লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছেন,—পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের প্রজাপুঞ্জের সহিত গবর্ণমেণ্টের (রাজপুরুষদিগের) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনই তাঁহার বঙ্গবিভাগ-প্রস্তাবের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ, শাসক ও শাসিতের মধ্যে যত ঘনিষ্ঠ সংস্রব ঘটে, ততই শাসনকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হয় এবং তাহাতে প্রজাকুলের মঙ্গল ঘটে, তাহাদের সুখ-সমৃদ্ধি ও উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়। লর্ড কর্জ্জনের এই উক্তির একাংশ সত্য সন্দেহ নাই। প্রকৃতিপুঞ্জ যত নিকটে থাকে, রাজপুরুষদিগের ততই শাসন ও শোষণের সুবিধা অধিক হয়; কিন্তু তাহাতে প্রজার সুখ-সমৃদ্ধি বাড়িবার সম্ভাবনা কোথায়? শাস্ত্রকারেরা বলেন, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির ন্যায় বৈদেশিক রাজার অত্যাসন্ন ভাব বা অতিসান্নিধ্য প্রজার পক্ষে অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। স্বদেশীয় ও সমধর্ম্মী রাজার সহিত ঘনিষ্ঠতায় প্রজার মঙ্গল সাধিত হয়, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় বিষম-দশাগ্রস্ত পরাধীন দেশে রাজা-প্রজার ঘনিষ্ঠতায় প্রজার ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের সম্ভাবনাই অধিক। এরূপ ঘনিষ্ঠতায় ধর্ম্ম ও সমাজগত বিপ্লবের উৎপত্তি হয়। আমাদের রাজার জাতি যদি খ্রীষ্টান ও ইউরোপীয় না হইতেন, তাহা হইলে লর্ড কর্জ্জনের প্রার্থিত ঘনিষ্ঠতায় প্রজাকুলের কিয়ৎপরিমাণে মঙ্গল ঘটিতে পারিত। কিন্তু খ্রীষ্টান ইউরোপীয়ের সংস্পর্শ ভারতবাসীদিগের ন্যায় প্রাচ্যজাতির পক্ষে বিষম অনিষ্টকর বলিয়া পাশ্চাত্য মনীষিগণই মত-প্রকাশ করিয়াছেন। মাননীয় মিঃ হল্ট মেকেঞ্জি বলিয়াছেন;—

The longer we have had these districts, the more apparently do lying and litigation prevail, the more are morals vitiated, the more are rights involved in doubt, the more are foundations of society shaken.

যে প্রদেশ যত অধিক কাল আমরা শাসন করিয়া আসিতেছি, সেই প্রদেশের লোক তত অধিক পরিমাণে অসত্য-পরায়ণ ও মোকদ্দমা-প্রিয় হইয়াছে, লোকের নৈতিক অধঃপতন হইয়াছে, স্বত্ব বিষয়ে সন্দেহ বৃদ্ধি পাইয়াছে, মোটের উপর তাহাদের সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তি পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছে।

কাপ্তেন ওয়েষ্টমেটক মহোদয় বলেন,—

I have no hesitation in affirming that in the Hindu and Mussalman

cities removed from European intercourse, there is much less depravity than there is in Calcutta, Madras and Bombay where Europeans chiefly congregate.

কলিকাতা মান্দ্রাজ অথবা বোম্বাই প্রভৃতি যে সকল নগরে অধিক-সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ বাস করিয়া থাকে, সেই সকল নগর অপেক্ষা, শ্বেতাঙ্গ-সংস্রব-শূন্য হিন্দু বা মুসলমান-প্রধান স্থানে, সত্যের ব্যভিচার অল্পই দৃষ্ট হয়, একথা স্বীকার করিতে আমি কুণ্ঠিত নহি।

স্যর জন শোর বলিয়াছেন,—

It has been observ ed as a general truth that the more connection the natives have had with the English, the more immoral and the more worse in every respect they become.

অর্থাৎ ইহা এক প্রকার সর্ব্বজন-স্বীকৃত সত্য যে, ইংরাজের সহিত ভারতবাসীর সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ হয়, ততই ভারতীয়দিগের চরিত্রের ও অন্য সকল বিষয়েরই উত্তরোত্তর অবনতি ও অপকর্ষ ঘটিতে থাকে।

অতএব ইংরাজ যাহাতে আমাদিগকে দূর হইতেই শাসন করেন, তাহাই আমরা প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করি। তাই কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের সহিত গবর্ণমেণ্টের ঘনিষ্ঠ সংস্রব-সাধনে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া দেশের ধর্ম্ম-প্রাণ সমাজ-নিষ্ঠ ও নীতি-প্রিয় ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। যে সংস্রবে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, ধর্ম্ম-জগতে বিপ্লব ঘটে, নৈতিক অধঃপতনের পথ প্রসারিত হয়, কোন্ স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তি সে সংস্রবকে প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিবেন?

মানসিক অবনতির অন্যান্য কারণ।

ইংরাজের কতিপয় জাতিগত দোষের বিষয় ইতঃপূর্ব্বে (৫ম পৃঃ) উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সকল দোষের মধ্যে ইংরাজের সহবাস গুণে বিলাসিতা, অহঙ্কার ও আত্ম-সুখ-পরায়ণতা প্রভৃতি দোষ আমাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করেন। ইংরাজের প্রণীত বিধি-ব্যবস্থার (আইন কানুনের) দোষে এদেশের ধর্ম্মাধিকরণ-(আদালত) সমূহ মিথ্যাচারের লীলাক্ষেত্র হইয়াছে। সেকালের পঞ্চায়তের বিচারে মিথ্যাচারের এরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল না। একদিকে অবস্থাভিজ্ঞ স্থানীয় পঞ্চায়তের সমক্ষে মিথ্যা কথা বলিয়া অব্যাহতিলাভ ও সমাজে সম্মান রক্ষা করা যেমন সুসাধ্য ছিল না, অপর দিকে সেইরূপ আইনের কূটতর্কের আশ্রয়ে প্রকৃত তথ্য উপেক্ষিত হইত না। এখন দেশের

সর্ব্বত্র পাশ্চাত্য-রীতি-সম্মত ধর্ম্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মিথ্যাচার এদেশে সমধিক আধিপত্য-লাভ করিয়াছে।

ইংরাজের প্রেষ্টিজ বা সম্মানের দায়ে ভারতবাসীর ধর্ম্মবুদ্ধিতে দ্বিধা-ভাব উপস্থিত হইয়াছে। এদেশে শ্বেতাঙ্গদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় নানাসূত্রে দেশবাসীর সহিত তাঁহাদিগের সংঘর্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সংঘর্ষ-সূত্রে ভারতবাসী অহরহঃ দেখিতেছে যে, রাজজাতির সম্মান-রক্ষার ব্যপদেশে আমাদিগের ন্যায়-বিচার-প্রাপ্তির পথ প্রতিপদেই রুদ্ধ হইয়া যায়, সত্যের বিধান লঙ্ঘিত হয়, ধর্ম্ম উপহত হয়েন। পাপিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ আসামীকে রক্ষা করিবার জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পর্য্যন্ত অধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না। পরন্তু এইরূপে যাঁহারা সত্যপথ লঙ্ঘন করেন, তাঁহাদিগের অচিরে পদোন্নতি ও সম্মান-বৃদ্ধি হয়, ছাপরা ও নোয়াখালির পেনেল-বিপ্লবে লোকে তাহা দেখিয়াছে। কেপকলোনি প্রভৃতি ইংরাজ উপ-নিবেশে ভারতবর্ষীয় সম্রান্ত ব্যক্তিরও ফুটপাথে গমন নিষিদ্ধ, যানারোহণে ভ্রমণ দণ্ডার্হ—ইত্যাদি সংবাদ আজ কাল সংবাদ-পত্রের সাহায্যে প্রায়ই দেশের অসংখ্য লোকের কর্ণগোচর হইতেছে। পক্ষান্তরে ভারতবাসী ইহাও নিত্য দেখিতে পায় যে, ইংরাজেরই ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতারা এদেশ-বাসীকে মানব-মাত্রের ভ্রাতৃত্ব ও ঈশ্বরের পিতৃত্ব-মূলক সাম্যবাদ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন, স্ব-জাতীয়দিগকে নেটিবের সহিত ভ্রাতৃত্ব বা সমতা শিখাইবার জন্য তাহার শতাংশের একাংশও আগ্রহ প্রকাশ করেন না। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহার ও দৃশ্য নয়নগোচর হইলে, অনুকরণ-প্রিয় পরাধীন জাতির নিত্য ধর্ম্মে আস্থা বৃদ্ধি পায় না, চরিত্র উন্নত হয় না,—একথা বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন। ইংরাজ-চরিত্রের এই সকল দোষের সংস্রবে আমাদিগের চরি-ত্রের যে অবনতি সাধিত হইতেছে, সুকবি ও চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

ইহাতে (ইংরাজের বিসদৃশ ব্যবহারে) আমাদের শিক্ষাদাতাদের ইষ্ট বা অনিষ্ট কি হইতেছে, তাহা লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না। ভয়ের কারণ এই যে, আমাদের মন হইতে ধ্রুব ধর্ম্মে বিশ্বাস শিথিল, ও সত্যের আদর্শ বিকৃত হইয়া যাইতেছে। আমরাও প্রয়োজনকে সকলের উচ্চে স্থান দিতে উদ্যত হইয়াছি। আমরাও বুঝিতেছি, পলিটিক্যাল উদ্দেশ্য সাধনে ধর্ম্মবুদ্ধিতে দ্বিধা অনুভব করা

অনাবশ্যক। অপমানের দ্বারা যে শিক্ষা অস্থিমজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে, সে শিক্ষার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিব কি করিয়া?...অতএব ইচ্ছা করি, না করি, বিলাত আমাদিগকে ঠেসিয়া ধরিয়া যে সকল শিক্ষা দিতেছে, তাহা গলাধঃকরণ করিতেই হইবে।

আমরা আজকাল রাষ্ট্রগত একান্ত স্বার্থপরতাকেই সভ্যতার একটি মাত্র মুকুটমণি † † বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। † † দোকানদারীর মিথ্যা বিদেশের দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিদিন গ্রহণ করিতেছি। আমরা টাকাকে মনুষ্যত্বের চেয়ে বড় এবং ক্ষমতাকে মঙ্গল-ব্রতাচরণের চেয়ে শ্রেয়ঃ বলিয়া জানিয়াছি। তাই এতকাল যে স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের দেশে লোক-হিতকর কর্ম্ম ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তাহা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে। শিশুকাল হইতে বিদেশীকে একমাত্র গুরু বলিয়া মানা অভ্যাস হওয়াতে তাঁহাদের কথাকে বেদবাক্য বলিয়া স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা-বিহীন হইয়াছি।" (বঙ্গদর্শন ১৩০১ সাল। "অত্যুক্তি"-শীর্ষক প্রবন্ধ)।

মাদকসেবনে মানসিক শক্তির কিরূপ হ্রাস হয়, চরিত্র-বলের কিরূপ হানি ঘটে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু আমাদের অর্থ-লুব্ধ গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীকে মাদক-সেবী করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। আফিমের চাষে এদেশবাসী কৃষকের কখনই বিশেষ অনুরাগ ছিল না, বরং অনেকে সে বিষয়ে যথোচিত বিরাগ-প্রদর্শন করিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র কৃষকদিগকে টাকা দাদন ও অন্যবিধ প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া আফিমের চাষে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট স্যর সিসিল বিডন বিলাতের ফাইন্যান্স কমিটীর সমক্ষে সাক্ষ্য-দান-কালে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে,—

The Government would probably not be deterred from adopting such a course by any consideration as to the deleterious effect which opium might produce on the people to whom it was sold.

অহিফেন-সেবনে প্রজার চরিত্র-বল বিনষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট সম্ভবতঃ কখনই এই লাভজনক ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।

বলা বাহুল্য, শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ান-পোষণে অজস্র অর্থ-ব্যয় করিয়া রাজকোষ শূন্য না করিলে গবর্ণমেণ্টকে কখনই এই দুর্নীতির পৃষ্ঠ-পোষণ করিতে হইত না।

কৃষকদিগকে টাকা দাদন করিয়াই গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত হন নাই। এদেশবাসী যুবকদিগের যাহাতে অহিফেনে আসক্তি জন্মে, তাহারও জন্য অতি গর্হিত উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব সহকারী কমিশনার মিঃ হাইও বলেন,—

Organised efforts are made by Bengal agents to introduce the use of the drug, and create taste for it among the rising generation.

এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া অহিফেনের প্রচার-বৃদ্ধির জন্য বঙ্গদেশে যথারীতি চেষ্টা হইয়াছিল। অহিফেন-সেবনে তরুণ যুবকদিগের যাহাতে আসক্তি জন্মে, তাহার জন্যও বিধিমতে চেষ্টা করা হইয়াছিল।

হাইও মহোদয় এই চেষ্টার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা এইরূপ.—গ্রামে গ্রামে প্রথমে আফিমের দোকান খোলা হইল। তাহার পর পল্লীবাসী যুবকদিগকে দোকানে ডাকিয়া বিনা-মূল্যে অহিফেন বিতরণের ব্যবস্থা করা হইল। কিছুদিন পরে যখন হতভাগ্যদিগের অহিফেন সেবনে অভ্যাস জন্মিল, তখন অতি অল্পমূল্যে এই বিষ বিক্রীত হইতে লাগিল; ক্রমে যে পরিমাণে যুবকদিগের নেশা বাড়িতে লাগিল, গবর্ণমেণ্ট সেই পরিমাণে উহার মূল্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিনের মধ্যে দেশের নানা স্থানে অহিফেনের প্রচার বাড়িল—পল্লীবাসী যুবকদল আফিমখোর হইয়া উঠায় পশুর অধম হইল!

যে সুরা এদেশে লোকের "অপেয়" ও "অস্পৃশ্য" ছিল, তাহার স্রোতে আজকাল সমাজ ভাসিয়া যাইতেছে। যে ঘৃণিত উপায়ে এদেশে আফিমের কাট্‌তি বাড়ান হইল, মদের কাট্‌তি বাড়াইবার জন্যও যে প্রথমে সেইরূপ নিন্দনীয় উপায়ই অবলম্বিত হইয়াছিল, স্যর সিসিল বিডন একথা বিলাতে গিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর মদের কাট্‌তি না বাড়াইতে পারিলে কলেক্টর ও ডেপুটী কলেক্টারদিগকে প্রকাশ্যভাবে তিরস্কার করা হইত, বঙ্গীয় রেভিনিউ বোর্ডের পুরাতন রিপোর্টসমূহ পাঠ করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজস্ব-বৃদ্ধির আশায় কর্ত্তৃপক্ষ পঞ্জাবে সুরার প্রচলন-বিষয়ে এরূপ আগ্রহাধিক্য প্রকাশ করেন যে, তাহাতে বিপরীত ফলের উৎপত্তি হইল। বহুপ্রদেশ সুরার বিষময় পরিণামে জনশূন্য হইয়া গেল, সরকারি রাজস্ব কমিয়া গেল। এ বিষয়ে পঞ্জাবের তদানীন্তন ছোটলাট স্যর ম্যাক্‌লিয়ডের উক্তি এই,—

In the Nerbudda territories I have known whole districts *depopulated* in consequence of the action of our spirit contractors. They used to send people all over the country to seduce these poor simple folk and utterly *demoralise* them. They got on their books, and after being *sold out of house and home*, they absconded in thousands.

এখনও আবগারি বিভাগের আয় বাড়াইবার জন্য—ভারতীয় সমা-

জের চরিত্র-বল হরণ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের যত্নের ত্রুটি নাই। সরকারি রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধ হয় যে, প্রতি বৎসরই মাদকদ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্টের ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা লাভ হয়। ১৮৮৩ সালে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪ কোটি ২৬ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। ১৮৯৫ সালে আবগারি বিভাগে ৬ কোটী ১৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। তদবধি উহা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়া গত ১৯০৩ সালে ৭ কোটী ৮৩ লক্ষ ৬৫ হাজারে দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ ঐ সালে গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট কর্তৃপক্ষ মাদক-বিক্রয় হিসাবে সাড়ে পাঁচ আনা করিয়া লাভ পাইয়াছেন! আবগারির আয় বাড়াইতে কর্তৃপক্ষের যেরূপ যত্ন, দেশে সুশিক্ষার বিস্তারে সেরূপ যত্ন নাই, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে! সুসভ্য ইংরাজের এই বিসদৃশ কার্য্য-প্রণালীর ফল কিরূপ ভীষণ হইয়াছে, মিঃ কষ্ট মহোদয় পশ্চাল্লিখিত মন্তব্যে তাহা সুব্যক্ত করিয়াছেন—

As to the *demoralising effect* of our control on the character of the native, we have presented to us the most fearful corroboration of what was asserted by Shore, and reiterated by Campbell...In the course of comparatively few years we have succeeded in destroying whatever of truthfulness and honour they have by nature, and substituting in its place *habits of trickery, chicanery and falsehood.* Every native will tell you that it is impossible, now-a-days, to find an honest man... Our whole *system of law and government* and *education* tends to make the natives clever, *irreligious, litigious scamps.* No man can trust another. Formerly a verbal promise was as good as a bond. Then bonds became necessary. Now bonds go for nothing and no prudent banker will lend money without recieving landed property in pledge. ... ...

You are only to compare our new provinces with the old. From the recently acquired Panjaub where the people have had little of our law and government, and education, and are comparatively truthful and honest, the population becomes worse and worse, as you descend lower and lower, to our old possessions of Calcutta and Madras.

ভারতবর্ষে ইংরাজ যে শাসন-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসীর চরিত্র দিন দিন হীন হইবে, স্যর জন শোর ও ক্যাম্বেল মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্প দিবসের মধ্যেই বৃটিশ শাসনে ভারতবাসীর স্বাভাবিক সত্য-প্রিয়তা ও সাধুতা অপগত হইয়াছে। প্রতারণা, কপটতা ও মিথ্যাবাদ ভারতীয় সমাজে বিশেষ প্রশ্রয়-লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক ভারতবাসীই এখন বলে, আজকালকার দিনে ভাল লোক পাওয়া অসম্ভব। আমাদিগের আইনে, শাসনে ও

শিক্ষায় ভারতবাসীকে ধূর্ত্ত, অধার্ম্মিক ও মামলাবাজ করিয়া তুলিয়াছে। এখন কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। পূর্ব্বে লোকের মুখের কথা দলিলের ন্যায় অটল বলিয়া বিবেচিত হইত; পরে দলিল বিশ্বাসের আধার হইল। এখন দলিলেও কেহ বিশ্বাস করে না। কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই আর স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক না পাইলে টাকা ধার দিতে অগ্রসর হয় না। যে সকল অঞ্চলে ইংরাজ-শাসন ও শিক্ষা বদ্ধ-মূল হয় নাই, সে সকল অঞ্চলে সাধুতা ও সত্য-প্রিয়তার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়—নব-বিজিত পঞ্জাবের সহিত বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজ প্রদেশের লোকের তুলনা করিলেই একথা বুঝিতে পারা যাইবে।

হায়! কোথায় সুসভ্য ইংরাজের সংসর্গে ভারতবাসীর চরিত্র দিন দিন উন্নত হইবে, না ক্রমেই তাহার অবনতি ঘটিতেছে। দীর্ঘকালের মুসলমান শাসনেও ভারতীয় সমাজের যে চরিত্র-গত অবনতি ঘটে নাই, স্বল্প দিনের ইংরাজ শাসনে তাহাই ঘটিল, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। ইংরাজের বর্ত্তমান দোষ-বহুল শাসন-নীতির পরিবর্ত্তন না ঘটিলে, এই চরিত্রাবনতির স্রোতঃ ক্রমেই বেগশালী হইবে, সন্দেহ নাই।

জাতীয় নিন্দা।

ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটিবার আর একটি কারণের বিষয়ে আমাদের জাতীয় মহাসমিতির দশম অধিবেশনের সভাপতি মিঃ আল্‌ফ্রেড ওয়েব মহোদয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

It is my growing conviction that disastrous consequences must sooner or later result from persistent vilification of Indian character.........I know how such vilification has worked in us, at times turning our better natutres into gall, and being responsible for many a hideous passage in our history.........*Subject peoples are abnormallg sensitive to the feeling towards them of their rulers.*

ভারতবাসীর চরিত্রের অনবরত কুৎসার বিষময় ফল, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, এক দিন অবশ্যই ফলিবে, আমার এইরূপ বিশ্বাস দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে। ঈদৃশ কুৎসায় আমাদিগের (আইরিশদিগের) কিরূপ অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমি জানি। ইহাতে আমাদের অনেক সদ্‌গুণ বিনষ্ট হইয়াছে। এইরূপ নিন্দাবাদে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে অনেক ঘটনা বীভৎস ভাব ধারণ করিয়াছে। রাজ-জাতির কৃত নিন্দা ও স্তুতিতে পরাধীন জাতির চরিত্রে অতি সহজে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে।

মহাভারতীয় উপাখ্যানে কথিত হইয়াছে যে, কর্ণকে হীন-বল করিবার নিমিত্ত তদীয় সারথি পাণ্ডব-হিতৈষী মদ্ররাজ শল্য তাঁহার বহুল নিন্দা করিয়াছিলেন। রাজজাতির মুখে অহরহঃ আত্ম-নিন্দা শ্রবণ

করিলে সাধারণতঃ সকলেরই আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হয় ও আপনাকে অকর্ম্মণ্য, হীন-শক্তি বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। এই ভ্রান্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ক্রমশঃ বুদ্ধি-ভ্রংশ ও চরিত্র-বলের হানি হইতে থাকে। এই কারণেই স্বজাতি-নিন্দা-শ্রবণ করা পাপ অর্থাৎ অবনতিকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইংরাজের নিন্দায় আইরিশ জাতির চরিত্রের যথেষ্ট অবনতি সাধিত হইয়াছে। তাই, ভারতবাসীর প্রতি বৈদেশিক রাজ-জাতির নিন্দা-বর্ষণ দেখিয়া সহৃদয় ওয়েব মহোদয় উপরি লিখিত মন্তব্য প্রকাশ-পূর্ব্বক আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

আত্ম-শক্তির প্রতি ভারত-বাসীর যাহাতে বিশ্বাসের লাঘব হয়, তাহার উদ্দেশ্যে অনেক রাজপুরুষ এদেশের লোক-চরিত্রের নিন্দা করিয়া থাকেন। উচ্চ-বেতনের পদসমূহে যাহাতে ভারত-সন্তানের পরিবর্ত্তে অধিক সংখ্যায় স্বজাতীয়েরই নিয়োগ হয়, তদুদ্দেশ্যেও অনেক সুচতুর ইংরাজ আমাদিগের চরিত্রে দোষারোপ করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন। **On the Edge of the Empire** নামক পুস্তকে একজন ইংরাজ রাজপুরুষ লিখিয়াছেন,—

The native of India like the *ape*, is at his best in childhood and deteriorates as he grows older.

ভারতবর্ষের অধিবাসীরা পুচ্ছহীন মর্কটের মত বাল্যকালে কিছু ভাল থাকে কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাদের চরিত্রের ক্রমশঃ অবনতি আরব্ধ হয়।

এদেশবাসীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, একজন ইংরাজ জেনা-রেল কিছু দিন পূর্ব্বে, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

The only way to do is to exercise no mistaken clemency, but to *slay* and *slay*, and *slay* recognising no surrender. That is the only logic that an Eastern people can really understand.

সৌভাগ্যের বিষয়, ইহাদিগের কৃত নিন্দা সকল সময়ে এদেশবাসী জনসাধারণের কর্ণগোচর হয় না। পক্ষান্তরে অনেক সহৃদয় রাজপুরুষ ভারতবাসীর চরিত্রের যথোচিত প্রশংসাও করিয়াছেন। (৩৭ পৃঃ দেখুন) আমাদের জাতীয় চরিত্রের হীনতা-প্রদর্শন-কার্য্যে খ্রীষ্ট-শিষ্য মিশনরি মহাশয়দিগেরই সমধিক আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয় এবং ইঁহাদিগেরই কুহকপূর্ণ বাক্যে আমাদের দেশের অনেক সরলচিত্ত শিক্ষিত ব্যক্তিও ভ্রান্তি-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। হিন্দুসমাজের উপরেই ইঁহাদিগের

আক্রমণ-বেগ কিছু প্রবল। "চর্চ্চ কোয়ার্টার্লি রিভিউ" পত্রে জনৈক রেভারেণ্ড (ভক্তি-ভাজন!) মিশনরি কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন,—

That the Hindus as a race are probably the most immoral, trecherous and cunning people on the face of this wicked earth will generally be admitted.

এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে বোধ হয় হিন্দু জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্নীতিপরায়ণ, বিশ্বাস-ঘাতক ও ধূর্ত্ত, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

এই নিন্দার মধ্যে বোধ হয় একটু অসম্পূর্ণতা থাকিয়া গিয়াছিল। তাই একটি কোমল-হৃদয়া মিশনরি-মহিলা গত ১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাসের Sentinel (শান্ত্রী) পত্রে লেখনীধারণ করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই অসম্পূর্ণতা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই মহিলা ইংলণ্ডীয় বিশ্ব-সুহৃদ্-সমাজে (British Philanthropic Societies) বিশেষ সম্মানিতা। ইনি বলিয়াছেন,—

Hinduism is impurity crystalised into a system.

স্ফটিকাকারে ঘনীকৃত অপবিত্রতা ও হিন্দু ধর্ম্ম একই পদার্থ।

মুসলমান বা জাপানী সমাজে যে অপবিত্রতা বা বিশ্বাস-ঘাতকাদি দোষের লেশমাত্র নাই, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম যে মিশনরিদিগের মতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ন্যায় "নিরবচ্ছিন্ন পবিত্রতায় ও সার সত্যে পরিপূর্ণ" তাহা নহে। তথাপি তাঁহাদিগের নিন্দাবাদে মিশনরি মহাশয়দের তাদৃশ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। জাপান ও পারস্য স্বাধীন দেশ বলিয়া, সেথানে এই খ্রীষ্ট-শিষ্যগণ বহু পরিমাণে বাক্-সংযম করিয়া থাকেন। চীন ও জাপানে একই ধর্ম্ম প্রচলিত; কিন্তু চীনদেশে মিশনরিদিগের যেরূপ উচ্চকণ্ঠ শ্রুত হওয়া যায়, জাপানে সেরূপ নহে। কারণ, চীন দুর্ব্বল আর জাপান প্রবল! ভারতবাসী মুসলমান পরাধীন হইলেও তাঁহাদিগের তেজস্বিতা সামান্য নহে। মুসলমান সমাজের নিন্দাবাদে বিশেষ তীব্রতা প্রকাশ করিলে কুৎসা-কারীকে পরনিন্দা-পাপের দণ্ড অচিরাৎ ভোগ করিতে হয়। কাজেই ধর্ম্মপ্রাণ মিশনরি মহোদয়েরা সে পথে পদার্পণ করেন না—নিরীহ হিন্দুর নিন্দা করিয়াই যথাসম্ভব তৃপ্তিলাভ করেন। শৌর্য্য-প্রধান রাজ-পুতনায় ইঁহাদিগের রসনার আস্ফালন অপেক্ষাকৃত অল্প ও প্রচার-কার্য্যের গতি অতীব মন্থর দেখিতে পাওয়া যায়।

শুনিতে পাই, মিশনরি মহাশয়েরা এদেশবাসী নরনারীর চরিত্রে ধর্ম্ম-ভীরুতার অভাব ও কুসংস্কারের প্রাবল্য-দর্শনে বিশেষ চিন্তিত। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে যখন দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন ইঁহারা বাইবেলের দোহাই দিয়া সেই ঘোরতর নিষ্ঠুর প্রথার সমর্থন করিতেন! ইউরোপে যখন দর্শন-বিজ্ঞানের প্রথম চর্চ্চা আরব্ধ হয়, তখন এই সুসংস্কার-সম্পন্ন খ্রীষ্টীয় যাজক-সম্প্রদায় রাজশক্তির সাহায্যে জ্ঞানের পথ কণ্টকিত ও স্বাধীন-চিন্তার দ্বার অবরুদ্ধ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের জন্য ইউরোপের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, চিতার অনলে দার্শনিক ও তত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল; ইতিহাস একথার অদ্যাপি সাক্ষ্যদান করিতেছে। কিন্তু পুরাতন কথার আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া যদি ইঁহাদিগের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালীর প্রতি মনোনিবেশ করা যায়, তাহা হইলেও ইঁহাদিগের উদ্দেশ্যের সাধুতায় সংশয় জন্মে। যে বৈরাগ্য, শান্তি, পাপভীরুতা ও স্বার্থত্যাগ যীশুখ্রীষ্টের প্রধান শিক্ষা বলিয়া ইঁহারা আমাদিগের নিকট সগৌরবে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের স্বদেশে তাহার একান্ত অভাব দেখিয়াও ইঁহারা বিন্দুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করেন না। মিঃ এ, আর, ওয়ালেস প্রণীত The Wonderful Century নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই,—

The whole world is but the gambling table of six great powers, ... Just as gambling deteriorates and demoralizes individuals, so the greed for dominion demoralizes governments. Witness their struggle in Africa and Asia, where millions are enslaved and bled for the exclusive benefit for their new rulers......It will be held by the historian of future that we of the 19th Century were *morally* and *socially* unfit to possess for good or for evil what the rapid advance in scientific discoveries had given us. What a horrible mockery is all this, when viewed in the light of either Christianity or advancing civilisation. Of real Christian deeds there are none; no real charity, no forgiveness of injuries, no help to the oppressed nationalities, no effort to secure peace or good will among men.

সমগ্র ভূমণ্ডল ছয়টি প্রধান রাজশক্তির দ্যূত-ক্রীড়ার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। জুয়াখেলায় যেমন ব্যক্তিবিশেষের নৈতিক অবনতি সাধিত হয়, অত্যধিক সাম্রাজ্যলিপ্সায় সেইরূপ রাজ-শক্তির অধোগতি ঘটিয়া থাকে। এসিয়া ও আফ্রিকা খণ্ডে ইহাদিগের কিরূপ স্বার্থ-সংগ্রাম চলিতেছে, তৎপ্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। দেখিবে, আপনাদিগের ইষ্ট-সিদ্ধির জন্য ইহারা লক্ষ লক্ষ লোককে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতেছে। নূতন শাসকদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য হতভাগ্য বিজিতদিগকে আপনাদিগের শোণিত-দান করিতে হইতেছে। ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকগণ অবশ্যই বলিবেন যে,

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, ধর্ম্মের চক্ষে, সমাজের চক্ষে আমরা তাহা গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। খ্রীষ্টধর্ম্মের দিক্ দিয়া দেখিলে এই সকল কাণ্ড কি ভয়াবহ প্রহসন বলিয়াই বোধ হয়। প্রকৃত খ্রীষ্ট-ধর্ম্মানুমোদিত একটিও কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে না ; প্রকৃত বদান্যতা, অপকারীর প্রতি ক্ষমা, অত্যাচার-পীড়িতদিগের সহায়তা,বা নর-সমাজে শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষার চেষ্টা—এ সকলের কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছে না।

যে স্বার্থ-পরতা হইতে সকল প্রকার অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, যাহার অনিষ্টকর পরিণাম-পরম্পরা-সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধাঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

সেই স্বার্থপরতা পাশ্চাত্য-সমাজে কিরূপ প্রবলতা-লাভ করিয়াছে, তৎ-সম্বন্ধে অধ্যাপক ল্যাড (Prof. Ladd L. L. D.) তাঁহার "Moral and Religious Crisis" নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

In business, in politics, in the family and the church, in internal and international relations, the reigning spirit of *covetousness* is at war with true spirit of morality and religion......The criminal spirit of insolence has become dominant in the whole of Christendom. This insolence is the crime of thinking and acting as though *there were no controlling power remaining in the Divine hands.*

বিষয় কর্ম্মে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে, পারিবারিক ব্যাপারে, ধর্ম্মমন্দিরে, স্বদেশীয় ও আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ-বিচার-স্থলে সর্ব্বত্রই, প্রকৃত ধর্ম্ম ও সুনীতিমূলক ভাবের সহিত অদম্য স্বার্থ লালসার ঘোর সংগ্রামে চলিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্মানুশাসিত সমাজনিচয়ে সর্ব্বত্র ঔদ্ধত্যের দূষণীয় ভাবটাই আজকাল প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যেন জগদীশ্বরের হস্তে মানবকে শাসন করিবার আর কোনও ক্ষমতাই অবশিষ্ট নাই—এইরূপ ভাব প্রবল হইয়াছে, এই দূষণীয় ভাবের বশীভূত হইয়া সকলে কার্য্য করিতেছে।

ইংলণ্ডীয় রমণী-সমাজের নিম্ন স্তরে সুরাপান-দোষের কিরূপ প্রাবল্য ঘটিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ম্যাঞ্চেষ্টারের মহিলা ইন্‌স্পেক্টর কুমারী ফ্রান্সিস জেনেটী ১৯০২।৩ সালের রিপোর্টে লিখিয়াছেন,—

Among women the gross death-rate from alcoholism was 74 per million higher than amongst males, and from 1881 to 1900, while the male death rate from this cause increased 48 per cent that of females went up 73 per cent. These figures applied only to deaths directly caused by inebriety, but many diseases were induced and aggravated by intemperance.

অর্থাৎ সুরাপান জনিত রোগে পুরুষের মৃত্যু-সংখ্যা গত ২০ বৎসরে

শতকরা ৪৮ হিসাবে ও স্ত্রীলোকের ৭৩ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে! এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে ডাক্তার হণ্টারের যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেও দৃষ্ট হইবে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ঘোর অধর্ম্মের গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া মনুষ্যত্বের নামে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে ইউরোপ খণ্ডেই এক্ষণে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ধর্ম্ম-প্রচারকের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম-প্রচারকের পক্ষে ইদানীং ইউরোপের ন্যায় কার্য্য-ক্ষেত্র পৃথিবীর আর কোথাও নাই। পাশ্চাত্য সমাজে যাহাতে সুনীতির সঞ্চার হয়, পাপানলে দহ্যমান প্রাণিকুলের হৃদয়ে যাহাতে ধর্ম্মামৃত সেচিত হয়, প্রত্যেক ধার্ম্মিকের এখন তাহাই প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের পাদ্রি মহাশয়দিগের সে দিকে আদৌ দৃষ্টি-পাত হয় না কেন? যাঁহারা স্বদেশীয় সমাজের পাপক্ষয়-কার্য্যে নিরত থাকিয়া ভগ্ন-মনোরথ হইতেছেন, তাঁহাদিগের সহায়তায় অগ্রসর না হইয়া ইঁহারা ভারতবর্ষের ন্যায় সুদূরদেশে আগমন, এখানকার ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ ও অত্রত্য অজ্ঞাত-চরিত্র নরনারীর চরিত্র-সংশোধনের শ্রম-স্বীকারে অধ্যবসায় প্রকাশ করেন, ইহা কি সামান্য বিস্ময়ের বিষয়? গৃহ-সংস্কার অপেক্ষা পরচ্ছিদ্রান্বেষণ ও পরোপদেশে পাণ্ডিত্য-প্রকাশ সহজসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু প্রশংসনীয় নহে। গত ১৯০৪ সালের নবেম্বর মাসের পিয়ার্সন্স্ ম্যাগেজিন পত্রে মিস অলিভ ক্রিশ্চান মালভেরি মিশনরিদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই,—

"I attended a meeting recently, at which funds were appealed for to mitigate the woeful sins of heathenism. It occurred to me as funny that souls ten thousands miles off should be accounted so much more precious than those in the London streets. Why, for instance, is it a more heinous crime for a Hindoo widow to be badly treated than for an English girl to be without shelter in London streets, starving and cold?"

ইঁহাদিগের অনুগ্রহে হিন্দু মুসলমানকে পথে, ঘাটে, স্বধর্ম্মের, স্বদেশীয় সমাজের ও স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষগণের কঠোর নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে হয়। মানবজাতি এক মনুষ্য-দম্পতির সন্তান, সাপে কথা কয়, মাছের পেটে মানুষ বাস করে, ভূতে শূকরের দেহে প্রবেশ করে, সূর্য্য গতিশূন্য হয়, তারকা মানুষের মাথায় দাঁড়ায়, গাধায় দেবদূত দেখে ও কথা কয়, প্রভৃতি গঞ্জিকা-সেবীর কল্পনা-প্রসূত গল্পের জন্য কেহ বাইবেলে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে মিশনরিদিগের নিকট

তাহাকে "অসভ্য," "মূর্খ ও "কুসংস্কারাচ্ছন্ন" প্রভৃতি বিশেষণে আপ্যায়িত হইতে হয়। ভারতবাসীর অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্য জেনানা মিশনের সৃষ্টি করিয়া ইঁহারা যে অনর্থ ঘটাইতেছেন, তাহাও এখন অভিজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের অবিদিত নহে।

ভেদনীতি-কৌশলে ইঁহাদিগের নৈপুণ্য কুটিল রাজনীতি-বিশারদ-গণেরও অনুকরণীয়। ইঁহারা বলেন,—"শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে অনেকে নেটিবদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহা দুঃখের বিষয় বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা অপর জাতিদিগের সম্বন্ধে হৃদয়ে যে প্রকার ঘৃণা পোষণ করেন, নেটিবের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা তাহার তুলনায় অতি সামান্য। ফলতঃ জাতিভেদের জন্যই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরাধীনতা ঘটিয়াছে।" কিন্তু বিগত ৭ শত বৎসরের মধ্যে ভারতের সিংহাসন লইয়া হিন্দু মুসল-মানে যে সকল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহার কয়টিতে জাতিভেদের জন্য হিন্দুগণ পরাজিত হইয়াছিলেন, পলাসীর যুদ্ধেই বা জাতিভেদ কতদূর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা ইঁহারা নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হন না। সেকালে আপাত-পরিদৃশ্যমান বৈষম্য-বাদ-সত্ত্বেও পল্লীগ্রামে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সদ্ভাব ছিল, ব্রাহ্মণের মুখেও "কামার দাদা" "কুমার খুড়ো" প্রভৃতি আত্মীয়তা-সূচক সম্বোধন সর্ব্বত্র শ্রুত হইত; এখন মৌখিক সাম্যবাদের প্রচার বাড়িলেও, সে প্রাচীন ঘনিষ্ঠতা বিলুপ্ত হই-য়াছে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতে দূরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে, এ কথা কি অস্বীকার করিতে পারা যায়?

যীশুখ্রীষ্ট জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সুসমাচারের প্রচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই পাদরী মহাশয়েরা নিরন্তর পর-ধর্ম্মের অতি তীব্র নিন্দার দ্বারা শান্তি-পূর্ণ দেশে অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া থাকেন, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। এদেশে যখন ইংরাজেরা রাজনীতিক প্রয়োজনে ন্যায় ও ধর্ম্ম পদদলিত করেন, তখন সেই পাপ-কার্য্যের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতে ইঁহাদিগের সাহসে কুলায় না। অথচ ভারতবাসীর নৈতিক দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময় ইঁহাদের অসীম উৎসাহ প্রকাশ পায়!

ইহার কারণ কি? মিশনরি চরিত্রে এইরূপ বিসদৃশ ভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হয় কেন? এ কথার উত্তরে মিঃ আলফ্রেড ওয়েব বলেন,—

Foreign mission work has become a career to thousands...Young men and women are enabled through it to marry, to settle down, and rear families. In the interest of missionary enterprise there is sometimes apparent a tendency to stimulate support by expatiating upon the darkest side of "Heathen" character. *The darker it is painted, the freer will be the flow of subscriptions*, the more occupation there will be for the missionary.

অধুনা বিদেশে গিয়া ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবসায় সহস্র সহস্র লোকের জীবিকানির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ হইয়াছে। এই ব্যবসায়ে আশ্রয়হীন যুবক যুবতীদিগের পরিণীত হইবার, সংসার পাতিবার ও বংশবৃদ্ধি করিবার সুবিধা হইয়া থাকে। কাজেই এই ব্যবসায় যাহাতে অব্যাহতভাবে চলে, তাহার জন্য খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস-বিহীন জাতিদিগের চরিত্রের অপকৃষ্ট অংশ বিশেষভাবে জনসাধারণের গোচর করিবার চেষ্টা করা হয়। কারণ, অন্যধর্ম্মাবলম্বীর চরিত্র যতই কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হইবে, ততই উহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ মিশনরি-প্রেরণের জন্য পাশ্চাত্যদেশের ধর্ম্মভীরু লোকেরা অধিক পরিমাণে চাঁদা দিবেন; ফলে মিশনরি-ব্যবসায়ও লাভজনক হইয়া উঠিবে!

এ বিষয়ে রুষ সম্রাটের পিকিনস্থিত ভূতপূর্ব্ব রাজদূত মিঃ পল লেসার মহাশয় "রিভিউ অব রিভিউজ্"পত্রের সম্পাদক ষ্টেড সাহেবকে বলেন,—

Men become missionaries as a kind of business and women go into it as a kind of excitement and from a love of travel, knowing that if they got into trouble, there is always the consul and the gun-boat. The fact is, it is all *rascals* who become Christians.

পুরুষেরা ব্যবসায়ের জন্য মিশনরি হয়, স্ত্রীলোকে দেশ-ভ্রমণের লালসায় বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের ব্রত গ্রহণ করে। তাহারা জানে, কোনরূপে বিপন্ন হইলে তাহাদের দেশের রাজদূত কামনপূর্ণ জাহাজের সাহায্যে তাহাদিগকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন। প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যদেশের দুর্ব্বৃত্তেরাই সাধারণতঃ স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হয়।

ইহার পর মিঃ পল লেসার বলিয়াছেন, চীন ও পারস্যদেশের দেশীয় খৃষ্টানদিগের মধ্যে অনেকেই স্বদেশীয় রাজার ও সমাজের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ভারতেও যে অনেক ইতর লোক দুষ্কার্য্য করিয়া রাজদণ্ডে ও সমাজ দণ্ডে অব্যাহতি পাইবার আশায় খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা কোনও কোনও প্রদেশের পুলিশ রিপোর্ট পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। পরিশিষ্টে দেশীয় খৃষ্টানদিগের যে সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোল, ভীল, সাঁওতাল, গোণ্ড, খসিয়া, মুণ্ডা প্রভৃতি অনার্য্য, পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির সংখ্যাই অধিক। ইহার কারণ সম্বন্ধে ১৯০১ সালের আদম সুমারীর রিপোর্টের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে,—

They took to missionaries for help in their disputes with their landlords and they see in Christianity a means of escape from the payment of fines imposed on witches and on those who are supposed to have neglected the demons and from persecution to which they would be subjected if unwilling to meet the demands of the *Bhoots* and their earthly servants.

ভাবার্থ— এই সকল অসভ্য জাতি তাহাদিগের জমিদারদের সহিত বিবাদ-প্রসঙ্গে মিশনরিদিগের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সামাজিক দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে। (১)

সে যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে জর্ম্মান সম্রাটের একটি উক্তি স্মৃতিপথে উদিত হয়। তিনি বলিয়াছেন,—

By true Christian I mean a good soldier.

তাঁহার মতে রুষিয়াবাসীরা প্রকৃত খৃষ্টান নহে বলিয়া জাপানের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে নাই! এদিকে জাপানী সেনাপতি টোগো আর্থর বন্দরের রুষ-নৌবাহিনীর ধ্বংস সাধন করিবামাত্র খৃষ্টানী সংবাদ-পত্র-নিচয় তাঁহাকে খৃষ্টান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে প্রকাশ পায় যে, সে কথা মিথ্যা। টোগোও অন্যান্য জাপানীদের ন্যায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সুখের বিষয়, মিশনরিদিগের কপটতা ক্রমেই নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে।

এই স্বার্থ-পর ধর্ম্ম-ধ্বজদিগের কুটিলতায় এদেশের যুবক-সমাজের বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটিতেছে, দেশের একতা বিনষ্ট হইতেছে, স্বদেশীয় সমাজের প্রতি অনেকের ভক্তিশ্রদ্ধা হ্রাস পাইতেছে। বিদেশে, পাশ্চাত্য সমাজে আমরা হেয় ও উপেক্ষিত হইতেছি। ডিগ্‌বি মহোদয়ও এ কথা বলিয়াছেন,—

As a hindrance, to their (the Indians') proper recognition as men of character and of noble life, the Christian missionary societies of England interested in India have done the Indian people *almost irremediable mischief*.

---

(১) ফলকথা, দেশীয় খৃষ্টানদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই পারলৌকিক মঙ্গলের কামনায় খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত দেখিয়া মিশনরি মহাশয়েরা উপহাস করিয়া থাকেন; কিন্তু খাস বিলাতেও খৃষ্টানেরা যে অন্যূন ২২৭ টি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এবং এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের লোককে নিরয়-গামী বলিয়া মনে করেন, একথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। এ বিষয়ে বোম্বায়ের সেন্সস্ রিপোর্টের লেখক মহোদয়ের উক্তি এ স্থানে উদ্ধারের যোগ্য।—

Those who are acquainted with the very numerous religious sects that exist in England and America, will not be disposed to be surprised at the list given under religion *Hindu*.

এই সকল কারণে মিশনরিদিগের কার্য্য-কলাপের রহস্য এস্থলে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইল।

মিশনরি-সমাজে কতিপয় সদাশয় ও বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। তাঁহাদিগের চেষ্টায় এদেশে অনেক শুভানুষ্ঠান হইয়াছে; সে জন্য আমরা বিশেষ উপকৃত ও কৃতজ্ঞ। তাঁহারা এই প্রকার নিন্দাবাদের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এস্থলে আবি, জে, এ, ডুবয় নামক একজন মিশনরি মনীষীর উক্তি একটু বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করা গেল—

I see with a kind of indignation that these peaceable and submissive people have of late years been a kind of *target*, to aim at them the shafts of calumny and malevolence and *to debase them by the most unfair means.* Alas! it is *not Bibles* the poor Hindûs want or ask for. It is *food* and *raiment.* When the belly is empty and the back bare, the best disposed even among the Christians feel themselves but very little inclined to peruse the Bible......Bibles cannot be to them (the Hindoos) of the least utility.... It has at present become a kind of fashion to speak of improvements and ameliorations in the civilisation and institutions of the Hindoos, and every one has his own plans for effecting them; but if we could for an instant lay aside our European eyes and European prejudices and look at the Hindoos with some degree of impartiality, we should perhaps find that *they are nearly our equals in all that is good and our inferiors only in all that is bad*......In fact, in education, in manners, in accomplishments and in the discharge of social duties, *I believe them superior to some European nations and scarcely inferior to any*......If you will take the trouble to attend to the subject and examine with impartiality the character and conduct of the persons of the same condition in our countries and in India, and compare husbandman to husbandman, artificer to artificer, mechanic to mechanic etc, etc, I apprehend that you will find that, in education and manners, *the Hindoo shines far above the European.*

Without a knowledge of alphabet, the Hindoo females are dutiful daughters, faithful wives, tender mothers and intelligent housewives...... Such is the result of my own observations. Abbe. *J. A. Dubios.*

ভাবার্থ এই যে—ভারতবর্ষের শান্তিপ্রিয় ও কলহ-বিমুখ অধিবাসীরা ইদানীং কিছু দিন হইতে একদল খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল হইয়াছে, দেখিয়া আমার হৃদয়ে বিষম ক্ষোভের সঞ্চার হইতেছে। এই সকল মিশনরি তাহাদিগকে চরিত্র-গৌরবে হীন করিবার জন্য অতি গর্হিত উপায় অবলম্বনে তাহাদিগের সম্বন্ধে ঘোর কলঙ্কপূর্ণ নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া থাকেন। হায়! দরিদ্র হিন্দুরা বাইবেল চাহে না; অথবা বাইবেলের অভাবও তাহাদিগের নাই। তাহারা অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গাল। যখন জঠরে ক্ষুধানল প্রজ্বলিত হয় এবং পৃষ্ঠদেশ আবরণের কোনও উপায় থাকে না, তখন খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে যাঁহারা ভাল লোক, তাঁহাদেরও বাইবেল পড়িবার প্রবৃত্তি হ্রাস পায়। ফলতঃ হিন্দুদিগের পক্ষে বাইবেলের বিন্দুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নাই।

ভারতবাসীর মধ্যে জ্ঞান-সভ্যতা প্রচার ও তাহাদিগের রীতি নীতির সংস্কার ও চরিত্রের উন্নতি সাধনের কথা একদল লোকের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে উপদেশ-দান এক শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গের রোগ-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যদি উঁহারা তাঁহাদিগের পাশ্চাত্য কুসংস্কারসমূহের বশীভূত না হইয়া কিঞ্চিৎ পক্ষপাতশূন্য নেত্রে হিন্দুদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, হিন্দুগণ প্রায় সর্ব্ব প্রকার সদ্‌গুণেই আমাদিগের সমকক্ষ, এবং তাহাদিগের চরিত্রে দোষভাগ আমাদিগের অপেক্ষা অল্প। ফল কথা,আমার বিশ্বাস,শিক্ষায়, রীতিনীতিতে, সৌজন্যে ও সামাজিক কর্ত্তব্য-পালনে কোন কোন ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা হিন্দুগণ শ্রেষ্ঠ, এবং কদাচিৎ কোন জাতি অপেক্ষা হীন। যদি কেহ এই বিষয়ের প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন এবং ইউরোপ ও ভারতের সমান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের চরিত্র ও আচরণের প্রতি অপক্ষপাতিতার সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, শিক্ষায় ও সৌজন্যে হিন্দু কৃষক, শিল্পী, যন্ত্রী প্রভৃতি সম্প্রদায় ইউরোপীয় ঐ সকল সম্প্রদায়ের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। হিন্দু রমণীগণ এক বর্ণ লিখিতে পড়িতেনা জানিলেও কর্ত্তব্যপরায়ণা দুহিতা, পতিব্রতা স্ত্রী,সন্তানবৎসলা জননী ও বুদ্ধিমতী গৃহিণী বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। বহু দিনের পর্য্যবেক্ষণের ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

এইরূপ আরও অনেক মনীষীর মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু স্থানাভাবে ও অনাবশ্যক-বোধে সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হইল। এই বহুদর্শী মিশনরি হিন্দু-চরিত্রের সহিত পাশ্চাত্য চরিত্রের তুলনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে আমাদিগেরই সহসা বিশ্বাস-স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মনে হয়, আমরা অতি হীন-চরিত্র, জগতে সকলের অধম। রাজ-জাতির মুখে অনবরত স্বজাতির নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া আমাদের এইরূপ মানসিক অবনতি ঘটিয়াছে!

ইংরাজ-শাসনের ফলে এদেশে ধর্ম্ম-শিক্ষা ও লোক-শিক্ষারও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। তাহাও আমাদিগের মানসিক অবনতি-সাধন-বিষয়ে অল্প সহায়তা করে নাই। পূর্ব্বে এদেশে লোকশিক্ষা বা জ্ঞান-বিস্তারের বহুল উপায় প্রচলিত ছিল। দক্ষিণাপথের হেমাদ্রি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে "চতুর্বর্গ-চিন্তামণি" নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন, অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তাহা বঙ্গদেশে সুপরিচিত হইয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও গোবর্দ্ধনাচার্য্যের শতকগুলি বঙ্গদেশে রচিত হইবার পরমুহূর্ত্তে মহারাষ্ট্র দেশে খ্যাতি-লাভ করিয়াছিল। ফলতঃ সেকালে দেশ-ভেদ, ভাষা-ভেদ ও জাতি-ভেদ বা শ্রেণীভেদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশগুলি একটি

ঐক্যসূত্রে বদ্ধ ছিল,(১) দেশে জ্ঞান-বিস্তারের সহজ উপায় প্রচলিত ছিল লোক-শিক্ষার প্রসঙ্গে বঙ্কিম বাবু যথার্থই বলিয়াছেন,—

"লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্ম্মের কূটতর্ক সকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম্ম চরণকে আর্দ্র করে।......... (কিন্তু) সেই কূটতত্ত্বময়, নির্ব্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্ব্বোধ্যধর্ম্ম শাক্যসিংহ ও তাহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে—গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলকে শিখাইয়াছিলেন—লোক-শিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্য্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল, দিগ্বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম্ম শিখাইলেন—লোক-শিক্ষার কি উপায় ছিল না? সেদিনও চৈতন্যদেব সমস্ত উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোক-শিক্ষার কি উপায় হয় না?"

তাহার পর বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর লোক-শিক্ষার উপায় নাই বলিয়াই রামমোহন রায়ের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত বহু চেষ্টাসত্ত্বেও ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ-লাভ করিতে পারে নাই। সেকালে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে যে কথকতা ও পুরাণপাঠ হইত, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—

কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়ক সংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার-সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণের সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না, সেও শিখিত—শিখিত, যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপপুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরমধর্ম্ম, যে লোক-হিত পরম কার্য্য।—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। * * (অনেকে এখন ভাবেন) কথকের কথা শুনিয়া কি হইবে? দক্ষযজ্ঞে, বিশ্ব যজ্ঞে ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? * * * (তাই) লোক শিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।

কেন যে ইংরেজী শিক্ষা-সত্ত্বেও দেশে লোক-শিক্ষার উপায়, হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার মূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না।

(১) "বঙ্গভাষা" নামক মাসিক পত্রিকার ১ম বর্ষের ৯ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত "আমাদের ইতিহাস" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে এখনও কথকতা ও পুরাণ-পাঠের প্রথা আছে, তবে ইংরাজী শিক্ষার গুণে দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। কথকতার যে সুফলের কথা বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য মিঃ সি, এফ, গর্ডন কমিং প্রণীত In the Himalayas and on the Indian Plains গ্রন্থের পশ্চাল্লিখিত কয়েক পংক্তি হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে—

Marvellous self-denial of the Hindoos in the service of their gods does certainly put our self-indulgent practice of Christianity to the blush. No one who studies the creed and practice of this race with unbiassed mind, can fail to be struck with their intense earnestness in living up to teaching, which, however, distorted, has in it rich veins of thought...... which we deem most sacred......So too, although we Christians are taught that "whether we eat or drink or whatsoever we do, we should do all to the Glory of God," I think it can scarcely be a transgression of charity to judge that comparatively few habitually obey this precept, whereas the most casual observer cannot fail to see that in the daily life of the average Hindoo this is the ruling principle.

মনীষী বৈদেশিকেরাও ইহা দেখিতে পান; কিন্তু আমরা সকল সময়ে দেখিতে পাই না। বাক্‌পটু প্রবল বিদেশীর মুখে স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের অনবরত নিন্দাবাদ শ্রবণ করিতে বাধ্য না হইলে কি আমাদের এরূপ শোচনীয় মানসিক অবনতি ঘটিত?

ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ উদ্ধারকর্ত্তা জোসেফ ম্যাজিনি বলিয়াছেন,—

In order to restore to man the free use of those powers and faculties which have been degraded by the prolonged arts of tyranny, the first step is to raise him in his own esteem, to efface the mark of slavery on his brow, and make known to him one divinity that lies dormant within him, the greatness of his destiny and the inviolability of human nature.

অর্থাৎ পরাধীন অবস্থায় মানবের যে সকল মানসিক শক্তি ও চিত্তবৃত্তি, বিবিধ অত্যাচার-মূলক বিধানবশে স্বভাবতঃ অধোগতি প্রাপ্ত হয়, সেই সকল মানসিক শক্তি ও চিত্তবৃত্তিকে পুনরায় প্রকৃতিস্থ ও ক্রিয়াশীল করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে সেই দাসত্ব-পঙ্কমগ্ন মনুষ্যকে আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতে শিখাইতে হইবে, তাহার ললাটস্থ দাসত্ব-চিহ্ন বিলুপ্ত করিতে হইবে এবং তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে, তাহার অন্তরে এক ব্রহ্ম-শক্তি গূঢ়ভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাহার অনন্ত উন্নতির পথ মুক্ত রহিয়াছে ও তাহার মনুষ্যত্বকে বিকৃত করিবার শক্তি এ জগতে কাহারও নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে "হিতবাদী"তে জনৈক চিন্তাশীল পত্রপ্রেরক যথার্থই লিখিয়াছেন,—

আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব আমাদিগের উন্নতি পথে ঘোর প্রতিবন্ধক। * * * * * এই আত্ম-বিশ্বাসের অভাব ইংরাজ প্রদত্ত শিক্ষার একটি ফল। ইংরাজ ভারতে পদার্পণ করিয়া অবধি ইতিহাসে, সংবাদপত্রে, সভায়, আর কখন কখন আমাদের

কর্ণমূলে প্রাণপণ চেষ্টায় বাঙ্গালীর নিন্দা গাইয়াছেন; এত চেষ্টা ও চীৎকারের পর যদি বাঙ্গালী সত্য সত্যই অপদার্থে পরিণত হয়, তাহা বিচিত্র কি? এইরূপে উপেক্ষিত হইয়া আইরিশ জাতি আয়র্লণ্ডে ছিন্নকন্থা মলিনদেহ গোলামের মত ছিল, কিন্তু আমেরিকায় যাইয়া তাহারা এখন ইংরাজের চক্ষুর অন্তরালে কি মহাজাতিই গঠিত করিয়া তুলিল! কে বলিতে পারে, এই ইংরাজ-সৃষ্ট জাতিগত পৌরুষ-হীনতার কুহেলিকা (national hypnotism) কাটিয়া গেলে, ভারতের বিলুপ্ত মহাশক্তি আবার পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে না।

তাহার পর জাতীয় দারিদ্র্যের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

দরিদ্রের পতিপ্রাণা স্ত্রী, আদর্শপুত্র, দেবীতুল্যা কন্যা থাকিলেও অশান্তি ঘুচে না, দৈন্যের সহিত সহস্র কলহ, বিবাদ, নীচতা, স্বার্থ, অসুখ আসিয়া গৃহে প্রবেশ করে; কিন্তু দরিদ্রতা ঘুচিলেই সে সব দোষ স্বতই বিলুপ্ত হয়। আমাদের জাতীয় জীবন দিন দিন ঘোর দারিদ্র্যগ্রস্ত হইতেছে, ধনের হ্রাসের সহিত স্বভাবতই লোকের স্বার্থ-চিন্তা বাড়িতেছে; তাই আমরা এতটুকু আপন বস্তু, পরের জন্য, দেশের জন্য ত্যাগ করিতে পারি না; কারণ, আমাদের যে ঐ টুকুই আছে। এই জাতীয় দীনতা ঘুচিলে, গৃহে লক্ষ্মীর সমাগম হইলে চরিত্রেও নানা সদ্‌গুণের স্ফূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইবে। তখন আর এত আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না, তখন একদিনে বাঙ্গালী মানুষ হইবে।

ফলতঃ দশকোটী ভারত-সন্তানের নিত্য অর্দ্ধাশন-ক্লেশ যদি নিবারিত হয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা যদি হ্রাস পায়, কর্ত্তৃপক্ষ মাদকের প্রচার সংযত করেন, যদি ভারতবাসীকে বুদ্ধি-বিকাশের যথেষ্ট অবসর দান করেন, তাহা হইলে সাত্ত্বিকতা-প্রিয় হিন্দু মুসলমানের চরিত্রবল নিঃসন্দেহ বৃদ্ধি পাইবে।

কৃষকের দুর্গতি।

The condition of agricultural labourers in India is a disgrace to any country calling itself civilised—*W. R. Robertson* (Agricultural Dept. Madras).

"অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনু ক্ষীণ।"

স্বজাতীয় হউন, বিজাতীয় হউন, স্বদেশীয় হউন, বিদেশীয় হউন, রাজা প্রকৃত পক্ষে জন-সমাজের প্রতিনিধি-মাত্র। সমাজের প্রতিনিধি-রূপে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, সামাজিকগণের ধর্ম্মনীতি ও ধনসম্পত্তি-

বর্দ্ধনের উপায়-বিধান প্রভৃতি বিষয়ের সুব্যবস্থা-পূর্ব্বক জনসমাজে সুখ-শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁহার প্রধান কার্য্য। এই কর্ত্তব্য-সাধন বহু-ব্যয়সাপেক্ষ। সেই ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য প্রজার নিকট হইতে রাজাকে কর গ্রহণ করিতে হয়। প্রজাও সুখশান্তির আশায় সানন্দচিত্তে রাজাকে কর দিয়া থাকে। রাজা একগুণ কর লইয়া এরূপ সুব্যবস্থার সহিত উহার ব্যয় করিয়া থাকেন যে, প্রজাকুল সহস্র গুণে উপকৃত হয়। তাই কবিকুল-গুরু কালিদাস আদর্শ নরপতি দিলীপের গুণ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥

প্রজার এরূপ অসীম মঙ্গল-সাধন করেন বলিয়াই আমাদিগের শাস্ত্রে রাজাকে দেবাংশ-সম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—রাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে বলা হইয়াছে। এই কারণেই রাজার মৃত্যু ঘটিলে প্রজারা বিপ্লবের ভয়ে আশঙ্কিত হইয়া উঠে—অপর রাজার সিংহাসনা-রোহণ-কাল পর্য্যন্ত ত্রস্ত অবস্থায় যাপন করে। তৎপরে নূতন রাজা সিংহাসনস্থ হইয়া প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করিলে, লোকের চিন্তা দূর হয়। লোক-যাত্রানির্ব্বাহের পথ বিঘ্নশূন্য হইয়াছে দেখিয়া, সকলেই আনন্দ প্রকাশ করে। নূতন রাজার অভিষেকে প্রজাবর্গের আনন্দ-প্রকাশের ইহাই মূল কারণ। অরাজক অবস্থায় সমাজে শান্তিভঙ্গের ভয় না থাকিলে, নবীন নরপতির অভিষেক-ব্যাপারকে প্রকৃতিপুঞ্জ "উৎসব" নামে অভি-হিত করিতে সম্মত হইত কি না সন্দেহ। রাজার জন্ম-মৃত্যুর সহিত প্রজার সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ পৃথিবীতে যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন রাজার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ ও নবভূপতির অভিষেকে উৎসবানুষ্ঠান লোক-সমাজ হইতে তিরোহিত হইবে না।

ফল কথা, রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিনিধি। সমাজের প্রতিনিধি-রূপে তাঁহাকে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করিতে হয়। শাসন, পালন ও সুখসমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় প্রজা রাজাকে কর প্রদান করে। এই কারণে কর-গ্রাহী রাজা "প্রজার ধন-রক্ষক" নামে সভ্য সমাজে পরিচিত। রাজকোষে যে অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহাতে রাজার অধিকার অতি সামান্য —উহা প্রজা-সাধারণেরই সম্পত্তি (public wealth) বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রাজা সেই "প্রজার সম্পত্তি" প্রজার মঙ্গলের জন্য ব্যয়

করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। ইহাই সভ্য দেশের ও সভ্য সমাজের নিয়ম। সুসভ্য বৃটিশ রাজ্যে এই নিয়ম অতীব প্রবল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য-ক্রমে, রাজপুরুষদিগের দোষে সেই নিয়ম এদেশে সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় না; ভারতগবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় প্রকৃষ্ট নীতিমার্গ পরিহার-পূর্ব্বক অর্থ-লোভে অন্ধ হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট হইতে অতিরিক্ত মাত্রায় কর গ্রহণ করিয়া থাকেন; ব্যয়ের সময়ে স্বেচ্ছাক্রমে নানা বিষয়ে অযথা অর্থক্ষয় করেন। তাঁহারা প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি সর্ব্বথা সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন না। এদেশে রাজ-ধর্ম্ম বহু প্রকারেই লঙ্ঘিত হইয়া থাকে।

অপব্যয়ের কথা স্থানান্তরে আলোচিত হইবে। যে অতিরিক্ত পরি-মাণে রাজস্ব-গ্রহণের জন্য ভারতীয় কৃষিজীবী প্রজা অর্থ-বলে অতীব হীন হইয়া দুর্গতির গভীর গহ্বরে পতিত হইয়াছে, এস্থলে অতি সংক্ষেপে কেবল তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় দেখাইয়াছেন, হিন্দু ও মোগল আমলে প্রজার নিকট হইতে যে পরিমাণে ভূমিকর আদায় হইত, এখন প্রজার অসামর্থ্য-সত্ত্বেও তদপেক্ষা অধিক কর আদায় করা হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, উত্তরোত্তর ভূমিকরের হার এক বঙ্গদেশ ভিন্ন সর্ব্বত্র ক্রমেই বাড়ান হইতেছে। অধিক হারে কর দিতেই লোকে দরিদ্র হইয়া পড়ি-তেছে। পরন্তু, খাজনা কবে বাড়িবে, তাহার কোনও স্থিরতা না থাকায় ভূমির অশেষ ক্ষতি হইতেছে। রাম ভাবিতেছে, "এই জমির খাজনা ১০৲ টাকা আছে, বাড়িয়া ১২৲ টাকা হইলে, আমি আর রাখিতে পারিব না—তখন শ্যাম লইবে। তবে আমি কেন মিছামিছি পরিশ্রম করিয়া এ জমির উন্নতি করিয়া মরি।" ইহাতে দেশের জমি দিন দিন অপকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। পক্ষান্তরে, গবর্ণমেণ্টকে এ দেশের কৃষি-কার্য্যের উন্নতি-বিধান-কল্পে কোনও চেষ্টা করিতে দেখিলে লোকে মনে করে, দুই এক বৎসর কোন প্রকারে ফসলের সামান্য উন্নতি দেখাইয়া স্থায়িভাবে খাজনা বৃদ্ধি করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ কৃষক-সমাজের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি দেখাইতেছেন! এই ভয়ে কৃষকেরা জমির ফসল-বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করিতে সহজে অগ্রসর হয় না। কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে ইহার অপেক্ষা সাংঘাতিক অবস্থা আর কি হইতে পারে?

রমেশ বাবু আরও দেখাইয়াছেন যে, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২২

খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট; বঙ্গদেশের জমিদারের প্রাপ্য খাজনার উপর শত-করা ৯০৲ ও উত্তর ভারতে ৮০৲ পরিমাণ রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন। মোগলদিগের আমলেও রাজস্বের হার এইরূপ ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা যাহা ধার্য্য করিতেন, তাহা প্রায়ই আদায় করিতেন না। তদ্ভিন্ন প্রজার শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক উন্নতি-সাধনে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। মহারাষ্ট্রীয় ভূপতিগণও রাজস্ব আদায় কার্য্যে বিশেষ কঠোরতা প্রকাশ করিতেন না (১)। কিন্তু ইংরাজ যে কর চাহিলেন, তাহা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইলেন। বঙ্গের শেষ নবাব ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার রাজত্ব কালের শেষ বৎসরে প্রজার নিকট হইতে ৮১,৭৫,৫৩০৲ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। ইংরাজ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজত্ব পাইয়া কর আদায়ের জন্য যে কঠোর নীতি অবলম্বন করিলেন, তাহাতে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্বের পরিমাণ বার্ষিক ২,৬৮,০০,০০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল! ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে ইংরাজ এলাহাবাদ ও অন্য কয়েকটি জেলা প্রাপ্ত হন। মুসলমান নবাবের আমলে ঐ কয় জেলার ভূমিকর, ১,৩৫,২৩,৪৭০৲ টাকা ধার্য্য ছিল। নবাবেরা ইহার মধ্যে কত আদায় করিতেন ও কত প্রজাকে ছাড়িয়া দিতেন, তাহা জানা যায় না। কিন্তু ইংরাজ তিন বৎসরের মধ্যে ঐ সকল জেলা হইতে ১,৬৮,২৩,০৬০৲ টাকা বার্ষিক কর আদায় করিলেন। ইংরাজেরা মান্দ্রাজে সর্ব্বপ্রথমে যে ভূমিকর ধার্য্য করেন, তাহাতে প্রজাকে কৃষি-লব্ধ মোট আয়ের অর্দ্ধাংশ রাজাকে প্রদান করিতে হইত। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। তখন উহার রাজস্বের পরিমাণ ৮০,০০,০০০ টাকা ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংরাজ উহা বাড়াইয়া বার্ষিক ১,৫০,০০,০০০ টাকা আদায় করিতে লাগিলেন! মহা-রাষ্ট্রে তদবধি ক্রমাগত ভূমির খাজনা বাড়িতেছে।

পাঠক মনে করিবেন না, ইংরাজ-শাসনে প্রজার অবস্থার উন্নতি বা কৃষিকার্য্যের বিস্তার ঘটায় এইরূপ রাজস্ব-বৃদ্ধি হইয়াছিল। আদায় কার্য্যে

(১) বিগত উনবিংশ অধিবেশনে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত লাল-মোহন ঘোষ মহাশয়ও এই কথাই বলিয়াছেন,—

The elastic modes (of collection) of the Moghul and the Mahratta have given place to cast-iron system worked by a host of highly paid and "promotion-by-result" settlement officers.

ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের নির্ম্মমতাই অল্প সময়ে অস্বাভাবিক রাজস্ব-বৃদ্ধির প্রধান কারণ। বিশপ হিবার সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়াছেন,—

No Native Prince demands the rent which we do.

অর্থাৎ দেশীয় কোন রাজাই প্রজার নিকট আমাদের মত অধিক কর গ্রহণ করেন না। কর্ণেল ব্রিগস্ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়াছেন,—

A land tax like that which now exists in India, professing to absorb the whole of the landlord's rent, was never known under any Government in Europe or Asia.

অর্থাৎ এসিয়া বা ইউরোপে কোনও রাজার আমলেই কখনও এরূপ উচ্চ হারে ভূমির কর আদায় করা হয় নাই। এ বিষয়ে সেকালের আরও অনেক বিজ্ঞ ইংরাজ লেখকের এইরূপ উক্তি প্রমাণ-স্বরূপে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্ট সেকথা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদিগের রাজস্ব-নীতির দোষ দেখাইয়া রমেশ বাবু যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর বিগত ১৯০২ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে সরকারি নির্দ্ধারণ-পত্রে (রেজোলিউশনে) বলিয়াছেন,—

"Historically it (the Land Revenue system of the present Government) owes its immediate origin to practices inherited from the most decadent period of native rule."

অর্থাৎ ইতিহাসের আলোচনা-পূর্ব্বক বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-নীতি খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর পতনশীল দেশীয় রাজ্যসমূহে প্রচলিত রাজস্ব-নীতির অনুকরণেই গঠিত হইয়াছে।

এক্ষণে বিশপ হিবার, কর্ণেল ব্রিগ্‌স্ প্রভৃতি সেকালের লেখকেরা স্বচক্ষে দেশের কৃষকদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিব, অথবা এতদিন পরে লর্ড কর্জ্জন কল্পনাবলে যাহা লিখিতেছেন, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব? কে এ সমস্যার মীমাংসা করিবে? সে যাহা হউক, এই রাজস্ব আদায়-কার্য্যে কিরূপ কঠোরতা অবলম্বিত হইত, সরকারি কাগজ পত্রেই তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ঘটে। শস্য ও খাদ্য-দ্রব্যাদি ক্রমশঃ মহার্ঘ্য হইতে থাকে। কিন্তু রাজপুরুষেরা রাজস্ব-

আদায়-কার্য্যে যথাসম্ভব দক্ষতা প্রকাশ করিলেন। হণ্টার সাহেবের Annals of Rural Bengal নামক গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠে লিখিত আছে যে,—

The revenues were never so closely collected before.

ইতঃপূর্ব্বে এরূপ কঠোরতার সহিত কখনও রাজস্ব আদায় কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই।

পরবর্ত্তী বর্ষে বঙ্গে ঘোর দুর্ভিক্ষপাত হইল। রাজপুরুষেরা বিলাতে কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন যে, "অসংখ্য লোক অনাহারে মরিতেছে। লোকের কষ্টের কথা বর্ণনা করিতে পারি, ভাষায় এরূপ শব্দ নাই। এক অত্যুর্ব্বর পূর্ণিয়া জেলাতেই কয়েক মাসে এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, ইহাতে রাজস্বের যেরূপ ক্ষতি হইবে বলিয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল, কার্য্যক্ষেত্রে সেরূপ হয় নাই!" তাঁহাদের মূল উক্তির শেষাংশ এইরূপ,—

But we are happy to remark the collections have fallen less short than we supposed they would.

১৭৭১ সালেও ইংরাজ প্রজার রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন। এখানকার রাজপুরুষেরা কর্তৃপক্ষকে লিখিলেন,—

Notwithstanding the great severity of the late famine and the great reduction of the people thereby, some increase has been made in the settlement both of the Bengal and the Behar provinces for the present year.

অর্থাৎ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও লোকনাশ-সত্ত্বেও এবার বঙ্গ ও বিহারের রাজস্ব-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় দশ লক্ষ বঙ্গবাসী অনশন-যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করে। ইংরাজ এই দুর্ঘটনার জন্য কোথায় প্রজার করলাঘব করিবেন, না পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা অধিক খাজনা আদায় করিলেন! ওয়ারেন হেষ্টিংসের কথায় প্রকাশ,—

The net collections of the year 1771 exceeded even those of 1768.

ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রতি বৎসর নূতন বন্দোবস্ত করিয়া ভূমির রাজস্ব-বর্দ্ধনের চেষ্টায় বঙ্গবাসী কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নহে। সৌভাগ্য-ক্রমে লর্ড কর্ণওয়ালিস বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত করায় বঙ্গবাসী অশেষ অত্যাচারের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। (১)

---

(১) বঙ্গের সর্ব্বত্র এখনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই। বঙ্গের অস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন ভূমি হইতে গত ১৯০০ সালে ৩৪,২৩,২৬৭ টাকা ও গবর্ণমেণ্টের খাস বে-বন্দোবস্তী মহাল হইতে ৪১,০৪,৭৫৩ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছিল।

ইংরাজ-শাসকের হস্তগত হওয়ায় অযোধ্যা অঞ্চলের যেরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল, তাহা কাপ্তেন এডোয়ার্ডসের উক্তি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দৌলার শাসনকালে কাপ্তেন সাহেব অযোধ্যা প্রদেশকে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ দেখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বর্ষে নবাবের মৃত্যু হইলে, ইংরাজ অযোধ্যা প্রদেশে প্রবেশ লাভ করেন। তদবধি ঐ অঞ্চলের সমস্ত সম্পদ অপহৃত হইতে থাকে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন এডোয়ার্ডস্ গিয়া দেখেন, অযোধ্যা প্রদেশ—

FORLORN AND DESOLATE

"নিরাশ্রয়" ও "জনশূন্য" হইয়াছে! (এই সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস অযোধ্যার বেগমদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়া যেরূপে তাঁহাদিগের ধন-হরণ করিয়াছিলেন, খাজনা দিতে না পারিলে প্রজাদিগকে যেরূপে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া প্রখর রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইত, অত্যাচারে ভয়ে কৃষকেরা যেরূপে আপনাদিগের শিশু পুত্র কন্যা পর্য্যন্ত বিক্রয়পূর্ব্বক খাজনা শোধ করিতে বাধ্য হইত, উপায়ান্তরের অভাবে দেশত্যাগী হইতে চাহিলে সেনাবলের সাহায্যে যেরূপে হতভাগ্যদিগের গতিরোধ করা হইত, এবং পরিশেষে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে,তাহাদিগের দমনের জন্য যেরূপ লোমহর্ষণ রক্ত-স্রোত প্রবাহিত করা হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।)

এই সময়ে বারাণসী অঞ্চলের কৃষি-বাণিজ্যও ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারে শোচনীয় অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজ প্রথমেই ভূমিকরের হার অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, তাহার পর আদায়ের সময়েও তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ কঠোরতা অবলম্বনে পশ্চাৎপদ হন নাই। কাজেই নয় বৎসরের মধ্যে দেশের অধিকাংশ স্থানই মরুভূমিবৎ হইয়াছিল। এই কঠোর অত্যাচারে ১৭৮৩ সালে বারাণসী প্রদেশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হয়।

কর্ণাটে কোম্পানির কর্ম্মচারীরা যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। মিঃ পেট্রি নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গুপ্ত সমিতির (Committee of secrecy) সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে তাঞ্জোর প্রদেশের সমৃদ্ধিশালিতার সবিস্তার বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

It will be necessary to inform the Committee that not many years ago (in 1768) that province was considered as one of the most flourishing, best cultivated, populous districts in Hindustan.

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রদেশকে সাক্ষী মহাশয় অতীব সমৃদ্ধি-শালী বহুজনপূর্ণ ও শস্য-শ্যামল দেখিয়া গিয়াছিলেন, ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার দুরবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পশ্চাল্লিখিত উক্তি হইতে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি বলিয়াছেন,—

Its decline has been so rapid, that in many districts it would be difficult to trace the remains of its former opulence.

এই অল্প দিনের মধ্যে এরূপ খরবেগে এই প্রদেশের অবনতি ঘটিয়াছে যে, এখন ইহার অধিকাংশ স্থানে পূর্ব্ব সম্পদের চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই।

ইংরাজের অর্থ-লোলুপতায় কেবল তাঞ্জোরেরই এইরূপ দুরবস্থা হয় নাই। নবাব মহম্মদ আলীর অর্থ-হরণ ব্যাপারে আর্কটের কৃষক-কুলের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। ইংরাজকে অর্থদান করিতে, দুর্ব্বল নবাবের ধনাগার যখন নিঃশেষ হইয়া গেল, অথচ ইংরাজের ক্ষুধা মিটিল না, তখন তিনি কৃষককুলের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইলেন। ইংরাজ কর্ম্মচারীরাও প্রজার করবৃদ্ধি করিয়া নির্দ্দয়ভাবে কৃষকের রুধির-শোষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রকৃতপক্ষে ১,৩৪,৬৭,৯৬০ টাকা প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তাঁহারা ২০,৩৯,০৫,৭০০ টাকার দাবী করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত প্রজার ধন-লুণ্ঠন করিতেছিলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মান্দ্রাজে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, এই সকল অত্যাচারই তাহার মূল কারণ। লর্ড ওয়েলেস্লি মহোদয়ের চেষ্টায় এই প্রতারণা ধরা পড়ে। তখন কর্ণাটবাসী প্রজা অত্যাচারের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিল।

এখন একবার বোম্বাইয়ের রাজস্বের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করুন। মহারাষ্ট্র ভূপতিদিগের শাসনকালে ঐ দেশে প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট হইতে বৎসরে ৮০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। যে বৎসর ইংরাজ ঐ দেশের আধিপত্য লাভ করেন, তৎপরবর্ত্তী বর্ষেই ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করিলেন! ফলে প্রজার উপর কিরূপ অত্যাচার হইতে লাগিল, সরকারি রিপোর্টে তাহার এইরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়—

Every effort was made,—lawful and unlawful,—to get the utmost out of the wretched peasantry, who were subjected to tortures—in some instances cruel and revolting beyond description—if they could not or

would not yield what was demanded. Numbers abandoned their homes and fled into neighbouring Native States; large tracts of land were thrown out of cultivation, and in some districts no more than one third of the cultured area remained in occupation.

ভাবার্থ এই যে, হতভাগ্য কৃষকদিগের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব অর্থ-সংগ্রহ করিবার জন্য বিধি-সঙ্গত ও বিধি বিগর্হিত সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। পীড়নে, স্থলবিশেষে দুঃসহ ও বর্ণনাতীত অত্যাচারে. জর্জ্জরিত করিয়া দরিদ্র কৃষক-কুলের নিকট হইতে অভিলষিত অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই। এইরূপ নিদারুণ নির্য্যাতনে প্রপীড়িত হইয়া শত শত কৃষক গৃহত্যাগ-পুরঃসর সন্নিহিত দেশীয় রাজ্যসমূহে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডসমূহ কৃষিকার্য্যের অভাবে পতিত থাকে, কোন কোন জেলায় কর্ষণযোগ্য ভূমির এক তৃতীয়াংশের অধিক জমিতে চাষ আবাদ হয় নাই।

উড়িষ্যাতেও কৃষিজীবী প্রজার নিকট হইতে অর্থশোষণের কম চেষ্টা হয় নাই। সরকারি কাগজ পত্রেই প্রকাশ যে, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার কৃষকদিগের নিকট হইতে রাজপুরুষেরা শতকরা ৮৩।০ হিসাবে খাজনা আদায় করিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এরূপ শোষণ-কার্য্য দীর্ঘকাল চলিল না। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে তাঁহারা উহা কমাইয়া শতকরা প্রায় ৭১ হিসাবে আদায় করিতে থাকেন। সম্প্রতি উহা ক্রমশঃ কমিয়া শতকরা ৪৫ হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় কৃষি-জীবী প্রজাকে শতকরা ১১ ভাগের অধিক ভূমিরাজস্ব দান করিতে হয় না। উড়িষ্যার ন্যায় অযোধ্যাতেও ১৮২২ সালে কোম্পানির ভৃত্যেরা জমিদারদিগের নিকট হইতে শতকরা ৮৩ ভাগ খাজনা আদায় করিবার আইন পাস করিয়াছিলেন। ফলে দেশে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া যায়।

এইরূপে রাজ-ধর্ম্মের অবমাননা ও প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছিল, তাহার অতি অল্পাংশই এদেশে ব্যয় করা হইত, অধিকাংশ টাকাই বিলাতে প্রেরিত হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-নির অংশিগণ, কর্ম্মচারিগণ ও বিলাতের পার্লামেণ্ট মহাসভার মাননীয় সদস্যগণ এই ভারত-লুণ্ঠনের অর্থে আপনাদিগের দারিদ্র্য দূর করিয়া-ছিলেন। কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইত তাহা কোম্পানি গ্রহণ করিতেন; এদেশের ধনি-সন্তানদিগের ও রাজা মহারাজ-দিগের নিকট হইতে অবৈধভাবে যাহা আদায় হইত, তাহাতে শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদিগের অর্থকষ্ট দূর হইত। এক বঙ্গদেশ হইতেই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ

হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অন্যূন ৪,৯৪,০৪,৯৮০ টাকা কেবল উৎকোচ-স্বরূপ আদায় করা হইয়াছিল! পার্লামেন্টে এ বিষয়ে যাহাতে অপ্রিয় আলোচনা উপস্থিত না হয়, সে জন্য কোম্পানি ও তৎকর্ম্মচারীরা মহা-সভার সদস্যদিগকেও উৎকোচ-দানে বশীভূত করিতেন (১)। অনেক সময়ে আবার উৎকোচের অর্থ-সংগ্রহের জন্যই ভারতীয় প্রজার ধন-লুণ্ঠন করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত। তদানীন্তন ইংলণ্ডেশ্বরও এই নিন্দনীয় উৎকোচ-গ্রহণ-ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিলেন না! একবার কোম্পানির কার্য্য-কলাপের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হওয়ায় স্বয়ং ইংলণ্ডপতি প্রচুর অর্থগ্রহণ করিয়া সকল গোলযোগ মিটাইয়া দেন। সুসভ্য ইংরাজ জাতির নৈতিক উন্নতির ইতিহাসে এ সকল ঘটনার মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে।

গজনীর মামুদ, নাদির শাহ, আহম্মদ শাহ আবদালী বা নাগপুরের বর্গীরা ভারতের ধনি-সন্তানদিগকে লুণ্ঠন করিয়া কত টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ ছাত্র-পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থেও সময়ে সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কোম্পানির আমলে ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কত টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার হিসাব সহজে পাওয়া যায় না।

মিঃ ডিগ্‌বী বলেন, পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ৫০ কোটী হইতে ১০০, কোটী পাউণ্ড (এক পাউণ্ডে ১৫ টাকা) ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। মিঃ ব্রুক্‌স্‌ এডামস্‌ Law of Civilisation and Decay নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

Possibly, since the world began, no investment has ever been yielded the profit reaped from the Indian *plunder*—pp 263.

সে যাহা হউক, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষেরা এ দেশের

---

(1) Nor was the Company in good repute at Home. An enquiry was set on foot, and it was found that the Company had devoted in one year £100,000 to *bribery*. But the House of Commons stifled inquiry. *The recipients of bribes were amongst the highest classes, and the King himself was seen to have accepted a large sum.*

In the mean time, and largely by the *diplomacy of abasement* the Company throve..........The Home Government wanted money. Some at home, anxious to get the concern into their hands for a price, *offered a bribe to the Government*. The Company staved off difficulty by offering *a larger bribe*. They advanced £200,000 and so secured an extention of the charter to the year 1766.—*British India and England's Responsibilities.* By G. Clarke. M. A. (pp 7—9.)

কৃষি-শিল্পজীবীদিগকে যেরূপ নির্ম্মমভাবে লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, তাহাতেই ভারতবাসীর অধিকাংশ সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়,—অতিরিক্ত কর দিয়া কৃষকেরা নিঃস্ব হইয়া পড়ে, শিল্পিগণ বাণিজ্য-সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া অর্থ-হীন হওয়ায় কৃষিকর্ম্ম অবলম্বনে বাধ্য হয়। ইংরাজ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের কৃষিজীবি-সমাজে দারিদ্র্য-রাক্ষস কিরূপে স্থায়ী আধিপত্য লাভ করে, তাহা বুঝিতে হইলে, রাজস্ব-বৃদ্ধির এই ইতিহাস অবশ্য জ্ঞাতব্য। বৃটিশসিংহ যখনই কোন প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছেন, তখনই সেই প্রদেশের কৃষকদিগের শোণিত এরূপ অপরিমিত ভাবে পান করিয়াছেন যে, হতভাগাগণ একেবারে উত্থান শক্তি-রহিত হইয়া পড়িয়াছে! ইহা ঘোরতর কলঙ্কের বিষয় হইলেও ঐতিহাসিক সত্য। তাহার পর অবশ্য প্রথম আক্রমণের কঠোরতা স্থানে স্থানে লাঘব করা হইয়াছে,কিন্তু তাহাতে প্রজাগণের প্রনষ্ট শক্তি কতদূর পুনরাগত হইয়াছে, প্রজা এক গুণ দিয়া সহস্র গুণ পাইয়াছে কি না, ভারতে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টের সংঘটনেই তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে।

ইংরাজ-শাসনের আরম্ভ-কালে এদেশীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের শোণিত-শোষণ কিরূপভাবে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্যাপি ভারতের অধিকাংশ স্থলে সে শোষণ সম্যক্ হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে ৮০ লক্ষ টাকা ভূমিকর আদায় হইত, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ তাহার পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া ১, কোটী ৫০ লক্ষ টাকা করেন, একথা বলা হইয়াছে। ইহার পর কোম্পানির যথেচ্ছাচার দূর করিবার জন্য দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার আমলে শাসন-বিভাগে নানা বিষয়ে সংস্কার ঘটিল; কিন্তু কৃষিজীবী প্রজার দুর্দ্দৈব ঘুচিল না। কোম্পানির আমলে যে প্রজারা ১৷৷০ কোটী টাকা কর দিতে বাধ্য হইত, পরলোকগতা মহারাণীর আমলে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদিগকে ২ কোটী ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতে হইল! কিন্তু এইখানেই রাজপুরুষদিগের অর্থলোভের শেষ হয় নাই! ৮০ লক্ষ টাকার স্থানে ২ কোটী ৩ লক্ষ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াও তাঁহারা রাজস্ববৃদ্ধির কার্য্য অব্যাহত রাখিলেন। কাজেই কৃষককুল আর সহ্য করিতে না পারিয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; নানা স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা

হওয়ায় রাজপুরুষেরা কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন এই বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য এক কমিশন বসিল। তদন্তে স্থির হইল, পুনঃ পুনঃ ভূমির বন্দোবস্ত দ্বারা অতিরিক্ত রাজস্ববৃদ্ধিই (Extravagantly heavy asessments) এই প্রকার বিভ্রাটের প্রধান কারণ।

এত গোলযোগ সত্ত্বেও রাজপুরুষদিগের অর্থ-লোভের হ্রাস হয় নাই। ত্রিশ বৎসরের বন্দোবস্তে যে সকল ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হওয়ায় আবার কর্তৃপক্ষ নূতন বন্দোবস্তের আদেশ করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত বন্দোবস্তের কার্য্য যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে এই নূতন বন্দোবস্তে মোটের উপর শতকরা ৩০ টাকা হারে প্রজার ভূমির কর বাড়িয়া গিয়াছে। এদিকে ডিরেক্টার অব্ ল্যাণ্ড রেকর্ডস এণ্ড এগ্রিকলচার বা ভূমি ও কৃষি-বিভাগীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের ১৮৮৭ সালের রিপোর্টে প্রকাশ যে, বোম্বাই অঞ্চলে—

Seventy-five per cent, of the cultivated area is under food grains. The reporting authorities agree that there is a *large number* of cultivators who *do not get a full year's supply* from their land.

ভাবার্থ—আবাদী জমির বার আনা অংশে খাদ্যোপযোগী শস্যের চাষ হয়। কিন্তু সকল রাজপুরুষেরাই একবাক্যে বলেন যে, বহুসংখ্যক কৃষকই চাষ করিয়া সংবৎসরের ব্যয়োপযোগী শস্য সংগ্রহ করিতে পারে না।

অধ্যক্ষ মহাশয়ের এই প্রকার মন্তব্য-প্রকাশের পরও ভূমির খাজনা বাড়িয়াছে! সুতরাং দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা না বৃদ্ধি পাইয়া আর কি হইতে পারে? এই প্রসঙ্গে দেশের কৃষীবলের অবস্থার কথাও বিবেচ্য! ১৮৯৪ সালে সমগ্র বোম্বাই প্রদেশে ৮০,৮০,০০০ কৃষিযোগ্য গো-মহিষাদি পশু ছিল। ১৯০১ সালের গণনায় প্রকাশ পায় যে, উহাদিগের সংখ্যা কমিয়া ৫২,৭৭,০০০ হইয়াছে। অর্থাৎ ছয় বৎসরে এক তৃতীয়াংশেরও অধিক গো-মহিষাদি পশু কমিয়া গিয়াছে। কৃষিযোগ্য ও কর্ষিত ভূমির তুলনায় কৃষীবলের সংখ্যাও অতি সামান্য। বোম্বাই অঞ্চলে গড়ে এক হাল গো-মহিষকে ৬০ বিঘা ভূমি কর্ষণ করিতে হয়! কৃষক-সমাজের পক্ষে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে?

গত ১৯০৬ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ভারতসচিব মিঃ জন মর্লি মহোদয় জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে পার্লামেণ্ট মহাসভায় যে তালিকা দাখিল করেন, তাহাতে প্রকাশ যে, বোম্বাই প্রদেশে ভূমিরাজস্ব-দান

করিতে অসমর্থ হওয়ায় ১৯০০ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ২,১৭৩ জনের জমি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইয়াছিল। সরকারি খাজনার দায়ে ঐ প্রদেশে ১৯০১ সালে ৬,৩৮৬ জন প্রজার জমি, ১৯০২ সালে ৯,৪৬২ জনের জমি, ১৯০৩ সালে ৪,১২০ জনের জমি ও ১৯০৪ সালে ১৫,৫৭৫ জনের জমির দখল উচ্ছেদ হইয়াছে। মরলি বাহাদুর বলিয়াছেন যে, অধিকাংশ স্থলেই যাহাদের জমির দখল উচ্ছেদ হইয়াছিল, তাহাদিগকেই পুনরায় জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। একথা সত্য হইলেও বোম্বাই অঞ্চলে ভূমি-রাজস্ব-দানে প্রজার অসামর্থ্য দিন দিন কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা ভারত-সচিবের প্রকাশিত তালিকা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

মান্দ্রাজের কৃষক-সম্প্রদায়ের অবস্থার উল্লেখ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ইংলিশ-ম্যান পত্রের সম্পাদক ১৮৮০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিয়াছিলেন—কোম্পানির আমলে মান্দ্রাজ অঞ্চলে ভূমির যে কর আদায় হইত, মহারাণীর আমলে তদপেক্ষা দশ-লক্ষাধিক মুদ্রা বা এক তৃতীয়াংশ অধিক রাজস্ব আদায় হইতেছে। অথচ কৃষক-সম্প্রদায়ের সুখ-সমৃদ্ধি-বিধানের কোন ব্যবস্থাই হইতেছে না। বরং রাজস্ব-বৃদ্ধির সহিত মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভার সিভিলিয়ান সদস্য মিঃ জি, রোজার্স ১৮৯৩ সালে ভারতবর্ষের অণ্ডার সেক্রেটারি মহাশয়কে মান্দ্রাজ প্রদেশের রাজস্ব-আদায়-বিষয়ক অত্যাচারের বিষয় জ্ঞাপনকালে দেখাইয়াছিলেন যে, ১৮৭৯।৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৯।৯০ অব্দ পর্য্যন্ত ১১ বৎসরের মধ্যে খাজনা আদায় করিবার জন্য মান্দ্রাজের রাজপুরুষেরা ৮,৪০,৭১৩ জন প্রজার ১৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৬৪ বিঘা জমির "দখলি" স্বত্ব প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদিগের তৃপ্তি হয় নাই। প্রজারা জমির দখল ছাড়িয়াই অব্যাহতি লাভ করে নাই। তাহাদিগকে খাজনার দায়ে আপনাদিগের ঘটী, বাটী, বিছানা-পত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া ২৯,৬৫,০৮১ টাকা গবর্ণমেণ্টকে দান করিতে হইয়াছে! উপরি লিখিত প্রায় ১৯,৬৩,৩৬৪ বিঘা জমির মধ্যে প্রায় ১১৸০ লক্ষ বিঘা জমি ক্রেতার অভাবে গবর্ণমেণ্টকে ক্রয় করিতে হইয়াছিল! খাজনার হার অতিরিক্ত না হইলে নিশ্চিত ঐ সকল জমির ক্রেতা জুটিত। ভূমি-রাজস্বের আধিক্য সম্বন্ধে এতদপেক্ষা স্পষ্টতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

মধ্যভারতের অবস্থা সম্বন্ধে গত ১৯০২সালে মাননীয় শ্রীযুক্ত বিপিন কৃষ্ণ বসু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন যে, ঐ অঞ্চলের কোনও কোনও জেলায় বিগত দশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ১০২ ও ১০৫ হারে প্রজার রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইয়াছে! এই দশ বৎসরের মধ্যে দুর্ভিক্ষাদিতে প্রজারা নিতান্ত বিপন্ন হইয়াছে, তথাপি কর্তৃপক্ষ খাজনা বাড়াইতে নিরস্ত হন নাই। বলা বাহুল্য, গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই অভিযোগের অদ্যাপি কোনও যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ হয় নাই।

মালাবারেও অনেক পরগণায় বিগত নূতন জরীপকালে শতকরা ৮৫ হইতে ১০৫ পর্য্যন্ত হারে খাজনা বাড়িয়াছে। এক তাঞ্জোর জেলাতেই গত দশ বৎসরে ১॥০ কোটী টাকা খাজনা বৃদ্ধি হইয়াছে।

কর্ণাটকীয় প্রজার খাজনার হার সম্বন্ধে সরকারি ভূমি ও কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়ই বলিয়াছেন,—

Despite its liability to famine it pays a higher land revenue than the Deccan or Concan.

এই প্রদেশে দুর্ভিক্ষাদির অধিকতর সম্ভাবনা-সত্ত্বেও এখানকার কৃষকদিগকে দক্ষিণাপথের বা কোঙ্কণের কৃষিজীবীদিগের অপেক্ষা অধিক ভূমিকর দান করিতে হয়।

কেবল দক্ষিণ ও মধ্যভারতেই নহে, এক বঙ্গদেশ ভিন্ন বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই ২০ বৎসর, ৩০ বৎসর অন্তর কৃষকদিগের দেয় রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিগত ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অনেক বিজ্ঞ শাসন-কর্ত্তা সমগ্র ভারতে বঙ্গদেশের ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮০৭ সালে মান্দ্রাজে স্যার টমাস মনরো প্রজার সহিত যে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত করেন, তাহা বঙ্গের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরই মত ছিল। বিলাতের অনুসন্ধান-সমিতির সমক্ষে সাক্ষ্য-দান-কালে তিনি একথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছিলেন। বোম্বাই অঞ্চলেও প্রথম অবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই প্রচলিত ছিল। ১৮০৩ সালে ইংরাজ যখন এলাহাবাদ ও অযোধ্যা প্রদেশ গ্রহণ করেন, তখন তথায় তাঁহারা খাজনা বিষয়ে প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী রাজপুরুষেরা, বিশেষতঃ রাজস্ব বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা অর্থলোভে অন্ধ হইয়া সে সকল প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন-পূর্ব্বক সকল

প্রদেশেই ২০৷৩০ বৎসর অন্তর জরীপ করিয়া খাজনা বাড়াইবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। গবর্ণমেণ্ট কিরূপ অবস্থায় প্রজার কত খাজনা বাড়াই-বেন, তাহার একটা বাঁধাবাধি নিয়ম যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনেকবার প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তদনুসারে লর্ড রিপণ এ বিষয়ে কতিপয় নিয়ম-প্রণয়নের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভারতবর্ষ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুরুষেরা পূর্ব্ববৎ যথেচ্ছাচার-মূলক পন্থা অবলম্বন করেন! অথচ জমীদারেরা প্রজার নিকট ঊর্দ্ধ সংখ্যায় কত রাজস্ব আদায় করিতে পারিবেন, কিরূপ অবস্থায় কত রাজস্ব বাড়াইতে পারিবেন, তাহার নিয়ম-প্রণয়নে তাঁহাদিগের আদৌ ঔদাস্য প্রকাশ পায় নাই। সে যাহা হউক, এখনও সরকারি খাজনা বৃদ্ধির সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং কোনও নিয়মের বশীভূত হইতে প্রস্তুত নহেন। কেবল তাহাই নহে, রাজস্ব কর্ম্মচারীরা কাহারও খাজনা অন্যায়-পূর্ব্বক বৃদ্ধি করিলে, তাহার বিরুদ্ধে আর আপীল করা চলে না। প্রজারা বেশী আপত্তি জানাইলে যাঁহারা খাজনা বাড়াইয়াছেন, তাঁহারাই উহার সম্বন্ধে পুনর্ব্বিচার করেন। তখন একটা তদন্তের (ইনকোয়ারির) ভান করিয়া কাহারও কাহারও খাজনা নাম মাত্র কমাইয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে প্রজার প্রতি প্রায়ই সুবিচার হয় না। প্রজার এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বরোদার মহারাজ শ্রীসয়াজি রাও গায়কোয়াড় মহোদয় স্বীয় রাজ্যে নিয়ম করিয়াছেন যে, সেটেলমেণ্টের কর্ম্মচারীরা কাহারও খাজানা বৃদ্ধি করিলে সাধারণ প্রকাশ্য আদালতে স্বতন্ত্র-প্রকৃতি বিচারপতির নিকট তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে। বৃটিশ রাজ্যে এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে কৃষিজীবী প্রজার বহুল কষ্টের লাঘব হইতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সুসভ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রজার এই সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। কাজেই যে কর্ম্মচারী অন্যায় করিয়া প্রজার খাজনা বাড়ান, হতভাগ্য প্রজাকে তাঁহারই নিকট সুবিচার-প্রার্থী হইতে হয়।

বিগত ১৯০৫ সালের ভারতীয় আয়-ব্যয়-বিষয়ক আলোচনা-কালে বড় লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখলে মহোদয় কৃষক-কুলের দুর্দ্দশার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, ইউরোপের তুলনায় ভারতীয় কৃষকগণের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে ভূমি-রাজস্ব গৃহীত হইয়া থাকে। যে ভূমিতে ১০০ টাকা মূল্যের ফসল

জন্মে, তাহার জন্য ইউরোপীয় দেশসমূহের কৃষকদিগকে কত রাজস্ব দান করিতে হয়, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

দেশের নাম	ভূমি-রাজস্বের হার	দেশের নাম	ভূমি-রাজস্বের হার
ইংলণ্ডীয় যুক্তরাজ্যে শতকরা	৮।/০	ইটালিতে	৭৲
ফ্রান্সে "	৪৸/০	বেলজিয়মে	২৸/০
জার্ম্মেনীতে "	৩৲	হলাণ্ডে	২৸/০
অষ্ট্রীয়াতে "	৪৸৶০		

"বলা বাহুল্য, জলকর, পূর্ত্তকর, চৌকিদারী ও ষ্ট্যাম্পকর প্রভৃতি করও উল্লিখিত হারের অন্তর্গত। ফ্রান্সে পথ-কর পর্য্যন্ত এই রাজস্বের অন্তর্গত। ভারতবর্ষে এই সকল স্থানীয় কর অবশ্যই ভূমি-রাজস্বের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হয় না। ঐ সকল স্থানীয় কর স্বতন্ত্র ভাবে প্রদান করিয়াও এ দেশের কৃষকদিগকে অতীব উচ্চহারে ভূমিকর দান করিতে হয়। রমেশ বাবুর প্রকাশিত হিসাব ছাড়িয়া দিয়া সরকারি হিসাবে আস্থা স্থাপন করিলেও দেখা যায় যে, ইউরোপীয় দেশসমূহে কৃষকদিগকে ভূমিকর ও সর্ব্বপ্রকার স্থানীয় কর সহ শতকরা ৯ টাকার অধিক কুত্রাপি দিতে হয় না; কিন্তু ভারতের দারিদ্র্য-পঙ্কে মগ্ন হতভাগ্য কৃষকদিগকে কেবল ভূমিকর হিসাবেই গবর্ণমেণ্টকে শতকরা অধিকাংশ স্থলে গড়ে ১৫৲ টাকা ও কোনও কোনও স্থলে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত দান করিতে হয়। এদেশে ভূমির উর্ব্বরতা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, কৃষকদিগের ও কৃষীবলের অবস্থা ক্রমশঃ নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, অতিবৃষ্টির ও অনাবৃষ্টির জন্যও তাহাদের বিড়ম্বনা সামান্য হইতেছে না। তাহাদের ঋণের কথা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের দুই-তৃতীয় অংশ ঋণ-পঙ্কে নিমগ্ন; ইহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেকের আর ঋণ-মুক্তির কোনও উপায় নাই। তথাপি গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে অতি উচ্চহারে কর-গ্রহণে বিরত নহেন। কেবল তাহাই নহে, মুদ্রা-শাসনী ব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ রৌপ্যের মূল্য-হ্রাসের পথ পরিষ্কৃত করায়, তাহাদিগের সঞ্চিত রৌপ্য-ধনের (অলঙ্কারাদির) মূল্যও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে সকল দিকেই রাজপুরুষেরা তাহাদিগকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন।

"ইহার উপর সেটেল্‌মেণ্ট বিভাগের জুলুম আছে। পুনঃ পুনঃ

জমি জরীপ করিয়া এই বিভাগের কর্ম্মচারীরা ক্রমেই ভূমিকর বৃদ্ধি করিতেছেন। গত দশ বৎসরে ইঁহাদিগের চেষ্টায় বোম্বাই, আগ্রা, মান্দ্রাজ, অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশসমূহে গবর্ণমেণ্টের ভূমিরাজস্ব ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে,—অথচ ঐ সকল প্রদেশেই দশ বৎসর পুনঃ পুনঃ অনাবৃষ্টি ঘটিয়া কৃষি-কার্য্যে বহু বিঘ্ন সংঘটিত হইয়াছে। যে দুঃসময়ে প্রজার কর-লাঘব করা কর্ত্তৃপক্ষের উচিত ছিল, সেই সময়ে তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে বার্ষিক ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা অধিক লইবার ব্যবস্থা করিলেন! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া গোখলে মহোদয় বলেন, "এখন হইতে রাজকোষে বার্ষিক ৭॥ কোটি টাকা উদ্‌বৃত্ত হইবে বলিয়া যখন দেখা যাইতেছে, তখন পূর্ব্বোল্লিখিত প্রদেশ-সমূহের কৃষকদিগের ভূমিকর শতকরা ২০ টাকা হিসাবে হ্রাস করিলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৎসরে তিন কোটী টাকার অধিক হ্রাস পাইবে না। রাজকোষের এইরূপ সচ্ছল অবস্থাতেও যদি গবর্ণমেণ্ট কৃষিজীবী প্রজার উপকারের জন্য বার্ষিক তিন কোটী টাকা কর-লাঘব করিতে প্রস্তুত না হন, তাহা হইলে আর কখন হইবেন? গবর্ণমেণ্ট এই সামান্য স্বার্থত্যাগ করিলে প্রজাকুলের অবস্থার দশগুণ উন্নতি ঘটিবে।" বলা বাহুল্য, গবর্ণমেণ্ট গোখলে মহোদয়ের এই অনুরোধ রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, ভারতের সর্ব্বত্র, ভূমির উপর যে সকল স্থানীয় কর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,প্রথমতঃ সেগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধন, দ্বিতীয়তঃ ভূমি-রাজস্বের হার লাঘব, তৃতীয়তঃ প্রজার সহিত ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—এই তিনটি প্রধান সংস্কার সাধন না করিলে হতভাগ্য কৃষিজীবীদিগের কষ্ট কিছুতেই দূর হইবে না। ১৯০৬ সালে লর্ড মিণ্টো ভূমি-সংক্রান্ত কয়েকটী কর লাঘব করিয়া ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায়কে বার্ষিক ৮২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার দায় হইতে রক্ষা করিয়াছেন দেখিয়া রমেশ বাবু লিখিয়াছেন যে, লর্ড রিপনের প্রদর্শিত পথে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভূমিকরের হার লাঘব বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ করা নিতান্ত আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে রমেশ বাবু দেখাইয়াছেন, ইংলণ্ডে ভূমির উপর খাজনার হার অতি অল্প। কৃষিজীবী প্রজার নিকট ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট নাম-মাত্র

কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিলাতী গবর্ণমেণ্টের ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকারও কম। কিন্তু ভারতে কৃষিজীবী প্রজার নিকট হইতে বার্ষিক প্রায় ত্রিশ কোটী টাকা বা সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রকৃত রাজস্বের তৃতীয়াংশ আদায় করা হইয়া থাকে! শুদ্ধ বিলাতে নহে, যে আমেরিকায় কৃষি-বিজ্ঞান উন্নতির চরম শিখরে উপস্থিত হইয়াছে, সেই আমেরিকায় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ এত অল্প যে, তাহা বজেটের তালিকায় উল্লেখযোগ্য বলিয়া কখনও বিবেচিত হয় না। ইউরোপেরও অবস্থা প্রায় এইরূপ। পূর্ব্বে ইউরোপে ভূমিকরের পরিমাণ ভারতবর্ষেরই ন্যায় অতীব অধিক ছিল। সে কালের ইউরোপীয় রাজারা ভূমিকরকেই রাজ্যের প্রধান আয় বলিয়া গণ্য করা উচিত, মনে করিতেন। কিন্তু তাহার পর ইউরোপে প্রজাশক্তি যত প্রবল হইতে থাকে, ততই এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। সংপ্রতি যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে পাশ্চাত্য ভূপতিদিগকে ভূমিকরের আশা এক প্রকার ত্যাগ করিতে হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভূপতিগণ ইদানীং বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপর কর ধার্য্য করিয়া রাজ্য-শাসনের ব্যয়-নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ে প্রকৃতিপুঞ্জকে যথাসাধ্য উৎসাহ দান করেন। তাঁহাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্যের যতই শ্রীবৃদ্ধি হয়, রাজ্যের আয় ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাজকোষে অর্থ-সংগ্রহের জন্য তাঁহারা কখনও কৃষিজীবী প্রজার উপর ট্যাক্স ধার্য্য করেন না। পাশ্চাত্য দেশের কৃষক-সম্প্রদায় নাম-মাত্র কর দিয়া ভূমিকর্ষণ করিতে পায়। কাজেই তাহারা ভূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ হয়।

ভারতের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। এদেশের পুরাতন শিল্পের বিনাশ করিয়া রাজপুরুষেরা ভারতবাসীকে কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছেন। তাহার পর ভূমির কর দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া কৃষক-সম্প্রদায়কে দুরবগাহ ঋণপঙ্কে নিমজ্জিত করিয়াছেন। অন্যান্য সুসভ্য দেশে শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন দ্বারা রাজকোষে অর্থাগমের সুবিধা করা হইয়া থাকে। এদেশে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের বিলোপ-সাধন করিয়াছেন, বিলাতী বাণিজ্যের উপর শুল্ক বসাইবার সাহসও তাঁহাদের নাই। কারণ, বিলাতী মালের উপর

গুরুতর শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করিলে ইংলণ্ডীয় শিল্পীদিগের ক্ষতি সাধিত হইবে। এদিকে রুষের আক্রমণ-ভীতি প্রকৃতপক্ষে যতই হ্রাস হউক, স্বজাতি-বাৎসল্য-বশে গবর্ণমেণ্ট সীমান্ত-রক্ষা-ব্যপদেশে দিন দিন ব্যয়-বাহুল্য করিতেছেন। এই সকল ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য ভূমির উপর গুরুতর শুল্ক-স্থাপন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের গত্যন্তর নাই। কাজেই দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। এখন তাহাদের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ৮২ লক্ষ টাকা কর লাঘব করিলে তাহাদের বিশেষ কোনও উপকার ঘটিবার সম্ভাবনা নাই ত্রিশ কোটী টাকায় ৮২ লক্ষ টাকা হ্রাস পাওয়া সমুদ্রে শিশির বিন্দুর ন্যায় বোধ হয়। তাই রমেশ বাবু অনুরোধ করিয়াছেন যে, এরূপ মুষ্টি যোগে আর সময় নষ্ট না করিয়া পাশ্চাত্য দেশসমূহের ন্যায় ভারতের ভূমি-রাজস্ব-বিষয়ক ব্যবস্থার আমূল সংশোধন করা হউক। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ অনুরোধ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবেন বলিয়া আশা করা যায় না।

বঙ্গে রোড-সেস।

সমগ্র ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা দূরে যাউক, বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভাঙ্গিবার প্রস্তাবও রাজপুরুষেরা একবার উত্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু গোলযোগের ভয়ে তাঁহাদিগকে সে বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। তথাপি তাঁহারা অপ্রত্যক্ষ-ভাবে নানারূপে বঙ্গদেশীয় প্রজার করবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। পথকর,পূর্ত্তকর ও চৌকিদারী কর প্রভৃতি অভিনব করগুলিই এ বিষয়ের নিদর্শন-স্বরূপ।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন বঙ্গের ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তখন যথাসম্ভব সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছিল যে. নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব কোন কারণে কস্মিন্ কালে পরিবর্দ্ধিত হইবে না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলেন না। সিপাহী বিদ্রোহের পরে যখন গবর্ণমেণ্টের অর্থাভাব হইল, তখন কি উপায়ে আয়-বৃদ্ধি হইবে,কর্তৃপক্ষ সেই চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। বিলাতের ব্যবসায়িগণ ভারতে বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন, সুতরাং আমদানি দ্রব্যের উপর কিঞ্চিৎ শুল্ক স্থাপন করিলে ন্যায়ের মর্য্যাদাও রক্ষিত হইত, গবর্ণমেণ্টেরও আয় বৃদ্ধি পাইত।

কিন্তু ইংরাজ বণিকগণের প্রতিকূলতায় কর্ত্তৃপক্ষ তাহা করিতে সাহসী হইলেন না। কাজেই দুর্ব্বল প্রজার রুধির-শোষণের ব্যবস্থা হইল। গবর্ণমেণ্ট অম্লান-বদনে লর্ড কর্ণওয়ালিসের কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ভূমি-রাজস্বের উপর "লোক্যাল সেস" নামে নূতন কর প্রবর্ত্তিত করিলেন। এইরূপে "রোডসেস" করের উৎপত্তি হইল। পরে, 'পবলিক ওয়ার্ক সেস" বা পূর্ত্তকরও ভূমি-রাজস্বের উপর স্থাপিত হইয়াছে।

প্রথমে রোডসেসের অর্থ কেবল গ্রাম্য পথের নির্ম্মাণে ব্যয় করিবার কথা হইয়াছিল। "সেস কমিটি" নামক একটি কমিটীর হস্তে রোড সেসের অর্থ ব্যয় করিবার ভার অর্পিত হয়। কিন্তু ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের ছোট লাট স্যার এশলি ইডেন্ বাহাদুর ব্যবস্থা করিলেন যে, রোডসেসের অর্থ শুদ্ধ পথ নির্ম্মাণে ব্যয় করা উচিত নহে। এই বলিয়া তিনি ঐ অর্থে অপর কতকগুলি কার্য্য-সম্পাদনের ভার সেস কমিটীর উপর ন্যস্ত করেন। তৎপরে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ছোট লাট স্যার রিভার্স টমসন বাহাদুর "সেস কমিটি" উঠাইয়া দিয়া বর্ত্তমান ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং "সেস ফণ্ড" বলিয়া যে অর্থ সংগৃহীত থাকিত, তাহার "ডিষ্ট্রীক্ট ফণ্ড" এই নামকরণ করিলেন। এ সকল পরিবর্ত্তনের পরেও রোড সেসের অর্থ স্বতন্ত্র জমা থাকিবার কথা ছিল। কিন্তু ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ রিজ্‌লি অম্লানবদনে ঘোষণা করিলেন যে, "রোড সেস ফণ্ড" বলিয়া স্বতন্ত্র কোন ধনভণ্ডার নাই!

ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে যখন রোডসেস বা পথকরের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন বঙ্গীয় জমিদার ও প্রজাবর্গ একবাক্যে উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, এরূপ কর-প্রতিষ্ঠা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধী। অনেক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষও এই কর-প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স বলিয়াছিলেন, প্রজার উপর নূতন কর স্থাপন করিতে দিলে, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা নানা বিষয়ে অপব্যয় করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন; তাঁহাদের এরূপ অপব্যয়ে প্রশ্রয় দান করা কথনই কর্ত্তব্য নহে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিলে গবর্ণমেণ্টের প্রতি জমিদারবর্গের বিশ্বাস নষ্ট হইবে ভাবিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টও লর্ড মেয়োর আমলে নূতন কর বসাইবার বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারত

গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন অর্থসচিব মিঃ জেম্‌স্ উইলসন, বঙ্গীয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্তর বার্ণেস পিকক, বোম্বাই হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি স্যর আরস্কিন পেরী, এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীই বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গে নূতন কর-প্রতিষ্ঠা করিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্ত্ত-ভঙ্গ ও সত্য-লঙ্ঘন করা হইবে। কিন্তু ভারত-সচিব ডিউক অব আর্গাইল কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া বঙ্গে পথকর প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি বঙ্গবাসীকে এই বলিয়া আশ্বাস-দান করিলেন যে, এই কর পল্লিগ্রামের পথ ঘাট নির্ম্মাণ, জলাশয়াদির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যেই ব্যয়িত হইবে, এই করের অর্থ পল্লিবাসীর ধনভাণ্ডার-রূপে পরিগণিত হইবে। পল্লিবাসীর সম্মতি না লইয়া উহার এক কপর্দ্দকও কোনও কার্য্যে ব্যয় করা হইবে না। ভারত-সচিবের এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বঙ্গীয় জমিদার ও প্রজাবর্গ পথকর প্রদানে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু রাজপুরুষেরা সে প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করিতে আদৌ মনোযোগ করিলেন না। পথকর-প্রতিষ্ঠার পর কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতেই ঐ করের অর্থ বড় বড় রাজপথ-নির্ম্মাণ, স্কুল-প্রতিষ্ঠা, ডাক্তার-খানা-সংস্থাপন ও ভারতীয় দুর্ভিক্ষ-দমন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয়িত হইতে লাগিল। অনেক স্থলে সহর মিউনিসিপালিটির সহায়তার জন্যও ঐ অর্থ ব্যয় করিতে রাজ-পুরুষেরা কুণ্ঠা-বোধ করিলেন না! ফলে যে পল্লি-বাসীরা কর-ভার বহন করিতে লাগিল, তাহারা উহা হইতে কোনও উপ-কারই প্রাপ্ত হইল না—কেবল সহরের লোকের অভাব-মোচনেই দরিদ্র প্রজার প্রদত্ত কর ব্যয়িত হইতে লাগিল! পল্লিগ্রামসমূহে রাস্তা ঘাটের সংস্কার ও জলাশয়াদির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এই অর্থ পাওয়া গেল না। সুতরাং পথকর দিয়াও পল্লিবাসী প্রজা প্রতি বর্ষে অবনতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। করদানের পূর্ব্বে হতভাগ্যদের যে দুর্দ্দশা ছিল, করদান করিয়াও তাহা ঘুচিল না। বরং নূতন কর প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে হতভাগ্যদিগের যন্ত্রণা বাড়িল। যথাসময়ে কর দিতে না পারায় অনে-কেরই ঘটী বাটী নিলামে চড়িতে লাগিল।

এইরূপে গত ত্রিশ বৎসরে প্রায় ১২ কোটী টাকা পথকরস্বরূপে বঙ্গের পল্লিগ্রামবাসী প্রজার নিকট হইতে আদায় করা হইয়াছে। এই টাকা যদি ভারত-সচিবের প্রতিশ্রুতি অনুসারে পল্লিবাসীর কষ্ট-মোচনের জন্য

ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে আজ আমাদিগকে মফস্বল হইতে ম্যালেরিয়ায় জরাজীর্ণ ও পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ সপ্ত কোটী মহাপ্রাণীর আর্ত্তনাদ শুনিতে হইত না। গবর্ণমেণ্ট যদি মিউনিসিপ্যাল সহরে জলের ব্যবস্থা ও বড় বড় প্রাদেশিক রাজপথ, স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতির ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য আপনাদিগের রাজকোষ হইতে অর্থ দান করিতেন, তাহা হইলে আজ পল্লিবাসীর এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিত না। ফলতঃ বড় বড় সহরের উন্নতিকল্পে যে সকল জলাশয় ও রাজপথ ভারত-গবর্ণমেণ্ট বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নির্ম্মিত হওয়া উচিত ছিল, সেই সকল জলাশয় ও রাজপথের নির্ম্মাণ ও সংস্কারেও রাজপুরুষেরা পথকরের অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। আরা ও ভাগলপুর সহরে নির্ম্মল-জল সরবরাহের জন্য যখন টাকার অভাব হয়, তখন বঙ্গেশ্বর স্যার চার্লস ইলিয়ট পল্লিবাসীর প্রদত্ত পথকরের অর্থ হইতে দুই লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। সে দিন আমাদের ছোট লাট স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজারও ঐরূপে মুঙ্গের ও বাখরগঞ্জের অধিবাসীদিগকেও পথকরের টাকা অকাতরে ব্যয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভারতীয় দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের সৃষ্টির জন্যও এই পথকরের টাকাই প্রদত্ত হইয়াছিল। অথচ দুর্ভিক্ষকালে লোকে সে টাকা পাইল না!

পথকর প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় প্রজার উপর পবলিক্ ওয়ার্ক সেস নামক আর একটি কর চাপাইলেন। দেশের মধ্যে খাল নালা কাটিয়া লোকের চাষের ও দেশের জলনির্গমের সুবিধা করিয়া দেওয়াই এই কর-স্থাপনের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু রাজপুরুষেরা এই টাকারও নানারূপে অপব্যয় করিয়াছেন। বিলাতের একটি কোম্পানি আপনাদিগের লাভের জন্য উড়িষ্যায় একটি খাল কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহাদিগের লোকসান হইতে লাগিল। সাহেব কোম্পানির টাকা ভারতে খাটাইয়া লোকসান হইবে, ইহা আমাদের দয়াময় গবর্ণমেণ্ট সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজপুরুষেরা পূর্ব্বোক্ত বিলাতী কোম্পানিকে কিছু লাভ সহ তাঁহাদের সমস্ত টাকা দান করিয়া উড়িষ্যার খালটি কিনিয়া লইলেন! স্যার জর্জ ক্যাম্বেল প্রভৃতি বিজ্ঞ কর্ম্মচারীরা এই দুষ্কার্য্য করিতে গবর্ণমেণ্টকে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহারা দরিদ্র বঙ্গীয় প্রজার প্রদত্ত পূর্ত্তকরের টাকা দিয়া ঐ খাল ক্রয় করিলেন! এই খালে গবর্ণ-

মেণ্টের লাভ হওয়া দূরে থাকুক, এ পর্য্যন্ত এক পয়সাও মূল টাকার সুদ হিসাবে পাওয়া যায় নাই!

কিন্তু এইখানেই রাজপুরুষদিগের প্রজাবাৎসল্যের শেষ হয় নাই। অন্য প্রকারেও তাঁহারা দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রদত্ত অর্থের অপব্যয় করিতে বিরত হন নাই। পাঠক অবগত আছেন, গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্ক সেস নামক ট্যাক্স আদায় করিবার ভারও কর্ত্তৃপক্ষ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডেরই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ ট্যাক্স আদায় করিবার কার্য্যে যে ব্যয় হয়, তাহার অর্দ্ধাংশ রোডসেসের ও অর্দ্ধাংশ পবলিক ওয়ার্ক সেসের ভাণ্ডার হইতে প্রদান করা উচিত ছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিলেন যে, ঐ দুই ট্যাক্স আদায় করিবার জন্য যে ব্যয় পড়িবে,তাহার দুই তৃতীয়াংশ রোডসেস ও এক তৃতীয়াংশ পবলিক ওয়ার্কসেসের ধন-ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হইবে! পবলিক সেসের টাকা গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য, কিন্তু রোডসেসের টাকা প্রজাদিগের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত। তাই প্রবলশক্তিশালী গবর্ণমেণ্ট পবলিকসেস আদায়ের খরচেরও একাংশ দরিদ্র কৃষিজীবী প্রজার নিকট হইতেই গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। বলা বাহুল্য, এই বন্দোবস্ত ১৮৭৭।৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে গোপনেই করা হইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, এই ব্যবস্থাতেও পূর্ত্তকরের পরিমাণ-বৃদ্ধির সহিত প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। তখন তাঁহারা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন যে, পবলিক ওয়ার্কসেস আদায়ের জন্য বোর্ডের যতই ব্যয় হউক না কেন, গবর্ণমেণ্ট ঐ বাবতে বার্ষিক ৪৬,৮০০ টাকার অধিক দিবেন না! ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের দেশীয় সদস্যদিগের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বোর্ডের সাহেব চেয়ারম্যান-দিগের অনুগ্রহে বোর্ডসমূহকে গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবে সম্মতিদান করিতে হইল। এই ব্যবস্থার ফলে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড-সমূহকে দরিদ্র প্রজার পথকর হইতে গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্ক-সেসের টাকা আদায়ের জন্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা দান করিতে হইয়াছে!

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় সংবাদপত্র-সমূহে কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন রাজস্ব-সচিব রাজপুরুষদিগের ব্যবহারের অন্যায্যতা স্বীকার করিয়া

১৮৭৭।৭৮ সালের নিয়মানুসারে পূর্ত্তকর আদায়ের জন্য আবার এক তৃতীয়াংশ ব্যয় দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আন্দোলনকারীরা তখন বলিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট যে ৭ লক্ষ টাকা অন্যায়-পূর্ব্বক অধিক গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা রোডসেস ফণ্ডে প্রত্যর্পণ করা উচিত। তদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে পূর্ত্তকর আদায়ের জন্য মোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশের পরিবর্ত্তে অর্দ্ধেক ব্যয় প্রদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই সাত লক্ষ টাকার মধ্যে এক কপর্দ্দকও প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না, এবং বলিলেন যে, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কার্য্যে যে সকল সরকারি সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী সহায়তা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বেতন গবর্ণমেণ্ট হইতেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই কারণে সরকার নামে এক তৃতীয়াংশ ব্যয় দান করিলেও বোর্ড কার্য্যতঃ তাঁহাদের নিকট হইতে অর্দ্ধেকেরও অধিক ব্যয় প্রাপ্ত হইতেছেন! পাঠক, উত্তর শুনিলেন? আমাদের বিশ্বাস, কর্ত্তৃপক্ষ যদি দয়া করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সহিত, মোটা বেতনের সিবিলিয়ানদিগের সংস্রবচ্ছেদন করেন, তাহা হইলে রোডসেসের টাকা কখনই প্রজাপুঞ্জের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বিষয়ে ব্যয়িত হয় না, গবর্ণমেণ্টও সিবিলিয়ান-পোষণের ব্যয় আমাদের ঘাড়ে চাপাইবার সুবিধা পান না।

সে যাহা হউক, এইরূপে বিগত ত্রিশ বৎসরে রোড সেসের টাকার অধিকাংশ নানা প্রকারে অপব্যয়িত করিয়া ১৯০৬ সালে গবর্ণমেণ্ট (রাজকোষে অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চিত হওয়ায়) ১২৷৷০লক্ষ টাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডসমূহকে দান করিয়াছেন। এই সামান্য দানের জন্য বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ পর্য্যন্ত সকলের মুখে আমরা গবর্ণমেণ্টের অসামান্য উদারতার প্রশংসা-গীতি শ্রবণ করিতেছি!

পক্ষান্তরে এই সকল স্থানীয় কর-সম্বন্ধে প্রকৃতিপুঞ্জের পক্ষ হইতে বহু আপত্তি উত্থাপিত হইলে, লর্ড কর্জ্জনের গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন যে, রাজকোষে অর্থের স্বচ্ছলতা হইলেই তাঁহারা এই সকল কর রহিত করিবার চেষ্টা করিবেন! কিন্তু লর্ড কর্জ্জনের শাসনকালেই প্রায় সপ্ত বৎসর কাল উপর্য্যুপরি রাজকোষে অর্থ উদ্বৃত্ত হইলেও তাঁহারা এই সকল করের লাঘব বা তিরোধান করেন নাই। বরং দিন দিন উহা বৃদ্ধিই পাইতেছে।

"প্রবাহ"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন,—বঙ্গদেশে রোড-সেস-নামক-করের দৌরাত্ম্যে

অনেকেই জ্বালাতন হইয়াছে। এই রোডসেস যেরূপ মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। পনের বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণে রোড-সেস দিতে হইত, কোন কোন স্থলে অধুনা তাহার দশগুণ দিতে হইতেছে। যাহারা মুসলমান শাসনকাল হইতে দেবোত্তর-স্বরূপ নিষ্কর ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগের নিকট হইতে রোড-সেস বাবদে এত টাকা আদায় করা হইতেছে যে, কর-ধার্য্য করিয়া সেই ভূমি গ্রহণ করিলে ভূস্বামীকে তাহার অধিক খাজনা দিতে হইত না। যে যে স্থলে যে যে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট প্রজার নিকট হইতে কোনরূপ কর আদায় করেন, সেই সেই স্থলেই কার্য্যনির্ব্বাহক অধস্তন কর্ম্মচারিগণ প্রায়শঃ অতিশয় হৃদয়হীন ব্যাপার করিয়া থাকেন। কাগজে কলমে সকল ব্যবস্থাই নিখুত থাকে, কিন্তু অভ্যন্তরে কর্ম্মচারীর দোষে অনেক ব্যাপারেই গোলযোগ দৃষ্ট হয়।" এই উক্তি যে রঞ্জিত নহে,ভুক্তভোগী তাহা জানেন।

এই প্রসঙ্গে চৌকিদারি ট্যাক্সের পরিচয় স্বতন্ত্রভাবে না দিলেও চলিবে। কারণ, বঙ্গের প্রত্যেক পল্লীর লোকেই এই অত্যাচার-মূলক করের নিষ্পেষণে নিপীড়িত হইতেছে। সুতরাং এই করের যন্ত্রণা শীঘ্র কাহারও বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। বঙ্গদেশের ন্যায় ভারতের অন্যান্য অংশেও এই প্রকার রোড-সেস প্রভৃতি কর বসান হইয়াছে! সুতরাং বৃটিশ ভারতের কোনও স্থানেই দরিদ্র কৃষিজীবী প্রজার বিড়ম্বনার শেষ নাই।

দুর্ভিক্ষ-নিবারক ধন-ভাণ্ডার।

এইস্থলে আর একটি করের উল্লেখ কর্ত্তব্য। ১৮৭৭সালে মান্দ্রাজে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইবার পর ভারত-গবর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিব স্যর জন ষ্ট্রাচি দরিদ্র প্রজার উপর "দুর্ভিক্ষ-নিবারক কর" স্থাপন করিলেন। স্থির হইল, এই কর-স্বরূপ বার্ষিক যে ১৷৷০ কোটি টাকা আদায় হইবে, তাহা লইয়া একটি "দুর্ভিক্ষ-নিবারক ধন-ভাণ্ডার" স্থাপিত হইবে এবং কোনও স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে, সেই ধন ভাণ্ডারের অর্থে দুস্থ ব্যক্তিদিগের সাহায্য করা হইবে। যে বৎসর দুর্ভিক্ষপাত না হইবে, সে বৎসর ঐ অর্থে সরকারী ঋণ আংশিক ভাবে পরিশোধিত হইবে। বলা বাহুল্য, রাজ্য-শাসনের ব্যয় নির্ব্বাহের পর রাজকোষে যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইতেই এই কার্য্য সম্পাদন করা

উচিত ছিল। কিন্তু সহৃদয় রাজপুরুষেরা তাহা না করিয়া দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট প্রজার উপর আবার ট্যাক্স বাড়াইলেন। এই ট্যাক্স বসাইবার সময় কর্ত্তৃপক্ষ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, ঐ ট্যাক্সের টাকা দুর্ভিক্ষ-নিবারণ ভিন্ন অন্য কোনও কার্য্যেই ব্যয় করা হইবে না।

এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেও রাজপুরুষদিগের কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। ১৮৭৮।৭৯ সালে এই ট্যাক্স স্থাপিত হইল এবং পরবর্ত্তী বর্ষেই উহা হইতে লব্ধ অর্থ অন্যদিকে ব্যয় করিবার সূত্রপাত করা হইল। ভারতবাসী প্রকৃতিপুঞ্জের পক্ষ হইতে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই কার্য্যের ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। বহু আন্দোলনের পর গবর্ণমেণ্ট ঐ দেড় কোটি টাকা দুর্ভিক্ষ-নিবারণ বা সরকারি ঋণ-শোধ-কার্য্যে ব্যয় করিতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু বলিলেন যে, রেল-নির্ম্মাণ ও খাল-খনন কার্য্য অতঃপর দুর্ভিক্ষ-নিবারক বলিয়া পরিগণিত হইবে অর্থাৎ ঐ দুই কার্য্যে অতঃপর এই দুর্ভিক্ষ নিবারক করের টাকাই ব্যয়িত হইবে। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞাও যথাযথ পালিত হয় নাই। কারণ সরকারি হিসাবে দেখা যায় যে, ১৮৮১ সাল হইতে ১৮৯৫।৯৬ সাল পর্য্যন্ত ১৫ বৎসরে দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টদিগকে সাহায্য দান, রেল ও খালের সুব্যবস্থা এবং ঋণ-পরিশোধ প্রভৃতি কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট ন্যূনাধিক চৌদ্দ কোটি মাত্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে বৎসরে দেড় কোটি টাকা হিসাবে ঐ সকল কার্য্যে ১৫ বৎসরে গবর্ণমেণ্টের ২২॥০ কোটি টাকা ব্যয় করা উচিত ছিল। এই অবশিষ্ট ৮॥০ কোটী টাকায় গবর্ণমেণ্ট সহজেই সরকারি ঋণের কিয়দংশ পরিশোধ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া বেঙ্গল নাগপুর ও ইণ্ডিয়ান মিড্‌ল্যাণ্ড রেল কোম্পানীর ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য দয়াময় রাজপুরুষেরা দরিদ্র প্রজার দুর্ভিক্ষ ফণ্ড হইতে প্রায় ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৪০ হাজারেরও অধিক টাকা দান করিলেন! পরবর্ত্তী ৬ বৎসরে ঐ রেল কোম্পানি-দ্বয়কে আরও ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা দান করা হয়। ১৮৯৬ সাল হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের জন্য আমাদের গবর্ণমেণ্টকে বহু কোটি টাকা ধার করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, দুর্ভিক্ষ-নিবারক ট্যাক্সের আয় অকারণে অপব্যয়িত না হইলে প্রকৃত দুর্ভিক্ষকালে গবর্ণমেণ্টকে পরের নিকট টাকা ধার করিয়া দরিদ্র প্রজার ঋণভার বৃদ্ধি করিতে হইত না।

এইরূপে বিবিধ সূত্রে কর-বৃদ্ধি করায় ভারতীয় প্রজাকুলের কষ্ট দিন দিন কিরূপ বাড়িতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট প্রজার কোন কষ্টই দেখিতে পাইতেছেন না। বরং প্রকৃতি-পুঞ্জের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে—প্রকাশ্য ভাবে এইরূপ মত ব্যক্ত করিতেও কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্কুচিত নহেন। পক্ষান্তরে সরকারি কাগজ পত্রেই আমরা কৃষক-সমাজের অবস্থার অন্যরূপ চিত্র দেখিতে পাই।

মিঃ থরবরণের মন্তব্য।

পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ এস, এস থরবরণ এদেশে প্রায় ৩২ বৎসর কাল রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দেশবাসীর অবস্থা বহুপরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ১৮৯৬ সালে কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করেন যে, পঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানেই কৃষিজীবীদিগের প্রায় অর্দ্ধাংশ হয় সর্ব্বস্বান্ত, না হয় গভীর ঋণপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। তিনি পরীক্ষার জন্য পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ৪৭৪ খানি গ্রাম নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। তদন্ত করিয়া তিনি বলেন, এই সকল গ্রামের মধ্যে ২৯৭ খানি গ্রামের অবস্থা পূর্ব্ব সেটেল্‌মেণ্টের আমলে বা ১৮৭১ সালের পূর্ব্বে সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু নূতন সেটেল্‌মেণ্টে রাজস্ব বৃদ্ধি হওয়ায় অনেক কৃষকের অবস্থাই অতীব শোচনীয় হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, পঞ্জাব অধিকৃত হইবার পরই গবর্ণমেণ্ট একেবারে রাজস্বের হার বৃদ্ধি করেন। তন্মধ্যে গুরগাঁও জেলায় প্রথমে অজ্ঞতা-বশেই রাজস্ব বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল (at first ignorantly over-assessed by us)। সে যাহা হউক, তাঁহার পরীক্ষাধীন গ্রামসমূহের মধ্যে ১২ খানি গ্রামের ৭৪২টি পঞ্জাবী পরিবারের মধ্যে ৫৬৬টি পরিবার ১৮৮১ সালের পর সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে! অন্য চারিটি পরীক্ষার্থ নির্ব্বাচিত বিভাগে (selected circles) ১২৬টি গ্রামের অর্দ্ধেক কৃষক এরূপ গভীর ঋণপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে যে, তাহাদের আর উদ্ধারের আশা নাই!

থরবরণ মহোদয় বলেন, রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা (Fixity of land revenue) এই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। প্রথমতঃ উচ্চ হারে কর-নির্দ্ধারণ ও দ্বিতীয়তঃ আদায়কালে নির্ম্মমতা, এই দুই কারণে যে কৃষকদিগকে মহাজনের আশ্রয় লইতে হয়, তাঁহার কথায় এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে।

তিনি গবর্ণমেণ্টকে আদায়-কার্য্যে কঠোরতা ত্যাগ করিতে ও মহাজন-দিগের অত্যাচার-নিবারণের জন্য জমি হস্তান্তর করিবার পথ সংকীর্ণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রথম অনুরোধ রক্ষা বা আদায় কার্য্যের কঠোরতা-লাঘব (elasticity in collection) করিতে সম্মত হইলেন না, কেবল Land Alienation Act নামক আইন পাস করিয়া (তাহাও বহু সহস্র কৃষকের সর্ব্বস্বান্ত হইবার পর) মহাজনদিগের দমন করিলেন। মিঃ থরবরণ স্বীয় রিপোর্টের একস্থলে বলিয়াছিলেন,—

In India a handful of foreigners rules the tens of millions and through action of these foreigners the peasant masses are now largely dependents of money-lenders, their former servants.

It is idle to say that Zamindars are thriftless, quarrelsome or extravagant and have themselves to blame for their indebtedness. The evidence in this inquiry brings home none of these charges, except, to some small extent, thriftlessness ; and even if all of them were deserved, we have to deal with human nature as it is,and the obligation would still lie on the Government so as to adjust its land revenue system as to obviate all reason for unnecessary borrowing from usurers......Before our time in the Punjab the village lender was, and in the other countries named, is still a dependent servant of the rural community, and never what our system is making him in the Punjab villages—that community's master......

Prices-current, rain statistics and the Revenue Reports of districts show that fodder and grain scarcities are of frequent recurrence and the village note-books and revenue statistics generally prove that suspensions are rare and remissions still rarer......In fact for the whole district (Sialkot) the revenue of which is now fifteen lakhs, I make out that in the last 30 years only Rs. 6,450 have been suspended, and Rs. 1,694 remitted all on account of damage done by hail. In that period there have been several prolonged fodder famines and quite a dozen poor harvests.

ভারতবর্ষে মুষ্টিমেয় বৈদেশিকেরা কোটি কোটি লোকের শাসন করিতেছে। এই বৈদেশিকদিগের কার্য্যদোষেই কৃষিজীবিগণকে অত্যধিক পরিমাণে উত্তমর্ণদিগের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। ভূস্বামী কৃষকগণ অমিতব্যয়ী ও কলহ-প্রিয়, সুতরাং তাহাদের নিজের দোষেই তাহারা ঋণগ্রস্ত হইতেছে, একথা বলা অসঙ্গত। কারণ, অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে, অত্যল্প মাত্রায় অমিতব্যয়িতা ভিন্ন উক্ত দোষনিচয়ের কোনটিরই অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যায় না। কিন্তু যদি তর্কস্থলে ঐ সকল দোষের কথা স্বীকার করিয়াই লওয়া যায়, তাহা হইলেও মানব-স্বভাবের বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে কার্য্য করিতে হইবে। ফলতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে ভূমিকর সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এ প্রকার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য যে, তাহাতে উত্তমর্ণের নিকট হইতে অনাবশ্যক ঋণ-গ্রহণের প্রয়োজন কৃষকেরা কখনই অনুভব করিবে না। আমাদের শাসন

প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে পঞ্জাবে গ্রাম্য ঋণদাতারা কৃষককুলের আশ্রিত ভৃত্যবৎ ছিল, কুরম উপত্যকায় ও সোয়াত প্রভৃতি প্রদেশে এখনও মহাজনেরা কৃষকদিগের অনুগত রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের শাসন-প্রণালীর ফলে পঞ্জাবের পল্লিগ্রামসমূহে তাহাদিগকে যেমন কৃষক-সম্প্রদায়ের প্রভু করিয়া তুলিয়াছে, তেমন পূর্ব্বে কখনই ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন জেলার বৃষ্টির পরিমাণ ও রাজস্ববিষয়ক রিপোর্ট পাঠ করিলে জানা যায় যে, তৃণ ও শস্যের দুর্ভিক্ষ এই সকল অঞ্চলে উপর্য্যুপরি হইতেছে; অথচ ভিলেজ-নোটবুক ও রাজস্ব-তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, ঐ প্রকার দুঃসময়ে কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিবার প্রথা অতি বিরল এবং দুস্থ প্রজাদিগকে একেবারে খাজনা ছাড়িয়া খাজনা আদায়-কার্য্য দিবার রীতি আরও অধিক বিরল। উদাহরণ-স্বরূপ শিয়ালকোট জেলার উল্লেখ করিতেছি। এই জেলার বার্ষিক আয় ১৫লক্ষ টাকা; কিন্তু বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তথায় মোট ১,৬৯৪ টাকা খাজনা রেহাই হইয়াছে এবং ৬,৪৫০ টাকা প্রজাদিগের নিকট হইতে নিরূপিত সময়ের কিছুদিন পরে আদায় করা হইয়াছে; অথচ ঐ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অনেকবার ঐ প্রদেশে দীর্ঘকালস্থায়ী তৃণাভাব ও অন্যূন ১২ বার অতি সামান্য চাষ আবাদ হইয়াছিল।

বঙ্কিম বাবু অদ্য জীবিত থাকিলে বলিতেন,—"বত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল-স্বরূপ যে সারগর্ভ উক্তি সিবিলিয়ান থরবরণের লেখনী-মুখে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা সিমলার প্রাসাদ-গাত্রে বিশদভাবে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত।" ফলকথা, ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশার প্রকৃত কারণাবলী এরূপ স্পষ্ট ভাষায় অতি অল্পসংখ্যক রাজপুরুষই প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের নিকটও এরূপ স্পষ্টবাদিতার পুরস্কার নাই। কারণ,

"অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।"

গবর্ণমেণ্ট এই সকল অপ্রিয় কথা শুনিতে ভাল বাসেন না। কাজেই অল্পদিন পরে কর্ত্তৃপক্ষের সীমান্ত-নীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলিতে গিয়া থরবরণ মহোদয়কে পদত্যাগ করিতে হয়। থরবরণের ন্যায় অন্যান্য স্পষ্টবাদী কর্ম্মচারীদিগকেও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সামান্য লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই। মাননীয় মিঃ স্মিটন বাহাদুর ব্রহ্মদেশের রাজস্ব বিভাগীয় কমিশনর ছিলেন। ১৯০০।০১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে আলোচনা-কালে বড়লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভায় তিনি বলিয়াছিলেন, "গতপূর্ব্ব বৎসরের দুর্ভিক্ষের ফলাফলের বিষয় চিন্তা করিলে বিগত বর্ষে বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও পঞ্জাব প্রদেশের কৃষিজীবীদিগের নিকট হইতে যে, ৬০ লক্ষ টাকা অধিক রাজস্ব আদায় করা হইয়াছে, তাহা ভাল হয় নাই।" সেই

প্রসঙ্গে তিনি ইহাও বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-নীতির দোষেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ এদেশে দিন দিন তীব্রতর হইতেছে। এই স্পষ্টোক্তির জন্য স্মিটন বাহাদুরের পদোন্নতির পথ নিরুদ্ধ হইল। সকলেই আশা করিয়াছিল, তাঁহাকে শীঘ্রই ব্রহ্মদেশের ছোটলাটের পদে নিযুক্ত করা হইবে কিন্তু তাহা হইল না। তিনি হতাশ চিত্তে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। আসামের ভূতপূর্ব্ব চীফ কমিশনর কটন বাহাদুরও হতভাগ্য কুলিদিগের প্রতি সহানুভূতি-প্রকাশের অপরাধে বঙ্গের ছোটলাট পদে সমাসীন হইতে পারিলেন না, একথা বোধ হয়, অনেকেই অবগত আছেন।

পঞ্জাবী কৃষকদিগের অর্দ্ধাংশ যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল রাজস্বের দায়ে ঋণজালে জড়িত ও উৎসন্ন হইয়াছে, থরবরণের কথায় ইহা সুস্পষ্ট বোধগম্য হয়। গুরগাঁও জেলার তদানীন্তন ডেপুটী কমিশনার মিঃ জে, আর ম্যাকোনকি তত্রত্য কৃষিজীবীদিগের অবস্থার সংক্ষেপে বর্ণনা-কালে পশ্চাল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—

In fair seasons there is no actual want of food, but the standard of living is perilously low......It is obvious that the supreme object in life for them is how to keep body and soul together, and the struggle is an arduous one.

সুবৎসরে ইহাদিগের প্রকৃত খাদ্যাভাব ঘটে না বটে, কিন্তু ইহাদিগের জীবন-যাত্রার আদর্শ অতীব শোচনীয়। কোনও প্রকারে দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারিলেই ইহারা আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করে। এবং কেবল প্রাণ-ধারণোপযোগী অন্ন-সংগ্রহের জন্য ইহাদিগকে অতি কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট-স্বীকার করিতে হয়।

পঞ্জাবের অধিকাংশ জেলার অবস্থাই যে অতীব শোচনীয়, তাহা "Economic Inquiry of the Punjab in 1888" নামক সরকারি রিপোর্ট পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পর পঞ্জাবের অবস্থার যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহা মিঃ এস, এস থরবরণ মহোদয়ের ১৮৯৬ সালের রিপোর্টেই প্রকাশিত হইয়াছে।

অযোধ্যা প্রদেশের অধিবাসীদিগের অবস্থা পঞ্জাবের অপেক্ষা কোনও অংশে ভাল নহে। Oudh Gazeteer-এর প্রথম খণ্ডের ৫১৫ পৃষ্ঠায় ঐ প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার Mr. W. C. Benett মহোদয়ের নিম্নলিখিত উক্তি পরিদৃষ্ট হয়।—

It is not till he has gone into these subjects in detail that a man can fully appriciate how terribly thin the line is which divides large masses of people from nakedness and starvation.

বিস্তারিত রূপে এই সকল বিষয়ের আলোচনা না করিলে এই প্রদেশের অধিকাংশ লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব কিরূপ ভীষণ, তাহা কাহারও বোধগম্য হইবে না।

ফয়জাবাদ বিভাগের তদানীন্তন অস্থায়ী কমিশনার মিঃ হ্যারিংটন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিলের পত্রে মিঃ বেনেটের উক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া ভূমি ও কৃষি-বিভাগীয় ডিরেক্টরকে লিখিয়াছিলেন,—

I believe that this remark is true of every district in Oudh.

আমার বিশ্বাস, এই মন্তব্য অযোধ্যা প্রদেশের প্রত্যেক জেলার সম্বন্ধেই খাটে।

ঐ পত্রের স্থানান্তরে তিনি আরও লিখিয়াছেন,—

My own belief, after a good deal of study of the closely connected question of agricultural indebtedness, is that the impression ("that the greater proportion of the people of India suffer from a daily insufficiency of food") is perfectly true as regards a varying, but always considerable, part of the year in the greater part of India.

ভাবার্থ—কৃষকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া আমার নিজের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ভারতের অধিকাংশ লোকেই বৎসরের অধিকাংশ সময়ে প্রত্যহ পর্য্যাপ্ত আহারের অভাবে কষ্ট পাইয়া থাকে। (১)

অযোধ্যা প্রদেশের ভূমির উর্ব্বরতা-হ্রাস-সম্বন্ধে রায়বেরেলীর ডেপুটী কমিশনার মিঃ আরউইন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের সুদীর্ঘ রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, এমন কি ২০ বৎসর পূর্ব্বেও, এই

---

(১) অযোধ্যা প্রদেশের রাজস্ব-বিবরণীর পশ্চাল্লিখিত অংশে দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধ হইবে যে, রাজকোষে অর্থাভাব উপস্থিত হইলেই রাজপুরুষেরা দরিদ্র কৃষকের খাজনা বাড়াইতে অগ্রসর হন।—

In some districts, notably, Fyzabad. Gonda, Kheri and parts of Sultanpur, at a time of supposed financial pressure, the revision of the assessment was hurried on, a greatly enhanced demand was imposed. *Report of* 1872-3.

ইহা অবশ্য ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। কিন্তু দরিদ্র প্রজার বর্ত্তমান দুরবস্থার সহিত এই পূর্ব্ব ঘটনার কি কোনই সম্বন্ধ নাই? মাননীয় মিঃ স্মিটনের উক্তি স্মৃতি-পথে আরূঢ় হইলে বর্ত্তমানকালেও রাজস্ব-বৃদ্ধির জন্য এইরূপ অবৈধ চেষ্টা হইয়া থাকে বলিয়া কি মনে হয় না?

দেশের ভূমিতে যে পরিমাণে গোধূম ও রবিশস্য উৎপন্ন হইত, এখন তদপেক্ষা অনেক কম উৎপন্ন হইতেছে। কারণ, লোকে পূর্ব্বের ন্যায় আর জমিতে সার দিতে পারে না। গবাদিপশুর মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সম্ভবতঃ উহাদের সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। কৃষকদিগের মধ্যে প্রায় শতকরা ৭৫ জনের গৃহে লেপ বা কম্বল নাই—কেবল একখানি "দোহারের" সাহায্যে তাঁহারা সমগ্র শীতকাল যাপন করে। এই প্রায়োপবাস এখন বহুলাংশে লোকের অভ্যাসের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। এই জেলায় Hunger **is** very much a matter of habit!

অতঃপর উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কৃষকদিগের অবস্থা কিরূপ, দেখা যাউক। লর্ড ডফরিণের আমলে ভারতীয় কৃষিজীবীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে গোপনীয় অনুসন্ধান হইয়াছিল, একথা ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলনই এই তদন্তের প্রধান কারণ। ঐ তদন্ত সংক্রান্ত বিবরণীর কয়েক খণ্ডমাত্র বহু চেষ্টার পর মিঃ ডিগ্‌বীর নেত্রগোচর হয়। তিনি স্বীয় গ্রন্থে সেই রিপোর্ট হইতে রাজপুরুষদিগের বিবিধ মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। তদীয় গ্রন্থের সাহায্যে ঐ রিপোর্টের আভাস পাঠকবর্গের গোচর করা যাইতেছে।

সরকারি রিপোর্টের রহস্য।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত ইটা জেলার তদানীন্তন কালেক্টার ক্রুক সাহেব স্বীয় রিপোর্টে লিখিয়াছেন,—"বহুসংখ্যক বিজ্ঞলোকের সাহায্যে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, যে কৃষকের ১৬৷৷০ বিঘা (ইটার বিঘায় ১০ বিঘা) জমী, এক হাল গরু ও জমীতে জলসেচনের যোগ্য কূপ আছে, তাহার বার্ষিক আয় হৈমন্তিক শস্যে ১২৯৷৷০ টাকা, ও রবি শস্যে ৮৪৷৷০ টাকা। এই মোট ২১৪ টাকার মধ্যে সরকারি খাজনায় ৭৫ টাকা, বীজসংগ্রহে ১৩৷৷০ টাকা, চাষের অন্যান্য ব্যয়ে ৭৯৷৶০ বাদ গিয়া ৪৫৮৶০ কৃষকের লভ্যাংশ থাকে। এই পঁয়তাল্লিশ টাকা চৌদ্দআনায় কৃষককে তিনটি পোষ্য সহ সংবৎসর যাপন করিতে হয়। চারিজনের জন্য প্রত্যহ দুই বেলায় তিন সের তণ্ডুল বা খাদ্যোপযোগী অন্য শস্যের প্রয়োজন। টাকায় ২৫ সের দরে এই পরিবারকে বৎসরে ৪৩ টাকার শস্য কিনিতে হয়। কাপড়ের জন্য বৎসরে ৮ টাকা

লাগে। এই মোট ৫১ টাকায় তিন জন পোষ্য সহ কৃষকের সংবৎসর যাপিত হয়। ফলে তাহার বৎসরে ৫ টাকার মাত্র অভাব হইয়া থাকে।"

উল্লিখিত বিবরণে দেখা গেল, সাধারণতঃ যাহার দশ (এখানকার হিসাবে ১৬৷৷০) বিঘা জমী আছে, তাহার চাসের ব্যয় বাদে ১২১ টাকা লাভ থাকে। ইহার মধ্যে তাহাকে ৭৫ টাকা ভূমিকর প্রদান করিতে হয়। অবশিষ্ট ৪৬ টাকার মধ্যে তণ্ডুল কিনিতে ৪৩ টাকা ব্যয়িত হইয়া যায়। ক্রুক মহোদয় তণ্ডুলের দর টাকায় ২৫ সের লিখিয়াছেন। কিন্তু ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁহার রিপোর্ট লিখিবার সময়ে, ইটায় খাদ্যোপযোগী শস্যের দর যে, টাকায় ১৭ সেরের অধিক ছিল না, তাহা Statistical Abstract of British India নামক সরকারি গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায়। সুতরাং ৪৩ টাকায় যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে ৬৩৷০ টাকা লাগে। তাহার পর তৈল, লবণ ও ব্যঞ্জনাদির জন্যও কিছু ব্যয় আছে, ক্রুক বাহাদুর তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। চারি জনের জন্য যে বৎসরে অন্ততঃ ১৷০ টাকার লবণ আবশ্যক হয়, একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। তৈল ব্যঞ্জনের জন্য বৎসরে ন্যূনকল্পে ৩৷৷০ টাকা ব্যয় ধরিলেও কৃষকের ন্যায্য ব্যয় বৎসরে ৬৮ টাকার কম হয় না। ক্রুক মহোদয় বলিয়াছেন, অনেক কৃষকেরই গৃহে অন্ততঃ পক্ষে একটি গো বা মহিষ থাকে। তাহার দুগ্ধে কৃষক-পরিবারের ঘৃত দুগ্ধাদির অভাব দূর হয়। কিন্তু এই গো-মহিষ-ক্রয়ের ও গর্ভাবস্থায় উহাদিগকে খাওয়াইবার ব্যয় কোথা হইতে আসে, তাহা তিনি বলেন নাই।

উপরের যে ৬৮ টাকা ব্যয়ের হিসাব দেখান গেল, তাহাতে রোগে ঔষধ পথ্যাদি এবং আইন আদালত, জন্ম মৃত্যু, বিবাহ ও ধর্ম্মকার্য্যাদির ব্যয় ধরা হয় নাই, ইহা বোধ হয় পাঠক লক্ষ্য করিয়াছেন। মিঃ ক্রুক তাঁহার রিপোর্টের ৩১ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন,—

A great majority of the rural population pass through at least one or two attacks of fever during the year ; in fact in many cases the disease has a tendency to become chronic or constitutional.

মফস্বলের অধিকাংশ লোকই বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ২।১ বার জ্বরে আক্রান্ত হয়। বাস্তবিক অনেক স্থলে এই রোগের বহুকালস্থায়ী বা জীবনসহচর হইবার উপক্রম হয়।

যেথানে জ্বরের প্রকোপ এইরূপ, সেথানে চারি জনের জন্য বার্ষিক

২৲ টাকা ঔষধ পথ্যাদির ব্যয়, অন্যায্য হইতে পারে না। ফলতঃ বার্ষিক ৭০ টাকা চারি জনের জীবনধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ক্রুক মহোদয়ের হিসাবে গৃহপতি কৃষকের আয় বার্ষিক ৪৫৸৵০ আনার অধিক নহে। ইহা হইতে, ইটা জেলায় গবর্ণমেণ্টকে উচ্চ হারে খাজনা দিয়া কৃষকেরা কিরূপ সুখে কালযাপন করিতেছে, বুঝিতে পারা যায়। ১২১ টাকায় ৭৫ টাকা কর লইয়া গবর্ণমেণ্ট আবার কৃষকদিগকেই ঋণপ্রিয় বলিয়া তিরস্কার ও মহাজনদিগকে বিষনয়নে নিরীক্ষণ করেন! মহাজন না থাকিলে কৃষকের কি দুর্দ্দশা হইত, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ঋণ করিয়া কয় দিন চলে? মহাজনই বা কতদিন ধার দিতে পারে? কাজেই কৃষক পরিবারকে অর্দ্ধাশনে কালযাপন করিতে হয়। মিঃ গ্যার্টান (Manager of the Palmar Waste Land Grant) বলেন, এদেশের লোকে অধিকাংশ স্থলেই ধার করা অপেক্ষা, অল্প পরিমাণ ও কদর্য্য অন্ন ভক্ষণ করিয়া দিন-যাপন করা শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করে।

They prefer short allowance and inferior kind of food to incurring debt

ক্রুক মহোদয়, কৃষকের পোষ্য-সংখ্যা গড়ে তিন জন ধরিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় আদমসুমারির বিবরণীতে দৃষ্টিপাত করিলে, গড়ে ন্যূন পক্ষে ৫ জনকে লইয়া এক একটি পরিবার গঠিত, একথা স্বীকার করিতে হয়। কৃষকের পোষ্য ৪ জন ধরিলেও তাহার বার্ষিক ব্যয় আরও ১৭৷৷০ টাকা বাড়িয়া যায়। এরূপ অবস্থায় কৃষক-পরিবারকে ঋণপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াও অর্দ্ধাশনে কালযাপন করিতে হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

মিঃ ক্রুকের আর একটি উক্তি এই,—

It is unusual to find a village woman who has any wraps at all.

এখানকার গ্রাম্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কাহারও গায়ের কাপড় বা চাদর নাই।

ইটা জেলার অবস্থা, পাঠক ইহা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই রিপোর্টের সার-সংগ্রহ-পূর্ব্বক যে সরকারি মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয়,—

Mr. Crook Collector of Etah (area 1739 Miles, population 756,528), whose peculiar knowledge of agricultural life lends a great value to his remarks, considers the peasantry to be a robust, apparently well-fed population, and dressed in a manner which quite comes up to their *traditional ideas of comfort*......Mr. Crook does not believe that anything like a large percentage of people in Etah or any other districts of the provinces, is habitually under-fed.

ইটা জেলার পরিমাণ ১৭৩৯ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৭,৫৬,৫২৮। এখানকার কালেক্‌টার মিঃ ক্রুক সাহেবের ভারতীয় কৃষি-জীবন সম্বন্ধে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, এই কারণে তাঁহার মন্তব্যের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এই বিজ্ঞ কর্ম্মচারীর মতে ইটা জেলার কৃষকগণ হৃষ্টপুষ্ট, তাহাদের অন্নকষ্ট আদৌ নাই। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে তাহাদিগের চিরন্তন ধারণা যেরূপ, তাহারা তদনুরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইটা জেলার বা অন্য কোনও প্রদেশের অধিকাংশ লোক বার মাস অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করে,—এ কথা মিঃ ক্রুক বিশ্বাস করেন না।

কিন্তু ক্রুক মহোদয় রিপোর্টের ২৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয় যে,—

The assertion which is universally believed by natives, that the cultivator is not so well-off now-a-days as at the time of the Mutiny.

দেশের লোকের সকলেরই বিশ্বাস, সিপাহী বিদ্রোহের সময় কৃষকদিগের অবস্থা যেরূপ সচ্ছল ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই।

পাঠক এই উক্তির সহিত সরকারি মন্তব্যের বক্রাক্ষরে মুদ্রিত অংশটি মিলাইয়া দেখিবেন। (১)

রিপোর্টের ১৬ হইতে ১৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আবেরাম ঠাকুর নামক এক কৃষকের পরিচয় দৃষ্ট হয়। তাহার সম্বন্ধে ক্রুক মহোদয় লিখিয়াছেন,—

আবেরামের বয়স ৪০বৎসর, পোষ্য ৫টি। সে ২৭বিঘা জমির চাষ করে। চাষ ভাল হইলে, দু'বেলায় তাহার পরিবারে ৴৫ সের তণ্ডুল খরচ হয়। খাদ্যের দর চড়িলে, তিন সের বা তদপেক্ষা অল্প তণ্ডুলে এই পরিবার দিন যাপনে বাধ্য হয়। এ বৎসর ক্ষেত্রে শস্য সম্পূর্ণ পক্ক হইবার পূর্ব্বেই সে উহা খাইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহার ক্ষেত্রে যে ধান্য হইয়াছিল, তাহার মূল্য ৭০।০ টাকা; তন্মধ্যে খাজনা দিয়াছে ৬৮৵৶০। ইহার অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্ট এবং অর্দ্ধেক জমিদার গ্রহণ করিয়াছেন। দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া সে এ বৎসর ১৮ টাকা পাইয়াছে। পিতা পুত্রে মজুরী করিয়া ১৫ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে। বীজ কিনিয়াছে ৯॥০ টাকার। পাঁচটি পোষ্যসহ ৪৪ টাকায় সে সংবৎসর জঠর-যন্ত্রণার আংশিক নিবারণ করিয়াছে। তাহাকে ৭॥০ টাকার কাপড় কিনিতে হইয়াছে। তাহার ঘরে একখানিও কম্বল নাই। গৃহস্থিত আসবাব পত্রের

---

(১) সিন্ধুদেশেও রাজপুরুষেরা প্রকৃতিপুঞ্জের শ্রীবৃদ্ধির বিশেষ লক্ষণ (a marked improvement) দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু বলিতেছেন,—

The people themselves will not admit it.

কবি যথার্থই বলিয়াছেন, "মন্দ লোকে বলে মন্দ"!

মূল্য ২৲ টাকার অধিক হইবে না। আরও ২৬॥৶৹ না হইলে তাহার সংবৎসরের (এক বেলা) অন্ন সংস্থান হইবে না। কিন্তু পূর্ব্ব বর্ষের ৫০।৶৹ টাকা ঋণ থাকায় আর তাহার মহাজনের নিকট টাকা ধার পাইবার উপায় নাই।

আবেরাম ঠাকুর সম্বন্ধে ক্রুক মহোদয়ের এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের তদানীন্তন ছোটলাট স্যার অকল্যাণ্ড কলভিন বাহাদুর তাঁহার প্রধান সচিব মিঃ রীডের (Mr. T. R. Reid) সাহায্যে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন,—

The family appears to be above want.

আবেরাম ঠাকুরের পরিবারবর্গের কোনও বিষয়ে অভাব নাই।

বলা বাহুল্য, এই মন্তব্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টও বিশ্বাস করিলেন, আবেরামের কোনও অভাব নাই

ইটা জেলায় সে বৎসর যাহাদিগের জমীতে উৎপন্ন শস্যের মূল্য ৩২১ টাকার অধিক হয় নাই. তাহাদিগকে ৩০৬৲ টাকা ভূমিকর দিতে হইয়াছে, রিপোর্টে এরূপ উদাহরণও পাওয়া যায়। তন্তুবায়, তৈলিক প্রভৃতির অবস্থাও কৃষকদিগের অপেক্ষা কোনও অংশে উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে, রিপোর্টে এরূপ নিদর্শন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এটাওয়া জেলার কলেক্টার মিঃ আলেক্জাণ্ডার ঐ অঞ্চলের কৃষকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

In all ordinary years I should say that many cultivators live one third of the year on advances from money-lenders.

সাধারণতঃ যে সকল বৎসরে অতি-বৃষ্টি অনাবৃষ্টির প্রকোপ থাকে না, সে সকল বর্ষে বৎসরের মধ্যে প্রায় ৪ মাস কৃষকদিগকে মহাজনের নিকট ঋণ লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়।

কানপুরের আসিষ্টাণ্ট কালেক্টার মিঃ বার্ড বলেন,—

I have calculated the cost of food of a male at £1. 12 s. per annum, of a female £ 1. 7s. 4d. and a minor 18 s. 8 d.

আমি গড়ে প্রতি পুরুষের বার্ষিক খাদ্যের ব্যয় ১৬৲ টাকা, স্ত্রীলোকের ১৩॥৶১৫ ও বালকের ৯।/১০ ধরিয়াছি।

যে জেলার পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে গড়ে ১৬৲ টাকা মূল্যের তৈল-লবণ-ব্যঞ্জন-তণ্ডুলে সংবৎসর (বা তিন পয়সায় দুই বেলা) যাপন করিতে

হয়, সে জেলার লোক কত সুখে আছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ঝাঁশী (Jhansi) বিভাগের কমিশনার মিঃ ওয়ার্ড ঐ অঞ্চলের জালবন জেলার লোকের অবস্থা সম্বন্ধে বলেন,—

In Jhalaun the burden of indebtedness is very heavy and I canno' but think that agriculture is declining from want of capital and from toc continuous cultivation of the same land for the same crop.

জালবন জেলার কৃষকদিগের ঋণভার অত্যন্ত অধিক। অর্থের অভাবে এখানকার কৃষির অবস্থা দিন দিন অবনত হইতেছে, একই ভূমিতে পুনঃপুনঃ একই প্রকার শস্য উৎপাদিত হওয়ায় ভূমির উর্ব্বরতা কমিয়া যাইতেছে।

দেশের অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর লোক প্রত্যহ অর্দ্ধাশনে থাকিতে বাধ্য হয় কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বান্দা অঞ্চলের কালেক্টার ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হোয়াইট বলেন,—

A very large number of lower classes of population clearly demonstrate by the poorness of their physique that they are habitually half-starved......I think the Government would be astonished to find how many Oudh peasants cultivate land without any bullock,

নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে যে চিরকাল অর্দ্ধাশনে যাপন করিতে হয়, তাহা তাহাদের দেহের শোচনীয় ক্ষীণতা হইতেই প্রতিপন্ন হয়। আমার বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, অযোধ্যা অঞ্চলের অনেক কৃষককে বলদের অভাবে স্বয়ং লাঙ্গল টানিতে হয়।

গাজীপুরের কলেক্টার সাহেব বলেন,—

As a rule, a very large proportion of the agriculturists in a village are in debt.

সাধারণতঃ গ্রামের অধিকাংশ কৃষকই ঋণগ্রস্ত!

সীতাপুরের অবস্থা কানপুরের অপেক্ষাও মন্দ; এখানকার প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষকে ১৪॥০ টাকায় ও বালকদিগকে ৭৵০ আনায় সংবৎসর কাল যাপন করিতে হয়। এখানকারই কমিশনার মিঃ বয় বলিয়াছেন যে, "কোনও বিশেষ কারণে ইদানীং প্রজাবর্গের এতদপেক্ষা অধিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কালযাপন বাঞ্ছনীয় নহে।"

পূর্ব্ববর্ত্তী সেন্সাসের বা আদমসুমারির তালিকার সহিত গত ১৯০১ সালের তালিকার তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, বেরার প্রদেশে ঐ দশ বৎসরে লোক-সংখ্যা প্রায় ৫,৮০,০০০ ও পঞ্জাবে ৭,৫০,০০০ কমিয়াছে। মধ্যপ্রদেশ-সমূহে ১৩,৭০,৫০০ জন অধিবাসী গত দশ বৎসরের (১৮৯১

খ্রীঃ—১৯০১ খ্রীঃ) মধ্যে হ্রাস পাইয়াছে। এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর ও বারাণসী জেলার লোকসংখ্যা ঐ সময়ের মধ্যে ২,৪৪,৬২৮৫ জন কম হইয়াছে। কৃষকের অন্নবস্ত্রের অভাব বৃদ্ধি না হইলে এত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল কিরূপে? রাজপুরুষেরা বলেন, দুষ্ট মহাজন, মোহময় দেওয়ানি আদালত ও নিষ্ঠুর দেবতার দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে; কর্ত্তৃপক্ষের কোনও দোষ নাই। অথচ ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বসু যখন দেখাইলেন যে, মধ্যপ্রদেশ-সমূহে স্থানে স্থানে শত করা ১০২ ও ১০৫ হারে রাজস্ব বৃদ্ধি করায় প্রজার কষ্ট বাড়িয়াছে, তখন কর্ত্তৃপক্ষ তাহার যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

প্রজার নিকট হইতে উচ্চহারে রাজস্ব গৃহীত হয় না, একথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিশেষ চেষ্টা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে ইন্দোর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর আর, রঘুনাথ রাও মহোদয় (ইনি অনেক দিন মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন সবার্ডিনেট সার্ব্বিসে কার্য্য করিয়া) লিখিয়াছেন, রাজপুরুষেরা বলেন যে, —ভূমির মোট উৎপন্নের শতভাগের ২৫ বা ৩০ ভাগ অথবা কৃষকের লভ্যাংশের অর্দ্ধেক রাজস্ব-স্বরূপ গ্রহণ করা হয়। প্রকৃত ঘটনা যদি এইরূপ হইত,তাহা হইলে প্রজারা দুই এক বৎসর ফসল ভাল না হইলেও বিশেষ বিপন্ন হইত না। কিন্তু প্রজার নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট মোট উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেকেরও অধিক রাজস্বস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সরকারি কাগজে পত্রে, শত ভাগের ২৫ বা ৩০ ভাগের অধিক খাজনা লওয়া হয় না, ইহা দেখাইবার জন্য জমীর আয় অধিক করিয়া ধরা হয়!” তাঁহার উক্তির একাংশ এইরূপ,—

This is only in theory, actually they receive on an average more than fifty per cent, of the gross. On paper it is shown to be between 25 and 30 P. c of the gross *by over-estimating the gross produce.*

ইহার পর দেওয়ান বাহাদুর উদাহরণ-স্বরূপে একটি গ্রামের কৃষি-বিষয়ক আয় ব্যয়ের বিবরণ ও গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত করের অন্যায্যতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

If there is any doubt in this case, I am prepared to hand over the village to Government if I be allowed to draw from the Government treasury annually the sum of fixed assessment perpetually.

এই হিসাবের সত্যতায় যদি কোনও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে আমি এই গ্রামটি চিরকাল গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারিত কর লইয়া গবর্ণমেন্টকে ইজারা দিতে প্রস্তুত আছি।

কোন্ প্রদেশের ভূমিতে গড়ে বিঘা প্রতি কত শস্য উৎপন্ন হয়, বিগত দুর্ভিক্ষ কমিশনে কর্ত্তৃপক্ষ তাহার হিসাব দাখিল করিয়াছিলেন। সেই হিসাবে প্রকাশ, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে প্রতি বিঘায় প্রায় ২৫ সের করিয়া শস্য অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সমগ্র দেশবাসীর সংবৎসর-ব্যবহারের উপযোগী শস্য রাখিয়া ও বিদেশে রপ্তানি করিয়াও দেশে কত অধিক শস্য সঞ্চিত থাকে, তাহারও হিসাব গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে কমিশনের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু কমিশন সে হিসাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

The *Bengal* returns are particuiarly *unreliadle.* The Bombay returns also appear to be far high.......The Burmah annual surplus has been pit ched too high......The surplus of 3,306,300 tons returned for the province of Bengal appears to us to be greatly in excess of the reality, and the Lo cal Government take the same view......On the whole we are disposed to think that in the figures supplied to us by Local Governments the normal surplus in most cases is placed too high.

এখন বেহার অঞ্চলের কৃষকদিগের অবস্থা শুনুন। পাটনার কালেক্টার বলেন,—যে সকল কৃষক ৭ বিঘা জমির চাষ করে, তাহারা—

Can take one full meal instead of two.

এক বেলা ভিন্ন দুই বেলা খাইতে পায় না।

গয়ার কমিশনার সাহেবের উক্তি এই,—

Forty per cent of the population are insufficiently fed.

এ জেলার শতকরা ৪০ জন অর্দ্ধাশনে কালযাপন করে।

মিঃ টয়েনবী (পাটনার কমিশনর) বেহারী কৃষকদিগের অবস্থার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"৫ বিঘা জমির চাষ করে, এইরূপ কৃষকের সংখ্যা এই অঞ্চলে অল্প নহে। গড়ে ইহাদের বৎসরে ১২৫ টাকা মূল্যের শস্য উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে খাজনা বাদে ১০২ টাকা তাহাদের হাতে থাকে। এই টাকায় সাধারণতঃ ৬ জন পোষ্য সহ কৃষককে সংবৎসর যাপন করিতে হয়। এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত লোকের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ হইবে। লক্ষ

লক্ষ লোককে দুই বিঘা মাত্র জমির চাষ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। এই সামান্য আয়ে ইহারা কিরূপ কষ্টে দিনযাপন করে, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এতদ্ব্যতীত শতকরা ১০।১৫ জনের জমি জমা নাই—কেবল মজুরী করিয়া ইহারা দিনপাত করে। শ্রমজীবীরাও বৎসরের মধ্যে ৮ মাসের অধিক কাল কোনও কাজ পায় না। মজঃফরপুর, সারণ, চম্পারণ ও দ্বারবঙ্গের অনেক অংশে শ্রমজীবীদিগকে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় কাপযাপন করিতে হয়।"

রবার্ট নাইট প্রণীত India Before Our Time and Since নামক গ্রন্থে দেখা যায়, উড়িষ্যায় পূর্ব্বে কৃষকের গৃহে ধান্য সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকিত। অন্ততঃ দুই বৎসরের ব্যবহারোপযোগী শস্য গৃহে সংগৃহীত না থাকিলে কোন কৃষকই নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। নাইট মহোদয় বলেন "বৃটিশ-শাসন উড়িষ্যায় প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে কৃষকদিগের ধানের গোলা-সমূহ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল এবং এক্ষণে সে সকল ধান্য-ভাণ্ডারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে।"

সরকারী রিপোর্ট অনুসারে নিম্নবঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকের অন্নকষ্ট আদৌ নাই,তবে পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা সেরূপ নহে। কিন্তু গত ১৯০৬ সালের দুর্ভিক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে যেরূপ হাহাকার উঠিয়াছিল, তাহাতে রাজপুরুষগণের মতের অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য বিহার ও উড়িষ্যাবর্জ্জিত নদীমাতৃক শস্য-শ্যামল বঙ্গদেশে ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় কৃষক-সমাজ নিরন্তর ঘোর অন্নকষ্টে পীড়িত নহে। তথাপি বাঙ্গালার সকলশ্রেণীর লোকের আয়, ডিগ্‌বী সাহেবের মতে গড়ে বার্ষিক ১৫ টাকা তিন আনা মাত্র! অর্থাভাবে বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই সুপানীয়ের অভাব ঘটিয়াছে। ফলে ম্যালেরিয়ায় ও কলেরায় প্রতিবর্ষেই বাঙ্গালীর মৃত্যু সংখ্যা বাড়িতেছে। সুখাদ্যের অভাবেও শিশুগণের যকৃৎ রোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিতেছে।

ফলতঃ ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র কৃষক-সমাজের অবস্থা ইংরাজের রাজস্ব-নীতি ও বাণিজ্যনীতির দোষে অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বৃটিশ-ভারতে অন্য সুখ যতই থাকুক, দশ কোটী লোকের যে "ভাত-কাপড়ের" কষ্ট অত্যন্ত প্রবল, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত রাজপুরুষদিগের মন্তব্য-সমূহ হইতেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঐতিহাসিক হণ্টারের Imperial Gazetteer of India নামক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ১৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত

হইয়াছে যে, "প্রকৃত দুর্ভিক্ষের সময় গবর্ণমেণ্ট বহু কষ্টে অনশন-পীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রাণ-রক্ষার ব্যবস্থা করেন বটে ; কিন্তু—

It cannot stop the yearly work of disease and death among a steadily under-fed people.

"নিত্য-অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট প্রজা-সমূহ যে প্রতি বৎসর রোগের তাড়নে ও কালের আক্রমণে অসময়ে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার প্রতীকার করিতে গবর্ণমেণ্ট অসমর্থ।"

গবর্ণমেণ্ট প্রজা-রক্ষায় অসমর্থ হইলে কে আর হতভাগ্যদিগের অকাল-মৃত্যু নিবারণ করিবে ? দেশের ধনি-সম্প্রদায়ের উপর দুঃসময়ে চিরকাল দরিদ্র-শ্রেণীর লোকে নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দেশের সেই ধনশালী দান-ধর্ম্ম-পরায়ণ অভিজাতবর্গ (Nobles) কোথায় ? সেই উদারচরিত কর্ণ-কল্প দাতৃসম্প্রদায় আজ কোথায় ? স্যার জন কে (Sir John Kaye) এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় বৃটিশ-শাসন-নীতির দোষ প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলেন,—

The proprietors of vast tracts of country, as far as the eye could reach have shrivelled into tenants of mud huts and possessors of only a few cooking pots.

অর্থাৎ যাঁহারা বড় বড় ভূমিখণ্ডের অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা বিশীর্ণ অবস্থায় মৃন্ময় কুটীরে কতিপয় তৈজসপত্র লইয়া দিনযাপন করিতেছেন।

সেকালের কুবের-কল্প দরিদ্র-পালক রাজবংশীয়দিগের পরিণাম কি হইল? ইহার উত্তরে মি জন ব্রাইট পার্লামেণ্ট মহাসভায় স্পষ্টাক্ষরে বলেন—

They are now either homeless wanderers or pensioners on the bounty of the strangers by whom their fortunes have been overthrown.

যাঁহারা এককালে দেশ শাসন করিতেছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে হয় গৃহ-শূন্য পরিব্রাজক শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন, না হয়, যে সকল বৈদেশিক তাঁহাদিগের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন, তাঁহাদিগেরই অনুগ্রহ-দত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করিতেছেন।

এখন গবর্ণমেণ্ট প্রজার অন্ন-কষ্ট দূর করিতে—তাহাদের অকাল মৃত্যু-নিবারণ করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলে, নিরাশ্রয় ভারতবাসী কোথায় যাইবে ? ১৮৮০ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ৩৯,২৮,৬৩১ জন মরিয়াছিল ; ১৯০০ সালে ৮৩,৩৪,১৫৫ জন ভারতবাসীর ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। সকল সভ্যদেশেই মৃত্যু সংখ্যা কমিতেছে, কেবল ভারতবর্ষেই উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় কেন ? দেশে খাদ্যাভাব ঘটায় অনেকেই দেশ-ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। যে ভারতবাসী সহজে আপনাদিগের

বাস্তুভিটা ত্যাগ করিতে চাহে না, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগের মধ্যে ১০,৭১২ জন জীবিকাহরণের জন্য কুলিরূপে বিদেশে গমন করিয়াছিল, ১৯০১ সালে উহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২১,৬১৩ হইয়াছে। বিগত ১৮৯৩ হইতে ১৯০২-৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৮৯ জন দেশত্যাগ করিয়াছে। পেটের দায়ে বিদেশে ইংরাজ উপনিবেশসমূহে যাহারা গমন করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি ঔপনিবেশিকেরা কিরূপ দুর্ব্ব্যবহার করেন, তাহা সংবাদপত্র-পাঠকদিগের অবিদিত নহে।

কর্ণেল ষ্টোন নামক জনৈক অবস্থাভিজ্ঞ ইংরাজ কিছুদিন হইল, কোনও বিলাতি মাসিক পত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরাজ-উপনিবেশে ভারতবর্ষীয়দিগের লাঞ্ছনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—"দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল শ্বেতাঙ্গ দোকানদার আছে, তাহারা White League "শ্বেতাঙ্গ সভা" নামক একটি সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সভা শ্বেতাঙ্গ পণ্যজীবীদিগের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ সংরক্ষণে ও হিতসাধনে নিয়োজিত। এই সভাই এক্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতবাসী ও অন্যান্য প্রাচ্য জাতিদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। যাহাতে ভারতবাসীরা এবং অন্যান্য প্রাচ্য জাতীয় লোকেরা দক্ষিণ আফ্রিকায় দোকান খুলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে পণ্য বিক্রয়-পূর্ব্বক শ্বেতাঙ্গদিগের ব্যবসায়ের অবনতি ঘটাইতে না পারে, তাহাই এই স্বার্থ-সর্ব্বস্ব শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবাসীরা বৃটিশ-রাজের প্রজা বলিয়া তাহাদিগের প্রতি ইহারা অণুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করে না। বরং ভারত-সন্তানদিগের ব্যবসায়-বুদ্ধি শ্রম-শীলতা, মিত-ব্যয়িতা, কার্য্য-পরিচালনের নৈপুণ্য এবং পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি গুণগ্রাম তত্রত্য শ্বেতাঙ্গ দোকানদারদিগের মর্ম্মপীড়ার কারণস্বরূপ হইয়াছে। সেইজন্য আজ ভারতবাসী পদে পদে দক্ষিণ আফ্রিকায় লাঞ্ছিত হইতেছে। তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষও রাজ-বিধান প্রণয়ন করিয়া এই সকল সদ্‌গুণসম্পন্ন ভারতবাসীকে পদ-দলিত ও নিগৃহীত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কর্ণেল ষ্টোন আরও বলেন, ইউরোপের সকল দেশের লোকই এই "শাদা দোকানদার" সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ মধ্যবিত্ত ইংরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া সিরিয়ার অতি ইতর শ্রেণীর লোক ও ইউরোপীয়

সমাজের আবর্জ্জনা-স্বরূপ অতি নীচ প্রকৃতি শ্বেতাঙ্গেরা কেবল বর্ণ-গৌরবে এই শ্বেতাঙ্গ সভায় স্থান লাভ করিয়াছে। যেরূপ উচ্চ অঙ্গের বুদ্ধিমত্তা থাকিলে বড় বড় বৃটিশ ব্যবসায়ীদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায়, সেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্য-নৈপুণ্য ইহাদিগের নাই।

"কিন্তু ভারত-সন্তানেরা বুদ্ধিমান, সহিষ্ণু এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে ইংরাজদিগের যোগ্য প্রতিযোগী। সেই জন্যই ভারতবাসীর উপর দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ পণ্যজীবীরা খড়্গ-হস্ত। সেই জন্যই সেখানকার গবর্ণমেণ্টও তাহাদিগের প্রতিকূল। দক্ষিণ আফ্রিকাপ্রবাসী ভারত-সন্তানের পদ-মর্য্যাদা, শিক্ষা এবং বিদ্যাবুদ্ধি যে প্রকারই হউক না কেন, সেখানে তাহারা "কুলী" নামে অভিহিত হয়। শ্বেতাঙ্গদিগের পল্লীতে ভারতসন্তানের প্রবেশাধিকার নাই। যাহারা পূর্ব্বাবধি আফ্রি-কায় গিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেছে, তাহাদিগকে নগরের বাহিরে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতে হইতেছে। সে গণ্ডীর বাহিরে তাহাদিগের আসিবার হুকুম নাই। রাজপথে চলিবার সময় ভারতবাসী সেখানে ফুটপাথ বা পাদপথের উপর দিয়া যাইবার অধিকারী নহে। আপনার অর্থব্যয় করিয়া ভারতবাসী সেখানে শকটে আরোহণ করিতে পারে না; চিরকাল সেখানে বাস করিয়াও ভূমির উপর কোন স্থায়ী স্বত্ব তাহারা প্রাপ্ত হয় না; তাহাদিগের বাণিজ্য-বিস্তারের পথও কণ্টকাকীর্ণ করা হইয়াছে। ব্যবসায় বা বাসের জন্যও যেন কোনও ভারত-সন্তানকে কেহ ঘর ভাড়া না দেয়, কেহ যাহাতে তাহাদের সহিত ব্যবসায়-সূত্রে কোনও সম্বন্ধ না রাখে, অন্য কোনও বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য না করে, তাহাদের দোকানে কোনও জিনিস ক্রয় বা বিক্রয় না করে, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার ভার একটি "ভিজিল্যান্স এসোসিয়েশন" নামক সভার উপর অর্পিত হইয়াছে। সেখানকার গবর্ণমেণ্ট এ সকল বিষয়ে কোনও আপত্তি করেন না। কাজেই ভারত-সন্তানদিগকে দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিতে হইতেছে। অথচ একই ইংরাজ ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকার রাজা।

এই প্রসঙ্গে অবস্থাভেদে কিরূপ ব্যবস্থাভেদ হয়, পাঠক তাহার একটা উদাহরণ দেখুন। চীনের শ্রমজীবীরা জীবিকার্জ্জনের জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গমন করিয়া তত্রত্য শ্বেতাঙ্গদিগের হস্তে লাঞ্ছিত হইতেছে

বলিয়া চীনে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। চীনের রাজমাতা এম্প্রেস ডাওয়েজার চীনীয় সংবাদ-পত্রে চীন-শ্রমজীবীদিগের নিগ্রহ-কাহিনী পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হন এবং নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করেন,—

"চীনের অধিবাসিবৃন্দ স্বদেশেই থাকুক আর বিদেশেই থাকুক, তাহারা আমাদিগের সন্তান; তাহারা যে কোন রূপ নিগ্রহ-ভোগ করিবে, ইহা আমাদিগের পক্ষে অসহ্য। আমাদিগের বহু প্রজা শ্রমজীবীর কাজ করিয়া দিনপাত করিবার জন্য বিদেশে গমন করিয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, আমরা তাহাদিগের অন্নের ব্যবস্থা করিতে পারি নাই,তাহাদিগকে অপত্যবৎ পালন করিতে পারি নাই। তাহার উপর তাহারা পরদেশে, পরহস্তে লাঞ্ছিত হইতেছে, এ ক্লেশ আমি কিছুতে সহ্য করিতে পারি না। এই জন্য আমি আপনাদিগকে এই আদেশ করিতেছি যে, যে সন্ধির জন্য প্রবাসী চীন-শ্রমজীবীরা এত ক্লেশ ভোগ করিতেছে, আপনারা অবিলম্বে সে সন্ধি রহিত করুন; আর যুক্তরাজ্যে আমাদিগের যে প্রতিনিধি আছেন, তাঁহাকে তারযোগে এই সংবাদ জ্ঞাপন করুন যে, তিনি যেন তত্রত্য চীনাম্যানদিগকে বৈদেশিকদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করেন। আমাদিগের যে সকল প্রজা তথায় ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত আছে, তাহাদিগের মঙ্গলাভিলাষ যে সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে, একথা স্মরণ রাখিয়া তিনি যেন কাজ করেন।"

চীনের মহীয়সী রাজমাতার হৃদয় যে করুণার সুধা-ধারায় পরিপূর্ণ, তাঁহার এই আদেশ শুনিয়া তাহা কে না স্বীকার করিবেন? সেই জন্যই বলিতেছিলাম, অবস্থাভেদে ব্যবস্থা ভেদ হইয়া থাকে। স্বাধীন রাজ্যের প্রজা এবং পরাধীন রাজ্যের প্রজায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। রাজা আমাদিগের স্বার্থ অপেক্ষা শ্বেতাঙ্গ প্রজার স্বার্থ-সংরক্ষণে সমধিক মনোযোগী বলিয়া আমাদিগের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। এ দেশের কৃষকেরা বলে:—"আছে গরু না বহে হাল, তার দুঃখ চিরকাল।" আমাদিগেরও সেই অবস্থা হইয়াছে। রাজা আছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের কষ্ট ঘুচিতেছে না।

যাহারা স্বদেশত্যাগ করিতে পারে নাই, অন্নকষ্টে তাহাদিগেরও দুর্গতির শেষ নাই। ১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষকালে যে ভারতবাসী চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন অপেক্ষা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিল, (১) তাহারা এখন ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া তস্করবৃত্তি স্বীকারে আর সঙ্কোচ

---

(১) ১৮৮৩ সালের "নাইন্টীন্থ সেঞ্চুরি" পত্রে মিঃ জে সেমুর কে লিখিয়াছেন—
An eye-witness on this occasion says,—"They were starving, but not one in a hundred thousand resorted to robbing.

বোধ করিতেছে না! গত ১৮৯৭ সালে ১,২০,০০০জন চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিল, ১৯০০ সালে ১,০৭,১৫৯ জন চুরি করিয়া দণ্ড পায়। অন্ন-ক্লেশের ইহা অপেক্ষা শোচনীয় নৈতিক পরিণাম আর কি হইতে পারে? সরকারি রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে আরও দৃষ্ট হয় যে, যে বৎসরে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে জঠর-জ্বালায় উন্মত্তবৎ হইয়া জনসমাজ রাজবিধানের লঙ্ঘন করিয়াছে, সেই বৎসরেই রাজপুরুষেরা বেত্রাঘাতে দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া হতভাগ্যদিগের নৈতিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ বর্ব্বরতা কখনই রাজ-ধর্ম্মের অনুমোদিত হইতে পারে না।

১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষে দেশীয় রাজ্যে অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি কিরূপ অনুকম্পা প্রদর্শিত হইয়াছিল, বোম্বাইয়ের "টাইমস অব ইণ্ডিয়া" নামক অর্দ্ধ সরকারী সংবাদ-পত্রের পশ্চাল্লিখিত উক্তি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।—

No less than 47,400 people migrated into H. H. the Nizam's territories from the adjoining British districts up to the spring of 1877 only. —Dec. 14, 1880.

অর্থাৎ সেই দুর্ভিক্ষের সময় নিকটবর্ত্তী বৃটিশ-শাসিত প্রদেশ হইতে অন্যূন ৪৭,৪০০লোক নিজামরাজ্যে গিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল। দেশীয় রাজ্যসমূহে কৃষক-সমাজে মহাজনদিগের প্রতিপত্তিও অপেক্ষাকৃত অল্প।

The money-lender is not the paramount power in Travancore, in Rajputana, in the Nizam's dominions, in Mysore or elsewhere outside the British provinces.—*India for the Indians—And for England. pp* 51.

পার্ব্বত্য নেপাল-রাজ্য শিক্ষা ও সভ্যতায় সুসভ্য ইংরাজের অপেক্ষা বহুগুণে হীন; কিন্তু অত্রত্য প্রজার অবস্থা সম্বন্ধে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেলের রিপোর্টে নিম্নলিখিত উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়,—

The condition of the Nepaul ryot is, on the whole, better than that of the British ryot.

বৃটিশ ভারতীয় প্রজার অপেক্ষাও নেপালী প্রজার অবস্থা মোটের উপর ভাল।

দুঃখের বিষয়, এখানকার উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরা একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন,বৃটিশ-শাসনে ভারতবাসীর আর্থিক অবনতি বা দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে, একথা আদৌ সত্য নহে। ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্টন মহোদয় গত ১৯০০সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে পার্লামেণ্ট মহাসভায় সর্ব্বজন সমক্ষে বলিয়াছিলেন,—

There is a small school in this country as in India who are perpetually asserting that our rule is bleeding India to death. Since I have been Secretary of State I have taken great pains to collect and investigate any information or evidence, I could obtain, no matter from what quarter it came, which by facts figures or other reliable information tended to support this allegation. I admit at once that if it could be shown that India has retrograded in material prosperity under our rule, we stand self-condemned, and we ought no longer to be entrusted with the control of that country. But no such facts, figures or evidence have I ever been able to obtain. That a section of the public both here and in India believes this allegation is clear from their constant and unwearied repetition of the charge. But this is founded not on figures, or facts or economic data but on plausible syllogistic formula that they are never tired of repeating.

বিলাতে ও ভারতবর্ষে একদল লোক আছেন,তাঁহারা বলেন,বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষের যে ভীষণ শোণিতস্রাব হইতেছে, তাহাতে ভারতবাসী মৃতকল্প হইয়াছে। আমি সচিবের পদ গ্রহণের পর হইতে এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য যথাসাধ্য কষ্ট-স্বীকার-পূর্ব্বক নানা সূত্রে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি। আমি স্পষ্টাক্ষরে একথা স্বীকার করি যে, বৃটিশ-শাসনে ভারতবর্ষের অনেক অবনতি ঘটিয়াছে—একথা প্রতিপন্ন হইলে আমাদিগের হস্তে ভারতের শাসনভার থাকা উচিত নহে। কিন্তু আমি সেরূপ কোনও তথ্যই এপর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। তথাপি এই অভিযোগে—ভারতবাসীর অবনতির উপন্যাসেই, বিলাতের ও ভারতের অনেকে যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদিগের এই অভিযোগের পুনঃপুনঃ উত্থাপনে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাঁহাদিগের এই বিশ্বাস, প্রকৃত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ন্যায়শাস্ত্রানুগত শুষ্ক তর্কের উপর তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত।

ইহা অপেক্ষা আমাদিগের দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? রাজপুরুষদিগের এইরূপ বচন-চাতুরীতে বিলাতের সহৃদয় ইংরাজ-সমাজ ভারতবাসী প্রজার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারেন নাই। ভারতের ভূতপূর্ব্ব অণ্ডার সেক্রেটারি শ্যার লুই ম্যালেট ভারতবর্ষের এই সঙ্কটময় অবস্থার কথা স্বীকার করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন,—

I have never concealed my opinion as to the extreme gravity of our financial position, and I believe that nothing but the fact that the present system (in India) is almost secure from all independent and intelligent criticism has enabled it so long to survive.

ফলতঃ যে ইংরাজ স্বদেশীয় কৃষকের দাসত্ব ও জগতের সমস্ত ক্রীতদাসের দাসত্ব-মোচন করিয়া অতুলনীয় গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন, সেই ইংরাজের দৃষ্টি এই বিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট না হইলে এদেশের দীনহীন প্রজার প্রতীকার-লাভ করিবার কোনও আশা নাই।

রেল ও খাল।

মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে? কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসদ্ভাব নাই? রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবর সকল ত নিখাত হইয়াছে? কৃষিকার্য্য ত বৃষ্টি-নিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে?"

সেকালের হিন্দু-নরপতিগণ কৃষি-কার্য্যকে "বৃষ্টি-নিরপেক্ষ" করিবার জন্য "রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবরাদি খনন" করাইতেন। এই কারণে দৈব-দুর্ব্বিপাকে অনাবৃষ্টির সংঘটন হইলেও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইত না, বর্ত্তমান কালের ন্যায় লক্ষ লক্ষ প্রজা জঠরযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইত না। কিন্তু ইংরাজ কৃষিজীবী প্রজার নিকট উচ্চহারে কর-গ্রহণ করিয়াও কৃষিকার্য্যকে "বৃষ্টি-নিরপেক্ষ" করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। এ দেশের লোকে যে সকল ঘটনাকে দৈবধীন বলিয়া মনে করে, ইংরাজ বিজ্ঞান-বলে সে সকল ব্যাপারকে আপনাদিগের আয়ত্ত করিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভিক্ষ-নিবারণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই তাঁহাদিগের মুখে দৈবশক্তির অনতিক্রমণীয়তার কথা শুনিতে পাওয়া যায়! ভারতবাসীর বিশ্বাস, তড়াগ বা সরোবরাদির খনন দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের (Irrigation) সুব্যবস্থা করিলে অনাবৃষ্টির কু-ফল বহু পরিমাণে হ্রাস পায়। তাই সেকালের হিন্দু নরপতিগণ নারদীয় নীতির অনুসরণ করিয়া জল-পূর্ত্তের ব্যবস্থা-বিধানে সমধিক যত্ন প্রকাশ করিতেন। লর্ড ওয়েলেসলি মহোদয়ের আদেশে ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকানন দক্ষিণ ভারতের কৃষিকার্য্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, শত বৎসর পূর্ব্বেও দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য-সমূহে জল-পূর্ত্তের অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল। তাঁহার গ্রন্থে তদানীন্তন সামান্য-ভূসম্পত্তিশালী দেশীয় রাজন্যবর্গের নিখাত ৪ক্রোশ দীর্ঘ ও ১৷৷০ক্রোশপ্রস্থ

তড়াগ-সমূহের ও বহুসংখ্যক জল-প্রণালীর বর্ণনা পাঠ করিলে এই সভ্যতা-দীপ্ত বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদিগের হৃদয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।

ইংরাজ বলেন, দুর্ভিক্ষের কুফল-নিবারণের জন্য খাল-পুষ্করিণী প্রভৃতির খননে অর্থব্যয় যে কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শস্য-শ্যামল দেশ হইতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে শস্য লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বত্র রেলপথের বিস্তার বিশেষ আবশ্যক। ভারতবাসী বলে, কৃষি-ক্ষেত্রে সেচনের জন্য প্রচুর জলের ব্যবস্থা করিতে পারিলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে; ইংরাজ বলেন,"সে কথা সত্য হইলেও দুর্ভিক্ষ-দমন-কার্য্যে রেলপথের আবশ্যকতা অত্যন্ত অধিক। পরন্তু রেলে লোকের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমনের ও বাণিজ্য-বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। সকল সভ্যদেশেই রেলপথের বিস্তার দ্বারা রাজকোষে ধনসঞ্চয় ও প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব রেলপথ বিস্তারে বিশেষভাবে মনোযোগ করাই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" এইরূপ যুক্তিবাদের অবতারণায় দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জের সিদ্ধান্ত সভ্যতাভিমানী প্রবল রাজার সিদ্ধান্ত-স্রোতে ভাসিয়া গেল।

রাজপুরুষদিগের মতানুসারে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস করিবার জন্য ১৮৪৯ খ্রীঃ হইতে ১৯০৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত দরিদ্র ভারতবাসীর ৩৭৫ কোটী ১৯॥০ লক্ষ টাকা বা ২৫ কোটি পাউণ্ড ব্যয়ে ন্যূনাধিক ২৯ হাজার মাইল দীর্ঘ রেল পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১৯০৬।৭খ্রীষ্টাব্দে ১৫ কোটী টাকা ব্যয়ে আরও ২৭৬৬মাইল রেলপথ নির্ম্মাণের আদেশ হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, প্রজার এই পর্ব্বত-প্রমাণ অর্থরাশি ব্যয় করিয়া ৫০ বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট এক পয়সাও লাভ করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে এই কার্য্যে১৯০০ সাল পর্য্যন্ত রাজকোষ হইতে প্রায় ৬০ কোটী টাকা লোকসান দিতে হইয়াছে, এবং প্রায় ১,০২,৫০,০০,০০০ টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে। তবে এই রেলপথের জন্য ৬৩০০জন শ্বেতাঙ্গ প্রভূতবেতন-গ্রহণের সুবিধা পাইতেছে এবং বিলাতের লৌহ-ব্যবসায়ীদিগেরও মাল যথেষ্ট পরিমাণে এদেশে বিক্রীত হইতেছে, একথা সত্য। শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী দেখাইয়াছেন, ভারতীয় রেলপথের জন্য যে টাকা ব্যয়িত হয়, তাহার শতকরা ৩১৸০ ভাগ লৌহোপকরণ ক্রয়ের জন্য বিলাতী কর্ম্মকারদিগের হস্তগত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এদেশে যে ২৩টি বৈদেশিক রেল

কোম্পানি আছে, তাহাদের ডিরেক্টার মহাশয়দিগের আফিস-সমূহ বিলাতে অবস্থিত বলিয়া ঐ সকল আফিসের জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা বিলাতের লোকেই পাইয়া থাকেন। রেল-নির্ম্মাণের ব্যয়-সংগ্রহের জন্য অধিকাংশ ঋণ বিলাতেই করা হইয়াছে। তাহার সুদ বিলাতেই যায়। ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের নিকট হইতে অতি সামান্য অর্থ (ন্যূনাধিক ছয় কোটী টাকা) ঋণস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। বৈদেশিক কোম্পানিরও অনেক টাকা রেলের কারবারে খাটিতেছে। সুতরাং সমস্ত লভ্যাংশ তাঁহারাই পাইতেছেন।

ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ২৩টি বৈদেশিক রেল কোম্পানি আছে। ইহাদিগের নির্ম্মিত রেলপথ ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট ৫টি রেলপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন; দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যেও ৫টি লৌহ-পথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে রেল বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্টের আগ্রহ এরূপ অধিক যে, পূর্ব্বোক্ত বৈদেশিক কোম্পানি-সমূহের মধ্যে কতকগুলিকে উৎসাহ দান করিবার জন্য তাঁহারা এ দেশে রেলের কার্য্যে ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতির পূরণ করিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার (guarantee) করিয়াছেন। কতকগুলি কোম্পানিকে অন্যরূপেও অর্থসাহায্য করিয়া ভারতে রেল খুলিবার জন্য তাঁহারা উৎসাহ দিয়াছেন। জি, আই, পি; বি, বি, সি, আই; ও মান্দ্রাজ রেলের অধিকারী কোম্পানী-সমূহের সহিত গবর্ণমেণ্ট কিরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন, শুনিবেন?

In the contract renewed with the three railways......it was agreed that the companies should receive interest at the guaranteed rate of five per cent, and half the surplus profits, no account being taken of deficits; that remittances to England should be converted at the rate of 1s, 10 d the rupee; and that calculations should be half-yearly.—Miss Ethel Farady M. A.—"*Paper on Indian Guaranteed Railways*"—1900.

বিলাতী বাজারে শতকরা ২॥০ বা ৩৲ টাকা সুদে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট এই তিনটি কোম্পানীর সহিত শতকরা ৫৲ টাকা সুদ পোষাইয়া দিবার চুক্তি করিয়াছেন। শতকরা ৫৲ টাকার উপর যে লাভ হইবে, এই চুক্তি-পত্র অনুসারে কোম্পানী তাহার অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যদি কোন কারণে লোকসান হয়, কোম্পানী তাহার অংশভাগী হইবেন না! বিনিময়ের দর যাহাই হউক, কোম্পানির প্রাপ্য টাকা ২২ পেন্স দরে গবর্ণমেণ্টকে

প্রদান করিতে হইবে। এখন বিনিময়ের যে দর, তাহাতে সাধারণতঃ ১৬ পেন্সে (আনায়) এক টাকা ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোম্পানি-ত্রয়কে ২২ পেন্স না দিলে, তাঁহাদিগের এক টাকা পরি-শোধিত হয় না! কাজেই গবর্ণমেণ্টকে প্রতি টাকায় ছয় আনা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার উপর আবার ছয় মাস অন্তর হিসাব নিকাশের চুক্তি থাকাতেও গবর্ণমেণ্টকে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। প্রথম ছয় মাসে যদি লোকসান হয়, অর্থাৎ শতকরা ৫৲ টাকার অপেক্ষা কম লাভ থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষতি গবর্ণমেণ্ট পূরণ করিয়া দেন; কিন্তু শেষ ছয় মাসে যদি লাভ হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহার অর্দ্ধাংশমাত্র প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ প্রথম ছয় মাসে শতকরা ৪ টাকা মাত্র লাভ হইলে গবর্ণমেণ্টকে ১ টাকা ক্ষতি-পূরণ দিয়া গড়ে কোম্পানির ৫ টাকা পোষাইয়া দিতে হয়; কিন্তু বৎসরের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৬ টাকা লাভ হইলে ভারত গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত লাভের অর্দ্ধাংশ বা আট আনা-মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি বৎসরান্তে হিসাব নিকাশের চুক্তি থাকত, তাহা হইলে প্রথম ছয় মাসের ১ টাকা ক্ষতি শেষ ছয় মাসের অতিরিক্ত লভ্য ১ টাকায় অনায়াসে শোধ করিয়া দিবার সুবিধা পাওয়া যাইত। কিন্তু ছয় মাস অন্তর হিসাব নিকাশের চুক্তি থাকায় গবর্ণ-মেণ্টকে প্রায় প্রতি বৎসরই বিষম ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। ফলঃকথা, ভারতীয় প্রজার প্রতিনিধি-স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রেলপথের বিস্তার-কামনায় ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈদৃশ অনিষ্টকর চুক্তি-সূত্রে বদ্ধ হইয়া নিত্য অনশন-পীড়িত দরিদ্র প্রজার বহুকষ্ট-প্রদত্ত রাজস্ব হইতে বার্ষিক প্রায় ১,৩০,০০,০০০ টাকা এই তিনটি বিলাতী রেল কোম্পানীকে প্রদান করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, আউধ ও রোহিলখণ্ড রেলের জন্য এইরূপে আমা-দিগের হৃদয়ের শোণিত তুল্য অর্থ হইতে ২৩,২৩,২৮৭ টাকা ও সাদারণ ইণ্ডিয়ান রেলের জন্য ১,৯৪,৮৫,৯৯০ টাকা ক্ষতিপূরণার্থ দান করিতে হইয়াছে। এইরূপে একাল পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৪ কোটি পাউণ্ড বা ৬০কোটি টাকা রেলপথ-নির্ম্মাণ উপলক্ষে আমাদিগের রাজকোষ হইতে লোকসান দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রেলের জন্য যে বিদেশী মূল ধন এদেশে খাটি-তেছে, তাহার সুদ আমাদিগকে বার্ষিক ৯ কোটি টাকা দিতে হয়!

বর্ব্বরের ধনক্ষয় আর কিরূপে হইতে পারে? শ্বেতাঙ্গ প্রজার টাকা

হইলে কি কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ ভাবে উহার অপব্যয় করিতে সাহস পাইতেন? রেল বিভাগের উচ্চপদসমূহে দেশীয়দিগের নিয়োগ হইলেও বরং কিছু ব্যয়-সংক্ষেপ ঘটিতে পারিত, একদিকে ক্ষতি হইলেও অন্য দিকে ভারতবাসী কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিত। কিন্তু অতিরিক্ত বেতন-দানে ৬,২৯৩ জন শ্বেতাঙ্গের এবং ৮,৭৬৫ জন ফিরিঙ্গীর দারিদ্র্য দূর করিবার লোভ-সংবরণেও কর্ত্তৃপক্ষ অসমর্থ। এরূপ অবস্থায় রেলের ব্যবসায়ে ক্ষতি না হওয়াই আশ্চর্য্য। সত্য বটে, অধুনা প্রায় ৪০,০৬,৮০৬ জন দেশীয় ব্যক্তি রেলবিভাগে কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে; কিন্তু কত যান-ব্যবসায়ী, নৌ-জীবী, শকট-চালক ও নৌ-শকটাদি-নির্ম্মাণকারী শিল্পীর জীবিকা লোপ পাইয়াছে, তাহাও সেই সঙ্গে বিবেচ্য।

ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশের পক্ষে কত মাইল রেল পথের নিতান্ত প্রয়োজন? অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে ন্যূনাধিক ছয় হাজার মাইল রেল পথ ভারতবর্ষের পক্ষে যথেষ্ট। তাই Moral and Material Progress and Condition of British India নামক সরকারি বিবরণীর লেখক প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে দেখিয়া ১৮৭৩ সালে লিখিয়াছিলেন,—

Railways are now almost completed, so that with the cessation of heavy outlay on construction, the financial position may be expected to improve.

অর্থাৎ ভারতে প্রয়োজনীয় রেলপথ সমূহের নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে, সুতরাং আর রেল নির্ম্মাণে অধিক অর্থ ব্যয়িত হইবে না; ফলে ভারতীয় রাজকোষের অবস্থার কিছু উন্নতি সাধিত হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার স্যার আর্থার কটন কর্ত্তৃপক্ষকে রেলপথ নির্ম্মাণকার্য্য একেবারে বন্ধ করিতে উপদেশ দেন। ইহার দুই বৎসর পরে যে দুর্ভিক্ষ কমিশন বসে, তাহার সদস্যেরাও এক বাক্যে বলেন, দুর্ভিক্ষ-দমনের জন্য এখন খাল-খননকার্য্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য দান করা উচিত। কিন্তু রাজপুরুষেরা এসকল উপদেশবাক্যে কর্ণপাত করিতে পারিলেন না। কারণ, বিলাতের লৌহ-ব্যবসায়ীরা ভারতে যাহাতে রেলের বিস্তার অধিক হয়, তাহার জন্য নানারূপ বৈধ ও অবৈধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ পার্লামেণ্ট মহাসভায় পুন পুনঃ প্রশ্নাদি করিয়া আপনাদের সুবিধার জন্য ভারতবাসীর অশেষ

ক্ষতিকর রেলপথের বিস্তার করাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে রেলপথ নির্ম্মাণ কখনই লাভ-জনক ব্যাপার নহে বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে গ্যারান্টি প্রথার সৃষ্টি করিতে হইল। ফলে বিলাতের কোম্পানিরা ভারতীয় রাজ-কোষ হইতে ক্ষতি-পূরণের টাকা পাইবার আশ্বাস পাইয়া এদেশে রেলপথ নির্ম্মাণ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে পার্লামেণ্টের আদেশ পালিত হইল বটে, কিন্তু ভারত-বাসীর ক্ষতির একশেষ হইল। গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করায় রেল কোম্পানি-সমূহ অর্থের যথেচ্ছা অপব্যয় করিতে লাগিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব দি রাইট অনারেবল এন, ম্যাসী মহোদয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের অনুসন্ধান সমিতির সমক্ষে সাক্ষ্য-দান কালে বলিয়াছিলেন,—

The East India company cost far more, if not twice as much as it ought to have cost. Enormous sums were lavished and the contractors had no motive whatever for economy. All the money came from the English capitalist and so long as he was gauranteed 5 p. c, on the revenues of India, it was immaterial to him whether the fund that he lent were *thrown into the Hooghly* or converted into brick and mortar. The result was these large sums were expended and that the East India Railway cost I think (I speak without Book) about £30,000 a mile...It seems to me they are the most extravagant works that were ever undertaken.

আরও অনেক উচ্চপদস্থ ও অভিজ্ঞ ইংরাজ রেল কোম্পানির অপব্যয় সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্যারাণ্টি প্রথায় যাত্রীদিগের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যবসায়ীদিগের সুবিধা অসুবিধার প্রতিও রেল কোম্পানি সমূহের আদৌ দৃষ্টি থাকে না। কারণ, তাঁহারা জানেন যে, রেলপথে ভ্রমণকারীর ও পণ্য-দ্রব্যের প্রেরণকারী ব্যবসায়ীদিগের সন্তোষ-বিধান করিতে না পারিলেও তাঁহাদের কোনও ক্ষতি হইবে না, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সমস্ত ক্ষতিরই পূরণ করিয়া দিবেন। একথাও বিলাতের অনুসন্ধান সমিতির নিকট একাধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, তাহাতেও আমাদিগের ভাগ্যে বিশেষ কোনও সুফল লাভ হয় নাই। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার মানসে ভারত-গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে অর্থব্যয় করিয়া বা বিদেশ হইতে টাকা ধার করিয়া স্বয়ং রেলপথ নির্ম্মাণ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু

শ্বেতাঙ্গ-পোষণের ব্যয়-বাহুল্য-জনিত অর্থাভাবে এবং দুর্ভিক্ষ ও সীমান্ত-সমর প্রভৃতি কারণে সে চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এদিকে বিলাতের লৌহ-ব্যবসায়ীরাও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাঁহাদিগের পীড়াপীড়িতে আবার রেল বিস্তার কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে মনোযোগী হইতে হইয়াছে। বিলাতী কোম্পানীরাও ভারত গবর্ণমেণ্টের অবস্থা বুঝিয়া গ্যারাণ্টি না পাইলে রেল খুলিবার ভার লইবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। কাজেই অসামর্থ্য-সত্ত্বেও আমাদিগকে বিলাতী লৌহ-ব্যবসায়ীদিগের সুবিধার জন্য রেল-বিস্তার কার্য্যে শোণিতসম অর্থ দান করিতে হইতেছে।

জাপানে রেল পথের বিস্তার অনেক সভ্যদেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক। তথায় জন-সংখ্যা হিসাবে প্রতি ১২,৭০০ জনের জন্য এক মাইল করিয়া রেল পথ আছে, কিন্তু আমাদের মত যাহাদের বার্ষিক আয় ১৮।১৯ টাকার অধিক নহে, এবং যাহাদিগকে প্রায়ই নিত্য অর্দ্ধাশনে কাল হরণ করিতে হয়, তাহাদিগের ভ্রমণ-সুখের জন্য প্রতি ৯,১৭১ জনে এক মাইল করিয়া রেল পথ নির্ম্মিত হওয়া কখনই শুভ লক্ষণ নহে। এত বিলাসিতা আমাদের মত দরিদ্র জাতির পক্ষে শোভা পায় না। তথাপি ১৮৭৩ সালের সরকারি রিপোর্টে "প্রয়োজনীয় রেলপথ সমূহের নির্ম্মাণ-কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে" বলিয়া মত প্রকাশিত হইবার পর বিগত ৩২ বৎসরে ন্যূনাধিক ২৪ হাজার মাইল বা চতুর্গুণ নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে!

ভারতীয় রেল-সমূহে গত ১৯০৪ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ২২,৭১,০০,০০০ টিকিট বিক্রয় হইয়াছে। ঐ সালে ইংলণ্ডের মত ক্ষুদ্রদেশে ১২০ কোটি টিকিট বিক্রীত হইয়াছিল! ভারতবর্ষে বহু ক্ষতি স্বীকার পূর্ব্বক রেল-পথ নির্ম্মাণ করায় কত অল্প লোকের ভ্রমণ করিবার সুবিধা হইয়াছে, ভারতবাসী রেলপথের আবশ্যকতা কতদূর অনুভব করে, তাহা এই দুই অঙ্কে দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। তাহার পর বাণিজ্য বিস্তারের কথা। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমাদিগের বিশেষ লাভ হয় নাই। রেলপথের বিস্তারের সহিত দূরবর্ত্তী পল্লিগ্রামেও বিলাতী দ্রব্যের কাটতি বাড়িয়াছে। মূর্খ পল্লি-বাসীও বিলাতী বিলাস-দ্রব্যের ক্ষণিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া দুর্ল্লভ শস্য-বিক্রয়-পূর্ব্বক উহা ক্রয় করিতেছে—রেলপথের সাহায্যে সেই বিক্রীত শস্য অচিরাৎ সমুদ্র-তীরে নীত হইয়া দূর

বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। রেলের জন্য দুর্ভিক্ষের সময়েও ভারতবর্ষ হইতে কত হন্দর শস্য বিদেশে যায়, তাহা নিম্নলিখিত রপ্তানির তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সাল	তণ্ডুল	গোধূম	অন্যান্য শস্য।
১৮৯৬।৭	২,৭৮,২৭,২৬৯	১৯,১০,৬২৬	২৬,৯৬,২১৭
১৮৯৭।৮	২,৬৩,৫৯,৯৮৮	২৩,৯২,৬০৭	২২,৩২,৬৯৪
১৮৯৮।৯	৩,৭৩,৯৭,৪০৪	১৯,৫২,৪৯৬	৪৫,১৩,২০৮

অন্যান্য দেশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা বুঝিবা-মাত্র রাজপুরুষেরা খাদ্য শস্যের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেন। অবাধ বাণিজ্য-নীতির দোহাই দিয়া ইংরাজ তাহাও করিতে চাহেন না। এতদ্ভিন্ন রেলের কল্যাণে পল্লিগ্রামে বিলাসদ্রব্য প্রবেশ-লাভ করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে, দেশীয় শিল্পের প্রতি পল্লীবাসীর অনাদর বৃদ্ধি পাইতেছে। বিদেশী শিল্পসামগ্রীর আমদানির কথা অধিক আর কি বলিব, বিলাতী ঔষধের কাটতি দেশে কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪৩,৫৭,১৪০ টাকার বিলাতী ঔষধের আমদানী হইয়াছিল, গত ১৯০২-৩ সালে ৬৪,৭৮,৭৪৫ টাকার বিদেশী ঔষধ ভারতে আসিয়াছে। তথাপি আমাদের গবর্ণমেণ্টের রেলপথ বিস্তারে বিরাম নাই।

কবি গাহিয়াছেন,—"ভারতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ"।

সেকালে রাক্ষস-রাজ রাবণ পুষ্পক রথের সাহায্যে অবলীলা-ক্রমে লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাদেবীকে হরণ করিয়া সমুদ্রপারে স্বীয় রাজধানী লঙ্কায় লইয়া গিয়াছিল, ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া লঙ্কার সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধন করিয়াছিল। একালে ইংরাজ বাষ্পীয় শকটরূপী পুষ্পক-রথের সাহায্যে ভারতের যাবতীয় শস্য স্বদেশে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, দেশীয় শিল্পের বিনাশ-সাধন-পূর্ব্বক বৈদেশিক পণ্যদ্রব্যে ভারতবর্ষ পূর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন। ফলে সুবর্ণ-কিরীটিনী লঙ্কার ন্যায় ইংলণ্ডের শ্রীসম্পদ্ দিন দিন বাড়িতেছে, ভারত দিন দিন অন্নের কাঙ্গাল হইয়া পড়িতেছে। খাল প্রভৃতি কাটিয়া দেশকে শস্যশ্যামল এবং উচ্চ শিক্ষার প্রসার দ্বারা দেশ-বাসীর জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধি করিবার দিকে ইংরাজের তাদৃশ লক্ষ্য নাই। কিন্তু ভারতে রেলপথ বিস্তারে তাঁহাদিগের বিষম আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নিউ ইংল্যাণ্ড ম্যাগাজিন পত্রের ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর

সংখ্যায় মার্কিন পাদ্রি রেভারেণ্ড জে, টি, স্যাণ্ডারল্যাণ্ড মহোদয় ভারতীয় দুর্ভিক্ষের কারণাবলীর উল্লেখ প্রসঙ্গে এই কথাই লিখিয়াছেন,—

Whatever lack of money there may be for education, or for sanitary improvements, or for irrigation, or for other things which the people of India so earnestly desire and pray for, the government always seems to have plenty for railways. Why? Because the railways of India help the English people to wealth............The railways have broken up many of the old industries of India, and thus have brought hardships and suffering to millions of people. ; but they enrich the ruling nation, and they give her a firmer military grip upon her valuable dependency and so money can always be found for them, whatever else suffers.

রেল-বিস্তারের সহিত দেশে বাণিজ্য-বিস্তার হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে বিদেশীয় বণিক্‌কুলেরই ধনবৃদ্ধি হইয়াছে। কথাটা একটু স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে হইলে রেল-বিস্তার ও বাণিজ্য-বিস্তার বিষয়ক অঙ্কে দৃষ্টিপাত আবশ্যক। প্রথমতঃ রেলপথ কিরূপ বাড়িয়াছে, দেখুন,—

১৮৭৩	খ্রীঃ	রেলপথ	৫,৬৯৭	মাইল	ছিল।
১৮৮০	খ্রীঃ	,,	৮,৯৯৬	,,	হইল।
১৮৮৫	খ্রীঃ	,,	১২,৩৮৬	,,	,,
১৮৯০	খ্রীঃ	,,	১৬,৯৮৪	,,	,,
১৮৯৫	খ্রীঃ	,,	১৯,৬৭১	,,	,,
১৮৯৯	খ্রীঃ	,,	২৩,৭৫৫	,,	,,
১৯০৬	খ্রীঃ	,,	২৯,০০০	,,	,,

এখন আমদানী রপ্তানির অঙ্কে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন,—

সাল	আমদানী		রপ্তানি
১৮৫৪।৫৫—	১৪,৭৭,০৯,২৮৯	টাকা	২০,১৯,৪২,৫৮০
১৮৫৯।৬০—	৪০,৬২,২১,০৩০	,,	২৮,৮৮,৯২,১০০
১৮৬৪।৬৫—	৪৯,৫১,৪২,৭৫০	,,	৬৯,৪৭,১৬,০৬০
১৮৬৯।৭০—	৪৬,৮৮,২৩,২৭০	,,	৫৩,৫১,৩৭,২৮৪
১৮৭৪।৭৫—	৪৪,৩৬,৩১,৫৯৬	,,	৫৭,৯৮,৪৫,৪৯৫
২৮৭৯।৮০—	৫২,৮২,১৩,৯৮০	,,	৬৯,২৪,৭৪,১০৬
১৮৮৪।৮৫—	৬৯,৫৯,১২,৬৯৬	,,	৮৫,২২,৫৯,২২১
১৮৮৯।৯০—	৮৬,৬৫,৬৯,৮৯৯	,,	১০৫,৩৬,৬৭,২০৮
১৮৯৪।৯৫—	৮৬,১১,০১,৯৯৯	,,	১১৭,১৩,৯৮,৪৯৯

সাল	আমদানী		রপ্তানি
১৯০৩।০৪—	১৩১,১১,৮৩,৭৯৫	টাকা	১৬৮,৫৬,১০,৪১০
১৯০৫।০৬—	১৪৩,৭৪,৬৩,৪৪৯	,,	১৭৭,৪১,৩০,৮১৬

বর্ত্তমান বাণিজ্য-বিস্তারে ক্ষতি।

রাজপুরুষেরা এই সকল অঙ্কের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, "রেলের জন্য দেশের বাণিজ্য এইরূপ দিন দিন বিস্তার লাভ করিতেছে ও তাহাতে দেশের ধনবৃদ্ধি পাইতেছে।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এই বাণিজ্য-বিস্তারে আমাদিগের ধনবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে ধনক্ষয়ই ঘটিতেছে। রেলের এরূপ অস্বাভাবিক বিস্তার না ঘটিলে, আমাদিগের দেশের ধনক্ষয়ের স্রোত ঈদৃশ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত কি না সন্দেহ।

বৈদেশিক মালের আমদানি বৃদ্ধিতে যে আমাদের দেশের শিল্পিগণের অন্নে ধূলি নিক্ষিপ্ত হইতেছে, একথা বিস্তারিত ভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে, রপ্তানির ব্যাপারে আমাদের ঘরে টাকা আসিবার কথা। আমরা দেশের জলজ, খনিজ ও কৃষিজ পণ্য বিদেশে পাঠাইয়া বৎসরে প্রায় পৌনে দুইশত কোটি টাকা প্রাপ্ত হইতেছি, তথাপি আমাদের অর্থকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ দূর হইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে, এই রপ্তানির আয়ের অল্পাংশই প্রকৃত পক্ষে আমাদের হস্তগত হইতেছে। রপ্তানির ব্যবসায়ে যদি ভারতবাসীর মূলধন খাটিত, যদি ভারতীয় শিল্পিগণের কৌশল-প্রসূত দ্রব্যাদি এইরূপ ভূরিপরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হইত, তাহা হইলে আমরা প্রকৃত ধনশালী হইতে পারিতাম। কিন্তু কার্য্য-ক্ষেত্রে তাহা হয় না। প্রথমতঃ দেশের দশ কোটি লোকের নিরন্তর অন্নাভাব-সত্ত্বেও বিদেশীয়েরা অবাধ বাণিজ্যের মাহাত্ম্যে এদেশের লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। দেশে দিন দিন শস্যাদি দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। কৃষিজপণ্যের মধ্যে চা কাফির রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু তাহাতে বিদেশীয়দিগের মূলধন খাটায় লভ্যাংশ তাঁহারাই পাইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ জলজ ও খনিজ পণ্যের উৎপাদনেও বিদেশীয় মহাজনদিগের টাকা খাটিতেছে। দেশের লোকে কেবল সামান্য মজুরী পাইতেছে, ব্যবসায়ের সমস্ত লভ্যাংশ বৈদেশিক বণিকেরা লইয়া যাইতেছে। সুবর্ণ, হীরক, লৌহ, কয়লা, অভ্র প্রভৃতি খনিজ ও

শঙ্খ-মুক্তাদি জলজ পণ্য রাশি রাশি বিদেশে প্রেরিত হওয়ায় রপ্তানির অঙ্ক অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারত-মাতার গুপ্ত ধন-ভাণ্ডারের সমস্ত রত্নরাশি বিদেশীয়েরা নিঃশেষ-পূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে—আমাদের রত্নগর্ভা বসুন্ধরা ক্রমেই অন্তঃসার-শূন্যা হইয়া পড়িতেছেন। ইহাতে দেশের ভাবী অবস্থা কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে, তাহা ভাবিলেও হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। দেশীয় খনিজ ও জলজ পণ্যের ব্যবসায়ে যদি আমাদের দেশের মূলধন নিয়োজিত হইতে পারিত, তাহা হইলে দেশের বাণিজ্য-বিস্তারের সহিত নিঃসন্দেহ আমাদিগের ধন বৃদ্ধি পাইত।

যে সকল জাতি ধনৈশ্বর্য্যে উত্তরোত্তর মহীয়ান্ হইতেছে, এই প্রণালীতেই তাহাদের ধন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংলণ্ডের খনিজ পণ্য ও কল-কারখানা হইতে প্রসূত পণ্যাদি দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া বহু দূরবর্ত্তী ভূভাগ হইতে ধন-রাশি সংগ্রহ-পূর্ব্বক স্বদেশে আনয়ন করে। ইহাতে ইংরাজের উৎপাদিত পণ্যাদির কেবল পারিশ্রমিক যে ইংরাজেরা ভোগ করিতেছেন, আর তাহার লভ্যাংশ অপরে শোষণ করিয়া লইতেছে, এমন নহে। এইজন্যই রপ্তানির ব্যবসায়ে ইংলণ্ডের শ্রীসম্পদ্-ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকাতেও তাহাই ঘটিতেছে। আমেরিকা আপনার গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার আপনার হস্তেই উদ্‌ঘাটিত করিতেছে। আপনার বিপুল কৃষিজ ও খনিজ পণ্যাদি আপনাদের ধনে, আপনারা পরিশ্রম করিয়াই উৎপাদন করিতেছে। সুতরাং মার্কিণের পণ্য-সামগ্রীও দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিভিন্ন দেশের ধন আপনার জাতীয় ভাণ্ডারে টানিয়া আনিতেছে। প্রত্যেক দেশেই এইরূপ নিয়মে ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদের যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই সকল অভিনব পণ্যাদির উৎপত্তি ও নূতন নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টিতে আমাদেরও জাতীয় ধনভাণ্ডার উত্তরোত্তর পূর্ণ ও স্ফীত হইয়া উঠিত।

কিন্তু এই সকল ব্যবসায়ের দ্বারা ভারতের ধনবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, তাহার দুর্ব্বিষহ ঋণ-ভারই বৃদ্ধি পাইতেছে। দারিদ্র্য-বৃদ্ধি হেতু আমাদের মূলধন নাই, ইহা সত্য। কিন্তু আমাদের রাজা যদি মুসলমানের ন্যায় এদেশে আসিয়া বসতি করিতেন, অথবা ইংরাজ বিদেশে থাকিয়াও যদি বণিক না হইতেন, ভারত-শাসনে ভারতবাসীর স্বার্থ ও সুবিধাই যদি তাঁহাদের একমাত্র অথবা প্রধান চিন্তার বিষয় হইত, তাহা হইলে বিদেশ

হইতে মূলধন ঋণ করিয়া আনিয়াও তাহার দ্বারা অন্য প্রণালীতে আমাদের দেশের ধনবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন সম্ভবপর হইত। ইংলণ্ডের খাতিরে পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতেই ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট স্বল্প সুদে যথেষ্ট টাকা ধার করিতে পারিতেন। জাপান তাহাই করিতেছে, অন্যান্য অনেক জাতিও এইরূপ করিতেছে। আমরাও যদি সেইরূপে বিদেশ হইতে টাকা ধার করিয়া আমাদের এই সকল জাতীয় ধনাগমের পন্থা, আপনারা উন্মুক্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই রপ্তানির ব্যবসায়ের দ্বারা আমাদের দেশের ধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত।

ভারতের বাণিজ্যে আমদানি ও রপ্তানির মিল নাই। বহুবৎসরাবধি আমাদের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশী হইতেছে। গত পাঁচ বৎসরের আমদানি ও রপ্তানির হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই ৫ বৎসরের মধ্যে আমরা সর্ব্বশুদ্ধ যত মূল্যের পণ্য আমদানি করিয়াছি, তদপেক্ষা ন্যূনাধিক ১৫০ কোটি টাকা মূল্যের অধিক পণ্য রপ্তানি করিয়াছি। যদি ভারতের বাণিজ্য পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে এই ৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের হয় ১৫০ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধিত হইত, নতুবা ঐ পরিমাণ টাকা অপর দেশীয়দিগকে ধার দিয়া আমরা বৎসর বৎসর তাহার সুদ গুণিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের এতদুভয়ের কিছুই হইতেছে না। আমাদের ঋণও শোধ যাইতেছে না, অপরের নিকট আমরা উত্তমর্ণ হইয়াও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমেরিকাতে রপ্তানি পণ্যের বৃদ্ধির ফলে তাহাই ঘটিয়াছে। এক সময়ে আমেরিকা ইউরোপের নিকট ঋণী ছিল। সেই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমেরিকা প্রতিবৎসর কিয়ৎপরিমাণে উদ্বৃত্তপণ্য বিদেশে রপ্তানি করিত। ফলে এখন তাহার ঋণ প্রায় শোধ হইয়া গিয়াছে। এখন আমেরিকা অপরকে টাকা ধার দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমাদের এই উদ্বৃত্ত পণ্য যায় কোথায়? ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬৭ বৎসর কাল মধ্যে অনূ্যন ৭০০,০০,০০,০০০ টাকা মূল্যের উদ্বৃত্ত পণ্য ভারত হইতে বিদেশে গিয়াছে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে ভারত এক কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হয় নাই। সমস্ত উদ্বৃত্ত পণ্যই আমাদের হোমচার্জ্জ ও সিবিলিয়ানদিগের বেতন-দানে নিঃশেষ হইয়া

যাইতেছে। ইংরাজ অনুগ্রহ করিয়া এই দেশ শাসন করিতেছেন বলিয়া আমাদিগকে তাঁহাদিগের সেলামী-স্বরূপ প্রতি বৎসর ২৫ কোটি টাকা দান করিতে হয়। সেইরূপ বড় বড় শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদিগকে বেতনের জন্যও ২০ কোটি টাকা এদেশের রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। মোগল আমলে রাজার সেলামীর ও রাজপুরুষদিগের বেতনের টাকা এদেশেই থাকিত ও ব্যয়িত হইত। কিন্তু এখন সব টাকাই বিলাত চলিয়া যায়। প্রতিবৎসর এই ৪৫ কোটি টাকা এদেশের প্রজাদিগকে ঘরের ধান গম বিক্রয় করিয়া রাজকোষে জমা দিতে হয়। প্রজার বিক্রীত ধান্যাদি শস্য রেলি ব্রাদার্স ও অন্যান্য বিলাতী ব্যবসায়ীরা কিনিয়া লইয়া রেলের সাহায্যে অনায়াসে বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকে। এই ধান্য-গোধূমের অতিরিক্ত রপ্তানির জন্যই আমাদের রপ্তানি পণ্যের অঙ্ক আমদানির অঙ্ক অপেক্ষা অধিক হয়। কিন্তু এই অতিরিক্ত রপ্তানির ফলে আমরা যে অর্থ লাভ করি, তাহা আমাদের হাতে থাকিতে পায় না, বিলাতে চলিয়া যায়। এইরূপে প্রতিবর্ষে শ্বেতাঙ্গ-পোষণের জন্য আমরা যত অধিক অর্থ দান করিতে বাধ্য হইতেছি, ততই আমাদিগকে অধিক শস্যাদি বিক্রয় করিতে হইতেছে; ফলে রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে। এই রপ্তানি বাণিজ্যের বৃদ্ধিতেই আমাদিগের ধনক্ষয় ও দারিদ্র্য-বৃদ্ধি পাইতেছে। নব নব পণ্য উৎপাদন করিয়াও ভারতের দারিদ্র্য ঘুচিতেছে না। যাহারা ধনী, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ব্যবসায় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে, প্রধানতঃ ও মুখ্যভাবে, তাহাদেরই ধনাগম হইয়া আসিতেছে। মজুরী করিয়া যাহারা এই সকল ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন করে, তাহাদের ধন-বৃদ্ধি কখনই হয় না। বরং যাহারা খাটিয়া ধনীর ধন-বৃদ্ধি করে, কোন কোন স্থানে তাহারা মজুরী পর্য্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় পায় না।

আমাদের ব্যবসায়ে ইংরাজ ধনী, সুতরাং লভ্যাংশ সমস্তই তাঁহাদের। দেশে রেলপথ-বিস্তারের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের যত বিস্তার হইতেছে, ততই ইংরাজের ধন বাড়িতেছে, আর আমরা ক্রমেই ধনহীন হইতেছি। রেলপথ এদেশের ধন-হরণের একটি প্রধান উপায়-স্বরূপ হইয়াছে।

খালে সুবিধা।

এই সকল কারণে ভারতবাসী দেশে রেলের বিস্তার অপেক্ষা খাল বিলের সমধিক বিস্তার অন্তরের সহিত প্রার্থনা করে। কিন্তু ইংরাজ

সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতে অনিচ্ছুক। রেলপথ বিস্তারের জন্য ইংরাজ প্রজার অন্যূন ৩৭৫ কোটি টাকা অপব্যয়িত করিয়াছেন, কিন্তু কৃষিজীবী প্রজার মঙ্গলার্থ তাঁহারা প্রজারই প্রদত্ত কর হইতে এ পর্য্যন্ত জল-প্রণালী খননের উদ্দেশ্যে পূর্ণ ৪২ কোটি টাকাও ব্যয় করেন নাই। জল-পূর্ত্ত বিভাগে অল্প অর্থব্যয় করিয়াও গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। গত বৎসরের হিসাবে দৃষ্ট হয়, এই বিভাগে ব্যয় বাদে গবর্ণমেণ্টের শতকরা ৮ টাকা লাভ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কৃষিজীবী প্রজার যে উপকার হইয়াছে, উচ্চ বেতনভোগী ইংরাজদিগের যে অর্থকষ্ট দূরীভূত হইয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে যখন এদেশে সর্ব্বপ্রথম পূর্ত্তবিভাগ সৃষ্টির প্রস্তাব উপস্থিত হয়, তখন অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে রেল ও খালে সমান ব্যয় পড়িবে; কিন্তু খালে মাইল প্রতি বার্ষিক ১৯০০ টাকা আয় হইবে, রেলে ১৭৫০ টাকার অধিক হইবে না। দুঃখের বিষয়, তথাপি এই লাভজনক কার্য্যে রাজপুরুষদিগের সমধিক অনুরাগ দৃষ্ট হইল না, প্রজাকে ক্ষতি-স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়া রেলের বিস্তারেই তাঁহারা অসাধারণ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এখনও তাঁহাদিগের সে আগ্রহ হ্রাস পায় নাই।

বৃটিশ ভারতে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ এক্ষণে প্রায় ৭৩ কোটি ৭৫ লক্ষ বিঘা ও কর্ষণ-যোগ্য ভূমির পরিমাণ প্রায় ৩১ কোটি ২ লক্ষ বিঘা। কর্ষিত ভূমির মধ্যে প্রায় ৬ কোটি বিঘা জমি সরকারি জল-পূর্ত্ত বিভাগ হইতে সেচনোপযোগী জল প্রাপ্ত হয়। তদ্ভিন্ন বে-সরকারি খাল-পুষ্করিণী-কূপ প্রভৃতি হইতে ৭ কোটি ৩ লক্ষ বিঘা ভূমি সেচিত হইয়া থাকে (১)। অবশিষ্ট ৬০ কোটি বিঘা ভূমির অধিকাংশেই অল্লাধিক পরিমাণে জল-সেচন করিবার প্রয়োজন আছে। সুতরাং জল-প্রণালীর নির্ম্মাণে ও (যেখানে সে সুবিধা নাই, তথায়) তড়াগ-সরোবরাদির খনন-কার্য্যে যদি গবর্ণমেণ্ট রেল বিভাগের ন্যায় অজস্র অর্থব্যয় করিতেন, তাহা হইলে এদেশের কৃষকেরা পাশ্চাত্য-দেশবাসীদিগের মত বৃষ্টি-নিরপেক্ষ হইয়াও প্রভূত শস্যোৎপাদনে সমর্থ হইত; দেশে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বিশেষ অনুভূত হইত না। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে

(১) দেশীয় রাজ্যে ২ কোটি ৬৭ লক্ষ বিঘা ভূমি কৃত্রিম উপায়ে জলসিক্ত হয়।

দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহার রিপোর্টেও এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে। মহীশূর-রাজ অধিক পরিমাণে খাল-খননে যত্নশীল; এই কারণে তাহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অল্প। যে সকল প্রদেশে খাল বিলের সংখ্যা অধিক, সে সকল প্রদেশে বিগত দুর্ভিক্ষ-সময়ে লোকের কষ্ট অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অতি সামান্যই হইয়াছিল, একথাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট পাঠের পরও জল-পূর্ত্তবিভাগের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সমধিক মনোযোগী হন নাই। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণে ও জলাশয়াদির খননে যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার অঙ্কে দৃষ্টিপাত করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। গবর্ণমেণ্ট ঐ ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে জলপূর্ত্তের জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য তাহার অপেক্ষা সাত গুণ অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন! পৃথিবীর কোনও কৃষি-প্রধান দেশেই জল-পূর্ত্ত বিভাগে রাজার এরূপ নিন্দনীয় ব্যয়-কুণ্ঠা দৃষ্টি-গোচর হয় না।

ভারতীয় জলপূর্ত্ত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল,তাহার রিপোর্টে প্রকাশ যে, ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ গড়ে ৩৭৷৷০ইঞ্চি বারিপাত হইয়া থাকে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, পৃথিবীর যে কোনও দেশে গড়ে ২০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইলেই কৃষিকার্য্যের পক্ষে তাহা যথেষ্ট হয়। ভারতে দুর্ভিক্ষের বৎসরেও কখন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০ ইঞ্চির কম হয় না। বরং ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের বৎসরেও উহার অপেক্ষা অনেক অধিক বারিপাত হইয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১৮৭৭ সালের মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় ৬৬ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছিল। ১৮৬৫।৬৬ সালের উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় বৃষ্টির পরিমাণ ৬০ ইঞ্চির কম হয় নাই। ১৮৭৬ সালের বোম্বায়ের দুর্ভিক্ষ-কালেও ৫০ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছিল। ১৮৯৬।৯৭ সালে মধ্য প্রদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, কিন্তু ঐ প্রদেশেই ঐ দুই বৎসরে যথাক্রমে ৫২ ও ৪২ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯০০ সালে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রদেশসমূহেও প্রচুর বারি-পাত হইয়াছিল। তথাপি দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস পায় নাই! এরূপ অবস্থায় অনাবৃষ্টিকে দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে জল সঞ্চয়ের অভাবই দুর্ভিক্ষের প্রকৃত ও প্রধান কারণ।

কূপতড়াগ-খাত-সরোবরাদির সাহায্যে বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থা থাকিলে অসাময়িক বৃষ্টিতে কৃষিকর্ম্মের বিশেষ কোনও অনিষ্টই সাধিত হইতে পারে না। এই কারণে সকল সভ্য দেশেই কৃত্রিম উপায়ে জল-সঞ্চয় করিবার জন্য রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে।

ভারতের ন্যায় কৃষি-প্রধান দেশে কৃত্রিম জলসেচনের ব্যবস্থা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া, হিন্দু ও মুসলমান নরপতিদিগের শাসন-কালে দেশের অধিকাংশ স্থলেই জলসেচনের যথোচিত ব্যবস্থা ছিল। সে কালে সমগ্র ভারতে কতগুলি কূপ ও পুষ্করিণী ছিল, তাহা আজ কাল জানিবার উপায় নাই। তথাপি মান্দ্রাজ অঞ্চলে ৪০ হাজার পুরাতন কূপ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ধারওয়াড় জেলায় তিন সহস্র কূপ আছে। বোম্বাই অঞ্চলের কূপের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২ লক্ষ ৫৪ হাজার। চিঙ্গলপট জেলায় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে নিখাত দুইটি কূপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কাবেরী নদীর আনিকট খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর কীর্ত্তি। ঐ আনিকটের দৈর্ঘ্য ১ সহস্র ফুট, বিস্তার ৪০ হইতে ৬০ ফুট ও গভীরতা ১৫ হইতে ১৮ ফুট। পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে মুসলমান ও শিখ্ শাসন-কর্ত্তাদিগের আমলের বড় বড় খাল অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। রাবী নদীর জল লাহোরে লইয়া যাইবার জন্য মুসলমান বাদসাহেরা যে খাল কাটিয়াছিলেন, উহার দৈর্ঘ্য ১৩০ মাইলের ন্যূন নহে। যমুনার ৯৫০ মাইল দীর্ঘ সুপ্রসিদ্ধ খাল মহম্মদ তোগলকের আমলে নিখাত হইয়াছে। ফল কথা, কৃষি-কার্য্যকে বৃষ্টি-নিরপেক্ষ করিবার জন্য এ দেশের রাজা ও প্রজারা চিরকাল যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন।

ইংরাজের আমলেও ইরিগেশন বা জলসেচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইংরাজ ভারতীয় প্রাচীন প্রথারই কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের স্যার আর্থার কটন ও উত্তর ভারতে স্যার পি, ক্যাট্‌লে মহোদয়ের চেষ্টায় অনেক পুরাতন খালের জীর্ণ সংস্কার ও নূতন খাল নিখাত হইয়াছে। ১৮৩৬ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাঞ্জোরে একটি আনিকট নির্ম্মাণ করেন। তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের ৫৮৷৷০ লক্ষ টাকা লাভ হয়। উত্তর ভারতে গঙ্গার খাল কাটাইয়াও কোম্পানি বহু অর্থ লাভ করেন। সে সকল খালে উত্তর ভারতের প্রায় ৫১ লক্ষ বিঘা ভূমিতে জল সেচিত হয়।

বৃটিশ ভারতে ইংরাজের নিখাত খালের মোট পরিমাণ প্রায় ৫১ হাজার মাইল হইবে। এই সংখ্যা দেখিলে আপাততঃ বিস্ময়ের উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের বিশালতার সহিত তুলনা করিলে ইংরাজ-কৃত খালের সংখ্যাকে আমরা কোনও প্রকারেই পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতে পারি না। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ নানা খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেই সকল রাজ্যের অধিপতিগণ স্ব স্ব রাজ্যের জন্য খণ্ডভাবে জলপূর্ত্তের যে ব্যবস্থা খণ্ড করিয়াছিলেন, তাহার অনুপাতে বিশাল বৃটিশ ভারতের জল-পূর্ত্তকে ইংরাজের একটা বিশেষ কীর্ত্তি বলিয়া মনে করা যায় না।

কৃষকেরা ক্ষেত্রে জল-সেচনের সুবিধা পাইলে কেবল তাহাদিগেরই যে উন্নতি সাধিত হয়, দেশ ধনধান্যে পূর্ণ হয়, তাহা নহে, গবর্ণমেণ্টকেও দুর্ভিক্ষ-কালে প্রজার খাজনা রেহাই দিয়া ও অন্নসত্রাদির ব্যবস্থা করিয়া রাজকোষ শূন্য করিতে হয় না। বিলাতী বাণিজ্যের প্রসার-বৃদ্ধির দিক্ দিয়া দেখিলেও কৃষক-সমাজের ধন-বৃদ্ধিতে ইংলণ্ডীয়-বণিক সম্প্রদায়ের লাভ নিতান্ত সামান্য নহে। ভারতের বিগত দশ বৎসরের আমদানি রপ্তানির হিসাব দেখিলে জানা যায় যে, ভারতবাসী গড়ে প্রতিজনে ইংলণ্ডের নিকট হইতে বার্ষিক তিন শিলিং বা ২।০ টাকার মাল ক্রয় করিয়াছে। ইহার মধ্য হইতে বড় লোকদিগের ও নগরবাসীর সংখ্যা বাদ দিলে দৃষ্ট হয় যে, প্রায় ১৭,০০,০০,০০০ কৃষি-শিল্প-জীবী বিলাতী দ্রব্য-ক্রয়ার্থ বৎসরে গড়ে দুই পয়সার অধিক ব্যয় করিতে পারে নাই। কৃষক-সম্প্রদায়ের দারিদ্র্যের ইহা অপেক্ষা ভীষণ নিদর্শন আর কি হইতে পারে? ভারতীয় কৃষিজীবী প্রজার অবস্থা যদি সচ্ছল হয়,তাহাদিগের যদি গড়ে ৶০ মূল্যের বিলাতী সামগ্রী-ক্রয়েরও সামর্থ্য জন্মে, তাহা হইলে ইংলণ্ডীয় বণিক্‌দিগের আয় ভারতীয় বাণিজ্য-সূত্রে কি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায় না? ক্যানোডার অধিবাসিগণ এরূপ ধনশালী যে, তাহারা ইংলণ্ডের নিকট হইতে গড়ে প্রতি জনে বৎসরে পাঁচ পাউণ্ড বা ৭৫৲ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে! ভারতবাসী যদি ক্যানেডাবাসীর ন্যায় ধনশালী হইবার সুবিধা পাইত, তাহা হইলে ভারতীয় বাণিজ্যে ইংলণ্ড বার্ষিক ২২৫০,০০,০০,০০০ টাকা লাভ করিতে পারিতেন! ইহাতে ইংলণ্ডের গৌরব ও শক্তি কতদূর বৃদ্ধি পাইত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু মিঃ থ্যাকারের (পৃঃ ৪০) প্রেতাত্মা যত দিন রাজপুরুষ-

দিগের স্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ না হইবে, ততদিন তাঁহারা এই সরল সত্যের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

রাজ-পুরুষেরা কেবল যে কৃষকের দুরবস্থার প্রতি অমনোযোগী হইয়া দেশে তড়াগ-সরোবরাদির খনন-কার্য্যে ব্যয়-কুণ্ঠতা প্রকাশ করিতেছেন তাহা নহে; তাঁহারা প্রজার নিকট জলকর আদায়-কার্য্যেও স্থান-বিশেষে অবৈধ কঠোরতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিগত ১৩০৭ সালে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়াছেন যে, যাহাদের ক্ষেত্রের নিকট দিয়া জল-প্রণালী গিয়াছে, তাহারা জল ব্যবহার করুক আর নাই করুক, তাহাদিগকে জলের কর দিতেই হইবে। কৃষিজীবী প্রজার পক্ষে ইহার অপেক্ষা অত্যাচার-মূলক ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয়, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন! ইহার দশ বৎসর পরে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টও এই প্রকার ন্যায়-বিরুদ্ধ আইন পাস করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তদানীন্তন ভারত-সচিব মহোদয়ের অনুগ্রহে উভয় গবর্ণমেণ্টেরই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু বিগত ১৮৯৭ সালের ঘোর দুর্ভিক্ষের পরও যখন মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট জল-কর আদায় সম্বন্ধে সাধু-জন-বিগর্হিত বিধানের প্রণয়ন করিলেন ও বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে কোনও আপত্তি করিলেন না, তখন অন্যান্য প্রদেশের প্রকৃতি-পুঞ্জের মস্তকেও সহসা মান্দ্রাজের ন্যায় অকারণে বজ্রাঘাত হইবে না, ইহা কেহই সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারেন না।

রেলপথের বিস্তার অপেক্ষা খাল খননের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যদি সমধিক মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে দেশের এরূপ দারিদ্র্য কখনই বৃদ্ধি পাইত না, সমাজের নানা শ্রেণীর লোকের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত, সন্দেহ নাই। কারণ প্রথমতঃ রেলপথের বিস্তারে যেরূপ নানাসূত্রে প্রভূত অর্থ দেশান্তরিত হয়, জল-পূর্ত্তে সেরূপ হয় না; ব্যয়িত অর্থের প্রায় সমস্তই দেশীয় শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের ও স্থপতিদিগের হস্তগত হয়। বিগত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিংশ বৎসরে বিলাত হইতে প্রায় ৪৫৮,০০,০০,০০০ টাকার রেলপথ নির্ম্মাণের উপকরণ এদেশে আসিয়াছে! এই পর্ব্বত প্রমাণ অর্থ-রাশির সমস্তই বৈদেশিক শিল্পীদিগের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে রেলের অপেক্ষা খালের সংখ্যা-বৃদ্ধি করিলে এত টাকা কখনই বিদেশে যাইত না, গবর্ণমেণ্টকেও রেলের

দায়ে ঋণগ্রস্ত হইতে হইত না। পক্ষান্তরে এই টাকার অর্দ্ধাংশও খাল-খননে ব্যয়িত হইলে দেশের কৃষকদিগের ও কৃষিকার্য্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারিত।

দ্বিতীয়তঃ জল-প্রণালীর সংখ্যা-বৃদ্ধি হইলে জলপথে মালের আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পায়, তাহাতে বহুসংখ্যক লোক নৌকাবাহন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ ও অর্থ-সঞ্চয়ের সুবিধা প্রাপ্ত হয়। যদি রেলপথের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র বৃহৎ সঙ্কীর্ণ ও বিস্তীর্ণ জল-প্রণালীর দ্বারা ভারতের এক প্রদেশের সহিত অপর প্রদেশের যথাসম্ভব সংযোগসাধনের চেষ্টা করা হইত এবং বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেল লাইন (trunk lines) নির্ম্মাণ করা হইত, তাহা হইলে ভারতবাসী আজ অন্তরের সহিত ইংরা-জের ধন্যবাদ করিবার অবসর পাইত। এরূপ ব্যবস্থায় যুগপৎ লোকের গমনাগমনের সৌকর্য্য ও দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারিত। যে টাকা এখন বিদেশীয় কোম্পানির অংশিগণ পাইতেছেন, সেই টাকা নৌকা-ব্যবসায়ী দেশীয় মহাজনেরা পাইতেন। ডাক্তার বুকাননের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাটনা হইতে নৌকাযোগে কলিকাতায় মাল পাঠাইতে ১২ হইতে ১৫ টাকার অধিক ব্যয় পড়িত না। জল-প্রণালীর সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত নৌকার সংখ্যা ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইলে নৌকার ভাড়া আরও কমিয়া যাইত, সন্দেহ নাই। এখনও ব্যবসায়ীরা রেলগাড়ী অপেক্ষা নৌকায় মাল-প্রেরণ অধিকতর সুবিধাকর মনে করিয়া থাকেন।(১)

মিশর দেশের জল-প্রণালী।

মিশরদেশে এবিষয়ে বহু পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তথায় নীলনদীর উপর দিয়া রেলপথ ও রাজপথের জন্য বহুসংখ্যক প্লবমান সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল সেতুর নিমিত্ত নদীপথে বৃহৎ নৌকাদির গমনা-

(১) এদেশের লোকের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত রেলওয়ে কমিশনার মিঃ রবার্টসন বলিয়াছেন যে, এখানকার রেলকর্ত্তৃপক্ষীয়গণ যাত্রি-গণের ও পণ্যদ্রব্য-প্রেরকগণের নিকট হইতে ন্যায্য ভাড়ার প্রায় দ্বিগুণ আদায় করিয়া থাকেন। তাঁহার উক্তি এই,—

The freight charges on these lines for passangers and goods are more than 80 p.c. *too high* for the industrial condition of the population of India.

গমনে কোথাও বাধা জন্মে না। কারণ সেতুগুলি কলিকাতার হাওড়া-সেতুর স্থায় নৌ-শ্রেণীর উপর স্থাপিত হইয়াছে। ব্যবসায়ীদিগের পণ্য-পূর্ণ পোতসমূহের গমনাগমনের জন্য দিবা ভাগে বহুবার ঐ সকল সেতু খুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা-সত্ত্বেও মিসরদেশীয় নৌ-বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে বলিয়া ব্যবসায়ীরা প্রায়ই অভিযোগ করিয়া থাকেন। তথাপি মিসরে নদী-পথে বাণিজ্য এরূপ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, তত্রত্য রেল কোম্পানিরা কিছুতেই তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইতেছেন না। তাঁহারা মালের ভাড়া যতদূর সম্ভব কমাইয়া দিয়াও কিছুই সুবিধা করিতে পারিতেছেন না। ব্যবসায়ীরা রেলপথ অপেক্ষা নদীপথে নৌকাযোগে মাল প্রেরণ করাই অধিকতর লাভ-জনক বলিয়া মনে করিতেছে। ফলে দিন দিন মিসর দেশে নৌ-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও রেল কোম্পানিসমূহের ভীষণ ক্ষতি সংঘটিত হইতেছে।

রেল অপেক্ষা খালে বাণিজ্যের পরিচালন অধিকতর লাভজনক হয় বলিয়া ইউরোপের সভ্যদেশ-সমূহে খাল খনন ও নদী-সমূহের গভীরতা-সম্পাদনে রাজপুরুষেরা বহু অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। ক্ষুদ্র অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্ট ১৮৫০খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০১খ্রীঃ পর্য্যন্ত পয়ঃপ্রণালীর জন্য ৩৪৷৷০কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। হুঙ্গেরী ১৮৭৬ খ্রীঃ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৩ কোটি টাকা, নেদারল্যাণ্ডসের কর্ত্তৃপক্ষ ১৮৭০ অব্দ হইতে ১৯০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ১৭ কোটি ৩১লক্ষ ৪১৷৷০ হাজার টাকা এবং রুষ গবর্ণমেণ্ট বিগত ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দেই নদীসমূহের জরীপ ও পঙ্কোদ্ধার কার্য্যে ১ কোটী ১২৷৷০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে গবর্ণমেণ্ট বহুদূরবর্ত্তী নদীসমূহকে বহুসংখ্যক কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা সংযোজিত করিয়া নৌ-বাণিজ্যের বিস্তারে যথাসাধ্য সহায়তা করিতেছেন। আর আমাদের বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট গঙ্গার স্থায় প্রসিদ্ধ নদীর শ্রীবৃদ্ধি-কল্পে বৎসরে ৫০ হাজারেরও কম টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় ও আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট জল-প্রণালীর জন্য অজস্র অর্থ-ব্যয় করিয়াও নৌ-ব্যবসায়ীদিগের নিকট টোল-কর আদায় করেন না, অথবা অতি সামান্য কর আদায় করিয়া থাকেন। বঙ্গে টোল করের হার সকল সভ্য-দেশ অপেক্ষা অধিক। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এরূপ উচ্চ হারে কর লইয়াও

নৌ-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কোনও চেষ্টাই করেন না। নূতন খাল কাটান ও পুরাতন নদীর মাটি তুলিয়া উহার গভীরতা সম্পাদনে যত্ন-প্রকাশ দূরে থাকুক, রেলের জন্য নদী ও খালের উপর দিয়া যে সকল অনুচ্চ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, সে গুলিও হাওড়ার পোলের ন্যায় প্রবমান করা হয় নাই। কাজেই উহাদিগের নিম্নদেশ দিয়া বড় বড় নৌকা গমনাগমন করিতে পারে না। রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ারেরা সস্তায় কাজ করিবার জন্য কেবল যে এইরূপ পাকা পোল তৈয়ার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে; নদী-জলের গভীরতা ও বেগ যাহাতে হ্রাস পায় এবং ঐ সকল সেতুর যাহাতে কোনও ক্ষতি সাধিত না হয়, তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমাদের রাজপুরুষেরা রেল কোম্পানী-সমূহের সুবিধার জন্য এই সকল গর্হিত ব্যাপারে প্রতিবাদ করিতেছেন না। এ বিষয়ে মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বিগত ১৯০৪।৫ সালের বজেট বিচার কালে ছোট লাটের সভায় এ সকল কথা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গেশ্বর তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। ইহার পর বিগত ১৯০৫ সালের ৭ই জুনের "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্" পত্রে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অতীব তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হয়; তথাপি কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নীরব রহিয়াছেন।

The question of railway versus river-borne traffic is of great importance in Lower Bengal, where the absence of feeder-roads is compensated for by the presence of innumerable small rivers teeming with country-boats. These feeder-rivers are being greatly damaged by the efforts of Engineers to construct cheep bridges, and the cutting of the headways to effectuate economy, has seriously interfered with river traffic. It is a mistaken policy in view of the gigantic amount of river-borne trade, and is merely killing the goose that lays the golden eggs. The Hon'ble Mr. Jogesh Chowdhury has repeatedly called attention to this matter in the Bengal Council, and as we think, has received extremely unsatisfactory replies, dictated in the interest of the railways without due consideration of the enormous importance of the river-borne trade or a due appreciation of the disastrous results caused by the silting up of rivers by artificial obstructions necessary to protect the railway bridges. It is now being realised in Germany and in England that it is cheap water transport which makes the country rich and the enormous scheme recently unfolded in Germany is an instance of it. Before all the water-ways of Bengal are ruined by injudicious concessions to the railway interest, it is to be hoped that the Government of India will look into the matter.

ফলকথা, বঙ্গদেশের রেলপথের বিস্তারে উত্তরোত্তর সহায়তা না

করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি বঙ্গের জল-পথ সমূহের উন্নতি-সংসাধনে যত্ন প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বঙ্গের বাণিজ্য স্বল্প-ব্যয়ে অসাধারণরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে। বিলাতের লোকেও এখন রেল-পথ অপেক্ষা নদী ও খাল-পথে বাণিজ্যের সুবিধার বিষয় বুঝিতে পারিয়া জল-প্রণালীর সংখ্যা-বর্দ্ধনে যত্নশীল হইয়াছেন। বঙ্গদেশে রেলের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, তাহার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র অর্থ ব্যয় করিলে বঙ্গের জল-পথ-সমূহের সংস্কার সাধিত হইতে পারে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট প্রজা-সাধারণের মঙ্গলের জন্য এই সামান্য ব্যয়-স্বীকারেও প্রস্তুত নহেন।

বঙ্গে নৌ-শিল্প।

তৃতীয়তঃ প্রাচীন নৌ-শিল্পীদিগের জীবিকা-লোপ হইত না; বরং বাণিজ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নৌকার নির্ম্মাণ দ্বারা জীবিকার্জ্জনকারীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইত। কিন্তু রেলের বিস্তারে এদেশে নৌ-নির্ম্মাণ-বিদ্যার বহুল অবনতি সাধিত হইয়াছে। ইংরাজও চেষ্টা-পূর্ব্বক এদেশের অন্যান্য শিল্পের ন্যায় নৌ-নির্ম্মাণ-শিল্পের উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে সমুদ্রপোতের বহুল উল্লেখ আছে। অতি প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদেও শত-পতত্র-যুক্তা (শতারিত্রাং নাবং) সমুদ্র-গামিনী নৌকার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। মহাভারতের জতুগৃহদাহ-পর্ব্বাধ্যায়ে মনোমারুত-গামিনী, সর্ব্ব-বাতসহা, যন্ত্র-যুক্তা নৌকার উল্লেখ দেখিতে পাই। নদনদী-বহুল বঙ্গদেশ চিরকাল নৌ-নির্ম্মাণ বিদ্যার জন্য বিখ্যাত ছিল। অতি প্রাচীনকালে বঙ্গবাসী নৌকাযোগে জলপথে সমরাভিযান করিয়া সিংহল দ্বীপ বিজয় করিয়াছিলেন, "মহাবংসো" নামক বৌদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ আছে। কালিদাসের "রঘু" দিগ্বিজয় উপলক্ষে পূর্ব্বদিকে অভিযান করিলে, বঙ্গীয় নরপতিগণ বহুসংখ্যক রণতরী লইয়া তাঁহার গতিরোধের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু রঘু সেই নৌ-বল-গর্ব্বিত বঙ্গ-ভূপতিগণের পরাজয় সাধন করিয়াছিলেন, এ তত্ত্ব রঘুবংশ পাঠকের নিকট নূতন নহে। ইংরাজীতে যাহাকে "নেভাল ফোর্স" বলে, কালিদাস তাহাকেই "নৌ-সাধন" নামে অভিহিত করিয়াছেন। যথা,—

"বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোদ্যতান্।"—রঘুবংশ ৪।৩৬।

মুসলমান আমলেও যে বাঙ্গালীর এই নৌ-সাধন বিনষ্ট হয় নাই, তাহা ঘটক-কারিকায় বর্ণিত প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় বীর প্রতাপাদিত্যের জামাতার পলায়ন-ব্যাপারের বিবরণ পাঠে বুঝিতে পারা যায়।

চতুঃষষ্টির্দ্দণ্ডযুতা নৌরানীতা মহামতিঃ।
নালী কৈঃ সজ্জিতা স্বৈরং সৈন্যাদ্যৈরভিরক্ষিতা।
তস্যামারোহণং কৃত্বা প্রগৃহ্য নালিকায়ুধম্।
তূর্ণং গমনবার্ত্তাঞ্চ নালিকধ্বনিভির্দ্দদৌ॥

চতুঃষষ্টি দণ্ডযুক্তা, নালিকাস্ত্র (কামান) সমূহে সজ্জিতা, সৈনিকবৃন্দের দ্বারা অভিরক্ষিতা নৌকায় আরোহণ করিয়া রামচন্দ্র নালিকাস্ত্রের ধ্বনি করিতে করিতে স্বীয় গমনবার্ত্তা জানাইয়া চলিয়া গেলেন।

মোগল সম্রাট্ আকবরের আমলে বাঙ্গালীর রণতরী কিরূপ ছিল, ঘটক-কারিকার এই বর্ণনা হইতে তাহা কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। কারিকা-লেখকেরা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জাহাজ-ঘাটার (ডকের) বর্ণনাও করিয়াছেন। ঘটক মহাশয়দিগের এই বর্ণনা যে কপোল-কল্পিত নহে, তাহা বাবু যদুনাথ সরকার প্রণীত The India of Aurungzeb নামক গ্রন্থের lvii চিহ্নিত পত্রাঙ্ক দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের অনূদিত "রিয়াজ—উস্ সালাতিন" গ্রন্থে ও শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের "প্রতাপাদিত্য" গ্রন্থে এ বিষয়ের অপেক্ষাকৃত বিশদ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর নৌ-নির্ম্মাণ বিদ্যা হীন-প্রভ হয় নাই, বরং দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছিল। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এ দেশে এরূপ সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য অর্ণবপোতসমূহ নির্ম্মিত হইত যে, তদ্দর্শনে বহু পাশ্চাত্য জাতির হৃদয়ে হিংসার উদ্রেক হইত। যে কলিকাতার বন্দর এক্ষণে বৈদেশিক পোত-শ্রেণীতে পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তথায় বহু সংখ্যক দেশীয় শিল্পীর নির্ম্মিত বড় বড় অর্ণবপোত শোভা পাইত। ঢাকায়, সপ্তগ্রামে ও চট্টগ্রামে অতি প্রাচীন কাল হইতে উৎকৃষ্ট জাহাজ নির্ম্মিত হইত। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি মহোদয় ঐ অব্দের প্রারম্ভে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে,—

The port of Calcutta contains about 10,000 tons of shipping built in India, of a description calculated for the conveyance of cargoes to England. * * From the quality of private tonnage now at command in

the port of Calcutta, from the *state of perfection which the art of ship-building has already attained in Bengal* (*promising still more rapid progress...*) it is certain that this port will aways be able to furnish tonnage to whatever extent may be required for conveying to the port of London the trade of the private British merchants of Bengal.

বঙ্গদেশে পোত-নির্ম্মাণ-বিদ্যা যখন ঈদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তখন বোম্বাই অঞ্চলে নির্ম্মিত পোত-সমূহও বিলাতী জাহাজ অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীই সর্ব্বপ্রথম মহারাষ্ট্র-দেশে নৌ-নির্ম্মাণ-শিল্পকে বিশেষ উৎসাহ দান করিয়া উহার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। মোগলদিগের চেষ্টাতেও এ দেশে নৌ-নির্ম্মাণ-বিদ্যা সামান্য উন্নতি লাভ করে নাই। পেশওয়েগণের আমলে মহারাষ্ট্রীয় শিল্পিকুলের নির্ম্মিত পোতাদি সাধারণের বিশেষ প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল। বিজয়দুর্গ, কোলাবা, সিন্ধুদুর্গ, রত্নাগিরি, অঞ্জনবেল প্রভৃতি বন্দরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সমর-পোত-নির্ম্মাণের "ডক" ছিল। মহারাষ্ট্র নৌ-সেনাপতি আংগ্রের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত এক একখানি জাহাজে চারি শত টন বা ৮,০০০ হন্দর পর্য্যন্ত মাল বোঝাই হইত। তদ্ভিন্ন রণপোত-সমূহে ১৬ হইতে ৭৪টি পর্য্যন্ত বড় বড় তোপ সুসজ্জিত থাকিত। অন্যতম নৌ-সেনানী আনন্দ রাও ধুলপের তত্ত্বাবধানে ৫০ খানি বৃহৎ রণপোত ছিল। তাহাতে তিন শত বড় বড় কামান সর্ব্বদা সাজান থাকিত; প্রত্যেক জাহাজে ৩।৪ শত সৈনিক অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ করিত। সেকালের ইংরাজ ও পোর্ত্তুগীজদিগের রণতরীসমূহও উল্লিখিত রণপোত-সমূহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল এ, ওয়াকার মহোদয়ের ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত Considerations on the Affairs of India নামক পুস্তকে এ বিষয়ের যে বিস্তারিত বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহার ৩১৬ পৃষ্ঠ হইতে কয়েক পংক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।—

It is calculated that every ship in the navy of great Britain is renewed every 12 years. It is well known that teak-wood-built ships last 50 years, and upwards. Many ships Bombay-built, after running 14 to 15 years, have been bought into the navy and considered as strong as ever. The *Sir Edward Huyhes* performed, I believe, eight voyages as an India man before she was purchased for the navy. No Europe-built ship is capable of going more than six voyages with safety.

এই বর্ণনা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সেকালের বিলাতী জাহাজ-

গুলি ১২ বৎসরের ব্যবহারের পর নৌ-সেনাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের :নিকট অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বোম্বাইয়ের সেগুন কাঠে নির্ম্মিত দেশীয় জাহাজ পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় অবিকৃত থাকিত। ১৪।১৫ বৎসর কাল ব্যবহৃত দেশীয় অর্ণব-পোতসমূহও বিলাতের নৌ-সেনা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ অতীব আগ্রহের সহিত কিনিয়া লইতেন। ইউরোপে নির্ম্মিত পোতনিচয়, ছয় বার ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে গমনাগমন করিলেই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া উঠিত, কিন্তু দেশীয় জাহাজ আট বার সমুদ্রে ঘুরিয়া আসিয়াও নূতনের মত থাকিত এবং ইংলণ্ডীয় নৌ-বিভাগে সাদরে ক্রীত হইত। ওয়াকার মহোদয় আরও বলেন,—"ভারতীয় অর্ণব-পোতসমূহ এরূপ সুদৃঢ় হইলেও উহাদিগের নির্ম্মাণার্থ, ইউরোপের তুলনায় অনেক অল্প ব্যয় হয়। যেরূপ জাহাজ বিলাতে সহস্র মুদ্রায় নির্ম্মিত হয়, ভারতে ৭৫০৲ টাকায় তদপেক্ষা চতুর্গুণ উৎকৃষ্ট পোত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডীয় পোত অধিক ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াও ১২ বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। কিন্তু ভারতীয় অর্ণবযানসমূহ অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে নির্ম্মিত হইলেও ৫০ বৎসরের অধিককাল অবিকৃত থাকে। এই সকল কারণে ভারতে নৌ-নির্ম্মাণের কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিলে, ইংলণ্ডের বহু পরিমাণে ব্যয়-লাঘবের সম্ভাবনা।"

ওয়াকার মহোদয়ের এই উপদেশ যদি পালিত হইত, তাহা হইলে যুগপৎ ইংলণ্ডের উপকার ও ভারতীয় নৌ-নির্ম্মাণ বিদ্যার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কর্ত্তৃপক্ষ এই বিজ্ঞ কর্ম্মচারীর উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। যে কারণে ভারতীয় পোত-রচনা-বিদ্যার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, তাহা মিঃ টেলার প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ২১৬ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত পশ্চাল্লিখিত অংশ পাঠ করিলেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে।—

The arrival in the port of London of Indian produce in Indian-built ships created a sensation among the monopolists which could not have been exceeded if a hostile fleet had appeared in the Thames. The ship-builders of the port of London took the lead in raising the cry of alarm. They declared that their business was on the point of ruin and that the families of all the shipwrights in England were certain to be reduced to starvation.

ভাবার্থ—ভারতবর্ষে নির্ম্মিত পোতসমূহ ভারতীয় পণ্যসামগ্রী লইয়া যখন লণ্ডনের বন্দরে উপস্থিত হইল, তখন বিলাতের একাধিপত্য-কামী শিল্পব্যবসায়ী সমাজে ভয়ঙ্কর

হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এই ঘটনায় বিলাতের জনসমাজ যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, শত্রুসৈন্য কতিপয় রণতরী লইয়া সহসা টেম্‌স নদীতে আবির্ভূত হইলেও বোধ হয় তদপেক্ষা অধিকতর বিচলিত হইত না। লণ্ডনের পোত-নির্ম্মাণকারীরা ভয়সূচক চীৎকারে চারি দিক্ কম্পিত করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—"আমাদিগের ব্যবসায় এইবার মাটি হইল, বিলাতের সমস্ত নৌ-শিল্পীদিগকে এইবার নিশ্চিত সপরিবারে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আপনাদিগের ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য এদেশে বাণিজ্য-পোত নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বঙ্গে তাঁহাদিগের জন্য পোত-নির্ম্মাণ-শিল্প বিস্তার লাভ করিতে থাকে। তখন খিদিরপুর, টিটাগড় ও কলিকাতার পুরাতন টাকশালের নিকট এক-একটী পোত-নির্ম্মাণশালা ছিল। ঐ সকল স্থানে ৫০০০ টন্ পণ্য-বহনে সমর্থ বড় বড় জাহাজ নির্ম্মিত হইত। কিন্তু তাহা লণ্ডন ও লিবারপুলের পোত-নির্ম্মাণকারীদিগের বিষম হৃদয়-দাহের কারণ হইয়া উঠিল। তাহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া একজন ইংরেজ লেখক ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ত্তৃপক্ষকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

"Is it not a matter to be deplored that the Company should employ the natives of India in building their ships, to the actual injury and positive loss of this nation, from which they received their charter? Mistaken as the Company have been in this particular, it is not very difficult to device what will take place if an unrestrained commerce shall be permitted: if British capital shall be carried to India by British speculators, we may expect a vast increase of dockyards in that country, and a proportional increase of detriment to the artificers of Britain."

ভাবার্থ—কোম্পানি পোত-নির্ম্মাণ-কার্য্যে ভারতীয় শিল্পীদিগকে নিযুক্ত করিয়া ইংলণ্ডবাসীর ঘোর ক্ষতি ও প্রকৃত অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে? এ বিষয়ে কোম্পানি বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যদি তাঁহারা ইংলণ্ড হইতে মূলধন ভারতে লইয়া গিয়া এইরূপ কার্য্যে ব্যয় করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে পোত-নির্ম্মাণশালার সংখ্যা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে এবং যে বৃটিশ জাতির নিকট হইতে কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য করিবার সনন্দলাভ করিয়াছেন, সেই বৃটিশ জাতির নৌ-শিল্পীদিগের ঘোর অবনতি সাধিত হইবে!

শিল্পীদিগের এইরূপ আর্ত্তনাদে ও আন্দোলনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বদেশ-ভক্ত সদস্যেরা আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। স্থির হইল, শ্বেতাঙ্গ-শিল্পীর মঙ্গলের জন্য ভারতীয় কৃষ্ণাঙ্গ শিল্পীর অন্নে ধূলি-মুষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে; ভারতবর্ষ হইতে উৎকৃষ্ট উপকরণসমূহ বিলাতে লইয়া গিয়া বিলাতী কারিকরের দ্বারা পোত নির্ম্মাণ করাইতে হইবে। এই সময়েই

ভারতীয় মুসলমান লস্করদিগের জীবিকা-হরণের ব্যবস্থা হয়। সে ব্যবস্থার আংশিক পরিচয় ইতঃপূর্ব্বে ৫৯ পৃষ্ঠে প্রদত্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডে তৎকালে "ওক" কাষ্ঠে জাহাজ নির্ম্মিত হইত; কিন্তু এই ব্যবস্থার পর জাহাজ-নির্ম্মাণ কার্য্যে ওক কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে সেগুন কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এখনও জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য এ দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ সেগুন কাষ্ঠ প্রতিবৎসর বিলাতে প্রেরিত হইয়া থাকে।

এইরূপে কেবল যে, সমুদ্রগামী বৃহৎ পোত-নির্ম্মাণের বিদ্যাই ভারতবর্ষ হইতে এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলযান-নির্ম্মাণ করিবার কৌশলও লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ও আরবোপসাগরের উপকূলে সহস্র সহস্র ভারতীয় শিল্পির নির্ম্মিত জল-যান পণ্য-সামগ্রী বহন করিত, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এই কার্য্য করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। বাণিজ্য-কুশল সুসভ্য ইংরাজের সংসর্গে ভারতের নৌ-নির্ম্মাণের ব্যবসায় ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিবে, ইহাই সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ফলের উৎপত্তি হইয়াছে। সরকারি (Statistical Abstract of British India) ও বে-সরকারি (O' Conor's Trade Report) কাগজ পত্র হইতে নিম্নে চারি বৎসরে পণ্য-বহন কার্য্যে যতগুলি দেশীয় সমুদ্র-যান নিযুক্ত ছিল, তাহাদের সংখ্যা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে ভারতীয় নৌ-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সাল	নৌ-সংখ্যা।	সাল	নৌ-সংখ্যা।
১৮৫৭	৩৪,২৮৬	১৯০০	১,৬৭৬
১৮৯৯	২,৩০২	১৯০১	১,০৪৯

মিঃ ওকোনার স্বীয় রিপোর্টের একস্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—The native craft employed in the foreign trade are slowly but surely disappearing. ইহাতে কত লোক যে জীবিকাশূন্য হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? ইংরাজ যদি সহৃদয়তা প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় শিল্পি-কুল নৌ-নির্ম্মাণ-বিদ্যায় পাশ্চাত্য শিল্পীদিগকে পরাস্ত করিতে পারিত, সন্দেহ নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগ পর্য্যন্ত এ দেশের নৌ-শিল্পের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাও শুনুন,—

The correct forms of ships—only elaborated within the past ten years by the science of Europe—have been familiar to India for ten centuries. —*Notes on India*. By Dr, Buist, (Bombay.)

ইহা ১৮৫০ সালের উক্তি। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে জন ইডাই (John Edye) নামক জনৈক সাহেব দক্ষিণাপথে ও সিংহল দ্বীপে নির্ম্মিত পোতসমূহের যে বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ম্যাল্‌কম (Malcolm) সাহেব লিখিয়াছেন,—

"Many of the vessels of which he gives us an account illustrated by correct drawings of their construction, are so admirably adapted to the purposes for which they are required that notwithstanding their superior science, Europeans have been unable during an intercourse with India of two centuries, to suggest, or at least to bring in to successful practice, one improvement. (Journal of the Royal Asictic society, no 1. Art 1.)

বিগত ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসের The Indian Texatile Journal পত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানির জামালপুর-স্থিত এঞ্জিনের কারখানার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহাও উল্লেখ-যোগ্য বলিয়া মনে করি।

The finished locomotive, as we see it in the paint shop in its new decorations, ready to take its place upon the railway, is *the best epitome of the capability of the native Indian craftsman.* If he can build an E. I. R. Co's locomotive under European supervision from start to finish he can build any thing...The proverbial laziness of the Indin worker is not to be discerned in the busy shops of Jamalpur and the best evidence of Indian capacity for work when properly directed and instructed, is to be found in the "Lady Curzon", the new E. I. Railway express locomotive.

যদি জামালপুরের কর্ম্মশালায় ভারতীয় শিল্পী রেল-এঞ্জিন-নির্ম্মাণের কার্য্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে নৌ-শিল্পের উন্নতি-সাধনে তাহারা যে অসমর্থ হইবে, ইহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। কিন্তু এসকল উন্নতিসাধনে রাজশক্তির অনুকূলতা আবশ্যক। রাজশক্তির আনুকূল্য লাভ না করিলে, শ্যাম, জাপান ও জার্ম্মেণি শিল্প-বাণিজ্যে ঈদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারিত কনা সন্দেহ। দুর্ভাগ্য-ক্রমে ভারতীয় রাজ-শক্তি দেশীয় শিল্পোন্নতির প্রতিকূল। তাই ভারতের বহু শিল্পের বিলোপ ঘটিতেছে, প্রজাকুল অন্নের কাঙ্গাল হইয়া উঠিয়াছে! কোথায় শিল্পকুশল বিজ্ঞানবিৎ সভ্যজাতির সংস্রবে ভারতবর্ষের শিল্পকলা-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিবে, না, তাহার সমূল উচ্ছেদ ঘটিতেছে।

ভারতবর্ষের বাণিজ্য-বিষয়ক রিপোর্ট-সমূহে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, বিগত ১৮৩৪।৩৫ সাল হইতে ১৯০২।১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত এদেশে ৫৪৪৪,৫০,১০,৭৫৬ টাকার মাল আমদানী ও এদেশ হইতে

৩০৩৪,৩২,৪৭,৪৪৪ টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে! বিগত ৬৫ বৎসরে এই ৫৪৭৮,৮২,৫৮,১৯০ টাকার পণ্যজাত বৈদেশিক নৌ-ব্যবসায়িগণ দেশ-দেশান্তরে বহন করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহার অধিকাংশ (যদি এদেশের নৌ-শিল্পের মস্তকে ইংরাজ বজ্রাঘাত না করিতেন, তাহা হইলে) এই দেশের লোকেরাই পাইত, সন্দেহ নাই। ইহার উপর যদি মহাজনের লাভের অঙ্ক শতকরা দশ টাকা হিসাবে ধরা যায়, তাহা হইলে বিগত শতাব্দীর বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় মহাজনেরা বিশুদ্ধ লভ্যাংশ নূন্যাধিক ৮০,০০,০০,০০০ টাকা পাইতেন। নৌ-শিল্পের বিলোপে এখন এ সমস্ত আয়ই বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগের হস্তগত হইয়াছে, ভারতবাসী অর্থ-হীন, পথের ভিক্ষুক হইয়া উঠিয়াছে।

পুরাতন কূপ-তড়াগাদির সংস্কারে যথোচিত মনোযোগ প্রকাশ করিলেও গ্রামে বর্ষাকালীন জল-সঞ্চয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু এদিকেও কর্ত্তৃপক্ষ অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। কাজেই অধিকাংশ পুষ্করিণী মজিয়া গিয়া লোকের জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। লর্ড লিটনের আমলে যখন রাজ্যের ব্যয়-সংক্ষেপের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, তখন দেশের পুষ্করিণী-প্রভৃতির সংস্কারের জন্য প্রতি বৎসর যে অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে,তাহার পরিমাণ হ্রাস করিলে কত অর্থ উদ্বৃত্ত হইতে পারে, ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন! কিন্তু তখন রেল বিভাগের ব্যয়-লাঘবের কথা তাঁহাদিগের মনে পড়িয়াছিল কি? ফলতঃ জলাশয়াদির সংস্কারে কর্ত্তৃপক্ষ অমনোযোগ করায় দেশের অনেক স্বল্প-পরিসর নদী, বিল ও খাল ক্রমে ভরাট হইয়া আসিতেছে। ম্যালেরিয়াদি রোগের প্রকোপ-বৃদ্ধি এবং দেশের মৎস্য-বংশ-লোপের ইহাই প্রধান কারণ।

বঙ্গে রেল লাইনের বিস্তার হওয়ায় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, একথা রাজা দিগম্বর মিত্র প্রথমে ম্যালেরিয়া কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য-দান-কালে বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করেন। 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস' প্রভৃতি এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্রেও বহুবার রেল বিস্তারের সহিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। স্যর প্যাট্রিক ম্যাসন মহোদয় প্রণীত Tropical Deseases নামক গ্রন্থেও এবিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রেলপথের জন্য দেশের জল-নির্গমের যে ব্যাঘাত

ঘটে, তাহা দূর করাও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার নহে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ রেলপথের বিস্তার-লাঘবেও সম্মত নহেন, জল-নির্গমের সুব্যবস্থা করিবার জন্য অর্থ-ব্যয়েও তাঁহাদের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসী ম্যালেরিয়ার দারুণ যন্ত্রণাভোগ করিতেছে।

ফলকথা, ভারতে রেল-পথের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি না করিয়া যদি ইংরাজ, জল-প্রণালী ও তড়াগ-সরোবরাদির সংখ্যা-বর্দ্ধনে সমধিক মনোযোগ করিতেন, তাহা হইলে ভূমি উর্ব্বরা ও কৃষক-সম্প্রদায় অর্থাৎ শতকরা ৮৫ জন ভারতবাসী সমৃদ্ধ হইতে পারিত, প্রাচীন নৌ-বাহী, নৌ-ব্যবসায়ী ও নৌ-শিল্পীদিগের বিলোপ না ঘটিয়া শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারিত। ইংলণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র ও বন্ধুর দেশের পক্ষে রেল যেরূপ সুফলপ্রদ, ভারতের ন্যায় বিশাল ও প্রায়-সমতল দেশের পক্ষে সেরূপ নহে,—একথা রাজপুরুষেরা অদ্যাপি বুঝিলেন না, অথবা বুঝিয়াও বিলাতের লৌহ-ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থ-রক্ষার জন্য জল-পূর্ত্তের পরিবর্ত্তে লৌহ-বর্ত্মের বিস্তারে সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। ইহার পরিণাম কিরূপ ভীষণ হইয়াছে, বিগত ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসের The Imperial and Asiatic Quarterly Review পত্রে জেনারেল ফিশার (General J. H. Fischer R. E.) নামক একজন ইংরাজ লেখক সরল ভাষায় তাহা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

No words could have better described the railway administration in India during the past half Century ; the advocates of this system have never ceased to din into the ears of the public in England "the incalculable benifits" the railways have conferred on India, without producing the shadow of evidence to support their assertions. *Those works of extreme utility*, without which it is impossible to make lands of any country valuable, have been entirely neglected, being too mean and paltry for the consideration of such very great minds ; and the results have been that the country has been brought to the verge of ruin and its whole population are in the most pitiable condition of hopeless poverty, misery and desolation.

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূমি-রাজস্ব-বিষয়ক নীতির দোষ প্রদর্শন করিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদস্বরূপ ভারত গবর্ণমেণ্ট ও মাদ্রাজের রাজস্ব-সচিব মহাশয় দুই খানি গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন। সেই দুই গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে জেনারেল ফিশার মহোদয় বলিয়াছেন,—

Examine these documents through and through, and you will not find

one word in them to show that the slightest attention whatever has ever been paid by any one of the revenue authorites towards promoting the real wealth of the country by any one of those means which Adam Smith and all modern authorities agree in declaring every country must be provided with, to make its land and labour as productive as possible. * *

There is, we fear very little excuse for us in this matter ; "*we knew the good and chose to follow the evil.*" and "have reaped as we have sown." The awful famines which have so frequently prevailed in India, accompanied with plague, cholera and pestilences, are the just judgments of God upon us for neglecting the interests of all the subjects placed under us by Him. * *

এখনও যদি ইংরাজ সহৃদয়তা প্রকাশ করেন, রেলের জন্য আর অর্থব্যয় না করিয়া কৃষিকার্য্যকে বৃষ্টি-নিরপেক্ষ করিবার জন্য সমগ্র শক্তি ব্যয়িত করেন, তাহা হইলে ভারতীয় প্রজার দুর্দ্দশা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে, দেশবাসীর ধন-বল বৃদ্ধি হইতে পারে।

বঙ্গীয় শিল্পি-কুলের সর্ব্বনাশ।

দেশের দারিদ্র্য-বৃদ্ধির সহিত দেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িতেছে। কৃষকসমাজের ঘোর অন্নকষ্ট ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের জীবিকার্জ্জনের পথ কণ্টকাকীর্ণ দেখিয়া দেশীয় শিল্পের উৎ-কর্ষ-সাধন-কল্পে অনেকে আজকাল বিশেষভাবে মনোযোগ করিয়া-ছেন। ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

অনেকের বিশ্বাস, বিলাতে বাষ্পীয় বলে পরিচালিত যন্ত্রাদির উদ্ভাবন হওয়াতেই এ দেশের শিল্পীদিগের গৌরব হ্রাস পাইয়াছে। বাষ্পীয় যন্ত্রে জাত পণ্যের সহিত হস্ত-কৌশলে নির্ম্মিত শিল্প-সামগ্রী প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হওয়াতেই ভারতীয় শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই দেশীয় শিল্পি-কুলের নিন্দায় অগ্রসর হন, তাহারা শিল্পকার্য্যে বাষ্পীয় যন্ত্রাদির সহায়তা গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন। যাঁহারা এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী, তাঁহারা দেশীয় শিল্প-নাশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত অবগত নহেন। বিজ্ঞানানুমোদিত যন্ত্রাদির সহিত প্রতিযোগিতায় যে এ দেশের

শিল্পীদিগকে কিয়ৎপরিমাণে বিপন্ন হইতে হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পি-সমাজে যে বিষম দুর্দ্দিনের উদয় হইয়াছে, তাহার অন্যবিধ গুরুতর কারণ আছে। এস্থলে সেই কারণের আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারতবর্ষীয় শিল্প-নাশের সর্ব্বপ্রধান কারণ, ইংরাজের অত্যাচার ও অপরিমেয় স্বার্থপরতা। ইংরাজ এদেশে বণিগ্‌বেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কাজেই এ দেশের বাণিজ্যে একাধিপত্য-লাভের বাসনা তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বভাবতঃ বলবতী হইয়াছিল। এই বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা যে সকল অবৈধ ও লোমহর্ষণ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের একদল ব্যবসায়ী ৭০ হাজার পাউণ্ড (বা সে সময়কার হিসাবে ৭ লক্ষ টাকা) মূলধন লইয়া ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য প্রথমে পদার্পণ করেন। এই ব্যবসায়ীর দল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে পরিচিত। প্রায় একশত বৎসর কাল মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে ব্যবসায় চালাইয়া ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহারা বঙ্গদেশে কলিকাতা ক্রয়-পূর্ব্বক তথায় একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। ভারতবাসীর নিকট এই পাশ্চাত্য বণিক্‌দিগের যে মূর্ত্তি প্রথমে প্রকাশিত হয়, ৫৮ পৃষ্ঠে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারা ব্যবসায়ের ও প্রতিপত্তি-লাভের সুবিধার জন্য মুখে বড় বড় নীতি-কথার প্রচার করিলেও—

From the outset the Company maintained the strictest principles of monopoly. * * * They contrived to make some money to establish themselves as colonists in several important places, to commit an *infinity of misdemeanours* of various degrees of enormity upon friends and foes. —*Empire in Asia*. By W. M. Torrens.

কার্য্যতঃ সর্ব্বপ্রকার নীতি-বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অর্থসংগ্রহে পরম আগ্রহ-প্রকাশ করিতেন; তজ্জন্য শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সমান দুর্ব্ব্যবহার করিতে বিরত হইতেন না। ব্যবসায়ে একাধিপত্য রক্ষার প্রতি ইঁহাদিগের পূর্ব্বাবধি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তদানীন্তন মোগল সম্রাট্ অওরঙ্গজেবের নিকট এই সকল দস্যু-বৃত্ত পাশ্চাত্য বণিকদিগের কীর্ত্তি-কলাপ অগোচর রহিল না। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বৈদেশিক ব্যবসায়ী-দিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ মাত্রে সুরাট হইতে ইংরাজেরা নিষ্কাশিত হইলেন; তাঁহাদের কর্ম্ম-

চারিগণ ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন; বোম্বাই,মছলীপত্তন ও ভিজিগাপত্তন প্রভৃতি ইংরাজের বাণিজ্য-কেন্দ্র-সমূহ অধিকৃত হইল, ইংরাজ বিষম বিপন্ন হইলেন। পরিশেষে তাঁহারা নিতান্ত দীনভাবে (most abject) পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ও ১,৫০,০০০ টাকা জরিমানা দিয়া অব্যাহতিলাভ করিলেন। অওরঙ্গজেব ভাবিলেন,—ইংরাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, তাহাদিগের শক্তি প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, আর তাহারা মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবে না। এইরূপে মোগল সম্রাটের উদারতায় ইংরাজ পুনর্ব্বার বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

অওরঙ্গজেবের পৌত্রের নিকট হইতে ইংরাজেরা নানা কৌশলে এদেশে অবাধ বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এই অধিকারের বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পণ্য-দ্রব্যাদি আমদানি রপ্তানির মাশুল না দিয়াও বঙ্গদেশের নানাস্থানে প্রেরিত হইত। বলা বাহুল্য, এদেশে কোম্পানির ব্যবসায় তখন বড় অধিক বিস্তৃত ছিল না। কিন্তু কোম্পানির ভৃত্যগণ বাদসাহী সনন্দের ও কোম্পানির নামের দোহাই দিয়া, যাহাকে তাহাকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার পরোয়ানা বিক্রয়-পূর্ব্বক আপনাদিগের উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে দেশের লোকের স্বাধীন বাণিজ্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। বঙ্গেশ্বরও ন্যায্য শুল্ক-লাভে বঞ্চিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ইংরাজ বণিকের কল্যাণে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয় রাজ-কোষের ও দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের ক্ষতি আরব্ধ হইল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর এদেশে ইংরাজের প্রতিপত্তি বাড়িল। ইংরাজেরা মীরজাফরকে প্রথমে নবাব করিয়া পরে স্ব-প্রয়োজনানুরোধে পদচ্যুত করিলেন। মীরজাফরের পর মীর কাশিমের প্রতি তাঁহারা বিশেষ সদয় হইলেন। ফলে তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট শোভা পাইতে লাগিল। তিনি নামে নবাব হইলেন, ইংরাজেরা প্রায় সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মীর কাশিম নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন না। দেশে ইংরাজের যথেচ্ছাচার তিনি সহিতে পারিলেন না। দরিদ্র প্রজার কষ্টমোচন করিতে গিয়া তাঁহাকে ইংরাজের কোপানলে ভস্মীভূত হইতে হইল। মীরজাফর আবার নবাবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইংরাজেরা আবার অকথ্য অত্যাচারে বাঙ্গালীকে উৎপীড়িত

করিতে লাগিলেন। এদেশের লোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করা সে সময়ে ইংরাজদিগের শাসন-পদ্ধতির মূলমন্ত্র ছিল।

পলাশীতে যুদ্ধাভিনয়ের পর হইতে বঙ্গে ইংরাজের যেমন প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল, তেমনই তাঁহারা বল-পূর্ব্বক বাণিজ্যের স্বত্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোম্পানির ভৃত্যেরা তাঁহাদিগের প্রভুর জন্য অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পাইয়া প্রত্যেকেই স্ব স্ব ব্যক্তিগত ব্যবসায় বিনা শুল্কে এদেশে চালাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন! প্রথমে এই কার্য্য গোপনে সম্পাদিত হইত। বঙ্গের হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলা এই অবৈধ বাণিজ্য-ব্যাপারে বাধা-প্রদান করিতে গিয়া ইংরাজের বিষনয়নে পতিত হন। সুচতুর ইংরাজ সেকালের কতিপয় অদূরদর্শী বঙ্গীয় কূট-নীতি-পরায়ণ ব্যক্তির সাহায্যে সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসন-চ্যুত ও নিহত করাইয়া আপনাদিগের অবাধ বাণিজ্য-বিস্তারের পথ নিষ্কণ্টক করিলেন।

এই প্রসঙ্গে কোনও সহৃদয় লেখক বলিয়াছেন,—যে দিন হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলা রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া ফকিরের বেশে মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিন হইতে ভারতে লুণ্ঠন আরম্ভ হইল। মীরজাফর, ক্লাইব ও অন্য কয়েকজন ইংরাজ, আমীর বোথাঁ, নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ একত্র হইয়া মুরশিদাবাদের ধনাগারে প্রবেশ-পূর্ব্বক ধন-বিভাগ করিতে লাগি-লেন। কলিকাতাস্থ কাউন্সিলের ইংরাজ সদস্যগণ ১২,৮০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ভিন্ন ক্লাইব গোপনে ৯৬,০০,০০০ টাকা আত্মসাৎ করিলেন! ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রায় এক কোটী টাকা দেওয়া হইল। বাঙ্গালীর ভাগ্যে চিরকালই পাত্রাবশিষ্ট; সুতরাং বাঙ্গালী বণিক্-দিগকে পিতৃশ্রাদ্ধের ভিক্ষার ন্যায় বিশ লক্ষ টাকা দেওয়া হইল। ইংরাজ সৈনিকগণ প্রায় প্রত্যেকেই নবদ্বীপের পণ্ডিতের ন্যায়, ছলে বলে ষোল আনা বিদায় প্রাপ্ত হইলেন, আর সিপাহীরা ও দেশীয় অন্যান্য সকলেই রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধের গড় বিদায়ের ন্যায় কিছু কিছু লাভ করিতে লাগিল। এই ধন-বিভাগের মধ্যে ইংরাজ পক্ষ হইতে বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নৃশংসতার ব্যাপার যথেষ্ট ঘটিয়াছিল। কোম্পানির দুর্ব্বৃত্ত ভৃত্যগণের অর্থ-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য ভারতের কত ধনী দরিদ্র হইয়া পড়িলেন, আবার তদানীন্তন শ্বেতাঙ্গগণের সদৃশ-প্রকৃতি কত নিম্ন শ্রেণীর লোক সহসা সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল! যেরূপে ইহাদের দ্বারা

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইল, যেরূপে ইহাদের নিষ্ঠুর ব্যবহারে আর্য্য-সন্তানদিগের কোমল হৃদয় ক্রমে ক্রমে পাষাণবৎ কঠিন হইয়া উঠিল, যেরূপে ইহাদের অসদৃষ্টান্তে ভারতবাসী অপরিজ্ঞাত-পূর্ব্ব নানাবিধ ধূর্ত্ততা, শঠতা ও বীভৎস পাপাচারের অনুষ্ঠান করিতে শিখিল, তাহা বিশেষরূপে যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে টরেন্স (W. M. Torrens) সাহেবের রচিত "এম্পায়ার ইন্ এসিয়া" (Empire in Asia) নামক পুস্তক মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। (১)

নবাব মীর কাশিম ইংরাজের অবাধ-বাণিজ্যে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী না হওয়ায় তিনি দেশীয় বাণিজ্যের শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন। কারণ, তিনি দেখিলেন যে, স্বরাজ্যে বিদেশীয় বণিকদিগকে বিনা শুল্কে ব্যবসায় করিতে দেওয়ায় শুল্কদানকারী স্বদেশীয় বণিক-সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তাঁহার এই সৎকার্য্যে বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালী ও ইংরাজ বণিক্ সমান অধিকার লাভ করিলেন। ইহাতে বাণিজ্য বিভাগীয় রাজস্বের আশা নবাবকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু প্রজার মঙ্গলের জন্য এইরূপ ত্যাগ-স্বীকার করিয়াও মীর কাশিম অভীষ্ট ফল-লাভ করিতে পারিলেন না। কলিকাতার স্বার্থান্ধ ইংরাজ বণিকেরা অতীব নির্লজ্জের ন্যায় মীর কাশিমের এই ন্যায়-সঙ্গত ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা কয়েকটি বিশেষ পণ্যের একাধিকার-লাভের জন্যই যদি বিবাদ করিতেন, তাহা হইলেও তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারা যাইত। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা বঙ্গদেশে শ্বেতাঙ্গমাত্রের পক্ষে সর্ব্ববিধ পণ্যের অবাধ বাণিজ্যে একাধিপত্য-লাভ ও দেশীয় বণিকদিগের উপর গুরুতর শুল্ক-ভার-স্থাপনের জন্য নবাব মীর কাশিমকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মীর কাশিম সে অবৈধ অনুরোধ-রক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় ইংরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রজা-হিতৈষী নবাবকে গেড়িয়া ও উদয়নালায় পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে হইল।

জগতের ইতিহাসে এইরূপ অন্যায় সমরের আর একটি দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া

(১) নব্যভারত, ১২৯০ সাল, চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ। কিন্তু বাণিজ্য-ব্যবসায়ে মনুষ্য-মাত্রের যে সাধারণ অধিকার আছে, এদেশের তদানীন্তন ইংরাজ রাজপুরুষেরা সেই স্বাভাবিক অধিকার হইতেও এদেশবাসীকে বঞ্চিত করিবার জন্য যে বহু প্রকার গর্হিত উপায়ের অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। দীর্ঘকালব্যাপী এইরূপ পৈশাচিক চেষ্টার পর যদি দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য বিলুপ্ত হয়, শিল্পের অবনতি ঘটে, এদেশবাসী যদি সহৃদয় কবির বর্ণিত,—

"হ'ল চাকরী সার যথায় তথায়,
অপমান সদাই কথায় কথায়॥"

অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি থাকিতে পারে?

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা এ দেশের পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তাদিগের আমলের অরাজকতার বিষয় স্বল্পাধিক পরিমাণে অতিরঞ্জিত করিয়া অতি বিস্তারিত ভাবেই স্ব স্ব গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এদেশে আসিয়া তাঁহারা যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়া বঙ্গদেশে ঘোর অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ কোনও প্রচলিত বাঙ্গালার ইতিহাসেই পরিদৃষ্ট হয় না। তথাপি সে সময়ের সরকারি কাগজপত্রেই এই বিষয়ের সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে এবং এখনও আমরা সেই অরাজকতার বিষময় ফলভোগ করিতেছি।

বঙ্গের তৃতীয় গবর্ণর মিঃ ভেরেল্‌ষ্ট ইংরাজের এই জুলুমের বিবরণ এইরূপে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

A trade was carried on without payment of duties, in the prosecution of which *infinite oppressions* were committed. English agents or Gomastahs, not contended with injuring the people, trampled on the authority of the Government, binding and punishing the Nabab's officers whenever they presumed to interfere. This was the immediate cause of the war with Meer Cassim.—*View of Bengal.*

ইহার মর্ম্ম এই যে, এদেশে আসিয়া ইংরাজ বণিকেরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য চালাইতে আরম্ভ করায় ও দেশীয় বণিকগণ উচ্চহারে শুল্কদানে বাধ্য হওয়ায় বঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তার-লাভ করিল। এই বাণিজ্য-বিস্তার করিবার জন্য ইংরাজ-পক্ষ দেশবাসীর উপর অসীম অত্যাচার করিয়াছিল। ইংরাজ বণিকের গোমস্তারা কেবল দেশবাসীকে উৎপীড়িত করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, তাহারা কোম্পানীর ভৃত্যগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশীয় রাজসরকারের আদেশও লঙ্ঘন করিত। দেশীয় রাজপুরুষেরা ইংরাজ বণিকের অত্যাচারে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে, শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীর দল তাহা-

দিগকেও নিগৃহীত করিতে ভীত হইত না। নবাব মীর কাশিম এই সকল অত্যাচারের প্রতীকারে কৃতসংকল্প হওয়ায় ইংরাজেরা তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

গবর্ণর ভেরেলেষ্টের উক্তি এইরূপ। কিন্তু এবিষয়ে তিনিই একমাত্র সাক্ষী নহেন। অন্য স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাক্ষীরও অভাব নাই। স্বয়ং নবাব মীর কাশিম কলিকাতার গবর্ণরের নিকট যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোম্পানির ভৃত্যগণের বহুল অত্যাচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিষিদ্ধ পণ্যের ব্যবসায়, নবাবের কর্ম্মচারীদিগের আদেশ ও রাজবিধানাদি লঙ্ঘন তাঁহাদিগের নিত্য কার্য্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজ বণিকেরা এদেশে সোরা ক্রয়-বিক্রয়ের একাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। একজন বণিক্ স্বয়ং নবাবের ব্যবহারের জন্য সামান্য পরিমাণে সোরা ক্রয় করিয়াছিল। তাহার এই কার্য্যে সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া ইংরাজ কোম্পানির পাটনাস্থিত প্রতিনিধি মিঃ এলিস নবাবের বণিক্‌কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করেন। দুইজন ইংরাজ সৈনিক পলাতক হওয়ায় মিঃ এলিস নবাবের মুঙ্গের-স্থিত দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগের অনুসন্ধানের জন্য স্বীয় ভৃত্যদিগকে প্রেরণ করেন। যাঁহারা নবাবের প্রতি এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, তাঁহারা জনসমাজের উপর জুলুম আরম্ভ করিলে, তাহার বেগ কিরূপ অপ্রতিহত হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। ওয়ারেন হেষ্টিং-সের দুইখানি পত্রে উল্লিখিত দুইটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সেকালের পারসী ইতিহাস-লেখক সৈর-মুতাক্ষরীণ-প্রণেতা ইংরাজের সামরিক চরিত্রের প্রশংসা করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন, "এদেশবাসীর মঙ্গলের দিকে ইহাদিগের আদৌ দৃষ্টি নাই—তাহাদের অধীন প্রজাকুল অত্যাচার-পীড়িত হইয়া চারিদিকে ঘোর আর্ত্তনাদ করিতেছে, দারিদ্র্য ও বিপন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। হা ভগবান্! তোমার এই আর্ত্ত সন্তানদিগের সহায়তার জন্য আগমন কর এবং ইহাদিগকে ঘোর অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার কর!"

মিঃ টমাস সিডেনহাম যথার্থই বলিয়াছেন,—

Englishmen are most apt than those of any other nation to commit violence in foreign countries. This I believe to be the case in India.

এই অত্যাচারের প্রকৃতি-সম্বন্ধে স্বয়ং নবাব মীর কাশিমের একখানি পত্রে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়।—"ইংরাজ বণিকেরা এদেশবাসী প্রজা

ও ব্যবসায়ীর গৃহ হইতে বলপূর্ব্বক মাল উঠাইয়া লইয়া যায় এবং প্রকৃত মূল্যের চতুর্থাংশ মাত্র তাহাদিগকে প্রদান করে। পক্ষান্তরে রায়তদিগকে বিলাতী জিনিষ গছাইয়া দিয়া, নানা প্রকার জোর জুলুমের দ্বারা এক টাকার স্থলে পাঁচ টাকা আদায় করা হয়! আমার কর্ম্মচারীদিগকে ইহারা শাসন বা বিচার-কার্য্য সম্পন্ন করিতে দেয় না। এইরূপ অত্যাচারে দেশে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে এবং আমার বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব কমিয়া গিয়াছে। আমি কোম্পানির সহিত সন্ধির সর্ত্ত অদ্যাপি পালন করিতেছি। কিন্তু কোম্পানির ভৃত্যেরা আমাকে ক্রমাগত ক্ষতি-গ্রস্ত করিতেছেন।" (১৭৬২ সালের মে মাসে লিখিত পত্র)

নবাব মীর কাশিমের কথায় যাঁহাদিগের বিশ্বাস না জন্মিবে, তাঁহা-দিগকে আমরা সার্জ্জেণ্ট ব্রেগো নামক শ্বেত পুরুষের ১৭৬২ সালের ২৬ শে মে তারিখে লিখিত পত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সার্জ্জেণ্ট মহোদয় ঐ পত্রে বলিয়াছেন,—"কোম্পানির ভৃত্যেরা আপনাদিগকে অসীম ক্ষমতাশালী বলিয়া মনে করে। কোম্পানির জন্য কোনও দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে হইলে ইহারা গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া অধিবাসী-দিগকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাল খরিদ বিক্রয় করিতে বাধ্য করে। কেহ কোম্পানির ভৃত্যদিগের আদেশ-পালনে অসম্মত বা অসমর্থ হইলে তাহাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত বা তৎক্ষণাৎ কারারুদ্ধ করা হয়। কেবল তাহাই নহে, অধিবাসীরা ইংরাজ বণিক্ ভিন্ন আর কাহারও মালের ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিবে না—এইরূপ সর্ত্তেও তাহাদিগকে বাধ্য করিবার জন্য জোর জুলুম করা হয়। এতদ্ব্যতীত কোম্পানির নামে কোম্পানির ভৃত্যগণের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য এইরূপ অত্যাচার করিয়া যে দ্রব্য ক্রয় করা হয়, তাহারও পূর্ণ মূল্য হতভাগ্য দেশবাসীদিগকে প্রদত্ত হয় না—কখনও কখনও আদৌ মূল্য দেওয়া হয় না! এইরূপ অত্যাচারের ফলে বাখরগঞ্জ জেলা ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার বিখ্যাত হাট বাজারেও আর বেশী জিনিষপত্র কিনিতে পাওয়া যায় না। তথাপি ইংরাজ বণিকের পিয়নেরা অবাধে দরিদ্র লোকের উপর জুলুম করিতে বিরত নহে। জমীদারেরা প্রজা-রক্ষার চেষ্টা করিলে তাঁহা-দিগকেও বিপন্ন করিবার ভয় দেখান হয়। পূর্ব্বে সরকারি কাছারীতে সাধারণে অভিযোগ করিয়া বিচার পাইত। এখন ইংরাজ বণিকের

গোমস্তাই বিচারকার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রত্যেক গোমস্তার ঘরেই আদালত বসিতেছে! গোমস্তারা বিচারক-রূপে জমীদারদিগের বিরুদ্ধেও দণ্ডাজ্ঞা-প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। জমীদারদের ব্যবহারে কোম্পানির ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে অকারণে টাকা আদায় করা হয়। গোমস্তার নিজের লোকেরা কোনও জিনিষ চুরি করিলেও জমীদারের লোকে করিয়াছে বলিয়া ভয় দেখাইয়া জমীদারের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইয়া থাকে!"

কেবল যে বাখরগঞ্জেই এইরূপ অত্যাচার হইত, তাহা নহে। বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র এইরূপ পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় ঘটিত। ঢাকার তদানীন্তন কলেক্টার মহম্মদ আলি ১৭৬২ সালের অক্টোবর মাসে ইংরাজ বণিক্‌দিগের অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া কলিকাতার গবর্ণরের নিকট যে পত্র লিখেন, তাহাতেও এই প্রকার অত্যাচারের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"কোম্পানির ভৃত্যেরা ঢাকা ও লক্ষ্মীপুরঅঞ্চলে অধিবাসীদিগকে তামাক, তূলা, লৌহ প্রভৃতি পণ্য বাজার দরের অপেক্ষা অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য করে! মূল্য আদায়ের কার্য্য সকল স্থলেই বলপূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পিয়নের খোরাকী বলিয়াও কিছু আদায় করা হয়। ফলে, এখানকার আড়তগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোম্পানির লক্ষ্মীপুরস্থিত কর্ম্মচারীরা আপনাদিগের বাসের জন্য বলপূর্ব্বক লোকের জমীজায়গা কাড়িয়া লয়, তাহার খাজনাও দেয় না। দুষ্ট লোকের পরামর্শে সিপাহী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া শ্বেতাঙ্গেরা অনেক গ্রামে গমনপূর্ব্বক অকারণে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে। স্থানে স্থানে মাশুল আদায়ের জন্য চৌকী স্থাপিত হইয়াছে। কোম্পানির ভৃত্যেরা দরিদ্র লোকদিগের গৃহে যাহা পায়, তাহা বিক্রয় করিয়া লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ করে। এই সকল জুলুমে দেশ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। প্রজারা ঘরে থাকিতে পায় না, মালগুজারী দিতে পারে না। অনেক স্থানে মিঃ শিভেলিয়ার জোর করিয়া কয়েকটি নূতন হাট ও শিল্পশালা (ফ্যাক্টরী) স্থাপন করিয়াছেন। তিনি জাল সিপাহী পাঠাইয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাহার নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিতেছেন। এই শ্বেতাঙ্গের জুলুমে এ অঞ্চলের অনেক হাট, ঘাট, পরগণা একেবারে উৎসন্ন হইয়াছে।"

উইলিয়াম বোল্টস্ নামক তদানীন্তন মেয়র কোর্টের জজ এই অত্যাচারের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আরও ভয়ানক। Considerations on Indian Affairs (1772 A. D.) নামক গ্রন্থে পাঠক সে বর্ণনা দেখিতে পাইবেন। তিনি বলেন,—"বঙ্গদেশে ইংরাজের বাণিজ্যকে অত্যাচারের ধারাবাহিক দৃশ্যাবলী বলিয়া উল্লেখ করিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। এই অত্যাচারের কুফল ঐ দেশের প্রত্যেক তন্তুবায় ও শিল্পী ভোগ করিতেছে। দেশের প্রত্যেক শিল্প দ্রব্যই ইংরাজ বণিকেরা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ শিল্পীকে কত মাল, কিরূপ মূল্যে, সরবরাহ করিতে হইবে, তাহা ইংরাজেরাই স্বেচ্ছামত স্থির করিয়া দেন। এজন্য দালাল, পাইকার ও তন্তুবায় প্রভৃতিকে সিপাহীর সাহায্যে কোম্পানির ভৃত্যদিগের নিকট হাজির করা হয়, এবং মালের পরিমাণ, মূল্য ও মাল দিবার সময় সম্বন্ধে একটা দলিলে আপনাদিগের সুবিধামত সর্ত্ত লিখিয়া তাহাতে শিল্পীদিগের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। সে বিষয়ে শিল্পীর সম্মতির বা মতামতের অপেক্ষা কেহই করেন না। শিল্পীর (তন্তুবায় প্রভৃতির) হস্তে কিছু টাকা প্রথমে বায়না বলিয়া প্রদত্ত হইয়া থাকে। সে লইতে অস্বীকৃত হইলে তাহার কাপড়ে উহা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর কাছারীর সিপাহীরা চাবুক মারিতে মারিতে তাহাদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দেয়! অন্য কাহারও কাজ করিবে না, এই সর্ত্তে অনেক শিল্পীকে বাধ্য করা হয়, এই সকল কার্য্যে কল্পনাতীত জুয়াচুরি খেলা হয়। প্রথমতঃ যে দরে তন্তুবায়দিগের নিকট বস্ত্রাদি ক্রীত হইয়া থাকে, তাহাই বাজার দরের অপেক্ষা অল্প; তাহার উপর "যাচনদার" বা বস্ত্র-পরীক্ষকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া উৎকৃষ্ট মালও অপকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহাতে হতভাগ্য তন্তুবায়দিগকে শতকরা ৪০ টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। এই সকল জুয়াচুরির জন্য যে সকল তন্তুবায় এগ্রিমেণ্ট বা চুক্তিপত্র অনুসারে মাল যোগাইতে অসমর্থ হয়, তাহাদিগের গৃহ ও গৃহজাতসমূহ তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করিয়া ক্ষতিপূরণ লওয়া হয়। রেশম-শিল্পী নাগোয়াড়দিগেরও প্রতি নানা প্রকার ভীষণ জুলুম হইয়া থাকে। ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াও ইহাদিগের নিষ্কৃতি ঘটে না। পাছে কোম্পানির লোকেরা ইহাদিগকে উৎপীড়নে জর্জ্জরিত করিয়া বস্ত্র-বয়ন কার্য্যে

বাধ্য করে, এই ভয়ে অনেক হতভাগ্য স্বহস্তে আপনাদিগের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিয়া অক্ষম সাজিয়া বসিয়া থাকে।"

ইংরাজ বণিকের অত্যাচারে বঙ্গের কেবল শিল্প-বাণিজ্যই যে বিনষ্ট হইতেছিল, তাহা নহে; কৃষিকার্য্যেরও ঘোর অবনতি ঘটিয়াছিল। এই বিষয়ের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বোল্টন্ মহোদয় বলেন,—"বঙ্গীয় প্রজার মধ্যে সাধারণতঃ সকলেই কৃষি ও শিল্পের সাহায্যে জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। কোম্পানীর গোমস্তারা তাহাদিগের নিকট হইতে শিল্প-জাত সংগ্রহের জন্য যে প্রকার অত্যাচার করে, তাহাতে হতভাগ্যেরা এরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, ভূমির উন্নতি-সাধনের শক্তি আর তাহাদিগের নাই। এমন কি, তাহাদিগের খজনা দিবার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, শিল্পজাতের জন্য তাহাদিগের উপর যেরূপ জুলুম হয়, ভূমির রাজস্ব আদায়ের জন্যও সেইরূপ হইয়া থাকে। রাজস্ব-কর্ম্মচারীদিগের অমানুষিক অত্যাচারে হতভাগ্য প্রজাকুল খাজনার টাকা যোগাড় করিবার নিমিত্ত প্রায়শঃ আপনাদিগের প্রাণ-প্রিয়তম সন্তানদিগকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়! যাহারা এই পৈশাচিক কার্য্যে অসমর্থ হয়, দেশ ছাড়িয়া পলায়ন ভিন্ন তাহাদিগের আর উপায়ান্তর থাকে না।"

পাঠক! এরূপ অত্যাচার ভারতবর্ষে, বা বঙ্গদেশে ঐতিহাসিক কালের মধ্যে কখনও হইয়াছিল কি? নাদিরশাহ, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতির নামে ত নিষ্ঠুরতার কলঙ্ক-কালিমা অক্ষয়ভাবেই লেপিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারাও কখনও এরূপ অত্যাচার কল্পনার বিষয়ীভূত করিতে পারিয়াছিলেন কি? অপরের কথা কি বলিব, কোম্পানির ডিরেক্টারেরাই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—

We think vast fortunes acquired in the inland trade have been obtained by *a scene of the most tyrannic and oppressive conduct that was ever konwn in any age or country.*

খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষে ও ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালীর সহিত ইংরাজের কিরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা লর্ড মেকলের নিম্নলিখিত উক্তি পাঠে হৃদয়ঙ্গম হইবে।—

The relations between the Bengalees and the English were such that the Englsh wire like wolves and the Bengalees like sheep, or the English were like demons and the Bengalees like men.

ব্যাঘ্রের সহিত মেষের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালীদের সহিত ইংরাজদিগের সেই সম্বন্ধ ছিল অথবা বাঙ্গালীরা মানুষ হইলে ইংরাজেরা রাক্ষস বা দানব ছিল বলিতে হয়।

বঙ্গীয় প্রজাকুলের উপর এই অকথ্য অত্যাচার দর্শন করিয়া সেকালে একটি ব্রাহ্মণ-কুমারের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তাঁহার অপর দোষ যাহাই থাকুক, তিনি এই ঘোর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শক্তির অভাবেই হউক, বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। এই ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কলিকাতার ইংরাজ কাউন্সিল ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই তারিখে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন,—

"Nobab Mir Jaffier has entered into an agreement with us that he or his officers should, on no account, interfere with the acts or conduct of the Factors and Gomastas of the East India Company and that these Factors and Gomastas should be allowed perfect liberty to act just as they pleased in furtherance of the commercial interests of the Company. *But a wicked Brahmin named Nundcumar*, notwithstanding the remonstrances of his master, the present Nobab of Murshidabad, always stands between the Company's servants and the weavers who take advances from them. *This man makes frequent complaints that the weavers are being oppressed by the servants and Gomastas of the East India Company. He has no right to make any such complaints when the Compay's servants are authorised by the Nobab himself to deal with these weavers just as they please, in furtherance of their most lawful trade. Nundcumar is really an enemy of East India Company.*"

ইহার ভাবার্থ এই যে,—নবাব মীরজাফর আমাদিগের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিয়াছেন যে, তিনি অথবা তাঁহার কর্ম্মচারীরা কোনও কারণে কোম্পানীর কুঠিয়াল বা গোমস্তাদিগের কার্য্যে বা ব্যবহারে হস্তক্ষেপ বা বাধা-দান করিতে পারিবেন না; তিনি কোম্পানির ভৃত্যদিগকে যদৃচ্ছা কার্য্য করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতাদান করিয়াছেন। কিন্তু নন্দকুমার নামক এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাহার প্রভু মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাবের নিষেধ-সত্ত্বেও কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যে পদে পদে বাধা দান করিতে অগ্রসর হয়; যে সকল তন্তুবায় টাকা দাদন লয়, সে তাহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিভ্রাট উপস্থিত করে। কোম্পানির গোমস্তা ও কুঠিয়ালেরা তন্তুবায়দিগের উপর জুলুম করিতেছে বলিয়া এই ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অভিযোগ উপস্থিত করে। বস্তুতঃ এই ব্রাহ্মণের এইরূপ অভিযোগ উত্থাপনের কোনও অধিকার নাই। কারণ নবাবের নিকট কোম্পানির ভৃত্যেরা তাঁহাদিগের প্রভুর ব্যবসায়-বৃদ্ধির জন্য তন্তুবায়দিগের সহিত স্বেচ্ছামত ব্যবহার করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। সুতরাং নন্দকুমার প্রকৃতপক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন শত্রু।

এইরূপে দরিদ্র স্বদেশীয় শিল্পীদিগের কষ্ট-বিমোচনের জন্য কোম্পানির

সহিত শক্রতাচরণ করিয়া পরিশেষে এই ব্রাহ্মণকে ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ-ত্যাগ করিতে হইল! দুঃখের বিষয়, বঙ্গের তদানীন্তন কূটনীতিকুশল প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের হৃদয় এই ঘটনাতেও তাদৃশ বিচলিত হয় নাই, স্বদেশীয় শিল্পি-কুলের দুঃখ-নিবারণে তাঁহাদিগের কেহই আগ্রহ-প্রকাশ করেন নাই। ইংরাজেরা অকর্ম্মণ্য দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে "দেওয়ানী" সনন্দ লাভ করিয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে দেশের রুধির-শোষণ করিতে লাগিলেন। লর্ড ক্লাইব বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—

No future Nobab will either have *power* or *riches* sufficient to attempt your overthrow by means either of force or corruption.

অর্থাৎ অতঃপর কোনও ভাবী নবাবের এমন ক্ষমতা বা অর্থবল থাকিবে না যে, তদ্দ্বারা এদেশে আপনাদিগের (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর) শক্তির উচ্ছেদ সাধিত হইতে পারে।

কিন্তু এইরূপ রুধির শোষণ করিয়াও কোম্পানি সম্পূর্ণ বিঘ্নশূন্য হইতে পারেন নাই। সদাশয় পেশওয়ে মাধব রাওয়ের আদেশে এই সময়ে মহাদজী শিন্দে বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজকে বিতাড়িত করিয়া তথায় হিন্দু-শাসন-প্রতিষ্ঠার জন্য সমরাভিযানের আয়োজন করিতেছিলেন। লালা সেবক রাম নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় দূতের সহিত জগমোহন দত্ত নামক জনৈক বাঙ্গালীর এবিষয়ে গুপ্ত পরামর্শ চলিতেছিল। ইংরাজেরা সে সংবাদ পাইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণকে জগমোহনের কার্য্য-কলাপ গোপনে অনুসন্ধান করিবার জন্য গুপ্তচর (spy) নিযুক্ত করেন। ফলে জগমোহন ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এই সকল ঘটনায় ইংরাজ আপনাদিগের পরিণাম চিন্তা করিয়া কিরূপ ভীত হইয়াছিলেন, ওয়ারেন হেষ্টিংসের পশ্চাল্লিখিত উক্তি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়,—

I much fear that it is not understood as it ought to be, how near the Company's existence has on many occasions vibrated to the edge of perdition and that it has at all times been suspended by a thread so fine that the touch of chance might break or the breath of opinion dissolve it and instantaneous will be its fall whenever it shall happen. (*British India.* By R. M. Frazar.

ইংরাজ মনীষী লর্ড মেকলেও সেই সময়কার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন;—

In what was this confusion to end? Was the strife to continue during centuries? Was it to terminate in the rise of another great monar-

chy ? Was the Musslman or the Maratha to be the Lord of India ? Was another Babar to descend from the mountains and to lead the hardy tribes of Kabul and Khorasan against a wealthier and less warlike race ? *None of these events seemed improbable.*

অর্থাৎ এই বিপ্লবের পরিণাম কি হইতে পারিত ? আরও কয়েক শতাব্দী কি এই সংঘর্ষ অব্যাহত ভাবেই চলিত ? অন্য কোনও মহাশক্তিসম্পন্ন রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটিয়া কি এই অরাজকতার শান্তি ঘটিত ? মুসলমান অথবা মারাঠা জাতিই কি ভারতের অধীশ্বর হইবার সুযোগ পাইতেন ? বাবরের ন্যায় আর এক জন বীরপুরুষ কি কাবুল ও খোরাসানের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে এক দল রণ-কর্কশ সৈনিক লইয়া ভারতের অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রিয় ও ধনবান্ জাতিসমূহের পরাজয় সাধন করিতেন ? এই সমস্ত ঘটনার কোনটিরই সংঘটন অসম্ভব ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

কিন্তু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব বলেন,—

So far as can now be estimated, the advance of British power at the beginning of the present (19th) Century, alone saved the Moghal Empire from passing to the Hindus ... The British won India not from the Moghals but from the Hindus.

অর্থাৎ এক্ষণে যতদূর অনুমান করা যাইতে পারে, তাহাতে ইংরাজ শক্তি এদেশে আবির্ভূত হওয়াতেই মোগল সাম্রাজ্য (সম্পূর্ণভাবে) হিন্দুদিগের করতলগত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজেরা মুসলমানদিগের নিকট হইতে ভারতবর্ষ গ্রহণ করেন নাই, হিন্দুদিগের হস্ত হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, লর্ড মেকলের উক্ত সম্ভবপর ঘটনা সমূহের মধ্যে কোন একটি যদি সত্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিত, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না। তবে এই বিংশ শতাব্দীতে মারাঠা বা মুসলমানের শাসনাধীন থাকিলেও যে ভারতবর্ষ তুরস্ক বা জাপানের ন্যায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় ও সুফল লাভ করিতে সমর্থ হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, মৎপ্রণীত বাজী রাওয়ের জীবন-চরিত পাঠ করিলে হণ্টার সাহেবের উক্তির যাথার্থ্য সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আজি কালিকার দিনে মোগল, পাঠান বা মহারাষ্ট্রীয় শাসনের কথা কর্ণগোচর হইলেই অনেকের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়া থাকে। জেতৃজাতির লিখিত বিকৃত ইতিহাস পাঠই এইরূপ আতঙ্কের প্রকৃত কারণ। রাজনীতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা

তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন ভারতীয় হিন্দু মুসলমান নরপতিগণের শাসন-কালকে অত্যাচার-মূলক বলিয়া বর্ণনা করিবার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এক রাজ্যের বিনাশ ও অপর রাজ্যের অভ্যুদয়—এতদুভয় ঘটনার মধ্যবর্ত্তী কাল যে সকল দেশেই বিপ্লব-পূর্ণ ও জাতীয় উন্নতির পক্ষে প্রতিকূল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, একথা ইঁহারা পাঠকদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে দেন না, এবং মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ও মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্ত্তী সময়ে দেশে যে স্বাভাবিক অশান্তির সূচনা হইয়াছিল, তাহাকেই ইংরাজ লেখকেরা দেশীয় শাসনের আদর্শরূপে বর্ণনা করিয়া বর্ত্তমানকালের সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজ শাসনের সহিত তাহার তুলনা করিয়া থাকেন। বরোদার মহারাজ শ্রীসয়াজি রাও গায়কোয়াড় মহোদয় গত ৬ই জুলাই ১৯০৫ সালের বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে হায়দ্রাবাদ রাজ্য-সম্বন্ধে আলোচনা-কালে ইংরাজ-লেখকদিগের এই ব্যবহারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

Such times of crisis, following the overthrow of one Empire and preceding the establishment of another, were not unknown in other countries besides India. *It was a mistake to take this period of history as affording evidence that the people of India were not capable of managing their own concerns.*

ফলতঃ, নূতন ও পুরাতন সাম্রাজ্যের সন্ধি স্থলে পতিত হইয়া ১৮শ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজ কিয়ৎপরিমাণে অশান্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়া যে তাহাতে শাসন-শক্তির অভাব ছিল বা ভারতীয় রাজগণের শাসনপদ্ধতি দোষপূর্ণ ছিল, এমন কথা বলা মূর্খতার পরিচায়ক মাত্র। (১) ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর ভারতবর্ষের অবস্থাভিজ্ঞ রাজপুরুষ গুণগ্রাহী সার জন সলিভান জেনারেল ব্রিগ্‌স্ মহোদয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও এই ভাব দৃষ্ট হয়। তিনি লিখিয়াছিলেন,—

(1) "It has been said that Great Britain can rule India better than India can rule herself. A sufficient answer to this claim would seem to be India's increasing famines, increasing impoverishment and increasing discontents of her people. But another answer also is seen in relative conditions of Britain-ruled India and self ruled Japan. When the British came on the scene, India was the leader of Asiatic civilization; she was far in advance of Japan. Time has passed. India has been ruled by a foreign power, Japan has governed herself, and shaped her own develop-

Pray do not give the enemy advantage by speaking in uuqualified terms of the bad government of our predecessors. Considering the incessant wars and revolutions in which they had been engaged for a full century after the Moghul Empire broke up, it is quite a wonder that there was any government at all. Yet in the midst of incessant fighting *the civil institutions were undisturbed and almost everywhere the country was flourishing.* Since our last good piece of work, when we put down the Pindary ravages in 1818, we have held India with such an iron grasp that hardly a shot had been fired in our territory. But what have we made of this quiet inetrval? The Government is more in debt and I doubt if the people are so rich.

ভাবার্থ—আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাষ্ট্র শাসনের নিন্দা করিয়া শত্রুপক্ষকে কোন অপ্রিয় কথা বলিবার অবসর অনুগ্রহ করিয়া দান করিবেন না, ইহাই আমার নিবেদন। মোগল রাজ্য বিনষ্ট হইবার পর পূর্ণ এক শতাব্দী কাল মহারাষ্ট্রীয়েরা যে অনবরত যুদ্ধবিগ্রহে ও বিপ্লবাদিতে লিপ্ত ছিলেন, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয় যে, এত গোলযোগের মধ্যেও যে এদেশে কোন গবর্ণমেণ্ট বা শাসনতন্ত্র বিদ্যমান ছিল, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! তথাপি এই সকল অবিশ্রান্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও দেশের শ্রীসম্পদ ও সামাজিক ব্যবস্থাদির কিছুমাত্র বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই এবং দেশের প্রায় সকল অংশেরই সমৃদ্ধি বাড়িতেছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে আমরা পিণ্ডারীদিগের দমন করিয়া যে শেষ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহার পর হইতে এদেশে আমাদিগের কঠোর শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; তদবধি দেশের কুত্রাপি একটীও বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় নাই; কিন্তু এই দীর্ঘ শান্তি কালের মধ্যে আমরা কি করিয়াছি? ভারতগবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঋণজালে জড়িত হইয়াছেন; দেশের লোকও তাদৃশ ধনশালী হইয়াছে কি না, তাহাতে আমার সন্দেহ আছে।

---

ment. What has been the result? Which country now is in the advance, India or Japan?"—*The Causes of Famine in India.* By Rev. J. T. Sunderland M. A.

পাদরি স্যাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেব বলেন,—

ইংরাজেরা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, ভারতবাসী দ্বারা ভারতবর্ষ যেরূপে শাসিত হইতে পারে, ইংরাজের দ্বারা তদপেক্ষা অধিকতর উত্তমরূপে শাসিত হইয়া থাকে। এই তর্কের উত্তরে বক্তব্য এই যে, ভারতের নিত্যবর্দ্ধনশীল দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য ও অসন্তোষ ইংরাজ শাসনের অপকর্ষ ঘোষণা করিতেছে। আত্ম-শাসিত জাপানের সহিত বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের অবস্থার তুলনা করিলেও এই তত্ত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। যখন ইংরাজেরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন ভারতবর্ষ সভ্যতা সম্বন্ধে এসিয়াখণ্ডে সকলের অগ্রগণ্য ছিল; জাপানের অপেক্ষা ভারতবর্ষ সভ্যতায় বহু অগ্রবর্ত্তী ছিল। ইহার পর দেড় শত বৎসর অতীত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকাল জাপান স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় রাজা দ্বারা শাসিত হইয়াছে এবং বৃটিশজাতি ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। ইহার পরিণাম কি হইয়াছে? ভারতবর্ষ ও জাপান এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ দেশ এক্ষণে সভ্যতায় অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে?

পাঠক,এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাষ্ট্র-বিল্পবে বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষে লোকের সুখ ও শান্তি কিরূপে অক্ষুণ্ণ ছিল এবং দেশের ধনসম্পদ কিরূপে বৃদ্ধি পাইতেছিল, জানেন? অভিজ্ঞ ইংরাজ রাজপুরুষেরা এবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এদেশের পল্লিসমাজ (ভিলেজ কমিউনিটিজ)-গুলির সুব্যবস্থাই ইহার প্রধান কারণ। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব লিখিয়াছেন,—

Their village communities are almost sufficient to protect their members if all other government are withdrawn.

ভাবার্থ এই যে, ভারতবাসীর পল্লিসমাজগুলি এরূপ কৌশলে গঠিত যে, যদি দেশে কোনও রাজতন্ত্র না থাকে, তাহা হইলেও ঐ সকল সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের সুখ-শান্তি প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস মেট্‌কাফ্ লিখিয়াছেন,—

The village communities are little republics, having nearly everything they want within themselves. They seem to last where nothing else lasts. Dynasty after dynasty tumbles down, revolution succeeds to revolution, Hindu, Pathan, Moghul, Marhatta, Shikh, English are masters in turn, but the village communities remain the same .....The union of village communities each one forming a little seperated State in itself, has, I conceive,contributed more than any other cause to the preservation of the people of India through all revolutions and changes which they have suffered and it is in a high degree conducive to their happiness and to the enjoyment of great portion of freedom and independence.

ভাবার্থ—ভারতের পল্লিসমাজগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রমূলক রাজ্যের তুল্য; পল্লিবাসীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাই এই সকল পল্লিসমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে আর সমস্তই কালের প্রভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেখানেও পল্লিসমাজগুলি অক্ষুণ্ণ-প্রায় রহিয়াছে, বলিয়া মনে হয়। দেশে এক রাজ-বংশের পর অপর রাজবংশের পতন হইয়াছে, রাষ্ট্রবিপ্লবের পর রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরাজ প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে দেশ শাসন করিয়াছেন; কিন্তু ভারতের পল্লিসমাজগুলি এই সকল বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন-সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আমার মনে হয়, এ পর্য্যন্ত ভারতে যে সকল বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাদের সংঘর্ষ হইতে এই পল্লিসমাজগুলিই দেশবাসীকে বহু পরিমাণে রক্ষা করিয়াছে। পল্লিসমাজের ব্যবস্থানিচয় জনসমাজকে বহু পরিমাণে সুখশান্তি, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিয়াছে। (১)

(১) দুঃখের বিষয় এই যে, দেশবাসীর শক্তি হরণ করিবার উদ্দেশ্যে ইংরাজ চেষ্টা করিয়া ভারতীয় পল্লিসমাজগুলিকে বিনষ্ট করিয়াছেন।

ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে আলিবর্দ্দী খাঁর আমলে বঙ্গদেশ কিরূপ সুসমৃদ্ধ ছিল, তাহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নহে। বিধর্ম্মী রাজাদিগের মধ্যে আলিবর্দ্দী খাঁর ন্যায় সুশাসক এদেশে অতি অল্পই রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। মুসলমান আমলের বিচার-পদ্ধতিকে আমরা এখন "কাজির বিচার" বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি; কিন্তু সে সময়ে ইউরোপে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যেরূপ বিচার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত তুলনা করিলে এদেশের মুসলমানদিগের বিচার-প্রণালীর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না. একথা রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব তাঁহার The Early History and Growth of Calcutta নামক গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজেরা এদেশে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন করিয়া যে পাশ্চাত্য বিচার-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে লর্ড মেকলে বলিয়াছেন,—

No Mahratta invasion has ever spread through the province such dismay as this inroad of English lawyers. All the injustice of the former oppressions, Asiatic or European, appeared as a blessing when compared with the justice of the Supreme Court.

ভাবার্থ—ইংরাজ উকিল ও ব্যারিষ্টারদলের দৌরাত্ম্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচার বিভ্রাটে দেশের লোকে এরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার তুলনায় বর্গীর হাঙ্গামা বা কোম্পানির ভৃত্যগণের ভীষণ অত্যাচারও তাহাদের নিকট সুখকর ঘটনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল!

ইংরাজ শাসন এদেশে প্রবর্ত্তিত না হইলে ভারতের অবস্থা বর্ত্তমান সময়ে কিরূপ হইত, তৎসম্বন্ধে মেকলে ও হণ্টার সাহেবের আনুমানিক সিদ্ধান্তের উল্লেখ ইতঃপূর্ব্বে করিয়াছি। পাদরি সণ্ডারল্যাণ্ডের উক্তিও উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ বিষয়ে বরোদার সুশিক্ষিত মহারাজ শ্রীসয়াজী রাও মহোদয়ের মত কিরূপ, তাহাও উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বোক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের বক্তৃতা প্রসঙ্গেই তিনি বলেন,—

The subject requires delicate handling from me, because the least mistake may be misunderstood............ I think if the British and French Government had not come on the scene, it would have been an interesting problem, which it is now useless to discuss, what would have become of India—whether many of the States would have vanished, whether some of them would have established a supremacy over others or whether they would have been formed into United States, something like those of America.

ইংরাজ ও ফরাসী ভারতের রঙ্গক্ষেত্রে আবির্ভূত না হইলে হয়, এদেশের খণ্ডরাজ্যগুলির মধ্যে কয়েকটি অবশিষ্টগুলির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিত, না হয় অধিকাংশ ক্ষুদ্ররাজ্যের বিলোপ ঘটিয়া কয়েকটি বৃহৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত, অথবা সমস্ত খণ্ডরাজ্যের সমবায়ে কিয়দংশে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের ন্যায় এদেশেও একটি বিশাল যুক্তরাজ্য গঠিত হইত—ইহাই মহারাজ শ্রীসয়াজি রাওয়ের আনুমানিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংসের আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যমূর্ত্তি ধারণ করিল।

সে যাহা হউক, বঙ্গের যে সকল মনীষী সিরাজদ্দৌলার ঔদ্ধত্যদর্শনে বিচলিত হইয়া তাঁহার পদচ্যুতির জন্য অসাধারণ কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইংরাজ বণিকের হস্তে লক্ষ লক্ষ স্বজাতীয়ের অমানুষিক দুর্দ্দশা দর্শন করিয়াও বিচলিত হন নাই। কোম্পানির ভৃত্যেরা অত্যাচার-প্রিয়তায় সিরাজকে পরাজিত করিয়াও কিরূপে বঙ্গের প্রধান ব্যক্তিগণের বিরাগ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। সৌভাগ্যক্রমে ভৃত্যদিগের অনুষ্ঠিত অত্যাচার-নিবারণে পরিশেষে কোম্পানির ডিরেক্টারদিগকেই মনোযোগ করিতে হইল। কারণ, ভারতবর্ষে আসিয়া এক এক দল ইংরাজ অল্পদিনের মধ্যে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছিল, ইহা ইংলণ্ডীয় অনেক ইংরাজেরই নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং তাহারা প্রবল ঈর্ষ্যার বশীভূত হইয়া কোম্পানির ভৃত্যদিগের অর্থোপার্জ্জনের পথে কণ্টকারোপের চেষ্টা করিতে লাগিল। দলে দলে ইংলণ্ডবাসী কোম্পানির ডিরেক্টারদিগের আফিসে গিয়া তাঁহাদিগের ভারতবর্ষ-স্থিত ভৃত্যদিগের অর্থ-লোভের ও অত্যাচার-উৎপীড়নাদির তীব্র প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল! কাজেই ডিরেক্টারেরা বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীদিগের প্রতি উৎকোচ ও অত্যাচার পরিত্যাগ করিতে কঠোর আদেশ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত কর্ম্মচারীদিগের দুর্নিবার অর্থ-লোভে ও অত্যাচার-প্রিয়তায় ডিরেক্টারদিগের আদেশসমূহ পদে পদে লঙ্ঘিত হইতেছিল। যাহা হউক, পরিশেষে তাঁহাদিগের দীর্ঘকালের চেষ্টায় অল্পে অল্পে অত্যাচারের মাত্রা হ্রাস পাইল।

এইরূপে কালক্রমে কোম্পানির ভৃত্যদিগের অত্যাচার নিবারিত

হইল বটে, কিন্তু বঙ্গবাসী শিল্পি-সমাজের দুর্দ্দৈব ঘুচিল না। কারণ, কোম্পানির ডিরেক্টারেরা ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই মার্চ্চের আদেশ-পত্রে এখানকার কর্ম্মচারীদিগের প্রতি অভিনব অত্যাচারের সূত্রপাত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "বঙ্গের সমস্ত রেশম-শিল্পীদিগকে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। অতঃপর কেহ যাহাতে স্বগৃহে স্বাধীনভাবে পট্ট-বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে না পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কোম্পানির শিল্প-শালায় (ফ্যাক্টরীতে) গিয়া কার্য্য করিতে শিল্পীদিগকে বাধ্য করিতে হইবে। যাহারা স্বাধীনভাবে রেশম-শিল্পের ব্যবসায় করিবে, তাঁহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবে।" এই অত্যাচার মূলক আদেশ-প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে, বঙ্গীয় রেশম-শিল্পের ধ্বংস-সাধন ও ইংলণ্ডের ইংরাজ শিল্পীদিগের উন্নতির পথ-প্রসার, একথা দশম-বর্ষীয় বালকেও বুঝিতে পারে।

দীর্ঘকালব্যাপী এইরূপ অকথ্য অত্যাচারের ফলে এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। ইংরাজ বণিকেরা বৈধ প্রতি-যোগিতার পরিবর্ত্তে এই প্রকার পাশব-বলের সাহায্যে ভারতবর্ষীয় শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস-সাধন করিয়াছেন, এদেশবাসীর অপরিমেয় ধনসম্পত্তি অন্যায়-পূর্ব্বক লুণ্ঠন করিয়া ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছেন। ইউরোপের অধিকাংশ সভ্যতাভিমানী জাতি এইরূপে পরস্বাপহরণ করিয়াইবর্ত্তমান সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। *

---

* Much of modern European national prosperity is based upon the plunder of nations representing ancient civilisations. Spain robbed South America ; England from Elizabeth to Cromwell seized as many of the Lusitanian treasure ships on their way to Spain as she could and apropriated what they carried.

England's industrial supremacy owes its orign to the vast hoards of Bengal and the Carnatic treasure being made available for her use. Before Plassy was fought and own, and before the stream of treasure began to flow to England, the industries of our country was at a very low ebb. *Lancashire spinning and weaving were on a par with the corresponding industry in India so far as machinery was concerned, but the skill which made Indian cotton a marvel of manufacture was wholly wanting in any of the Western nations.* As with cotton so with iron, industry was in Britain at a very low ebb, alike in mining and in manufacture. Modern England has been made great by Indian wealth, wealth never proffered by its possessor, but always taken by the might or skill of the stranger.

Prosperous British India.

দেশীয় শিল্পের ধ্বংস।

—০:০:০—

The cotton and silk goods of India up to the period (1813, A. D.) could be sold for a profit in the British market at a price from 50 to 60 per cent. lower than those fabricated in England. It consequently became necessary to protect the latter by duties of 70 and 80 per cent. on their value or by positive prohibition. Had this not been the case, had not such prohibitory duties and decrees existed, the mills of Paisley and Manchester would have been stopped in their outset, and could scarcely have been again set in motion, *even by power of steam*. They were created by the sacrifice of the Indian manufacture. Had India been independent she would have retaliated, would have imposed prohibitive duties upon British goods and would thus have preserved her own productive industry from annihilation. This act of self-defence was not permitted her; she was at the mercy of the stranger. British goods were forced upon her without paying any duty and the foreign manufacturer employed *the arm of political injustice* to keep down and ultimately strangle a competitor with whom he could not have contended on equal terms." *Mill's History of British India.* (Wilson)

অর্থাৎ ভারতীয় কার্পাস ও রেশমজাত বস্ত্রাদি ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিলাতের বাজারে, বিলাতী শিল্পীদিগের নির্ম্মিত পণ্য অপেক্ষা শতকরা ৫০।৬০ টাকা কম মূল্যে বিক্রীত হইত। এই কারণে বিলাতী শিল্প পণ্যের রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতীয় পণ্যের উপর শতকরা ৭০।৮০ টাকা শুল্ক স্থাপন করা বা উহাদের বিক্রয় নিষিদ্ধ করা ইংরাজদিগের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। ইংরাজেরা যদি এইরূপে ভারতীয় পণ্যের উপর গুরুতর শুল্ক স্থাপন ও উহার আমদানি রহিত করিবার ব্যবস্থা না করিতেন, তাহা হইলে পায়েসলি ও ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কলগুলি প্রারম্ভেই বন্ধ হইয়া যাইত—এমন কি. বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে কলগুলি চালাইলেও উহা লাভজনক হইত কি না সন্দেহ। ঐ কলগুলি চালাইবার জন্য ভারতীয় শিল্পের ক্ষতি-সাধন করিতে হইয়াছিল। ভারতবাসীর যদি স্বাধীনতা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা ইহার প্রতিকার করিতে পারিত, বিলাতী মালের উপর স্বেচ্ছামত গুরুতর শুল্ক স্থাপন করিয়া আপনাদিগের লাভজনক শিল্প-ব্যবসায়কে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু এই আত্মরক্ষার অধিকার হইতেও ইংরাজ ভারতবাসীকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে এ বিষয়ে বৈদেশিকদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। বিলাতী পণ্যসামগ্রীসমূহ বিনা শুল্কে ভারতে আনিয়া ইংরাজেরা ভারতবাসীকে উহা ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ভারতীয় শিল্পীদিগের সহিত সরল ভাবে প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়া বিলাতী শিল্প-ব্যবসায়ীরা রাজনীতিক কূটাস্ত্রের সাহায্যে প্রথমে তাহাদিগের দমন ও পরিশেষে শ্বাসরোধপূর্ব্বক বিনাশ-সাধন করিয়াছিলেন। (অধ্যাপক উইলসন সম্পাদিত মিল সাহেবের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'।)

যাঁহারা মনে করেন, বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে নির্ম্মিত পণ্যসামগ্রীর সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হওয়াতেই আমাদিগের স্বদেশী শিল্পিগণের হস্ত-কৌশলে নির্ম্মিত পণ্য ক্রমশঃ পরাভূত ও বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা ঐতিহাসিক উইলসনের উপরি উদ্ধৃত উক্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলে, আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। ইতঃপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে শ্বেতাঙ্গ বণিক্‌দিগের ভীষণ অত্যাচারে বঙ্গের শিল্পী ও ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় নিতান্ত জর্জ্জর হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্ত্তারা সে সকল জুলুম বন্ধ করিয়া অভিনব অত্যাচারের সূত্রপাত করেন। তাঁহাদিগের আদেশে বঙ্গদেশের অধিকাংশ শিল্পী স্বাধীন-ভাবে বস্ত্রাদি-বয়ন করিবার অধিকারে বঞ্চিত হয়।

এই সকল অত্যাচারে বঙ্গীয় শিল্প-বাণিজ্যের বহু পরিমাণে অবনতি হইলেও সম্পূর্ণ বিনাশ হয় নাই। দীর্ঘকাল অত্যাচার সহ্য করিয়াও বঙ্গীয় শিল্পিগণ যে সকল বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া বিলাতে প্রেরণ করিতেন, তাহা সেখানকার বাজারে বিলাতী শিল্পীদিগের নির্ম্মিত পণ্য অপেক্ষা শতকরা ৫০—৬০ টাকা কম মূল্যে বিক্রয় করিলেও যথেষ্ট লাভ থাকিত। ইংরাজ বণিকেরা ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা একদিকে ভারতীয় পণ্য-সামগ্রীর উপর গুরুতর শুল্ক-স্থাপন করিয়া ও অপর দিকে বিলাতী মাল বিনা শুল্কে এদেশে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কৃত-সংকল্প হইলেন। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষে বিলাতী মালের কাট্‌তি বাড়িতে পারে, তাহাই তাঁহাদিগের এক মাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য পার্লামেণ্টের হাউস অব কমন্সের আদেশে গঠিত একটি কমিশনে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস, স্যার টমাস মনরো, স্যার জন ম্যালকম, জন ষ্ট্রাচী প্রভৃতির ন্যায় ভারতের অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইতে লাগিল,—

From your knowledge of the Indian character and habits, are you able to speak to the probability of a demand for European commodities by the population of India, for their own use?

অর্থাৎ ভারতবাসীর স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে আপনাদিগের যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আপনারা কি বলিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের অধিবাসী দিগের পক্ষে তাহাদের নিজের ব্যবহারের জন্য ইউরোপীয় পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করিবার কোনও সম্ভাবনা আছে কি না?

এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষীদিগের সকলেই বলিলেন, "ভারতবর্ষ-জাত

দ্রব্যেই ভারতবাসীর সকল অভাব দূরীভূত হইয়া থাকে। তাহারা আদৌ বিলাস-প্রিয় নহে। ভারতীয় শ্রমজীবীরা মাসে তিন চারি টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না। ফল কথা, ভারতবাসীর নিকট বিলাতী দ্রব্যের আদর হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।" টমাস্ মনরো মহোদয় সেই সময়ে সাক্ষ্য-দান-কালে বলিয়াছিলেন, "ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বিলাতী পণ্যের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। একখানি ভারতীয় শাল আমি সাত বৎসরকাল ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু এই দীর্ঘকালের ব্যবহারেও উহার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, আমি ইউরোপীয় শাল বিনা মূল্যে উপঢৌকন-স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেও তাহা ব্যবহার করিতে চাহি না।"

এইরূপ নৈরাশ্য-জনক উত্তর পাইয়াও বিলাতী বণিক্‌সমাজ নিরস্ত হইলেন না। তাঁহারা স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া রাজশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের উপর অতি গুরুতর শুল্ক স্থাপন করিয়া উহার শক্তি-নাশ করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই স্বতন্ত্রভাবে বস্ত্রবয়নাদি কার্য্য নানা স্থানে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের উপর বিলাতে শতকরা ৭০ হইতে ৮০ টাকা পর্য্যন্ত কর বসান হইল। এদিকে ভারতে আমদানী বিলাতী কাপড় বিনা শুল্কে দেশের সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এইরূপ গর্হিত আচরণে লজ্জিত না হইয়া ইংরাজ বণিকেরা স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেন, "ইহা কোনও ক্রমেই দূষ্য নহে। আমরা ইহাকে আমাদিগের স্বদেশীয় পণ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধক "রক্ষা-শুল্ক" বলিয়া মনে করি,—

(We) "Look upon it as a protecting duty to encourage our own manufactures."

মালাবার অঞ্চলের ক্যালিকো নামক ছিটের কাপড় পূর্ব্বে বিলাতে বহু পরিমাণে রপ্তানি হইত। ১৬৭৬ সালে বিলাতে প্রথম এই কাপড় প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপিত হয়। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে এই শিশু-শিল্পের সহায়তা-কল্পে তন্তুবায়দিগের আবেদনে ভারতবর্ষীয় ক্যালিকো ছিটের ও রেশমী কাপড়ের আমদানি নিষিদ্ধ করিয়া পার্লামেণ্ট মহাসভা এক আইন পাশ করিলেন।

The parliament passed two acts—called by sir George Birdwood "the scandalous law of 1700"—which both obtained the Royal

assent on the 11th of April, by which it was enacted "that from and after the 29th day of September, 1701, all wrought silks, and stuffs mixed with silk or herba, of the manufacture of China, Persia, of the East India, and all Calicoes, painted or stained there, which are or shall be imported into this kingdom, shall not be worn or otherwise used in Great Britain ; and all goods imported after that day, shall be warehoused or exported again."—W W. Hunter.

ইহার ভাবার্থ এই যে, খ্রীষ্টীয় ১৭০০ সালে পার্লামেণ্ট দুইটি বিধান বিধিবদ্ধ করেন। এই বিধান দুইটিকে স্যার জর্জ্জ বার্ডউড "১৭০০ সালের কলঙ্কর আইন" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বর এই উভয় আইনেই ঐ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে অনুমোদন করেন। এই আইন অনুসারে ১৭০১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে বঙ্গদেশ ও চীনদেশে প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার রেশম পণ্যের, ভারতীয় ক্যালিকো বস্ত্রের ও সর্ব্ববিধ ছিটের বিলাতে আমদানি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ঐরূপ মাল আমদানী হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ ভারতে ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, ইহাও এই আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

অতঃপর ভারতীয় ছিটের উপর প্রতি বর্গ গজে তিন পেন্স বা দেড় আনা করিয়া শুল্ক স্থাপিত হইল। সেই সঙ্গে সাদা ক্যালিকোর উপরও আমদানি শুল্ক বসান হইল। দুই বৎসর পরে বিলাতী তন্তুবায়দিগের অনুরোধে পার্লামেণ্ট ক্যালিকো ছিটের শুল্ক দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রতি গজে তিন আনা করিলেন! ১৭২০ সালে আইন হইল, ভারতীয় ক্যালিকো বিলাতে যাহারা বিক্রয় করিবে, তাহাদিগকে ২০ পাউণ্ড বা দুই শত টাকা ও উহার ব্যবহারকারীকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করা হইবে। *

অন্যান্য পণ্যের উপর কিরূপ শুল্ক গৃহীত হইত, দেখুন—

ঘৃতকুমারী	শতকরা	৭০৲	হইতে	২৮০৲
হিঙ্গু	„	২৩৩৲	„	৬২২৲
এলাচী	„	১৫০৲	„	২৬৬৲
কাফি	„	১০৫৲	„	৩৭৩৲
মরিচ	„	২৬৬৲	„	৪০০৲
চিনি	„	৯৪৲	„	৩৯৩৲
চা	„	৬৲	„	১০০৲
ছাগ-লোম-জাত পণ্য		৮৪৷৶০		
মাদুর	„	৮৪৷৶০		
মসলিন	„	৩২৷০		

* Useful Arts and Manufactures of Great Britain pp. 363.

ক্যালিকো শতকরা	৮১৲
কার্পাস প্রতি মণে প্রায়	১৫৲
কার্পাস বস্ত্র শতকরা	৮১৲
লাক্ষা	৮১৲
রেশম	২৸৹ তদ্ভিন্ন প্রতি সের ৪৲

একে কোম্পানির কুঠীতে দেশীয় শিল্পীদিগকে বল-পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য করায় দেশীয় কারখানাগুলির লোকসান হইতেছিল, তাহার উপর দেশীয় পণ্যের উপর উল্লিখিত প্রকারে উচ্চহারে শুল্ক স্থাপিত হওয়ায় এখানকার শিল্পবাণিজ্যের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল।

এইরূপ গর্হিত উপায়ে ভারতীয় শিল্পের বিনাশ-সংসাধন করিয়া এদেশে বিলাতী মালের প্রচলন করা হইল। ফলে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে যে ভারতে ১৫৬ পাউণ্ডের অধিক বিলাতী কার্পাস-জাত বস্ত্রের আমদানি হয় নাই, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই ভারতে ১ লক্ষ ১৮ হাজার চারি শতাধিক পাউণ্ড মূল্যের শুদ্ধ বিলাতী কাপড়ের আমদানি হইল! এই প্রকারে ক্রমশঃ ভারতবর্ষ বিলাতী মালের খরস্রোতে প্লাবিত হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে বিলাতে ও অপরাপর দেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। দেশীয় শিল্প-জাতের অবনতির বেগ কিরূপ প্রবল হইয়াছিল, নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে।

বিলাতে দেশীয় পণ্যের রপ্তানির হিসাব,—

তুলা।

১৮১৮ খ্রীঃ	১,২৭,১২৪ গাঁইট।
১৮২৮ খ্রীঃ	৪,১০৫ গাঁইট।

কাপড়।

১৮০২ খ্রীঃ	১৪,৮১৭ গাঁইট।
১৮২৯ খ্রীঃ	৪৩৩ গাঁইট।

লাক্ষা।

১৮২৪ খ্রীঃ	১৭,৬০৭ মণ
১৮২৯ খ্রীঃ	৮,২৫১ মণ

কিন্তু নীলের ও কাঁচা রেশমের রপ্তানি বাড়িতে লাগিল। সেই সঙ্গে গুরুতর শুল্কের জন্য ভারতবর্ষের রেশমী কাপড়ের প্রতিপত্তি বিলাতে হ্রাস পাইতে লাগিল।

এই সময়েও আবেদন নিবেদনের ত্রুটী হয় নাই। ভারতবাসীর পক্ষ হইতে ঐ অবৈধ কর লাঘব করিবার জন্য অনেকবার পার্লামেণ্টে আবেদন-পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ দেশীয় শর্করাদির শুল্ক হ্রাস করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কতিপয় ইংরাজ বণিকও তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ "ভিক্ষারাং নৈব নৈব চ" নীতির অনুসরণ করিলেন।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একমাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিই ভারতে মাল আমদানি রপ্তানি করিতেন। ঐ অব্দ হইতে ইংলণ্ডের সকল বণিকেরাই ভারতে ব্যবসায় করিবার অধিকার লাভ করিলেন। সুতরাং বিলাতী মালে ভারতবর্ষের হাট-বাজার ক্রমেই পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬৫॥০ লক্ষ পাউণ্ড বা সাড়ে ছয় কোটী টাকার বিলাতী মাল ভারতে আমদানি হইল।

ভারতীয় শিল্পবাণিজ্য-নাশের জন্য কোম্পানি বাহাদুর পূর্ব্বকথিত গর্হিত উপায়াবলীর অবলম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা ভারতেও দেশীয় শিল্পের উপর গুরু কর-ভার স্থাপন করিয়াছিলেন। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান হয়, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, বিলাতী কাপড় ভারতে শতকরা ২॥০ টাকা কর দিয়া বিক্রয় হইত; কিন্তু ভারতবাসীরা, আপনাদিগের ব্যবহারের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিলেও তাহার উপর শতকরা ১৭॥০ টাকা কর দিতে বাধ্য হইতেন। দেশীয় চর্ম্ম-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি দেশে ব্যবহৃত হইলেও কর্তৃপক্ষ তাহার উপর শতকরা ১৫৲ টাকা শুল্ক আদায় করিতেন। দেশীয় চিনির উপর বিলাতী চিনি অপেক্ষা শতকরা ৫৲ টাকা অধিক কর আদায় করা হইত। এইরূপে ভারতের প্রায় ২৩৫ প্রকার বিভিন্ন পণ্যের উপর অতি গর্হিত অন্তর্ব্বাণিজ্য কর (Inland duties) সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রায় ষষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত এই প্রকার উচ্চহারে কর দান করিতে বাধ্য হইয়া ভারতীয় শিল্পী ও ব্যবসায়ীর দল অবনতির নিম্নস্তরে পতিত হইলেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

এই সকল অত্যাচারে বিদেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি কমিতে

লাগিল। আমেরিকা, ডেনমার্ক, স্পেন, পোর্ত্তুগাল, মরীচ দ্বীপ ও এশিয়াখণ্ডের অন্যান্য প্রদেশের সহিত ভারতীয় শিল্পীর সম্বন্ধ হ্রাস পাইতে লাগিল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে এদেশ হইতে আমেরিকায় ১৩,৬৩৩ গাঁইট কাপড় গিয়াছিল, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে উহার পরিমাণ কমিয়া ২৫৮ গাঁইটে পরিণত হইল! ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ডেন্‌মার্কে ন্যূনাধিক ১,৪৫০ গাঁইট কাপড় রপ্তানি হইত; কিন্তু ১৮২০ সালের পর ঐ দেশে ১৫০ গাঁইটের অধিক কাপড় আর কখনই রপ্তানি হয় নাই। ১৭৯৯ খ্রীঃ ভারতের শিল্পব্যবসায়িগণ ৯,৭১৪ গাঁইট কাপড় পোর্ত্তুগালে পাঠাইয়াছিলেন; ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের পর আর তাঁহারা ১০০০গাঁইটের অধিক কাপড় পাঠাইতে পারেন নাই। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আরব ও পারস্য সাগরের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে ৪ হাজার হইতে ৭ হাজার গাঁইট কাপড় ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইত; কিন্তু ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের পর ঐ সকল অঞ্চলে ২ হাজার গাঁইটের অধিক মাল আর কখনই প্রেরিত হয় নাই! মহম্মদ রেজা খাঁর আমলে বঙ্গদেশীয় তন্তুবায়গণ ছয় কোটী স্বদেশবাসীর লজ্জা নিবারণ করিয়াও প্রতি বৎসর ১৫ কোটী টাকার বস্ত্রজাত বিদেশে প্রেরণ করিতেন। ইদানীং তাঁহারা বৎসরে ৩ লক্ষ টাকার মালও রপ্তানি করিতে পারেন না! ভারতীয় বস্ত্রশিল্পীদিগের স্বাধীন ব্যবসায়ে বাধা দান করিয়া ইংরাজ এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের কিরূপ সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াছিলেন, এই সকল অঙ্ক হইতে তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিলাতে অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্ত্তনে অর্থনীতিবিদ্‌গণের আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল বটে, কিন্তু ভারতের শিল্পব্যবসায় যত দিন সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হইল, ততদিন বৃটিশ বণিক্‌সমাজ অবাধ-বাণিজ্য-নীতির অবলম্বনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন না। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে অন্তর্ব্বাণিজ্য শুল্ক তিরোহিত হয়। কিন্তু তখন দেশীয় বণিক্ ও শিল্পি-সম্প্রদায়ের শরীর শোণিত-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অন্য দিকে রেলপথ-বিস্তারে দেশের নৌ-জীবী ও যান-ব্যবসায়ীদিগের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল, সুদূর পল্লিগ্রামেও বিলাতী মাল অপ্রতিহত বেগে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

ডাঃ বুকানন কোম্পানির আদেশে উত্তর ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা, শাহাবাদ

প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। তাঁহার তদন্তে প্রকাশ পায় যে, পাটনা জেলায় ধানের দর টাকায় ১৮৹ মণ ছিল। ২৪০০ বিঘা ভূমিতে তূলার ও ১৮০০ বিঘা ভূমিতে ইক্ষুর চাষ হইত। ৩,৩০,৪২৬ জন স্ত্রীলোক কেবল সূত্র-কর্ত্তন-ব্যবসায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। দিবসের মধ্যে কয়েক ঘটিকা মাত্র কার্য্য করিয়া তাহারা সংবৎসরে ১০,৮১,০০৫ টাকা লাভ করিত। ইংরাজের অত্যাচারে, সূক্ষ্ম সূত্রের রপ্তানি হ্রাসের সহিত তাহাদিগের ব্যবসায়ের অবনতি ও জীবন-যাত্রা কষ্টকর হইতে লাগিল। তন্তুবায়েরা বস্ত্র-বয়ন করিয়া বার্ষিক (ব্যয়বাদে) ৭৷৷০ লক্ষ টাকা রোজগার করিত। ফতুহা, গয়া, নওয়াদা প্রভৃতি স্থান তসরের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শাহাবাদে ১,৫৯,৫০০ রমণী বৎসরে ১২৷৷০লক্ষ টাকার সূতা কাটিত। ঐ জেলায় ৭,৯৫০টি তাঁতে বৎসরে ১৬,০০,০০০ টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এতদ্ভিন্ন কাগজ, গন্ধ-দ্রব্য, তৈল, লবণ ও মদ্যাদির ব্যবসায়ও অতীব সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল। ভাগলপুরে চাউলের দর টাকায় ৮৭৷৷০ সের ছিল। ঐ জেলায় ১২,০০০ বিঘা জমীতে কার্পাসের কৃষি হইত। তসর বুনিবার ৩,২৭৫টি তাঁত ও কাপড় বুনিবার ৭,২৭৯টি তাঁত ছিল। গোরক্ষপুরে ১,৭৫,৬০০ স্ত্রীলোক চরকা কাটিয়া দিনপাত করিত; তথায় ৬,১১৪টি তাঁত চলিত এবং ২০০ হইতে ৪০০পর্য্যন্ত নৌকা প্রতি বৎসর নির্ম্মিত হইত! তদ্ভিন্ন লবণ ও শর্করা প্রস্তুত করিবার কারখানাও অনেক ছিল। দিনাজপুরে ৩৯,০০০ বিঘা পাট, ২৪,০০০ বিঘা তূলা, ২৪,০০০ বিঘা ইক্ষু, ১৫,০০০ বিঘা নীল ও ১৫০৭ বিঘা তামাকের চাষ হইত। এই জেলায় ত্রয়োদশ লক্ষেরও অধিক গাভী ও বলদ ছিল! উচ্চ-বর্ণের বিধবা ও কৃষক-রমণীগণ সূতা কাটিয়া বার্ষিক (ব্যয় বাদে) ৯,১৫,০০০ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। পাঁচ শত ঘর রেশম ব্যবসায়ী বৎসরে ১,২০,০০০ টাকা লাভ করিত। তন্তুবায়েরা বার্ষিক ১৬,৭৪,০০০টাকার কাপড় বুনিত। মালদহের মুসলমান রমণীদিগের মধ্যে সূচী-শিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল। সূতায় ও কাপড়ে নানা রকমের রং করিয়াও বহু সহস্র ব্যক্তির জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। পূর্ণিয়া জেলায় রমণীগণ প্রতি বৎসর গড়ে আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকার কার্পাস কিনিয়া যে সূতা প্রস্তুত করিতেন, তাহা বাজারে ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত! তন্তুবায়দিগের ৩,৫০০ তাঁতে ৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা

মূল্যের কাপড় প্রস্তুত হইত। ইহাতে শিল্পীরা প্রায় ১॥০ লক্ষ টাকা লাভ করিতে পারিত। এতদ্ভিন্ন ১০,০০০ তাঁতে মোটা কাপড় বুনিয়া তাহারা ৩,২৪,০০০ টাকা লাভ করিত। সতরঞ্চী, ফিতা প্রভৃতির ব্যবসায়ও অতীব সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে, সেকালের টাকার মূল্য (ক্রয়-শক্তি) এখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল।

এই সকল জেলার অবস্থা হইতেই পাঠক সেকালে সমগ্র দেশে শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার কিরূপ ছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। * ইংরাজ বণিকের স্বার্থ-পরতায় দেশের এই বিশাল বাণিজ্য ধূলিসাৎ হইয়াছে, তাই এখন ভারতে লক্ষ লক্ষ লোকে, 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে!

এই ঘটনার বর্ণনা-প্রসঙ্গে সু-প্রসিদ্ধ "হিতবাদী" সংবাদপত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এস্থলে উদ্ধারের যোগ্য।—"কোম্পা-

---

* বৃদ্ধদিগের মুখে শুনা যায় যে, এদেশে বিলাতী সূতা চালাইবার জন্য কোম্পানির লোকে সূত্র-ব্যবসায়-জীবিনী-রমণীদিগের অনেকের "চরকা" ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, স্থানবিশেষে চরকার উপর গুরুতর কর স্থাপিত হইয়াছিল। গ্রামে কোম্পানির লোক আসিতেছে শুনিলে, রমণীরা পুষ্করিণীর জলে চরকা ডুবাইয়া লুকাইয়া রাখিতেন বলিয়াও শুনা যায়। ঐ সকল প্রবাদ যতদূর সত্য হউক, চরকার উপর গুরুতর কর-স্থাপন-মূলক কথার ঐতিহাসিক প্রমাণ দুর্লভ নহে। যথা:—

"Francis Carnac Brown had been born of English parents in India and like his father had considerable experience of the cotton industry in India. He produced an Indian *charka* or spinning wheel before the select Committee and explained that there was an oppressive *Moturfa* tax which was levied on every *charka*, on every house, and upon every implement used by artisans. The tax prevented the introduction of saw-gins in India"—India in the Victorian Age. p. 135.

সেকালের বিলাতী তন্তুবায়েরা কাপড়ের পাড় বুনিতে জানিত না। সে বিদ্যা তাহারা ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গীয় তাঁতিদিগের নিকট হইতেই শিখিয়া যায়। প্রথম প্রথম যে সকল বিলাতী কাপড় এদেশে আমদানি হইয়াছিল, তাহার পাড় এরূপ কদর্য্য হইত যে, এখনকার লোকে তাহা কখনই ব্যবহার-যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। ক্রমে যখন বিলাতী কাপড় উৎকর্ষে দেশীয় বস্ত্রের তুল্য হইতে লাগিল, তখন এদেশের অনেক লোকে বিস্ময়-সহকারে বলিয়াছিলেন---"এ কাপড় ত বিলাতী বলিয়া চিনিবার যো নাই! এ যে ঠিক দেশীয়ের মত হইয়াছে!" আর আজ আমরা ভাল দেশী কাপড় দেখিলে বলি---"ইহা ঠিক বিলাতীর মত হইয়াছে!" হায়! শত বৎসরে এদেশীয় ও বিলাতী বস্ত্র-শিল্পের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে!

নির অত্যাচারে এইরূপে বঙ্গের বস্ত্র-শিল্প নষ্ট হইল। এক দিকে তন্তুবায়, অন্যদিকে বঙ্গীয় বিধবা-সমাজে ক্রন্দনের রোল উঠিল। সূত্র-নির্ম্মাণ-ব্যবসায় হারাইয়া বঙ্গীয় বিধবাগণ সত্য সত্যই নিরাশ্রয়া ও আত্মীয়গণের একান্ত গলগ্রহ হইয়া পড়িলেন। আমরা ইংরাজী শিক্ষার মতিভ্রান্ত হইয়া বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন-পূর্ব্বক তাঁহাদের দুঃখ-মোচনের উপায় উদ্ভাবনে ব্যগ্র হইলাম। ক্রমে ইংরাজের অনুকরণে ও বিলাতী বিলাস-দ্রব্যে আমাদিগের লোভ বাড়িতে লাগিল। দেশের শিল্পীদিগের অবস্থা কি হইবে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আমরা সর্ব্ব প্রকারে বিদেশীয়ের প্রতি অনুরক্ত হইতে লাগিলাম। আমরা ভাবিতে লাগিলাম, আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে সভ্য হইয়া উঠিতেছি, আমাদের মোহান্ধকার দূর হইতেছে, কিন্তু জগতের প্রকৃত সভ্য জাতিসমূহ বুঝিলেন যে, বাঙ্গালী ক্রমেই ঘোরতর অসভ্য হইতেছে। কারণ, তাঁহাদিগের মতে যে জাতি যে পরিমাণে আপনার অভাব আপনি মোচন করিতে পারে,সে জাতি সেই পরিমাণে সভ্য; আর যে যতটা পরের উপর নির্ভর করে, সে ততটা অসভ্য। ইংরাজী শিক্ষার মোহে, পড়িয়া আমরা এই সার সত্যটুকু প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম, ইংরাজ আমাদিগের সকল অভাব মোচন করিয়া আমাদিগকে সভ্যতার উচ্চশিখরে উত্তোলিত করিবেন। কিন্তু দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় আমাদিগের সে ভ্রম ক্রমেই দূর হইতেছে।

"এবিষয়ে বোম্বাইবাসীর প্রথমে মোহ ভঙ্গ হয়। ঐ অঞ্চলে বিলাতী বস্ত্রাদির প্লাবন আরম্ভ হইয়াছে দেখিবামাত্র তাঁহারা সতর্ক হইলেন। আপনাদিগের মূলধন খাটাইয়া বোম্বায়ে কল-কারখানা স্থাপন করিলেন। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। কিন্তু বোম্বাইবাসী আপনার লজ্জা আপনি দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইংলণ্ডের উপর প্রধান ও প্রয়োজনীয় পণ্য—বস্ত্রের জন্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়াছেন দেখিয়া ইংরাজ চমকিয়া উঠিলেন। তখন নূতন নিয়ম হইল, বিলাত হইতে কল-কব্জা ভারতে আনিতে হইলে উচ্চ হারে কর দিতে হইবে! বোম্বাই-বাসী সেই কর দিয়াও কল আনাইলেন। সেই কলে কাপড় প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম ক্ষতি-স্বীকার করিয়াও বোম্বায়ের কলওয়ালারা হতাশ হইলেন না। তখন গবর্ণমেণ্ট

ফ্যাক্টরি আইন করিয়া বোম্বায়ের কলওয়ালাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কলওয়ালারা তথাপি নিরুৎসাহ হইলেন না! এদিকে মহারাষ্ট্র-বাসীর প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহারা সাধ্যপক্ষে বিলাতী কাপড় ব্যবহার করিবেন না।"

বোম্বাইবাসীর এই প্রতিজ্ঞা ও দেশীয় কলকারখানার শ্রীবৃদ্ধির পথে গবর্ণমেণ্ট কণ্টকারোপের চেষ্টা করায় ভারতবর্ষে স্বদেশী বস্ত্রের আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অতঃপর যতই ইংরাজের কুটিলতা ভারতবাসীর দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল, ততই স্বদেশের দিকে লোকের দৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। তখন ১৮৯৬ সালে গবর্ণমেণ্ট দেশীয় বস্ত্র-শিল্পের প্রসার হ্রাস করিবার জন্য দেশীয় বস্ত্রের উপর শুল্ক-স্থাপন করিলেন! একেই ল্যাঙ্কেশায়ারের কলকারখানা-ওয়ালাদিগের তুলনায় এদেশের কলকারখানা-ওয়ালাদিগকে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কারখানা স্থাপনের জন্য বাটী-নির্ম্মাণ করিতে বিলাতের অপেক্ষা এদেশে অধিক ব্যয় পড়ে, কল খাটাইবার খরচও বেশী পড়ে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মতে এই দুইটী কার্য্যে বিলাতে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িলে ভারতে ২।০ লক্ষ টাকার কমে কিছুতেই হয় না। কলের অন্যান্য সরঞ্জাম (Mill stores) বিলাতের অপেক্ষা ভারতবর্ষে মহার্ঘ। বিলাতে কয়লার ব্যয় অপেক্ষা এখানে কয়লার ব্যয় দেড়গুণ অধিক! বিলাতে দুই টাকা তিন টাকা সুদে যথেষ্ট টাকা ধার পাওয়া যায়, ভারতে ৬।৭ টাকার কমসুদে টাকা পাওয়া যায় না। ইহার উপর শিক্ষিত মজুরের অভাবও এদেশে কম নহে। এদেশীয় কল-কারখানা-ওয়ালাদের এই সকল অসুবিধার জন্য এখানে শস্তায় কাপড় তৈয়ার হয় না। ইহার উপর গবর্ণমেণ্ট প্রতিকূলতা করিলেন। বিগত ১৮৯৬ সাল হইতে বিলাতী বস্ত্রে শতকরা ১॥০ টাকা কর কমাইয়া দেশীয় বস্ত্রে শতকরা ৩॥০ টাকা নূতন শুল্ক স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার ফলে চীন ও জাপান দেশে ভারতীয় বস্ত্র-পণ্যের রপ্তানি বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। এ দেশেও বিলাতী বস্ত্রের তুলনায় দেশীয় বস্ত্র অক্রেয় হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানক্ষেত্রে ইংরাজ অকপটভাবে অবাধ-বাণিজ্যনীতির অনুসরণ করিলেও এ দেশের বস্ত্র-শিল্পের এতদূর ক্ষতি সাধিত হইত না। ফল কথা, রাজপুরুষেরা এই পক্ষপাত-মূলক ব্যবস্থার পরিহার না করিলে, এদেশীয় শিল্পের সম্যক্

উন্নতি কতদূর সম্ভবপর হইবে, তাহা প্রত্যেক দেশহিতকামী ব্যক্তিরই বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

এই স্থলে, ইংলণ্ডীয় উপনিবেশসমূহের সহিত ভারতীয় বস্ত্র পণ্যের আমদানি মাশুলের হারের তারতম্য কিরূপ, তাহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক। ইংরাজ ভারতবর্ষে যেরূপভাবে অবাধ-বাণিজ্য-নীতির পরিচালন করিয়া থাকেন, উপনিবেশ-সমূহে সেরূপ করিতে পারেন না। কানাডায় বিলাতী পণ্যের উপর শতকরা ১৭ টাকা, বস্ত্রের উপর ২৩৲ টাকা, নবজিল্যাণ্ডে ৯।০ টাকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ৬।।০ টাকা শুল্ক গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতে ২৸০ টাকা শুল্ক দিয়া সকল বিলাতী পণ্যই বিক্রয় করা হয়। বিলাতী কাপড়ের উপর ৩।।০ টাকা শুল্ক লওয়া হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতীয় বস্ত্রের উপরও মাশুল বসান হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কোনও উপনিবেশেই ইংরাজ স্থানীয় বস্ত্রের উপর কর বসান নাই।

ঐতিহাসিক উইলসন যথার্থই বলিয়াছেন, "ভারতীয় পণ্যের বিলোপ-সাধনের জন্য এইরূপ গর্হিত উপায়াবলী অবলম্বিত না হইলে, ম্যাঞ্চেষ্টার ও পায়েস্‌লির কাপড়ের কতকগুলি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত; এমন কি, সেই কলগুলিকে বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যেও পুনরায় পরিচালিত করা সহজ-সাধ্য হইত না। ফলতঃ ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের বিনাশ-সংসাধন করিয়াই বিলাতী কলগুলিকে সজীব রাখা হইয়াছে। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন দেশ হইত, তাহা হইলে সে এই বাণিজ্য-সংঘর্ষে আত্ম-রক্ষা করিতে পারিত, বিলাতী মালের উপর গুরুতর শুল্কস্থাপন করিয়া স্বদেশীয় লাভজনক শিল্পসমূহের রক্ষা করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু এই আত্মরক্ষার ন্যায্য অধিকার ইংরাজ ভারতবর্ষকে প্রদান করেন নাই—ভারতবাসীকে বৈদেশিক বণিক-সম্প্রদায়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছে।"

ইংরাজ যদি রাজশক্তির সাহায্যে এদেশবাসীর শিল্প-বুদ্ধি-বিকাশের পথ রুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে বহু দিন পূর্ব্বেই ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্মত যন্ত্রাদির সাহায্যে বিবিধ শিল্পজাত উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে পারিত। ভারতবাসী সর্ব্বপ্রথমে বিজ্ঞান-সম্মত অভিনব যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ না হইলেও যে অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় উহাদের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন, ইহাতে সন্দেহ

করিবার কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না। ভারতবাসী অনুকরণ-ক্ষমতায় পৃথিবীর কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নহে। তথাপি ভারতীয় আর্য্য-সন্তানেরা যন্ত্র-বিজ্ঞানে সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তী। ইহার একমাত্র কারণ, ভারতের রাজশক্তি এবিষয়ে ভারতবাসীর একান্ত প্রতিকূল। এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করণার্থ এস্থলে কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে।

অনেকে অবগত আছেন, ইংরাজ সর্ব্বপ্রথম দীপশলাকার উদ্ভাবন করেন; এক সময়ে পৃথিবীতে ব্যবহৃত দীপশলাকার দশভাগের নয় ভাগ এক ইংলণ্ডেই প্রস্তুত হইত। কিন্তু আজ ফ্রান্স, বেলজিয়ম, সুইডেন ও জাপানের দিয়াশলাই ইংলণ্ডকে পরাস্ত করিয়াছে। এখন এক ফ্রান্স দেশ হইতে ইংলণ্ডেই ৩৬০০,০০,০০০ বাক্স দিয়াশলাই আমদানি হইয়া থাকে। ইংলণ্ড "টাইপ রাইটারের" উদ্ভাবন করিলেও জগতে আজ মার্কিণ দেশীয় "টাইপ রাইটারই" সর্ব্বত্র সমাদৃত। তাহার পর লেড (বা উড) পেন্সিল, পিয়ানো ও ঘড়ির ব্যবসায়ের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করুন। এক্ষেত্রেও ইংরাজ উদ্ভাবন-কর্ত্তা; কিন্তু মার্কিণ, জার্ম্মাণ ও সুইস জাতিই এই শিল্পের বাণিজ্যে এক্ষণে একাধিপত্য করিতেছেন। এখন ইংলণ্ডেই বিদেশ হইতে বহু পরিমাণে পিয়ানো, ঘড়ি ও পেন্সিল আমদানি হইয়া থাকে। সীবন-যন্ত্র বা সেলাইয়ের কল সম্বন্ধেও সেই কথা—একজাতি উহার উদ্ভাবন করিয়াছে, কিন্তু অন্য জাতি উহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিয়া ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে।

স্বয়ং ইংরাজেরাই ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমর-পোত-নির্ম্মাণ-বিদ্যায় ফরাসীদিগের অপেক্ষা হীনতর ছিলেন। পরে ফরাসী জাতির নিকট হইতে সেই বিদ্যা অপহরণ করিবার জন্য একজন ইংরাজ শিল্পী দরিদ্র পান্থের বেশে ফ্রান্সে প্রেরিত হইল। সেই শিল্পী ফ্রান্সে গিয়া ফরাসীদিগের রণ-পোত-নির্ম্মাণ-প্রণালীর প্রতি গোপনে লক্ষ্য স্থাপন করিল। কিছুদিনের গুপ্ত পর্য্যবেক্ষণের ফলে, সে ঐ বিদ্যার পরিচয় লাভ করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তদবধি ইংরাজের সমর-পোতসমূহ নব মূর্ত্তি ধারণ করে। তখন ফরাসীদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাদিগের নৌ-নির্ম্মাণ-বিদ্যা গোপন করিবার জন্য কঠোর বিধানাদির প্রণয়ন করেন। আবার প্রতিভাবান্ ফরাসী শিল্পীরা রণপোত-নির্ম্মাণের উৎকৃষ্টতর প্রণালীর উদ্ভাবন করিলেন! আবার ইংরাজ গুপ্ত

চরের সাহায্যে সে বিদ্যার গুহ্য-তত্ত্বসমূহ সংগ্রহ করিলেন! নির্ধূম বারুদও ফরাসীর নিকট হইতেই বহু চেষ্টার পর ইংরাজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমেরিকার অস্ত্র-শিল্পীদিগের নিকট হইতে ইংরাজের ম্যাক্সিম গন প্রভৃতি বহু প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণের কৌশলে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে।

ফলতঃ সকল জাতিই এইরূপে পরের উদ্ভাবিত শিল্প-কৌশলের অনুকরণ ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। জাপানও পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষীণালোক প্রাপ্তি মাত্র সেই পথের অনুসরণ করিয়া আপনার জাতীয় ধনবৃদ্ধি করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবাসী দেড় শত বৎসর কাল সুসভ্য যন্ত্র-শাস্ত্রবিৎ ইংরাজের সহবাস লাভ করিয়াও শিল্প-বাণিজ্যে কোনও প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারিল না। রাজশক্তির প্রতিকূলতায় ভারতবাসী বদ্ধ-চক্ষুঃ বলীবর্দ্দের ন্যায় এই দেড় শত বর্ষ কাল কেবল ঘানি টানিতেছে; ইচ্ছা ও বুদ্ধি-সত্ত্বেও ভারতবাসী এ বিষয়ে উপায়হীন।

ভারতবর্ষের ধন-বল বিনষ্ট না হইলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ন্যায় ভারতবাসীও যন্ত্র-জাত শিল্প-বাণিজ্যে সম্যক্ উন্নতি লাভ করিতে পারিত, সন্দেহ নাই। ধন-বল থাকিলে, শিল্প-বাণিজ্যে বিদ্যা ও বুদ্ধি-বলের অভাব হয় না। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতির ইতিহাসই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উদ্ধৃত হইতে পারে। মিঃ ব্রুক্স্ এডাম্স "সভ্যতা ও বিনাশের নিয়ম" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"The influx of the Indian treasure, by adding considerably to the nation's cash capital, not only increased its stock of energy, but added much to its flexibility and the rapidity of its movement.

Very soon after Plassy, the Bengal plunder began to arrive in London, and the effect appears to have been instantaneous; for all authorities agree that the "Industrial revolution," the event which divided the 19th Century from all antecedent time, began with the year 1760. Prior to 1760 according to Baines, the machinery used for spinning cotton in Lancashire was almost as simple as in India; while about 1750 the English iron industry was in full decline......At that time four-fifths of the iron used in the kingdom came from Sweden.

Plassy was fought in 1757, and probably nothing has ever equalled the rapidity of the change which followed......In themselves inventions are passive, many of the most important having lain dormant for centuries waiting for a sufficient store of force to have accumulated to set them working. That store must always take the shape of money, and money not hoarded, but in motion.

From 1694 to Plassy, the growth (of Banks) had been relatively slow......Writing in 1790 Burke mentioned that when he came to England

In 1750 there were not "twelve bankers shops" in the provinces, though then, he said, they were in every market town. Thus the arrival of the Bengal silver not only increased the mass of money, but stimulated its movement.—"*Law of Civilisation and Decay.*" By Brooks Adams pp.259/64.

ভারতীয় ধনরাশির বিলাতে আমদানি হওয়ায় শুদ্ধ যে ইংলণ্ডের জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; উহাতে জাতীয় উদ্যমশীলতার বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নতির বেগ দ্রুততর হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বঙ্গের লুণ্ঠিত ধন বিলাতে আনয়নের সূত্রপাত হয়; তাহার সুফলও সঙ্গে সঙ্গে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিলাতের ল্যাঙ্কাশায়ারে সূতা প্রস্তুত করিবার কল কারখানা ও লৌহ-নির্ম্মিত দ্রব্যাদির ব্যবসায়ের অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল; তখন বিলাতে সুইডেন হইতে অধিকাংশ লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যাদির আমদানি হইত; কিন্তু ১৭৫৭খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধের পর বিদ্যুদ্বেগে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল।

উদ্ভাবনী শক্তি জাতীয় জীবনে সুপ্তভাবে অবস্থিতি করে। উদ্দীপনা না পাইলে উহার স্ফূর্ত্তি হয় না। যন্ত্রাদির উদ্ভাবনও সকল সময়ে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে পারে না। অনেক বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্রও উদ্ভাবিত হইবার পর, তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার শক্তির অভাবে, দীর্ঘকাল অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়িয়াছিল; অর্থ-বল সংগৃহীত হওয়ায় সেগুলি কার্য্যোপযোগী হইল। প্রচুর অর্থ-শক্তির সাহায্যেই সকল দেশে যন্ত্রাদি যথারীতি পরিচালিত হইয়া থাকে। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ব্যাঙ্কের অবস্থাও অতি শোচনীয় ছিল। কিন্তু পলাশীর পরে বঙ্গীয় রজতের আমদানির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ব্যাঙ্ক-সমূহের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। দেশে টাকা জমা হওয়ায় টাকা খাটাইবার দিকে লোকের প্রবৃত্ত ধাবিত হইল।

যে অর্থবলে ইংলণ্ডীয় শিল্পি-সমাজে নবযুগের আবির্ভাব হইল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের দৌরাত্ম্যে আমরা সেই অর্থবলে বঞ্চিত হইলাম। পরন্তু, নানা কঠোর বিধান প্রণয়ন করিয়া আমাদিগের দেশীয় শিল্পের উন্নতির পথও রুদ্ধ করা হইল। জাপান, জার্ম্মেনি, মার্কিন, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক ও সুইজারল্যাণ্ডের লোকে যে সকল সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন, রাজশক্তির প্রতিকূলতায় ভারতবাসী সে সকল সুবিধা অদ্যাপি লাভ করিতে পারিল না। কোম্পানির আমলে আমাদের শিল্পোন্নতির পথে কেবল যথাসাধ্য কণ্টকই আরোপিত হয় নাই, উহার মস্তকে কঠোর বজ্রও নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক উইলসন এ কথা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপে ভারত-বাসীর সর্ব্বনাশ সংসাধন করিয়াও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টার মিঃ সেণ্ট জর্জ্জ টকার মহোদয় অম্লানবদনে বলিয়াছেন,—

No government ever manifested, perhaps a more constant solicitude to promote the welfare of a people and it is with satisfaction and with pride that I can bear an almost unqualified testimonoy in its favour.

ইহার সহিত ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি লর্ড উল্‌স্লী মহোদয়ের পশ্চাল্লিখিত উক্তি পাঠ করিলে রাজপুরুষদিগের বচনবাগীশতা অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

"As a nation we bred up to feel it a disgrace even to succeed by falsehood."——The Soldier's Pocket Book of Field Service.

রাজ-শক্তির আনুকূল্য ঘটিলে ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের পুনরভ্যুদয় এখনও সম্ভবপর। আমাদের রাজপুরুষেরা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যেরূপ যত্ন-প্রকাশ করিয়া থাকেন, ভারতবাসী কৃষ্ণাঙ্গ প্রজার শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য যদি তাহার অর্দ্ধেক যত্নও প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে এদেশের অনেকের অন্নের সংস্থান হইত। নীলের ব্যবসায়ের অবনতি-নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট কত অর্থব্যয় করিয়াছেন, সে জন্য কত রাসায়নিক পণ্ডিতের নিয়োগ হইয়াছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ভারতে চা-পানের প্রসার বৃদ্ধির জন্য কর্ত্তৃপক্ষ "টী-সেস" নামক কর বসাইয়াছেন। রপ্তানির চায়ের উপর এই শুল্ক বসান হইয়াছে। বৈদেশিক ক্রেতাদিগের নিকট হইতে "টী-সেস" আদায় করা হয়। সেই শুল্ক-লব্ধ অর্থ কর্ত্তৃপক্ষ চায়ের ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন চা ও নীলের ব্যবসায়ে শ্বেতাঙ্গেরা লিপ্ত আছেন বলিয়া এই দুই ব্যবসায়ের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ঈদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ অনুগ্রহ যদি দেশের অন্যান্য শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতি প্রদর্শিত হইত, তাহা হইলে আজ আমাদিগের নিশ্চিত অবস্থান্তর ঘটিত। কটন-ডিউটি বা কার্পাস-কর বাবতে গবর্ণমেণ্ট গত ৫ বৎসরে প্রায় দেড় কোটি টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু উহার একাংশও এদেশীয় বস্ত্র-শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হয় নাই! তবে ইদানীং যে ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে উৎকৃষ্ট কার্পাসের চাষ করাইবার জন্য কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়াছেন, তাহার কারণ স্বতন্ত্র। আমেরিকার তূলার বাজার সেখানকার ধনশালী ব্যবসায়ীদিগের এক চেটিয়া হইয়া যাওয়ায় ইংলণ্ডের তন্তুবায়দিগের হাত প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাই তাঁহারা ভারতগবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাদের এই খাস মহলে (ভারত-

বর্ষে) উৎকৃষ্ট তূলার চাষ আবাদ করাইতেছেন। ইহাতে যদি পরোক্ষ-ভাবে আমাদের কিছু লাভ হয়, সে আমাদের সৌভাগ্য—সেজন্য গবর্ণ-মেণ্টের ধন্যবাদ করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

চামড়ার উপর ইদানীং যে রপ্তানির শুল্ক আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার মাত্রা যদি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করেন, এবং সেই অতিরিক্ত শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থ যদি এদেশে পাশ্চাত্য চর্ম্ম-পরিষ্করণ-বিদ্যার প্রবর্ত্তনে ব্যয় করেন, তাহা হইলে কত নিরন্নের অন্ন-সংস্থান হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এদেশ হইতে রাশি রাশি কাঁচা চামড়া আমেরিকার মহাজনেরা লইয়া যায় এবং সেই চর্ম্মকে পরিষ্কৃত ও সুরঞ্জিত করিয়া পুনরায় চারিগুণ মূল্যে এই দেশেই আনিয়া বিক্রয় করে ! রাজপুরুষেরা দেশীয় চর্ম্মকারদিগকে বৈজ্ঞা-নিক প্রণালী-সম্মত চর্ম্ম-পরিষ্করণ-কৌশল শিখাইবার চেষ্টা করিলে চর্ম্ম-ব্যবসায়ে বিদেশ হইতে ভারতে বহু ধনাগম হইত, সন্দেহ নাই। এইরূপে অন্যান্য রপ্তানি কাঁচা মালের উপর অতিরিক্ত শুল্ক-স্থাপন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ লব্ধ-অর্থে এদেশের বহু শিল্পের উন্নতি-সাধন করিতে পারিতেন।

কিন্তু এই মুষ্টিযোগে ভারতীয় সকল শিল্পের উন্নতি সম্ভবপর নহে। জার্ম্মেনি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ন্যায় এদেশেও রক্ষা-শুল্কের প্রতিষ্ঠা ও দেশীয় শিল্পীদিগকে বৃত্তিদান (bounty) করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জার্ম্মন গবর্ণমেণ্ট শর্করা-ব্যবসায়ীদিগকে প্রভূত বৃত্তি-দান করিয়া স্বদেশীয় শর্করা ভারতে বহু পরিমাণে প্রচলিত করিয়াছেন। মার্কিন গবর্ণমেণ্ট স্বদেশীয় কাগজের কারখানাগুলি রক্ষা করিবার জন্য বৈদেশিক কাগজের উপর শতকরা ৫০ টাকা হারে শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন ! আমেরিকায় কয়েক বৎসর হইতে তিসির চাষ আরব্ধ হইয়াছে। এই শিশু ব্যবসায়ের রক্ষার্থ মার্কিন গবর্ণমেণ্ট ইতোমধ্যে ভারতীয় তিসির ও তৈলের উপর গুরু-শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন। কাজেই মার্কিনে "কলিকাতা ওয়েল" (Calcutta oil) নামে পরিচিত ভারতীয় তিসির তৈলের আমদানি কমিয়াছে। এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের রক্ষা করিতে হইলে ভারত গবর্ণমেণ্টকেও এইরূপ সংরক্ষিত-বাণিজ্য-নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, এদিকে রাজপুরুষদিগের আদৌ দৃষ্টি নাই। এখনও যদি এ বিষয়ে তাঁহাদিগের সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইলে ত্রিশ কোটী প্রজা তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিবে।

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজশক্তির আনুকূল্য ভিন্ন কোনও দেশেই কখনও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে নাই। প্রধানতঃ রাজ-পরিবার ও রাজ-সরকারের প্রয়োজন-পরিপূরণের জন্যই দেশীয় শিল্পাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে। যে রাজা বিদেশ-জাত পণ্য-সামগ্রীর সাহায্যে আপনার সকল অভাব পূরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার রাজ্যে কখনই শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য বণিক্-সম্প্রদায় অনুকূল রাজশক্তির বলেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র আপনাদিগের বাণিজ্যাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতবর্ষেও ইংলণ্ডের বাণিজ্যাধিপত্য রাজশক্তির বলেই ঘটিয়াছে। যে জার্ম্মেনির বাণিজ্যের প্রবল স্রোতে আজ ইংরাজ বণিক্ ও শিল্পি-কুল ভাসিয়া যাইতেছেন, প্রতিপদে জার্ম্মন শিল্প ইংলণ্ডীয় শিল্পকে পরাস্ত ও স্থানচ্যুত করিতেছে, সেই জার্ম্মেনি যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বীয় রাজশক্তির সংহরণ করেন, তাহা হইলে এই বিশাল জার্ম্মন-বাণিজ্য নিমেষমধ্যে জলের তিলকের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে, একথা বিশেষজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নহে। তাই আমরা ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-কল্পে রাজ-শক্তির আনুকূল্য কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকি। কিন্তু স্বজাতি-বাৎসল্য-বশে ইংরাজ আমাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন, ইহা আমাদিগের সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে।

স্বদেশী আন্দোলন।

ইদানীং ভারতবাসীর দৃষ্টি স্বদেশীয় শিল্পপণ্যের উন্নতি-সাধনের দিকে বিশেষভাবেই পতিত হইয়াছে, একথা কাহারও অবিদিত নহে। বঙ্গ-সন্তান বৈদেশিক দ্রব্যাদি আর সাধ্য-পক্ষে স্পর্শ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মধ্যভারত ও পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরাও বঙ্গবাসীর বৈদেশিক দ্রব্য-পরিবর্জ্জনের প্রতিজ্ঞায় যোগদান করিয়াছেন। এই কারণে বিগত ১৩১২ সালে শারদীয়া পূজার সময়ে বৈদেশিক পণ্যের ক্রয় বিক্রয় একপ্রকার স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ বিলাতী বস্ত্র প্রায় কেহই ক্রয় করেন নাই—অতি স্থূল কদর্য্য দেশীয় বস্ত্রও সানন্দে ব্যবহার করিয়াছেন। এখনও অনেকের স্বদেশীয় বস্ত্রাদির ব্যবহারে আশাতিরিক্ত আগ্রহ দেখা যাইতেছে। ফলতঃ স্বদেশীয় দ্রব্যের

প্রতি ভারতবাসীর বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর এরূপ আগ্রহ আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। ইহাতে এখানকার শ্বেতাঙ্গ বণিক্‌সমাজ বিচলিত হইয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টকে বৈদেশিক বাণিজ্য রক্ষার জন্য অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতেছেন। দেশের লোকে স্বদেশীয় বস্ত্র-ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা করায় বোম্বায়ের কলওয়ালারা তাঁহাদিগের অভাব-পূরণের জন্য দিন কয়েক ১২ ঘণ্টার স্থানে ১৫ ঘণ্টা কল চালাইয়া স্বদেশবাসীর বস্ত্রাভাব দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে জন্য শ্রমজীবীদিগকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দানেও তাঁহারা বিরত হন নাই। শ্রমজীবীরাও অতিরিক্ত উপার্জ্জনের পথ সম্মুখে উন্মুক্ত দেখিয়া সানন্দে অধিকতর-শ্রম-স্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দেশবাসীরাও অতিরিক্ত মূল্য দিয়া স্বদেশী বস্ত্র ক্রয় করিতেছিলেন। সুতরাং ভারতবাসী আপনার লজ্জা আপনি নিবারণ করিবে বলিয়া যে সংকল্প করিয়াছে, তাহা রক্ষিত হওয়াই সম্ভবপর দেখিয়া খল-প্রকৃতি শ্বেতাঙ্গ সমাজের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল। তাঁহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ বোম্বায়ের সুপ্রসিদ্ধ "টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদ-পত্রের সম্পাদক—

BOMBAY SLAVES.

COLD-BLOODED INHUMANITY.

A plea for Government Intervention.

অর্থাৎ "বোম্বায়ের ক্রীতদাস-সম্প্রদায়," "ভয়ঙ্কর জুলুম" "গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ আবশ্যক" ইত্যাদি শিরোনাম-যুক্ত সপ্তস্তম্ভব্যাপী এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। এই প্রবন্ধে লিখিত হইল যে, দেশীয় কলওয়ালারা হতভাগ্য শ্রমজীবীদিগকে প্রত্যহ ১৫ ঘণ্টা করিয়া খাটাইয়া লইতেছেন। ইহাতে শ্রমজীবিগণ বিশ্রামের ও অন্যান্য গার্হস্থ্য কার্য্য করিবার, পুত্রকলত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার বা তাহাদের সহিত দুই দণ্ড বিশ্রম্ভালাপ করিবার সময় পায় না। এইরূপ বিশ্রামাভাবে হতভাগ্যদিগের কিরূপ স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, তৎপ্রতি নিষ্ঠুর দেশীয়দিগের দৃষ্টি নাই। গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ ভিন্ন এই ঘোর অত্যাচারের নিবারণ সম্ভবপর নহে। অতএব গবর্ণমেণ্টের অবিলম্বে একটি আইন পাস করা কর্ত্তব্য এবং জাতীয় মহাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া যাঁহারা স্বদেশহিতৈষণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরও এ সমন্ধে

নীরব থাকা উচিত নহে। টাইম্‌সের মুখে এই কথা শুনিয়া বিলাতের শ্রমজীবীর দল নাচিয়া উঠিয়াছে এবং ভারত-গবর্ণমেণ্টকে টাইম্‌সের অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে। ইহাতে ভারতবাসীর মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। কারণ, স্বজাতি-বৎসল গবর্ণমেণ্ট এই সুযোগে দেশীয় কলওয়ালাদিগের অসুবিধা-জনক কোনও নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া দেশীয় বস্ত্র-শিল্পের উন্নতির পথে কণ্টক দান করিবেন কি না, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। কারণ, গবর্ণমেণ্ট মুখে দেশীয় বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি কামনা করিলেও, চিরকাল তাঁহাদের কার্য্যে তাহার বিপরীত ব্যবস্থাই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তাই টাইম্‌সের কথা শুনিয়া সমগ্র ভারতবাসী ভীত হইয়াছেন। *

বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন-প্রসঙ্গে বঙ্গদেশে কল কারখানার প্রতিষ্ঠায় দেশের ধনবান্ ব্যক্তিদিগের বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পায় নাই দেখিয়া যাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইতেছিলেন, তাঁহারা বোম্বাই টাইম্‌স্ পত্রের হুঙ্কার শ্রবণে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছেন। বিলাতী কলের মজুরদিগের উপর ভারতের মজুরদিগের অপেক্ষা অধিকতর জুলুম হইয়া থাকে। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত না হইয়া বিলাতী ব্যবসায়ীদিগের শুভদৃষ্টি ভারতের কলের মজুরদিগের উপর পতিত হইয়াছে এবং তাঁহারা ভারত-গবর্ণমেণ্টকে ভারতীয় শ্রমজীবীদিগের কার্য্য-কাল হ্রাস করিবার আইন প্রণয়নের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন—ইহা দেখিয়া এখন বঙ্গবাসী বুঝিয়াছেন যে, বাষ্পীয় বলে পরিচালিত কল কারখানার প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা গ্রাম্য তন্তুবায়দিগকে উন্নত প্রণালীর তাঁতের সরবরাহ করিয়া সস্তায় বস্ত্র-বয়ন-কার্য্যে সহায়তা করিলে আমাদিগের দেশে অধিকতর সুফল ফলিবে। কারণ বাষ্পীয় বলে পরিচালিত তাঁতের জন্য সমস্ত খরচ সমেত প্রতি তাঁতে এক হাজার টাকা করিয়া ব্যয় পড়ে এবং তাহাতে মোটা

---

* বোম্বায়ের কাপড়ের কলের মজুরদিগের কষ্টে "টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়ার" হৃদয় বিগলিত হইয়াছে, কিন্তু চা-বাগানে কুলিদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, ঐ পত্রের সম্পাদক ও পৃষ্ঠ-পোষকেরা এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন। কোন কোনও শ্বেতাঙ্গ মুখে বা সংবাদ-পত্রে মজুরদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হন নাই; মজুরদিগকে দেশীয় মিলওয়ালাদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা পর্য্যন্ত করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রকাশ পাইয়াছে।

কাপড় প্রত্যহ ৭ জোড়া ও সরু কাপড় অনধিক চারি জোড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ৩০।৪০ টাকা মূল্যের এক একটি দেশী ফ্লাই শাট্‌ল (ঠক্‌ঠকি) তাঁতে প্রত্যহ অন্ততঃ ১২ হইতে ১৩ হাত পর্য্যন্ত মিহি কাপড় প্রস্তুত হয়, ইহা অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। আবার মাটিতে গর্ত্ত করিয়া তাঁত না বসাইয়া, কাঠের ফ্রেমের উপর বসাইলে প্রত্যহ কুড়িহাত পর্য্যন্ত কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় এক হাজার টাকা ব্যয়ে একখানা বিলাতী তাঁত না আনাইয়া ২৫ খানা ফ্লাইশাট্‌ল বা ঠক-ঠকি তাঁত কিনিয়া কাজ চালাইতে পারিলে বাষ্পীয় শক্তিকে পরাজিত করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। একথার প্রমাণস্বরূপ "ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট" পত্রে কিছুদিন পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"In 1896 the manager of a mill in the Central Provinces wrote to the Local Chamber of Commerce that within the previous five years 2 mills in Cawnpore had to discontinue the weaving of cloth and stop their loom, because of their inability to compete with hand-woven cloths. Here we have an apt illustration of the power of hand-woven cloth to compete with that woven by machinery.

"১৮৯৬ সালে মধ্যে প্রদেশের কোনও কাপড়ের কলের ম্যানেজার ঐ প্রদেশের চেম্বারস অব্ কমার্স নামক ব্যবসায়ী সমিতিকে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, গত ৫ বৎসরের মধ্যে হস্তচালিত তাঁতের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া কানপুরের দুইটি কাপড়ের কলের কর্ত্তারা কলের কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হস্ত-চালিত তাঁতের সাহায্যে যে আধুনিক যন্ত্র-শক্তিকেও পরাস্ত করিতে পারা যায়, ইহা তাহারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।"

ইহার উপর আজকাল দিন দিন যেরূপ উন্নত শ্রেণীর তাঁত, চরকা ও টানা তৈয়ারি করিবার যন্ত্র এদেশে উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহাতে সুব্যবস্থা পূর্ব্বক চালাইতে পারিলে কলের অপেক্ষা দেশীয় তাঁতে সস্তায় কাপড় প্রস্তুত হইতে পারিবে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য, যে দেশে তন্তুবায়ের সংখ্যা কম বা শ্রমজীবীদিগের পারিশ্রমিকের হার অত্যন্ত অধিক, সে দেশে বাষ্পীয় শক্তির সাহায্য না লইলে সুলভ মূল্যে পণ্য নির্ম্মাণ করা দুঃসাধ্য হইতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশে পারিশ্রমিকও যেরূপ সুলভ, তন্তুবায়ের সংখ্যাও সেইরূপ অপরিমিত। এ অবস্থায় এদেশে বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্র-বয়নের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়

না। বিশেষতঃ কলের সাহায্যে ২০ নম্বরের অপেক্ষা সূক্ষ্ম সূত্রের বস্ত্র-বয়ন করিতে গেলেই গবর্ণমেণ্টকে শতকরা ৩৷৷০ টাকা বা মূলধনের উপর শতকরা প্রায় ৭ টাকা হিসাবে কর দিতে হয় *—হস্তচালিত তাঁতে কাপড় প্রস্তুত করিলে এই করের দায়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। হাতের তাঁতে কারবার ফেল হইবার আশঙ্কাও অল্প। তদ্ভিন্ন ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কলকারখানার বিস্তারে দেশের লোকের শিল্প-বুদ্ধি বিকশিত হইবার পথ কণ্টকিত হয়, দেশে কেবল শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, শিল্পজীবীদিগের অবনতি ঘটে। তাহার পর মূলধন-ওয়ালাদিগের সহিত শ্রমজীবীদিগের যেরূপ অনন্ত কলহ ইউরোপে আরম্ভ হইয়াছে, এদেশে সেইরূপ কলহের সূত্রপাত করিয়া ফল কি? এই সকল কারণে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই দেশীয় হস্তচালিত তাঁতের প্রসার-বৃদ্ধি দেখিবার কামনা করেন। তবে যদি নিতান্তই বাষ্পীয় শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তবে ছোট ছোট এঞ্জিনের সাহায্য গ্রহণ করিলে, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। দেশের লক্ষপতিগণ হয় ত এই কার্য্য-প্রণালীর সমর্থন করিবেন না, হয় ত তাঁহারা অধিক মূলধন খাটাইয়া বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করিবার দিকেই আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের প্রচুর অর্থলাভ হইলেও বঙ্গের সাত লক্ষ তাঁতির কোন উপকার হইবে না, একথা মধ্যবিত্ত লোকের কখনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। †

---

* A 3½ per cent duty on cloth is equivalent to about a 7 per cent duty on weaving capital; since the produce per loom sells for about *twice* as much as the value of the fixed capital per loom.—*The Cotton Industry of India and the Cotton Duties.* By B. J. Padshah.

† এবিষয়ে বরোদা-রাজ্যের অন্যতম সচিব সিবিলিয়ান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ও কলিকাতা আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবও এই মতের পক্ষপাতী। হ্যাভেল সাহেবের মত স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে রমেশ বাবুর অভিমতের একাংশ তাঁহার বারাণসী-শিল্প-সমিতির বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত হইল।—

"India is a country of cottage industries. Each agriculturist tills his own little field, pays rent and transmits his holding to his son.........The humble weavers working with their wives and children in their homes, live better and more peaceful lives than men and women working in crowded and un-wholesome factories...I am myself partial to cottage-industries ...The dignity of man is seen at its best when he works in his own field or his own cottage,—not when he is employed as part of a vast machine which seems to crush out all manhood and womanhood in the operatives."

বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতে প্রায় দুই শত কাপড় ও সুতার কল কারখানায় প্রায় ১৬ কোটি টাকা খাটিতেছে এবং তাহাতে ১৭ কোটি পাউণ্ড (আধ সেরে এক পাউণ্ড) সূতা ও ৫৫ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। ৫৮ কোটি পাউণ্ড সূতার মধ্যে ২৩৷৷০ কোটি পাউণ্ড চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়, ১৩৷৷০ কোটি ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালারা বস্ত্রবয়নের জন্য গ্রহণ করেন, ও ১৯ কোটি পাউণ্ড সূতা গ্রাম্য তন্তুবায়েরা হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্র-বয়ন করিবার জন্য ক্রয় করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বিলাত হইতে যে সূতা আসে, তাহার মধ্যেও প্রায় ৩ কোটি পাউণ্ড সূতা গ্রাম্য তাঁতেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং গ্রাম্য তাঁতে মোটের উপর ২২ কোটি পাউণ্ড বা ভারতীয় কাপড়ের কলের প্রায় দ্বিগুণ সূতা ব্যবহৃত হয়। অতএব শুদ্ধ হস্ত-চালিত তাঁতে এদেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৯০ কোটি গজ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। ফলতঃ এখনও ভারতে দেশীয় কলের কাপড়ের অপেক্ষা হস্তচালিত তাঁতেই অধিক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। আরও দুইশত নূতন কাপড়ের কল স্থাপন করিতে না পারিলে কলের কাপড় পরিমাণে তাঁতের কাপড়ের সমকক্ষতা করিতে পারিবে না। বিলাত হইতে প্রতিবৎসর ২১৬ কোটি গজ কাপড় এদেশে আসে। ঐ পরিমিত কাপড় এদেশে কল কারখানার সাহায্যে উৎপাদন করিতে হইলে অন্যূন ত্রিশ কোটি টাকা মূলধনের প্রয়োজন। কিন্তু সরকারি তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, গত দশবৎসরে আমাদের দেশের লোকে কল কারখানায় তিন কোটি টাকার অধিক মূলধনের নিয়োগ করে নাই! অতঃপর প্রতিবৎসর তিন কোটি টাকা করিয়া মূলধন প্রয়োগ করিতে পারিলে দশ বৎসরে ত্রিশ কোটি টাকা মূলধন কলকারখানায় নিযুক্ত হইয়া বিলাতী বস্ত্রের অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে পারে। অবশ্য এদেশের বড় লোকদিগের চেষ্টায় যে এই টাকা সংগৃহীত হইতে না পারে, তাহা নহে। কারণ, তাঁহাদের প্রায় ৫০ কোটি টাকা কোম্পানির কাগজে আটক হইয়া রহিয়াছে, তদ্ভিন্ন ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে যে টাকা গচ্ছিত আছে, তাহার পরিমাণও ন্যূনাধিক ২০ কোটি হইবে। কিন্তু সম্মিলিত মূলধনে কলকারখানার কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন করিবার কৌশলে এদেশ-বাসীর তাদৃশ অভিজ্ঞতা না থাকায় লোকে সহজেই কলকারখানার

কাজে টাকা ফেলিতে ভীত হয়। পক্ষান্তরে, গ্রাম্য তন্তুবায়দিগের সাহায্যে বস্ত্রবয়ন করাইবার জন্য সাধ্যমত অর্থ-ব্যয় করা অনেকের পক্ষেই কষ্টকর বা আশঙ্কাজনক হইবে না, একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখি, ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে কলকারখানার হাঙ্গামায় না পরিয়া উহার এক দশমাংশ অর্থ ব্যয়ে গ্রাম্য তন্তুবায়দিগের দ্বারা উন্নত প্রণালীর তাঁতের সাহায্যে বস্ত্র-বয়ন করাইতে যত্ন প্রকাশ করাই অধিকতর সহজ ও ফলপ্রদ হইবে, সন্দেহ নাই। সরকারি সেভিংসব্যাঙ্কে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদিগের প্রায় ১১ কোটি টাকা জমা আছে। ইহার মধ্য হইতে দুই কোটি টাকা দেশী তাঁতে বস্ত্র-নির্ম্মাণের জন্য নিয়োজিত হইলেও তাহা অল্প লাভজনক হইবে না। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে, এই বঙ্গদেশের রমণীগণের চরকার সূতায় গ্রাম্য তন্তুবায়েরা এককালে এরূপ প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত করিত যে, উহাতে সমগ্র দেশবাসীর লজ্জা নিবারিত হইয়া বিদেশ হইতে বার্ষিক ১৬ কোটি টাকা স্বদেশে আনীত হইত! বর্ত্তমান সময়ে গ্রাম্য তন্তুবায়দিগের সাহায্যে বস্ত্রবয়নের যথারীতি চেষ্টা করিতে পারিলে পূর্ব্বের ন্যায় বিদেশ হইতে বার্ষিক ১৬ কোটি টাকা স্বদেশে না আসুক, স্বদেশের ১৬ কোটি টাকা প্রতি বৎসর বিদেশে যাইবে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বিগত ১৯০১ সালের আদম সুমারির হিসাবমতে বঙ্গদেশে কর্ম্মক্ষম (actual workers) তাঁতির সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৫ হাজার, যুগীর সংখ্যা ৯০ হাজার ২১৮, চিকের (ছোট-নাগপুর অঞ্চলবাসী তন্তুবায়-জাতির) সংখ্যা ৯ হাজার ৩ শত, পানের (উড়িষ্যা ও ছোট-নাগপুর অঞ্চলের তন্তুবায় জাতির) সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭ শত। ইহাতে অকর্ম্মণ্য বালকবালিকা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংখ্যা ধরা হয় নাই। এই হিসাবে দৃষ্ট হইবে যে, বস্ত্র-বয়ন যাহাদিগের জাতি-গত ব্যবসায়, এরূপ কর্ম্মক্ষম হিন্দুর সংখ্যা অখণ্ড বঙ্গদেশে ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ২ শত। তদ্ভিন্ন মুসলমান বস্ত্রবয়ন-ব্যবসায়ী জাতির মধ্যে কর্ম্মক্ষম পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৩ শত। সুতরাং সমগ্র বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মক্ষম তন্তুবায়ের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১০ লক্ষ ৬ হাজার ৫ শতের ন্যূন নহে, একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। এস্থলে "কর্ম্মক্ষম" বলিতে যাহাদিগকে জীবিকার্জ্জনের জন্য বারমাস খাটিতে হয়, তাহাদিগকেই বুঝিতে হইবে। এই

১০ লক্ষ ৬ হাজার ৫ শত তন্তুবায়ের মধ্যে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৮২৮ জন জোলা ও মালিক, ৮৫ হাজার ৪১৭ জন তাঁতি, ৪৪ হাজার ৯৫৯ জন যুগী, ৯ হাজার ১৫২ জন পান ও ২ হাজার ৫৩৬ জন চিক বা সর্ব্বশুদ্ধ ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৯২ জন তাঁত চালাইয়া জীবিকার্জ্জন করে।

কিন্তু আদম সুমারির হিসাব মতে অখণ্ড বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৪ লক্ষ ২ হাজার ৭১৬ জন পুরুষ ও রমণী বস্ত্র-বয়ন-কার্য্যে নিযুক্ত আছে। তদ্ভিন্ন প্রায় ৪৭৷৷০ হাজার জন আংশিক তাঁত চালাইয়া ও আংশিক চাষ করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, বস্ত্র-বয়ন যাহাদের পৈতৃক ব্যবসায় নহে, এরূপ ১ লক্ষ ৭৭ হাজার জন নরনারী তন্তুবায়-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। ইহার পর বিগত দুই বৎসরের স্বদেশী আন্দোলনে বঙ্গদেশের অনেক জেলার বহু তন্তুবায় কুলি-মজুরী ও চাকরি ছাড়িয়া আবার পৈতৃক ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে। ইহাদিগের সংখ্যা গ্রহণ করিলে বঙ্গদেশে বস্ত্র-বয়ন-ব্যবসায়ে লিপ্ত নর-নারীর সংখ্যা ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ হইবে, বলা যাইতে পারে। তথাপি বর্ত্তমান সময়ে প্রায় ৭ লক্ষ কর্ম্মক্ষম হিন্দু মুসলমান তন্তুবায় কুলপরম্পাগত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

এই ৭ লক্ষ লোকের সাহায্যে ৪ লক্ষ উন্নত প্রণালীর তাঁত চলিতে পারে। পল্লীগ্রামে কাষ্ঠ যেরূপ সুলভ ও সূত্রধরদিগের পারিশ্রমিক যেরূপ অল্প, তাহাতে ফ্লাই-শাট্‌ল তাঁত নির্ম্মাণ করিতে গড়ে ১৫ টাকার অধিক ব্যয় হয় না। ইহার উপর প্রতি তাঁতের জন্য ১৫ টাকার করিয়া সূতা লাগিবে। গড়ে প্রতি তাঁতে ৩৫ টাকা করিয়া ব্যয় ধরিলেও ৪ লক্ষ তাঁতের জন্য ১ কোটি ৪০ হাজার বা ১৷৷০ কোটির অধিক টাকা ব্যয়িত হইবে না। তদ্ভিন্ন দেশে যে ন্যূনাধিক ৩ লক্ষ সাবেক ধরণের তাঁত আছে, তাহাদের সংস্কার করিয়া সেগুলিকে উন্নত প্রণালীর তাঁতে পরিণত করিতে ৪০ লক্ষ হইতে ৫০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হইবে। কলিকাতার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ফল কথা, ২ কোটি টাকা মূল ধনে অন্যূন ৭ লক্ষ উন্নত প্রণালীর তাঁত বঙ্গদেশে প্রচলিত হইলে বৎসরে (প্রতি তাঁতে প্রত্যহ ৬ গজ হিসাবে ৩ শত দিনে) অন্যূন ১২৬ কোটি গজ কাপড় অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারিবে। বাঙ্গালা দেশে বিলাতি কাপড় ইহার অপেক্ষা

অধিক আমদানি হয় না। কিন্তু এই দুই কোটি টাকা মূল ধনে বাষ্পীয় এঞ্জিনের বলে পরিচালিত কাপড়ের কল স্থাপন করিলে তাহাতে বৎসরে আট কোটি গজের অধিক কাপড় প্রস্তুত হইবে কি না সন্দেহ! *

সুখের বিষয়,দেশের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিমান লোকেরা আবার দেশীয় তাঁত চালাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। অনেক জেলায় জোলা-যুগী ও তাঁতি তাহাদের পরিত্যক্ত পৈতৃক ব্যবসায় পুনর্ব্বার উৎসাহ সহকারে অবলম্বন করিতেছে। যাঁহাদের শিল্পবুদ্ধি এত দিন প্রসুপ্ত ছিল, তাঁহারা এখন নূতন নূতন তাঁত, টানা প্রস্তুত করিবার কল, চরকা ও বিবিধ-শিল্পপণ্য-নির্ম্মাণে অপূর্ব্ব দক্ষতা প্রকাশ করিতেছেন। † বৈদেশিক পণ্যের পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় বহুসংখ্যক নিরন্নের অন্ন-সংস্থান হইয়াছে। এক্ষণে রাজপুরুষেরা যদি দেশের লোকের শিল্পোন্নতির চেষ্টায় সামান্য সাহায্য করেন, তাহা হইলে এদেশের দীর্ঘকালের দারিদ্র্য অল্প দিনের মধ্যেই বহুপরিমাণে

---

* এইরূপে কলের পরিবর্ত্তে তাঁত চলিলে যে, দেশের লক্ষ লক্ষ তন্তুবায়েরই অন্নের সংস্থান হইবে, তাহা নহে; তাঁত, চরকা, প্রভৃতি বস্ত্র-বয়নের উপকরণ-সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া দেশের সহস্র সহস্র সূত্রধর, কর্ম্মকার, প্রভৃতি শিল্পী জীবিকার্জ্জনের সুবিধা পাইবে। অন্যান্য দেশীয় শিল্প-পণ্যের প্রচার ও শ্রীবৃদ্ধির সহিত শিল্পজীবী জাতিদিগের আবার পূর্ব্বের ন্যায় পৈতৃক ব্যবসায়ে জীবিকার্জ্জন চলিবে। এইরূপে চাষ ও চাকরির প্রতি এই সকল কারুকর জাতির দৃষ্টি কমিলে, তাহা কৃষক, মসীজীবী ও রাজ-সেবক মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের পক্ষে সামান্য মঙ্গলের নিদান হইবে না। সেই সঙ্গে অধিক লাভজনক কার্পাসের চাষও দেশের মধ্যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতেও দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে।

† হ্যাভেল সাহেব বিগত ১৯০৫ সালের বারাণসী-শিল্প-সমিতির অধিবেশনে বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন,—

The improvement of Indian hand looms and other weaving appliances has now become the first industrial question of the day. It is making rapid progress all over India, and it cannot be many years before power-loom mills, both in India and in Europe will have to face a very stronger compitition than before. Under these circumstances, I think the much prudent investor would be well advised to leave power-loom weaving alone......No one can maintian that European industrial conditions are an improvement on those which obtain in India from a humanitarian point of view. It is beyond dispute that the work in modern power-loom factories is physically, morally and intellectually degrading.

দূরীভূত হইবে, দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ও নিত্য অর্দ্ধাশনে ক্লিষ্ট জনগণের জঠর-জ্বালা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইবে। দুর্ভিক্ষ-কমিশনের মন্তব্যেও বহুবার দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় শিল্পাদির পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের গবর্ণমেণ্টও মুখে বহুবার বলিয়াছেন যে, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত না হইলে দেশের দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ঘুচিবে না; মনে মনেও হয়ত তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে ভারতীয় শিল্পোন্নতির বাসনাই পোষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু বিলাতী শিল্পীদিগের ব্যবসায়ে ক্ষতি হইবার ভয়ে তাঁহারা এ বিষয়ে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন না। অল্প অল্প করিয়া ৫০ বৎসরে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যোন্নতি ঘটিলে আমাদের রাজ-পুরুষেরা কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না; কিন্তু বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের উপলক্ষে আপনাদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহারা যেরূপ দৃঢ়তা ও ক্ষিপ্রতার সহিত দেশীয় শিল্পের উন্নতি-বিধানে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহারা প্রথমে আমাদের স্বদেশী আন্দোলনকে "বাঙ্গালীর হুজুগ" ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ উহার ব্যাপকতা ও গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেক রাজপুরুষের চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। ১৯০৪-০৫ সালের অপেক্ষা ১৯০৬-০৭ সালে বঙ্গদেশে ৭ কোটি ১০ লক্ষ গজ বিলাতী কাপড় কম আমদানি হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা বিষম বিচলিত হইয়াছেন। নিত্য অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট ভারতবাসীর যন্ত্রণার পরিবর্ত্তে এখন স্ব-জাতীয় শিল্পিকুলের অন্ন-চিন্তাই তাঁহাদিগের চিত্তক্ষেত্রকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে। তাই তাঁহারা নানা ছলে—কখনও শান্তি-রক্ষার ব্যপদেশে, কখনও দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া, কখন বা অবাধ-বাণিজ্যের দোহাই দিয়া স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে ও তাঁহাদের সাহায্যকারী দেশের যুবক-সম্প্রদায়কে নানারূপে নিগৃহীত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। জমিদারদিগকেও ভয় দেখাইয়া এই আন্দোলন হইতে বিরত করিবার চেষ্টা হইতেছে। মুসলমান গুণ্ডাদিগের সাহায্যে নিরীহ হিন্দুগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হইতেছে। রাজনীতিক সভাসমিতিতে দেশের প্রাণ-স্বরূপ ছাত্র ও শিক্ষকদিগের যোগ-দান রাজ-বিধান প্রচার করিয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে প্রকাশ্য সভাসমিতি করিয়া

স্বদেশী আন্দোলনের প্রসার বৃদ্ধি বা মনোভাব প্রকাশ করিবার পথও রাজপুরুষেরা বন্ধ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, মাদারিপুর, রঙ্গপুর, নোয়াখালি, ঢাকা, কুমিল্লা, জামালপুর, দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যে সকল ভয়াবহ কাণ্ডের অভিনয় হইয়াছে, তাহা সংবাদ-পত্রের সাহায্যে এখন কাহারও অগোচর নহে। ইহার সহিত সেকালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভৃত্যদিগের অত্যাচারের কতদূর তুলনা হইতে পারে, তাহা রাজপুরুষেরা একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে নিশ্চিত লজ্জিত হইবেন। সেকালে ঢাকায় ও বাখরগঞ্জে দেশীয় শিল্পের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য যে চেষ্টা হইয়াছিল, আর এ কালে বরিশাল ও সিরাজগঞ্জে স্বদেশী আন্দোলনের দমনের জন্য গুর্খা ও আসাম পুলিসের সাহায্যে নিরীহ প্রকৃতিপুঞ্জের উপর যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে—বিলাতে ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভের লোকেরা আপনাদের বস্ত্র-শিল্পের রক্ষার জন্য ভারতীয় বস্ত্র-পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়কারীকে গুরুতর অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাইয়া কিরূপ গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, আর এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবাসী স্বদেশীয় শিল্প-রক্ষার জন্য সামান্য চেষ্টা করিয়া কিরূপ লাঞ্ছিত হইতেছে, তাহাও রাজপুরুষদিগের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। কিন্তু তাঁহাদিগের সে সকল কথা এখন স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে না; অথবা তাঁহারা সে সকল কথা ভাবিবার অবসর পাইতেছেন না। স্বদেশীয় শিল্পীদিগের অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট মুখ যখন তাঁহাদিগের মনে পড়িতেছে, তখন তাঁহাদের দয়া, ধর্ম্ম, ন্যায়-বুদ্ধি প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির শক্তি মন্দীভূত হইতেছে। উত্তর ভারতের কোনও সাধুপুরুষ যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন,—

"পেট দিয়ো বড়ো পাপ দিয়ো হায়।"

অর্থাৎ "হে ভগবান্! অনেক সৎকার্য্য করিব বলিয়া সংকল্প করি; কিন্তু এই পোড়া পেটের জন্য সে সকলের একটিও করিতে পারি না। তুমি যে পেট দিয়াছ, তাহা হইতেই সকল পাপের উৎপত্তি হইয়াছে!"

ইংরাজ রাজপুরুষেরা স্বজাতীয় শিল্পীদিগের অন্ন-রক্ষার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, আমাদিগকেও আত্মরক্ষার জন্য, দেশবাসীর অন্ন-সংগ্রহের উপায় করিবার জন্য সেইরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টায় আমরা ঔদাস্য প্রকাশ করিলে আমাদিগের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে

বিলুপ্ত হইবে। ইংরাজ বাহুবলে বলীয়ান্, আমাদের বাহুবল নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু বাহুবল অপেক্ষা মানসিক বলের শ্রেষ্ঠতা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরা যদি মানসিক বলের পরিচয় দিতে অগ্রসর হই, সহস্র ক্লেশ স্বীকার করিয়াও ধীর ও সংযত ভাবে স্বদেশি-গ্রহণ ও বিদেশি-বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করি, যদি আমাদের বিলাসিতা ও ক্ষণিক মোহ হ্রাস পায়, ত্যাগ আমাদের অঙ্গের ভূষণ হয়, স্বদেশের অর্থ বিদেশে প্রেরণ করিতে হৃদয়ে দারুণ ব্যথার সঞ্চার হয়, তাহা হইলে ইংরাজের পশু-বল আমাদের নিকট নিশ্চিত পরাস্ত হইবে। এই কঠোর সাধনা ভিন্ন বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে আমাদের রক্ষার অন্য উপায় আর নাই।

কোনও দেশেই রাজপুরুষেরা কখনও অসির বলে প্রজার হৃদয় জয় করিতে পারেন নাই। বাহুবলে কখনই লোকের অন্তর্নিহিত স্বদেশপ্রীতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর বিনষ্ট হয় নাই। অত্যাচারে কখনও কোনও দেশে সংকার্য্যের দমন হয় নাই। সহজে দুর্ব্বল-দলন কুত্রাপি হয় না। বরং সকল দেশে নির্য্যাতনকারীদিগকেই পরিণামে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। কারণ, স্বদেশী আন্দোলন সম্পূর্ণ আইন-সঙ্গত ও ধর্ম্ম-সঙ্গত ব্যাপার। যাঁহারা ইহার দমনে যত্ন-প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই আইন ও ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিতেছেন। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে ঈদৃশ অত্যাচার কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না, এই অত্যাচারে স্বদেশী আন্দোলনেরও কোনই ক্ষতি হইবে না; বরং ইহাতে আন্দোলনের শক্তি বাড়িতেছে। রাজপুরুষদিগের জুলুমে মৌখিক আন্দোলন কিছু কমিলেও স্বদেশী পণ্যে লোকের আন্তরিক অনুরাগ দিন দিন বাড়িতেছে। তথাপি যাঁহারা মনে করেন যে, বাহুবলে আমরা ইংরাজের অপেক্ষা হীন বলিয়া আমাদিগের চেষ্টা নিশ্চিত বিফল হইবে, তাঁহাদিগের জন্য আমরা স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি সারগর্ভ উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি,—

"মনুষ্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ, তথাপি হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মনুষ্যের বাহুবলে শাসিত হইতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে তুলনা করিয়া দেখ, যে সকল পার্ব্বত্য বন্যজাতি হিমালয়ের পশ্চিম ভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান্ কে? এক একজন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে অনেক সেলর গোরাকে ঘূর্ণ্যমান

হইয়া আঙ্গুর পেস্তার আশা পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। তবে গোরা সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া ভারত অধিকার করিল—কাবুলীর সঙ্গে ভারতের কেবল ফল-বিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিল কেন? অনেক ভারতীয় জাতি হইতে ইংরাজেরা শারীরিক বলে লঘু। শারীরিক বলে শিখেরা ইংরাজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ, তথাপি শিখ ইংরাজের পদানত। শারীরিক বল বাহুবল নহে।

"উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্র করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহু-বল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালীর কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালীর বাহুবল নাই; কিন্তু সামাজিক গতির বলে এ চারিটি বাঙ্গালী-চরিত্রে সমবেত হইবার অ-সম্ভাবনা কিছুই নাই।

"বেগবৎ অভিলাষ হৃদয় মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে। অভিলাষমাত্রেই কখনও উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগলাভ করে যে, তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলাষের অপূর্ত্তি-জন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাহি যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহা তদভাবে সুখ বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থান পাইলে উদ্যম জন্মিবে।

"যখন বাঙ্গালীর হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালীই তজ্জন্য আলস্যসুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।

"সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ, আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে, তজ্জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জনও শ্রেয়ঃ বোধ হইবে। তখন সাহস হইবে।

যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে।

অতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালীর কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয় (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালীর অবশ্য বাহুবল হইবে।

"বাঙ্গালীর এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না; যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।"——"বাঙ্গালীর বাহুবল"—বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ।

——

দেশের আয়-ব্যয়।

India is poor a country, and cannot afford a good, expensive and scientific Government. Our Government is already far too expensive and gets more so every year. The departments to cut down would not, in my opinion be far to seek. Native industries should be more protected to the exclusion, for instance, of Manchester trade.

Mr. Harris. Deputy Commissioner, the Panjab.

যে দেশে ২২ কোটী প্রজার মধ্যে দশ কোটী প্রজা সুভিক্ষের বৎসরেও অর্দ্ধাশনে কালযাপন ও দুর্ভিক্ষকালে দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, যে দেশকে স্বয়ং ভারত-সচিব পর্য্যন্ত very very poor country, বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই দেশের শাসন কার্য্য যত স্বল্পব্যয়ে সম্ভব, সম্পন্ন করাই যুক্তিসঙ্গত, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এদেশের লোকেরা স্বভাবতঃ যেরূপ রাজভক্ত, শান্ত শিষ্ট ও ধর্ম্মভীরু, তাহাতে তাহাদিগের শাসনের জন্য অধিক আয়াস ও ব্যয়-স্বীকারের কোনও আবশ্যকতাই উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের শাসন-কার্য্যে ইংরাজ যেরূপ ব্যয়-বাহুল্য করিয়া থাকেন, পৃথিবীর আর কোনও দেশে অনুরূপ অবস্থায় সেরূপ ব্যয় হয় কি না সন্দেহ। যিনি সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান কর্ণধার, বিলাতের সেই প্রধান মন্ত্রী মহাশয়কে ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে বাৎসরিক ৫৫,০০০ টাকা বেতন প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের একাংশস্বরূপ দরিদ্র ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি বড়লাট বাহাদুরকে চিরদুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজার অর্থ হইতে বার্ষিক ২,৫০,০০০ টাকা বেতন দেওয়া হয়! এতদ্ভিন্ন ভাতা, বাটার ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি উপলক্ষেও তিনি বহু সহস্র মুদ্রা পাইয়া থাকেন। এরূপ উচ্চহারে বেতন পাইয়াও তিনি সন্তুষ্ট নহেন। কিছুদিন পূর্ব্বে স্বীয় বেতন-বৃদ্ধির জন্য লর্ড কর্জ্জন বিলাতে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। দরিদ্র ভারতবাসীর সৌভাগ্য-ক্রমে সে আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। সে যাহা হউক, এই একটি ঘটনাতেই ভারতীয় প্রজার

অর্থ কিরূপ মুক্তহস্তে ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভারত-সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের আলোচনা করিলে এরূপ ব্যয়-বাহুল্য নানাদিকেই পরিদৃষ্ট হয়।

ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা সমাজের প্রতিনিধি ও ধন-রক্ষক। সভ্যদেশে—বিশেষতঃ বৃটিশ রাজ্যে রাজকোষের সমুদায় অর্থ "প্রজার সাধারণ সম্পত্তি" বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বৃটিশ-ভারতীয় রাজকোষে যে অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহাও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে প্রকৃত পক্ষে বৃটিশ-ভারতীয় প্রজারই সম্পত্তি। তাই রাজকাষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে আমাদিগের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্ক করিবার অধিকার আছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয় প্রকৃত পক্ষে "আমা-দিগেরই দেশের আয়-ব্যয়।" দেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেশবাসীর জানা কর্ত্তব্য। বৈদেশিক রাজপুরুষেরা অবৈধ ক্ষমতা-প্রিয়তার বশী-ভূত বা ভ্রান্তনীতির পক্ষপাতী হইয়া প্রজার গচ্ছিত সম্পত্তির অপব্যয় করিলে, বিধি-সঙ্গত উপায়ে তাহার যথাসাধ্য প্রতিবাদ করাও আমা-দিগের কর্ত্তব্য।

আমাদের গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয় এতদিন সর্ব্বপ্রকারে ১১০ কোটী টাকা ছিল। বিগত সাত বৎসরের হিসাবে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, কয়েক বৎসর হইতে ক্রমাগত ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯০০।১ সালে প্রায় ১১৩ কোটী, ১৯০১।২ সালে ১১৪॥০ কোটী, ১৯০২।৩ সালে ১১৬ কোটী, ১৯০৩।৪ সালে ১২৫ কোটী ৮৩ লক্ষ ও ১৯০৪।৫ সালে ১২৭ কোটী ১৯০৫।৬ সালে ১২৭॥০ কোটি ও ১৯০৬।৭ সালে ১৩৩ কোটিরও অধিক টাকা আয় হইয়াছে। ব্যয়ের অঙ্ক আয়েরই অনুরূপ। রাজপুরুষেরা আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে না পারায় আমাদিগের কিছু ঋণও হইয়াছে। সেই ঋণ "সার্ব্বজনিক ঋণ" নামে পরিচিত। এই সার্ব্বজনিক ঋণের পরিমাণ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড (বা তখনকার হিসাবে ৫১,০০,০০,০০০ টাকা) ছিল, এক্ষণে সেই ঋণের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া তিন শত ৪৮ কোটি টাকা[illegible] অধিক হইয়াছে। এই ঋণের দায়ে দেশীয় ও বৈদেশিক মহাজনদিগের নিকট ভারতবর্ষের রেল, খাল, বিল, বন, জঙ্গল ও প্রজার কৃষিক্ষেত্রাদি বন্ধক আছে!

সরকারি (সার্ব্বজনিক) ঋণ।

এই প্রায় ৩৪৮ কোটী টাকা ঋণের মধ্যে ভারতীয় ধনবান্ ব্যক্তি-দিগের নিকট গবর্ণমেণ্ট প্রায় ১২২ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা ও সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রভৃতির হিসাবে ২৬ কোটী টাকা ধার করিয়াছেন। অবশিষ্ট প্রায় ২০০ কোটী টাকা ইংলণ্ডীয় মহাজনদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই ঋণের নিমিত্ত দরিদ্র ভারতবাসীকে বার্ষিক ১১ কোটী ৫৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৯৫ টাকা সুদ দিতে হয়। এই সুদের মধ্যে ৬,৬৩,৫৮,৬৬০ টাকা বিলাতের মহাজনেরা পাইয়া থাকেন। এই সরকারি ঋণের ৩৪৮ কোটী টাকার মধ্যে ১৯১ কোটী ৪০॥ লক্ষ টাকা রেল পথ বিভাগের জন্য ও ৩৯ কোটী ২১॥০ লক্ষ টাকা জলপূর্ত্তের জন্য ধার করা হইয়াছে। * অবশিষ্ট ১১৮ কোটী টাকার মধ্যে ৭৬॥০ কোটী টাকা, ভূতপূর্ব্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে ভারতবর্ষের স্বত্ব ক্রয় করিবার জন্য ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ধার করা হয়। তখন ইহার পরিমাণ ৫১ কোটী টাকা (অর্থাৎ ৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড) ছিল। এখন পাউণ্ডের দর বৃদ্ধি হওয়ায় ৫১ কোটীর স্থলে ৭৬৷০ কোটী হইয়াছে। বিগত ৫০ বৎ-সরের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট আমাদের সার্ব্বজনিক ঋণের প্রায় কিছুই পরিশোধ করিতে পারে নাই। যদি কোম্পানিকে প্রদত্ত ৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ডের ঋণ কর্ত্তৃপক্ষ পরবর্ত্তী ত্রিশ বৎসরেরও শোধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পাউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধির জন্য পূর্ব্বেকার ৫১ কোটী টাকা এক্ষণে অকারণে ৭৬॥০ কোটী টাকায় পরিণত হইত না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশের লোকের নিকট হইতে নানা-প্রকারে প্রায় সহস্র কোটী মুদ্রা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের হস্ত হইতে ভারত-শাসনের ভার-গ্রহণ করিবার সময় তাঁহাদিগকে ৫১ কোটী টাকা ক্ষতিপূরণ বা মূল্য-স্বরূপ দেওয়া হইল! কোম্পানির নিকট হইতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভারত-রাজ্য ক্রয় করিলেন; সুতরাং ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতেই ভারত-সাম্রাজ্যের মূল্য প্রদত্ত হওয়া উচিত

---

* Vide Statistical Abstract of British India. 40th No. (1906 A D.)
ইং ১৯০৪।৫ সালের হিসাব। ইহার পর বিগত দুই বৎসরে রেল-বিভাগের জন্য অন্যূন ২০ কোটি টাকা ধার করা হইয়াছে।

ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভারত-সাম্রাজ্যের লভ্যাংশের ভাগী হইবেন জানিয়াও "পণের টাকা" ভারত-বাসী প্রজার নামে খরচ লিখিয়া রাখিলেন। অর্থাৎ আমরাই পণের টাকা দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিলাম। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিন্দুমাত্র শোণিত বা একটি কপর্দ্দকও ব্যয় না করিয়া ত্রিংশৎ কোটী ভারতবাসীর প্রভুত্বের অধিকারী হইলেন! ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপার্জ্জিত রাজত্বের মূল্য-দান করিল—ভারতবাসী, কিন্তু রাজ্যাধিকারী হইলেন—ইংরাজ! সামান্য বুয়র যুদ্ধে ইংরাজকে সাড়ে চারি শত কোটী টাকা ব্যয় করিয়া ক্ষুদ্র ট্রান্সভাল রাজ্য অধিকার করিতে হইয়াছে; তদ্ভিন্ন ইংরাজের কত যে শোণিতপাত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য জয় করিবার জন্য একটি কপর্দ্দকও ইংলণ্ডকে ব্যয় করিতে হয় নাই! সাম্রাজ্য-বিস্তারের অর্থদান করিল ভারতবাসী, শোণিত-পাত করিল ভারতবাসী, কিন্তু সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন ইংরাজ! তাহার পর অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল রাজ্য-শাসন করিতে না করিতে নিত্য-অনশন-পীড়িত রাজভক্ত প্রজাপুঞ্জকে তাঁহারা ৩৪৮ কোটী টাকার ঋণ-পঙ্কে নিমজ্জিত করিলেন। এরূপ অপূর্ব্ব ঘটনা জগতের ইতিহাসে আর কোথাও দৃষ্ট হয় কি?

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৮২ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। ১৮৯৬ সালে উহা কমিয়া ৬৫ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। ইংলণ্ডীয় রাজ-পুরুষেরা ৩৬ বৎসরে ১৭ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ভারতীয় ঋণের পরিমাণ বহু গুণ বাড়িয়াছে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এদেশের ঋণের পরিমাণ ৫ কোটী দশ লক্ষ পাউণ্ড বা ৫১ কোটী টাকা ছিল,১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৯৭ কোটী টাকা হয়! তৎপরবর্ত্তী ৪৫ বৎসরে উহা ৩৪৮ কোটী টাকায় পরিণত হইয়াছে। বিগত ৫০ বৎসরে রাজ্যের আয় যেমন বাড়িয়াছে, ঋণও সেইরূপ বাড়িয়া গিয়াছে! ঋণ-প্রিয়তায় ভারত-গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় অশিক্ষিত কৃষক-সম্প্রদায়কেও পশ্চাৎপদ করিয়াছেন, দেখিতেছি।

২৩ কোটী বৃটিশ ভারত-বাসীর সরকারী ঋণ ৩৪৮ কোটী টাকা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে যখন দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া ভারত-

সাম্রাজ্যের শাসন ও পালন ভার গ্রহণ করেন, তখন আমাদের সরকারি ঋণের পরিমাণ ৫১ কোটী টাকা ছিল! অর্থাৎ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসীর সরকারি ঋণের পরিমাণ গড়ে জনপ্রতি ন্যূনাধিক ৩ টাকা ছিল; এক্ষণে উহা গড়ে প্রায় ১৫টাকা হইয়াছে। ৫০ বৎসরে প্রজার সরকারি ঋণভার প্রায় পঞ্চগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? সভ্য জাতি-মাত্রেরই বহু সহস্র কোটী মুদ্রার ঋণ আছে, একথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু স্বাধীন জাতির ঋণের সহিত পরাধীন জাতির ঋণের তুলনা করা সঙ্গত নহে। স্বাধীন ও সভ্য জাতি ঋণ করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহা দেশ-বিজয়-পূর্ব্বক সাম্রাজ্যের আয় ও গৌরব বৃদ্ধি, উপনিবেশ-সংস্থাপন ও শিল্প-বাণিজ্যাদির বিস্তার প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। বলিতে গেলে এই সকল কার্য্য করিবার জন্যই সভ্য ও স্বাধীন জাতিসমূহ সার্ব্বজনিক জাতীয় ঋণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু পরাধীন জাতির—বিশেষতঃ ভারতবাসীর ন্যায় পরাধীন জাতির সরকারি ঋণে এ সকল মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। বিগত একশত বৎসরের মধ্যে ভারতে প্রায় ২৫ বার দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে ও তাহাতে তিন কোটীর অধিক লোক প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এদেশে কৃষি-ব্যাঙ্ক-স্থাপনে কত অর্থব্যয় করিয়াছেন? দেশে কৃষিকার্য্যের দিন দিন অবনতি হইতেছে, বিদেশীয় পণ্যের তুলনায় ভারতীয় শস্যাদি পণ্য দ্রব্য বিদেশের বাজারে হীন বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, কিন্তু সে বিষয়ে উন্নতি বিধানের জন্য ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়াও উচ্চ অঙ্গের কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি? দেশে উচ্চ শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে? প্রজাকুলের স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকর অনুষ্ঠানে, পল্লীগ্রামে সুপানীয়ের ব্যবস্থা-পূর্ব্বক ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠার প্রকোপ-নিবারণের জন্য রাজপুরুষেরা কি যথোচিত অর্থব্যয় করিয়াছেন? দেশীয় গো-মহিষাদির সংখ্যা-বৃদ্ধি ও বংশোন্নতির জন্য ভারতীয় প্রজার প্রতিনিধিস্বরূপ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত কত মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন? ফলতঃ এই সকল নিত্য-মঙ্গলকর কার্য্যের জন্য যদি অধিক অর্থ ব্যয় না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই ৩৪৮ কোটী টাকা কিসের জন্য ঋণ করা হইল? একথা বোধ হয়, প্রত্যেক ভারতবাসীই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

১৮৩৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যারোহণের সময় হইতে ১৮৫৭সাল পর্য্যন্ত কালের এদেশীয় রাজ-কোষের আয়-ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জানা যাইবে যে,ভারতীয় রাজস্বে ভারত-শাসনের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইয়া প্রতি বৎসরেই রাজকোষে বহু পরিমিত মুদ্রা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ ইংলণ্ডীয় ব্যয়ের অর্থাৎ হোমচার্জ্জের ব্যপদেশে প্রতিবৎসরই উত্তরোত্তর অধিক অর্থ এদেশ হইতে শোষণ করিয়া এদেশবাসীর সরকারি ঋণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ১৮৩৭খ্রীষ্টাব্দে যে হোমচার্জ্জের পরিমাণ দুই কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকা ছিল, ১৮৫৭খ্রীষ্টাব্দে তাহা ৬ কোটী ১৬।০লক্ষ মুদ্রার পরিণত হইয়াছিল! এই হোমচার্জ্জের ব্যয় যদি আমাদের নিকট হইতে পরিগৃহীত না হইত,যদি উপনিবেশসমূহের ন্যায় ভারতবর্ষেরও শাসনকার্য্য পরিদর্শনের ব্যয় ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করা হইত,* তাহা হইলে ভারতবর্ষকে আদৌ ঋণগ্রস্ত হইতে হইত না; বরং ভারতীয় রাজকোষে বহু কোটী মুদ্রা সঞ্চিত হইত। কিন্তু ইংরাজের অসমদর্শিতায় তাহা হইল না। পক্ষান্তরে ১৮৫৮ সালের প্রারম্ভে ভারতবাসীর ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৬৯॥০কোটী টাকা হইয়াছিল। ১৭৯২সাল হইতে ১৮৩৭সাল পর্যন্ত ভারতীয় রাজ-কোষের ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিকতর হইয়াছিল; তখন রাজ্য-শাসনকার্য্যে দেশীয়ের নিয়োগ প্রায়ই হইত না। প্রভূত বেতনে শ্বেতাঙ্গপোষণ করিয়াও তখনকার শাসন-কর্ত্তারা আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে পারিতেন। তদ্ভিন্ন এখানকার সমস্ত ব্যয়-নির্ব্বাহ করিয়া কোম্পানিকে হোমচার্জ্জস্বরূপ বৎসরে ২ কোটী টাকা করিয়া বিলাতে পাঠাইতে হইত। এই টাকা না পাঠাইলে কোম্পানির আদৌ কোনও ঋণ করিবার প্রয়োজন হইত না।

ইহার পর সিপাহী-বিপ্লবের দমনের জন্য ইংলণ্ডের যে ৪০ কোটী টাকা ব্যয় হয়, তাহাও ভারতবাসীর নিকট হইতেই আদায় করিবার

* উপনিবেশ-সমূহের কার্য্য-পরিদর্শনের জন্য বিলাতে যে "কলোনিয়াল আফিস" আছে, তাহার জন্য বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই টাকার সমস্তই ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়; কিন্তু ভারতীয় শাসন-কার্য্য-পরিদর্শনের জন্য "ইণ্ডিয়া আফিসে" যে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়, তাহার এক কপর্দ্দকও ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয় না, সমস্তই দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ভারতবাসীকে বহন করিতে হয়। ইদানীং কিছুদিন হইতে কেবল ভারত-সচিবের বেতনটুকু বিলাতী রাজকোষ হইতে প্রদান করিবার প্রস্তাব কয়েক বারই পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ব্যবস্থা করা হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে ভারতবর্ষ ক্রয় করিবার অর্থ ভারতবাসীই যেমন ইংরাজকে ঋণ করিয়া দান করিতে বাধ্য হইয়াছিল, ভারতের সিপাহী-বিপ্লব-দমনের ব্যয়ও, সেইরূপ তাহাদিগকেই ঋণ করিয়া দিতে হইল! শুদ্ধ তাহাই নহে, বিপ্লবের জন্য ভারতীয় রাজকোষের অবস্থা যখন অতীব শোচনীয় ও শূন্য-প্রায় হইয়াছিল, সেই দুঃসময়ে ইংরাজ বিপ্লব-দমনের জন্য যে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের ইংলণ্ড-ত্যাগের পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় মাসের বেতনও ভারতবাসীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল! বলা বাহুল্য যে, ঐ বিপ্লবটি ইংরাজদিগের দোষেই হইয়াছিল। "টোটা কাটার গল্প" যে অলীক ছিল না, সত্য সত্যই যে টোটায় হিন্দু মুসলমানের অস্পৃশ্য চর্ব্বি মাখান থাকিত, একথা এখন নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।

ফলতঃ যাহারা ধর্ম্মনাশ-ভয়ে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে কেহই অপরাধী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন না। তথাপি তাহাদিগের অনেককেই প্রাণদান করিয়া এই পাপের(!) প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। যাহারা এই দুর্ঘটনায় নিহত বা প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হয় নাই, তাহাদিগেরও অন্যপ্রকারে যথেষ্ট শাস্তি ও লাঞ্ছনা-ভোগ ঘটিয়াছিল, অনেক নিরীহ ব্যক্তিকেও তাহার অংশভাগী হইতে হইয়াছিল। কোন না কোন প্রকারে বিপ্লবের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে রাজপুরুষেরা কুণ্ঠিত হন নাই! এইরূপে যখন বিপ্লবকারীদিগের অনেকের লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছিল, তখন আবার নিরীহ ভারতবাসীর স্কন্ধে ৪০ কোটী টাকার ব্যয়-ভার নিক্ষিপ্ত হইল কেন? যাহারা অপরাধ করিয়াছিল, তাহারা দণ্ড-ভোগ করিল, কিন্তু যাহারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল, বরং স্বদেশীয় সিপাহীদিগের বিরুদ্ধেই ইংরাজ-রাজকে সর্ব্বপ্রকারে বিপ্লব-দমনে সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদিগকে ইংরাজ-রাজ ৪০ কোটী টাকা অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত ও পরিশেষে নিরস্ত্র করিলেন কেন? পক্ষান্তরে ট্রান্সভালবাসীরাই বা ইংরাজের বিরুদ্ধে ঘোর যুদ্ধ করিয়া অন্যরূপ ফল লাভ করিল কি জন্য? সেখানকার যুদ্ধের ব্যয়-স্বরূপ ৪৫০ কোটী টাকা ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইল এবং তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই বুয়রদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দিয়াও পুরস্কৃত করা হইল। এইরূপ এক-যাত্রায় পৃথক ফল ঘটিবার কারণ কি?

ইহা কি আমাদিগের অ-কৃত্রিম রাজ-ভক্তির পুরস্কার? বিপ্লব-দমনে স্বদেশ-বাসীর বিরুদ্ধে ইংরাজকে সহায়তা করিবার ইহাই কি প্রতিফল? যাহারা ধর্ম্মে আঘাত পাইয়া আত্মরক্ষার্থে বিপ্লব করিয়াছিল, তাহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি ঐ ৪০ কোটী টাকার ঋণ-ভার বহন করিয়া প্রতি বৎসর সুদ দিতেছে, এ কথা ভাবিলে কাহার না হৃদয় ব্যথিত হয়?

এইরূপে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতীয় প্রজার সরকারি ঋণ প্রায় শতকোটী মুদ্রায় পরিণত হইল। ভারতীয় প্রজার এই সরকারী ঋণের জন্য ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যদি জামিন হইতেন, তাহা হইলে অল্প সুদে টাকা ধার পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইল না; রাজা ভারতীয় প্রজার স্কন্ধে যে ঋণ-ভার নিক্ষেপ করিলেন, তাহার জন্য স্বয়ং কোনও প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। ফলে মহাজনেরা অধিক সুদ চাহিতে লাগিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট বিলাতী কর্ত্তাদের পীড়নে বাধ্য হইয়া অধিক সুদেই টাকা ধার করিয়া তাঁহাদের প্রার্থিত অর্থ দান করিলেন। দরিদ্র ভারত-বাসী রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া অদ্যাপি অধিক সুদ দান করিতেছে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দেই লর্ড ষ্টান্‌লি পার্লামেণ্ট মহাসভায় এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু জন ব্রাইট উহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ভারতীয় রাজপুরুষেরা যেরূপ অমিত-ব্যয়ী, তাহাতে ভারতীয় ঋণের জন্য ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যদি জামিন হন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের কর-দাতাদিগকে পরিণামে হয়ত ঘোর ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে হইবে! অর্থাৎ যদি অতিব্যয়ে ভারত-গবর্ণমেণ্ট কখনও দেউ-লিয়া হইয়া পড়েন, তাহা হইলে মহাজনেরা ঋণের টাকা ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে আদায় করিবার চেষ্টা করিবে। জন ব্রাইট মহোদয় এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করায় পার্লামেণ্ট মহাসভা ভারতের সরকারি ঋনের জন্য জামিন হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। লর্ড ষ্ট্যান্‌লির প্রস্তাব মত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ঋণের জন্য জামিন হইলে বার্ষিক দেড় কোটি হইতে দুই কোটি টাকা সুদের দায়ে আমরা অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতাম, তদ্ভিন্ন ভারতীয় রাজপুরুষদিগের অপব্যয়ের উপর ইংলণ্ডের করদাতাদিগের সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত, সন্দেহ নাই। ফলে আমাদের সরকারি ঋণের এরূপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিত না।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে হোমচার্জ্জের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতে

লাগিল। উচ্চ বেতন-ভোগী শ্বেতাঙ্গদিগের আমদানি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিশাল এসিয়া খণ্ডে ও আফরিকায় ইংরাজের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা ও রাজ্য-বিস্তারের জন্য যুদ্ধাভিযান প্রভৃতিতে যত অর্থ ব্যয়িত হইল, তৎসমস্তই ভারতবাসীর নিকট হইতে আদায় করিবার ব্যবস্থা করা হইল। ইহার উপর রেল-বিস্তারেও কর্তৃপক্ষ জলের ন্যায় অর্থ-ব্যয় করিবার সংকল্প করিলেন। রাজপুরুষেরা নিরঙ্কুশ-ভাবে যথেচ্ছ অর্থ-ব্যয় করিতে লাগিলেন, প্রজার খাজনা প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু তাহাতেও ব্যয় সঙ্কুলান হইল না। সুতরাং অবাধে ঋণ-গ্রহণ-কার্য্য চলিতে লাগিল। এইরূপে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে যে ঋণের পরিমাণ প্রায় এক শত কোটি মুদ্রা ছিল, তাহা ১৯০৬ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে ৩৪৮ কোটি মুদ্রায় পরিণত হইয়াছে!

ভারতীয় রাজস্বের বিবরণ।

১৯০৬—১৯০৭ সালের আয়-ব্যয়ের সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ এখনও হয় নাই। এই কারণে ১৯০৫-৬ সালের আয়-ব্যয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। ঐ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ভারত গবর্ণমেণ্টের ১২৬ কোটী ৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৪৫ টাকা আয় হইয়াছিল। এই আয়ের মধ্যে ভূমি-রাজস্বে প্রায় ২৮ কোটী ২৯ লক্ষ, অহিফেনে ৬ কোটী ২০ লক্ষ ৩১ হাজার, লবণশুল্কে ৬ কোটী ৫৬ লক্ষ ৪৬ হাজার, ষ্টাম্পে ৫ কোটী ৮৯ লক্ষ, আবকারিতে ৮ কোটী ৫৩ লক্ষ, প্রাদেশিক রাজস্বে (প্রবিন্সিয়াল রেটস্) ৪ কোটী ১৯৸০ লক্ষ, আমদানি-রপ্তানি শুল্কে ৪ কোটী ৫৬৷৷০ লক্ষ, বিবিধ করে ১ কোটী ৯৮ লক্ষ, বন-বিভাগে ২ কোটী ৬৭ লক্ষ, রেজিষ্টারিতে ৫৪ লক্ষ ২৯ হাজার ও দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট প্রাপ্ত করে ৮৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৫০ টাকা আদায় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য আয়ও আছে। সর্ব্বসমেত ৭৪ কোটী ২৯ লক্ষ ১৯৷৷০ হাজার টাকা প্রজার নিকট হইতে করস্বরূপে আদায় হইয়াছে। রেল, ডাক, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ব্যবসায়-মূলক বিভাগের আয় অবশিষ্ট ৫১৸০ কোটী টাকা।

বিগত পাঁচ বৎসরে ভারত-গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের আয় এবং রেল, খাল, ডাক, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ব্যবসায়-মূলক বিভাগের আয় কিরূপ

হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা এস্থলে সংকলিত করিয়া দেওয়া হইল,—

সাল— রাজস্বের আয়।	ব্যবসায়-মূলক আয়।
১৯০১—৬৯,৯০,২৬,৪৭৫ টাকা	৪৪,৬১,৪১,৪০০ টাকা
১৯০২—৭১,০৭,১৩,৫০০ টাকা	৪৫,০৮,১০,২২৫ টাকা
১৯০৩—৭৩,৮০,৬৯,৮৫৫ টাকা	৫১,৮২,৭৩,৪৭০ টাকা
১৯০৪—৭৫,৬৭,৮৯,৫২৫ টাকা	৫১,৫৪,০৫.০৪০ টাকা
১৯০৫—৭৪,২৯,১৯,৩৮৫ টাকা	৫১,৭৭,৬২,২৬০ টাকা

রাজস্বের এই প্রায় ৭৪।০ কোটি টাকার মধ্যে ভূমি-কর, লবণ-কর, ষ্টাম্প-কর ও বন-কর ও অহিফেনের ব্যবসায়ে গবর্ণমেণ্টের একাধিপত্য, প্রজার পক্ষে কতদূর কষ্ট-দায়ক, তাহা একটু বিশদরূপে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। ভূমিকরের আদায় কার্য্যে যেরূপ কঠোর নীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে, ইতঃপূর্ব্বে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা গিয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য করের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

লবণের ন্যায় সর্ব্বজন-প্রয়োজনীয় দ্রব্যে প্রতি মণে ২॥০ টাকা কর এত দিন আদায় করা হইয়াছে গত ১৯০৩ সালের প্রারম্ভে মণ করা আট আনা শুল্ক হ্রাস করা হয়। তাহার পর ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাস হইতে মণকরা ১৷৷০ টাকা ও তৎপরে ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে মণকরা এক টাকা মাত্র শুল্ক আদায়ের আদেশ হইয়াছে। পৃথিবীর কোনও সভ্য দেশেই লবণের উপর কোনও শুল্ক গৃহীত হয় না। কিছুকাল পূর্ব্বে জাপানেও লবণের শুল্ক প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান জাপান গবর্ণমেণ্ট লবণের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঐ শুল্ক রহিত করিয়া দিয়াছেন। বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহের নিমিত্ত জাপানের অনেক অর্থনীতিজ্ঞ ব্যক্তি লবণ-শুল্কের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু জাপানী পার্লামেণ্ট তাঁহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। চীন দেশে লবণের উপর কর গৃহীত হয় বলিয়া জাপানীরা চীন গবর্ণমেণ্টের ঐ প্রথাকে বর্ব্বর-ব্যবস্থা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। ইংরাজের আগমনের পূর্ব্বে ভারতের অধিকাংশ স্থলেই লবণের উপর কুড়ি মণে ১৷৷০ টাকা হইতে ১৸০ টাকার অধিক কর ছিল না। তখন লবণের দরও ৷৷১০ আনা হইতে ৷৷৵০ আনা মণ ছিল! দরিদ্র লোকে

তখন যথেষ্ট লবণ খাইতে পাইত, গো-মহিষাদিও লবণ-সেবনে বঞ্চিত হইত না। এক্ষণে ইংরাজ-রাজত্বে লবণের উপর গুরুতর কর স্থাপিত হওয়ায় দরিদ্রদিগের পক্ষে লবণ দুর্লভ হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন, খাদ্যে লবণের পরিমাণ হ্রাস হইলে ওলাউঠা, প্লেগ, রক্তপিত্ত, জ্বর প্রভৃতি রোগের আক্রমণ-সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ভারতবাসী এই সকল রোগের আক্রমণে দিন দিন জীর্ণ হইতেছে, তথাপি কর্ত্তৃপক্ষ লবণের উপর গুরু শুল্ক আদায় করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

একমণ লবণ প্রস্তুত করিতে সাধারণতঃ ছয় পয়সা খরচ পড়িয়া থাকে! দেড় আনার মালের উপর এক টাকা করও নিঃসন্দেহ ঘোরতর নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। এক ইটালী ব্যতীত কোনও পাশ্চাত্যদেশে লবণের উপর কর নাই। স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য বৎসরে প্রতি জনের অন্ততঃ ১০ সের লবণ-ব্যবহার আবশ্যক। কিন্তু করের আধিক্য-বশতঃ লবণ অক্রেয় হওয়ায় ভারতবাসী এতদিন বৎসরে গড়ে জন প্রতি ৬।।০ সেরের অধিক লবণ ভক্ষণ করিতে পায় নাই। বলা বাহুল্য, সঙ্গতিপন্ন পরিবারেরা এই সাড়ে ছয় সেরের অধিক যে পরিমাণ লবণ ভক্ষণ করিয়াছেন, দরিদ্র জনেরা সেই পরিমাণে কম লবণ পাইয়াছে! আবার গো-মহিষাদির জন্য যে লবণ ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহাও উক্ত গড় ৬।।০ সেরেরই অন্তর্গত! সুতরাং অতিরিক্ত করের জন্য এ দেশের দরিদ্র জন-সমাজকে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা কত কম লবণ সেবন করিয়া দিন-যাপন করিতে হইয়াছে, ইহা হইতে তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য অধুনা লবণ-করের হ্রাস হওয়ায় দরিদ্রদিগের লবণ-ব্যবহারের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছে; লবণের ব্যবহার গড়ে জন প্রতি বার্ষিক ৬।।০ সেরের স্থানে ৭।০ সের হইয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘকাল অল্প লবণ-সেবনে লোকের যে স্বাস্থ্য-হানি ও পশু-নাশ হইয়াছে, ইহাতে তাহার ক্ষতিপূরণ কিছুতেই হইবে না। (১) সকল দেশেই বিলাস-দ্রব্যের উপর কর বসান হইয়া

---

(১) প্রচুর লবণের অভাবে এ দেশের গো-মহিষাদির কিরূপ নাশ হইয়াছে ও হইতেছে, তৎসম্বন্ধে লর্ড লরেন্স বলিয়াছেন,—

I believe myself, that a great deal of the loss of the cattle from murrain in India has arisen from want of salt. I have very strong opinion on the subject.

থাকে। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে লবণের ন্যায় স্বাস্থ্য-রক্ষার্থে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপরও অতি গুরুতর শুল্ক স্থাপিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বৈদেশিক লবণ আমদানির বিষয়ও সংক্ষেপে আলোচ্য। পূর্ব্বে লবণের ব্যবসায়ে ভারতীয় হিন্দু মুসলমান নরপতিগণের এরূপ একাধিপত্য ছিল না। সমুদ্র-তীরে নানা স্থানেই দেশীয় মহাজনদের লবণ-উৎপাদনের কারখানা ছিল। তখন দেশে যে লবণ উৎপন্ন হইত, তাহাতেই দেশবাসীর অভাব দূর হইত; বিদেশ হইতে লবণ আমদানি করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি হইত না। জন-সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত দেশের লবণ-ব্যবসায়েরও বিস্তার ঘটিত; কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া করায় দেশীয়দিগের অবাধ-বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটিয়াছে, দিন দিন বিদেশ হইতে বহু লবণ আমদানি করিতে হইতেছে। ১৮৯১।২ সালে বিলাত হইতে ৬০ লক্ষ ২ হাজার ১ শত মণ লবণ এ দেশে আসিয়াছিল, ১৯০১।২ সালে প্রায় ৭০ লক্ষ মণ আসিয়াছে। অন্যান্য দেশের লবণেরও আমদানি বাড়িয়াছে। ১৮৯১।২ সালে ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ ১ কোটী ৯৮ হাজার মণ লবণ আমদানি হইয়াছিল, ১৯০১।২ সালে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪০০ মণ আমদানি হয়। বৈদেশিক লবণের আমদানি ঐ দশ বৎসরে শতকরা ৩৮ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে! বৈদেশিক লবণ ভারতের স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ হিন্দু-মুসলমানের নিকট অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। হিন্দুগণ কোনও দৈব বা পৈত্র্য কার্য্যে বৈদেশিক লবণ ব্যবহার করেন না। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ বৈদেশিক লবণ স্পর্শও করেন না। কারণ, উহাতে সময়ে সময়ে বিবিধ জীবের অস্থি-খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক লবণের জাহাজে সাহেবদিগের জন্য বিলাত হইতে বৃষ ও শূকরের মাংস লবণ-রাশির মধ্যে প্রোথিত করিয়া এদেশে আনীত হয়, একথা অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া ভারতের অনেক হিন্দু মুসলমান ইদানীং বৈদেশিক লবণের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যদি দেশীয় বণিক্‌দিগকে উৎসাহ দান করেন, তাহা হইলে এই লবণাম্বু-বেষ্টিত ভারতে হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম-হানিকর বৈদেশিক লবণ আনয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনায়াসে দূরীভূত হইতে পারে, এ কথা বলাই বাহুল্য। খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে বঙ্গদেশ হইতে বৎসরে তিন শত

জাহাজ লবণ বিদেশে রপ্তানি হইত, ইদানীং সেই বঙ্গদেশে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে বৎসরে ৫৫ লক্ষ টাকার লবণ আমদানি হইয়াছে, (১) ইহাও এ প্রসঙ্গে কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

পক্ষান্তরে এ দেশে মাদক দ্রব্যের প্রসার-বৃদ্ধি-বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। পঞ্চবিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে দেশে যে পরিমাণ মাদক দ্রব্য বিক্রয় হইত, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। এক্ষণে আবকারি বিভাগের সরকারি আয় ৮॥০ কোটি টাকা হইয়াছে। রাজা কোথায় প্রজার চরিত্র-বল-বর্দ্ধনে সহায়তা করিবেন, না, অর্থলোভে অন্ধ হইয়া প্রজার মাদক দ্রব্যে আসক্তি-বৃদ্ধি ও পশুত্ব-প্রাপ্তি বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন! দেশবাসীকে জ্ঞান-দান করিবার জন্য প্রতিগ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কর্ত্তৃপক্ষের তাদৃশ আগ্রহ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু মদ, গাঁজা, আফিমের দোকান যাহাতে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই খোলা হয়, সেজন্য তাঁহাদিগের বিশেষ যত্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আদমসুমারির রিপোর্টে প্রকাশ, বৃটিশ ভারতে পল্লীগ্রামের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ। তন্মধ্যে কেবল এক পঞ্চমাংশ গ্রামে বিদ্যালয় আছে। অবশিষ্ট পাঁচ ভাগের চারিভাগ গ্রামে লেখা পড়া শিক্ষার কোনও বন্দোবস্ত নাই। কিন্তু অনেক গ্রামেই মাদক দ্রব্যের দোকান দেখিতে পাওয়া যায়! গত পূর্ব্ব বৎসর গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আর আবকারি বিভাগের রাজস্ববৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন না। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি কার্য্যকালে রক্ষিত হয় নাই। এ বৎসরও আবকারি বিভাগের রাজস্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ষ্ট্যাম্পের আইনও লোকের সামান্য যন্ত্রণার কারণ নহে। বর্ত্তমান কালের ন্যায় বিচার-বিক্রয় এদেশে কখনও ছিল না। অধিকতর পরিতাপের বিষয় এই যে, ধনশালী ইংলণ্ডে যে হারে ষ্ট্যাম্পের মূল্য গৃহীত হয়, দরিদ্র ভারতে তদপেক্ষা অধিক মূল্য লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিলাতে বন্ধকী স্বত্ব-বিষয়ক দলিলে ৫ পাউণ্ড বা ৭৫ টাকায় ৩ পেন্স বা তিন আনা, ৫০০ পাউণ্ড বা ৭৫০০ টাকায় ১ পাউণ্ড বা ১৫ টাকার কোর্ট ফি ষ্টাম্প দিতে হয়। ভারতবর্ষে ঐরূপ দলিলের জন্য ৫০ টাকায়

(১) শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রণীত "সোণার বাঙ্গালা" ২০—পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

চারি আনা ও এক হাজার টাকায় পাঁচ টাকা লাগে! বিলাতে সম্পত্তির হস্তান্তর বিষয়ক দলিলে ৫ পাউণ্ড বা ৭৫ টাকায় ৬ পেন্স বা ৬ আনা এবং ২০০ পাউণ্ড বা ৩০০০ হাজার টাকায় ১৫ টাকা গবর্ণমেণ্ট লইয়া থাকেন। ঐরূপ কার্য্যে ভারতবর্ষে ৫০ টাকায় আট আনা এবং এক হাজার টাকায় ১০ টাকা গৃহীত হয়। এদেশে ২০ টাকার অধিক মূল্যের রসীদে এক আনার ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিতে হয়; বিলাতে ত্রিশ টাকার থতে এক পেন্সের (আনার) রসিদ ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন ষ্ট্যাম্প-সংক্রান্ত অন্যান্ত বিষয়েও ভারতবাসীকে বিলাতের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজস্ব দান করিতে হয়।

পূর্ব্বে দেশে যে পঞ্চায়ৎ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা ইংরাজের নীতি-কৌশলে বিনষ্ট হওয়ায় লোকের আত্ম-শাসন-শক্তি ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়াছে। কাজেই সর্ব্বস্বান্ত হইলেও লোকের মামলা-মোকর্দ্দমায় প্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। (১) ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশে সর্ব্বশুদ্ধ ২৭,৯১,০৮৮টি দেওয়ানি মোকদ্দমা হইয়াছিল, গত ১৯০৪ সালে ২৯,০৯,৯১৫টি হইয়াছে।

ইংরাজের আমলে বৃটিশ ভারতে বনবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দরিদ্র প্রজাকুলের ইন্ধনের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড মহোদয়ের রাজ্যাভিষেক-কালে ভারতবর্ষের কোনও কোনও অঞ্চলের প্রজাগণ বিনা শুল্কে কাষ্ঠ আহরণের অধিকার প্রার্থনা করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, প্রজার সেই সামান্য প্রার্থনাও পূর্ণ হয় নাই। বলা বাহুল্য,

(১) কোইম্বাটুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ও মান্দ্রাজ মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ আরুণ্ডেল বলেন,—

It is a singular feature of the centralizing tendency of our bureaucratic rule, that the village communities have lost much of the power of self-rule and self-help they formerly possessed. The native jury-system, the *punchayt* has been rudely shaken.

ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও কৃষিবিভাগীয় ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী স্যার এডোয়ার্ড বক্ ১৯০১ সালে বোম্বাইয়ের মালাবারি মহাশয়কে ভারতের পল্লীসমাজের পুনর্গঠ-নের অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেও স্বীকৃত হইয়াছে যে,—

During the first half of the last century, we destroyed the village community in this part of India, Sir Richard Temple striking the final blow in the Central Provinces.

পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের শাসনকালে ভারতীয় প্রজার জঙ্গল হইতে কাষ্ঠা-হরণের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষেরা সে অধিকার হরণ করায় দরিদ্র প্রজার ব্যয় ও ক্লেশ উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাণিজ্য-সংগ্রামে পরাভূত ধন-বল-হীন প্রজার লবণ, বিচার ও কাষ্ঠ-সংগ্রহে ব্যয়-বৃদ্ধি কখনই সুখকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বন-বিভাগের জন্য ভারতের অনেক স্থলে প্রজাপুঞ্জের গো-চারণ বিষয়ে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে! পক্ষান্তরে কাষ্ঠের অভাবে গোময় বহু পরিমাণে ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় কৃষিক্ষেত্র-সমূহে সারের অভাব ঘটিয়াছে। তথাপি গবর্ণমেণ্ট বনভূমির বিস্তার-কার্য্যে বিরত নহেন। অধুনা গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় সমগ্র ভারতবর্ষের এক-চতুর্থাংশ ভূমি সরকারি বন-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে! ইহা প্রকৃতি পুঞ্জের পক্ষে সামান্য ক্লেশকর নহে।

অহিফেনের ব্যবসায়ে গবর্ণমেণ্টের একাধিপত্য থাকায় প্রকৃতিপুঞ্জ একটি বিশেষ লাভ-জনক ব্যবসায় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ইংরাজের এ দেশে পদার্পণের পূর্ব্বে এই লাভজনক ব্যবসায়ে প্রজার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অহিফেনের চাষ একায়ত্ত করিয়া প্রকৃতি-পুঞ্জের বিশেষ ক্ষতি সাধন করিয়াছেন। কলিকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই অত্যাচার-মূলক অহিফেনের ব্যবসায় হইতে নিরস্ত হইবার জন্য বিলাতের পার্লামেণ্ট মহাসভায় আবেদন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। সুতরাং অহিফেনের আয়-স্বরূপ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বার্ষিক ৮॥০ কোটি টাকা দরিদ্র প্রজার হস্তগত না হইয়া প্রথমে রাজকোষে সঞ্চিত ও তৎপরে সামরিক বি-ভাগে ব্যয়িত হইতেছে!

এই সকল কারণ ব্যতীত অন্য বহু কারণেও প্রজার কষ্ট বৃদ্ধি পাই-য়াছে। গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে রাজ-কোষে যখনই অর্থাভাব ঘটিয়াছে, তখনই রাজস্বসচিব মুদ্রার মূল্য-হ্রাসকে তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক অর্থাভাব দূরীকরণের জন্য প্রজার উপর অতিরিক্ত কর-সংস্থাপন করিয়াছেন। অর্থাভাবের জন্য প্রথমে দুর্ভিক্ষে সাহায্য-দান বন্ধ করা হইয়াছিল। ১৮৮৬, ১৮৮৭ ও ১৮৮৮ এই তিন সালে কর্ত্তৃপক্ষের অর্থাভাবের জন্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজা কোন প্রকার রাজ-সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার পর দুই বৎসর ঐ সাহায্যের পরিমাণ

আংশিক লাঘব করা হয় এবং পরে উহা স্থায়িভাবেই কম করা হইল। কাজেই প্রজার কষ্ট বাড়িল। কিন্তু ইহাতেও গবর্ণমেণ্টের কল্পিত অর্থা-ভাব দূরীভূত হয় নাই। কাজেই তাঁহারা ক্রমাগত প্রজার করভার বৃদ্ধি করিয়া আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮৮৩।৪ সাল হইতে ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট নয় বার প্রজার উপর নূতন কর স্থাপন করিয়াছেন!

প্রথমতঃ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আয়-কর প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার এক বৎসর পরেই ১৮৮৭।৮ সালে মণকরা আট আনা হিসাবে লবণের শুল্ক-বৃদ্ধি ঘটে। ব্রহ্মদেশে লবণের কর মণকরা তিন আনা ছিল, এই সময়ে ইংরাজ উহা বাড়াইয়া এক টাকা করিলেন! তৎপরবর্ত্তী বর্ষে পাটওয়ারি ট্যাক্স ও কেরোসিন তৈলের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশবাসীকেও সেই বৎসর আয়-করের অধীন করা হইল। তাহার পর-বৎসর বিদেশী মদ্যের উপর কর্ত্তৃপক্ষ আমদানি মাসুল বসাইলেন। ১৮৯০-৯১ সালে দেশীয় বিয়ার মদ্যের উপরেও কর বসিল। ১৮৯২-৯৩ সালে ব্রহ্মদেশে লোণা মৎস্যের উপর আমদানি মাসুল বসে। ১৮৯৩-৯৪ সালে কার্পাস-জাত সামগ্রী ভিন্ন অন্য পণ্যের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে কর পুনঃ সংস্থাপন করা হয়। পরিশেষে ১৮৯৪-৯৫ সালে কার্পাসজাত পণ্যের উপরেও কর্ত্তৃপক্ষ আমদানি মাসুল আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্য-শুল্ক সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহার ফলে, বিলা-তের আমদানি কার্পাস-সূত্রের উপর যে, শতকরা ৫ টাকা কর আদায় করা হইত, তাহা রহিত হইয়া গেল। তদ্ভিন্ন বৈদেশিক বস্ত্র-জাতের আমদানি মাসুল কমাইয়া ৫ টাকার স্থলে ৩।৷০ সাড়ে তিন টাকা করা হইল। এই জন্য গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়-কুলের মঙ্গলের জন্য গবর্ণমেণ্ট সে ক্ষতি সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন এবং ভারতীয় কলের কাপড়ের উপর শতকরা ৩।৷০ টাকা কর বসাইয়া সেই ক্ষতির আংশিক পূরণ করিলেন। ১৮৯৯ সালে বৈদেশিক বৃত্তি-পুষ্ট শর্করার উপর আমদানি মাসুল বসান হই-য়াছে। এইরূপে বার বৎসরে ভারত গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয় প্রায় ১২ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই খানেই গবর্ণমেণ্টের আয়-বৃদ্ধির শেষ হয় নাই। অন্যান্য বিষয়ের

ন্যায় ভূমির রাজস্বও উক্ত দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে বহুপরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্বোক্ত সময়ের মধ্যে দেশে দুইবার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষপাত হইলেও, রাজকোষে ভূমির রাজস্ব অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৯৬ সাল হইতে বিগত ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট গড়ে বার্ষিক ২৬ কোটীর অধিক টাকা প্রজার নিকট হইতে ভূমির কর-স্বরূপে আদায় করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন লর্ড কর্জ্জনের সপ্ত বৎসরের শাসনকালে প্রজার নিকট হইতে সর্ব্বসমেত ৪৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর গৃহীত হইয়াছে। দরিদ্র দেশে এইরূপ ঘন ঘন কর-বৃদ্ধি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ রাজকোষের যে আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহার কিরূপ সদ্ব্যয় হইতেছে, এক্ষণে তাহার আলোচনা করা যাউক।

কৃষি-বিভাগে সরকারি ব্যয়।

জ্ঞান-পূর্ব্বক হউক, অজ্ঞান-পূর্ব্বক হউক, প্রজার কষ্টবৃদ্ধি করিয়া রাজপুরুষেরা দিন দিন জমির যেরূপ খাজনা বাড়াইতেছেন, তদনুপাতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি-সাধনের জন্য তাঁহারা অর্থ-ব্যয় করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। ইংরাজ বণিক্‌দিগের কল্যাণে এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের বিলোপ ঘটায় ভারতবাসী এক্ষণে কৃষিমাত্র-সম্বল হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার প্রায় ১৮ কোটী লোকেরই কৃষি ভিন্ন জীবিকা-নির্ব্বাহের অন্য উপায় নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই ১৮ কোটী কৃষকের উন্নতি-কল্পে এতদিন বৎসরে দশলক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন নাই। পাশ্চত্য-দেশসমূহ বাণিজ্য-প্রধান হইলেও সেখানকার শাসন-কর্ত্তারা কৃষির উন্নতি-সাধনের জন্য বৎসরে কত টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

দেশের নাম		ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ।
অষ্ট্রিয়া	...	২,৪৭,৫০,০০,০০০ টাকা।
রুষিয়া	...	৬,০০,০০,০০,০০০ „
হঙ্গেরী	...	২,৫৫,০০,০০,০০০ „
মার্কিন যুক্তরাজ্য	...	১,২০,০০,০০০ „
ইটালি	...	৯০,০০,০০০ „
সুইডেন	...	৫২,৫০,০০০ „
ডেনমার্ক	...	৩০,০০,০০০

ডেনমার্কের জনসংখ্যা ২৫ লক্ষের অধিক নহে। (১) অথচ ডেনিশ গবর্ণমেণ্ট এই ক্ষুদ্র জন-সমাজের কৃষি-বিষয়ক উন্নতি-সাধনের জন্য ত্রিশ-লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, আর এই ত্রিংশৎ কোটী-জনপূর্ণা ভারত-ভূমিতে ১৮ কোটী কৃষিজীবীর মঙ্গলার্থ আমাদের সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট বৎসরে দশ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করিতে পারেন নাই! তবে ১৯০৫ সাল হইতে কৃষি বিভাগে বার্ষিক ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, তাহারও অধিকাংশ উচ্চ বেতন দিয়া শ্বেতাঙ্গ পোষণ করিতেই ব্যয়িত হইয়া যায়।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি-সাধনের প্রথম ও প্রধান উপায় জল-পূর্ত্তের বিস্তার। কিন্তু এই উপায়ের অবলম্বনে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ব্যয়-কুণ্ঠা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কৃষকদিগের জল-সেচনের সুব্যবস্থা করিবার জন্য পূর্ব্বে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ ব্যয় মঞ্জুর ছিল। তাহার পর ১৯০২ সাল হইতে ঐ কার্য্যে বৎসরে অধিক অর্থ ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের যত্ন ও আগ্রহের অভাবে কোনও বৎসরই স্থিরীকৃত অর্থের সমস্ত ভাগ জল-পূর্ত্তের জন্য ব্যয়িত হয় নাই! নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন,—

১৯০২-৩ সালে স্থিরীকৃত ব্যয় ১ কোটি   প্রকৃত ব্যয় ৮৪ লক্ষ।
১৯০৩ ৪ " " " ১ "   " " ৭৬ "
১৯০৪ ৫ " " " ১ " ২৫ লক্ষ   " " ৫৪ "
১৯০৫-৬ " " " ১ " ২৫ লক্ষ   " " ৮৪ "
১৯০৬-৭ " " " ১ " ২৪ লক্ষ   " ১ কোটি ২৩ লক্ষ।

জলপূর্ত্তের উন্নতি-বিষয়ে এরূপ ব্যয়-কুণ্ঠা প্রকাশ করিলে এদেশে কৃষিকার্য্য কিরূপে বৃষ্টি-নিরপেক্ষ হইবে? পক্ষান্তরে, প্রতিবর্ষে নূতন রেল-পথ-বিস্তারের জন্য রাজপুরুষেরা প্রায় ১২ কোটী টাকা হিসাবে ব্যয় করিতেছেন। অতঃপর বার্ষিক ১৫ কোটী টাকা হিসাবে প্রতি বৎসর রেলের জন্য ব্যয়িত হইবে বলিয়া শুনিতেছি।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি-সাধনের দ্বিতীয় উপায় বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালীর

---

(১) পাশ্চাত্য দেশসমূহে কৃষিজীবীর সংখ্যা কিরূপ, তাহাও এস্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইল। অষ্ট্রীয়ায় শতকরা ৩৮ জন, হঙ্গেরীতে ৬৪ জন, ইটালিতে ৪৭ জন, সুইজারল্যাণ্ডে ৩৭ জন, ফ্রান্সে ৪৪ জন, ইংলণ্ডে ১০ জন, স্কটল্যাণ্ডে ১৪ জন, আয়ার-ল্যাণ্ডে ৪৪ জন, মার্কিন যুক্ত-রাজ্যে ৩৬ জন ও ডেনমার্কে ৫০ জন।

প্রবর্ত্তন। কিন্তু বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে উন্নত কৃষি-জ্ঞানের প্রসার জন্য পাশ্চাত্য-দেশ-প্রচলিত উপায়াবলীর একটীরও যথারীতি অবলম্বন করেন নাই। এদেশে কৃষিবিজ্ঞান-শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুণা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, কানপুর, শিবপুর প্রভৃতি স্থানে কৃষি-বিদ্যা শিখিবার সামান্য ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে সন্তোষজনক শিক্ষালাভ হয় না। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট দ্বারবঙ্গের পুষা নামক স্থানে একটী সুবৃহৎ কৃষি-বিদ্যালয় ও আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন। শুনিতেছি, এই কলেজের দ্বারা এদেশের কৃষি-কার্য্যের নাকি বিশেষ উন্নতি হইবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষের ১৮ কোটী কৃষিজীবীর জন্য অন্ততঃ ১৮টি উচ্চ অঙ্গের কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে এবং কৃষি-বিজ্ঞান-বিষয়ক অভিনব তত্ত্বসমূহ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য প্রতি বৎসর এক দল প্রচারক পল্লিগ্রামসমূহে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, এদেশে কৃষি-প্রণালীর বিশেষ পরিবর্ত্তন বা সংস্কার হইবে না। ক্ষুদ্র জাপানে তিন শত কৃষিতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কৃষক-সম্প্রদায়কে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ দিয়া বেড়াইবার জন্য নিযুক্ত আছেন। ইঁহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া কৃষকদের জমি ও সার পরীক্ষা করিয়া থাকেন, এবং গাছ পালার রোগের প্রতিকার করিবার উপায় বলিয়া দেন। জাপানের অনুপাতে বৃটিশ ভারতে অন্ততঃ ১৮ শত কৃষিতত্ত্বজ্ঞ পল্লিগ্রামে ভ্রমণ-পূর্ব্বক কৃষকদিগকে উপদেশ দিবার জন্য নিযুক্ত হওয়া উচিত। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের লোকসংখ্যা পৌণে আট কোটী। ঐ রাজ্যে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ১০টি কলেজ ও ৫৪টি আদর্শ কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র আছে। পরীক্ষা-ক্ষেত্রগুলির জন্য মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট বৎসরে অন্যূন ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। আমেরিকার লোক-সংখ্যার তুলনায় ভারত-সাম্রাজ্যে ইংরাজ-রাজের বার্ষিক এক কোটী টাকা ব্যয়ে অন্যূন ১৫০টি আদর্শ কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত। মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের মোট ব্যয় কিঞ্চিদূন তিন কোটী টাকা। তদনুপাতে ভারত-গবর্ণমেণ্টের অন্ততঃ বার্ষিক ৮৷৷০ কোটী টাকা ব্যয় করা উচিত। গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ পাইলে রাজানুগ্রহ-প্রার্থী অনেক রাজা জমিদার, এই

কার্য্যে অর্থ-সাহায্য-দানে অগ্রসর হইবেন, এরূপ আশা করা যায়। আমেরিকায় কৃষিকার্য্যের উন্নতি-বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ প্রকাশ পাওয়ায় সেখানকার বড়লোকেরা বার্ষিক দুই কোটী টাকা কৃষি-বিদ্যালয়-সমূহের উন্নতি-সাধনের জন্য প্রদান করিয়া থাকেন। (১)

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত ভড়োচ (Broach) জেলার কমিশনার মিঃ লেলি গত ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ অঞ্চলের ভূমির অবনতি বিষয়ে আলোচনা-কালে তদীয় রিপোর্টে বলিয়াছেন, ঐ প্রদেশে তিন বৎসর পরে এক বৎসর কাল বিনা আবাদে জমি ফেলিয়া রাখিবার রীতি বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল। এই প্রথার ফলে সার না পাইলেও ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্ত্তী বর্ষে দ্বিগুণ শস্য উৎপন্ন হয়। প্রাচীন জমীদার ও শাসন-কর্ত্তারা এই উদ্দেশ্যে প্রজাদিগকে তিন বৎসরের পর এক বৎসরের খাজনা রেহাই দিতেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও প্রথম কিছুদিন এই প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, তাঁহারা এই হিতকর প্রথার পরিহার করিয়াছেন। মিঃ লেলি বলেন, তদবধি ভড়োচ জেলায় দিন দিন জমীর অবনতি ঘটিতেছে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম না পাওয়ায় ভারতবর্ষের অনেক স্থানেরই জমী যে দিন দিন অনুর্ব্বর ও কৃষককুল হীনতাপন্ন হইতেছে, এ কথা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং শুদ্ধ কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেই ভারতে কৃষি-ব্যবসায়ের উন্নতি সংসাধিত হইবে না। দরিদ্র কৃষককুল যাহাতে ঋণ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া, বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতির ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ হয়, তাহার জন্য তাহাদিগের ভূমি-রাজস্ব হ্রাস করাও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে, ভারতের কৃষকসমাজের এক তৃতীয়াংশ এরূপ গভীর ঋণ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে যে, তাহাদিগের

(১) আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সরকারি কৃষিবিভাগ হইতে প্রতি বৎসর ৮ শত পৃষ্ঠা-ব্যাপী অতি উৎকৃষ্ট বাঁধাই বার্ষিক কৃষি-বিবরণীর প্রায় ৫ লক্ষ খণ্ড বিনামূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে। ভারতে ঐ সকল রিপোর্ট বিক্রয় করা হয়। এখানকার লোকে চাহিয়া পাঠাইলেও মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট বিনামূল্যে রিপোর্ট পাঠাইয়া দেন বলিয়া শুনিতে পাই। কিন্তু এখানকার গবর্ণমেণ্টের নিকট চাহিলে কেহই বিনামূল্যে রিপোর্ট পুস্তক প্রাপ্ত হয় না। অথচ কৃষিজীবী প্রজার নিকট হইতেই আমাদের গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা আয় হইয়া থাকে!

আর পুনরুদ্ধারের আশা-মাত্র নাই। অবশিষ্ট কৃষকদিগের অর্দ্ধাংশ অল্পাধিক পরিমাণে ঋণ-গ্রস্ত। কেবল এক তৃতীয়াংশ কৃষিজীবীর কোনও প্রকার ঋণ নাই। ১৮৮০ সালে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তথাপি কর্ত্তৃপক্ষ এতদিন প্রতীকারে অগ্রসর হন নাই। কাজেই বিগত কয়েক বৎসরের দুর্ভিক্ষে বহুলক্ষ কৃষিজীবীর ভব-যন্ত্রণা শেষ হইয়াছে!

কৃষককুলের দুরবস্থার নিরাকরণ করিতে হইলে, রাজা ও প্রজা উভয়কেই কিয়ৎপরিমাণে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। দেশের উত্তমর্ণ সম্প্রদায়কে সুদের হার কমাইতে হইবে এবং রাজাকে দরিদ্র শিল্পীদিগের উৎসাহ-বর্দ্ধন, পঞ্চায়েৎ বিচারের প্রবর্ত্তন ও রাজস্ব-সংক্রান্ত নিয়মাবলীর কঠোরতা-হ্রাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষিত জন-সাধারণের ইহাই অভিমত। এই মতানুসারে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে দেশের কতিপয় সহৃদয় উত্তমর্ণ সমবেত ভাবে কৃষি-ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক স্বল্প সুদে কৃষকদিগকে ঋণ-দানের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা এজন্য রাজপুরুষদিগের আনুকূল্য-ভিক্ষাও করিয়াছিলেন। মহামতি ওয়েডারবরণের ন্যায় সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গগণ উত্তমর্ণদিগের সদ্ব্যবহারের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিভূ হইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয়, এই সদনুষ্ঠানে সহায়তা করিতে গবর্ণমেণ্ট সম্মত হন নাই। রাজশক্তি ও দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী স্তরে জমীদার বা মহাজনের ন্যায় কোনও শ্রেণীর ধনবান্ ও শক্তিশালী সম্প্রদায় থাকিতে দেওয়া এই দেশের রাজপুরুষদিগের নিকট যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। এজন্য তাঁহারা দেশের সহৃদয় উত্তমর্ণদিগের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। সুতরাং বৃটিশ ভারতের হতভাগ্য কৃষকেরা নীরবে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু দেশীয় রাজ্যে কৃষকদিগের অবস্থা এরূপ শোচনীয় নহে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব সেন্সাস কমিসনার বেন্স সাহেব বলেন,—

It is a very curious feature in the census returns that the proportions of money-lenders who combine that occupation with the possession of land is far greater in British territory, than in the Native States.

অর্থাৎ জনসংখ্যার অনুপাতে দেশীয় রাজ্য অপেক্ষা বৃটিশ শাসিত ভারতে কুশীদজীবী উত্তমর্ণের সংখ্যা অধিক।

এত দিন পরে এদেশীয় কৃষকসমাজ যাহাতে অল্প সুদে টাকা ধার

করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি-সাধনের সহিত মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি 'কো-অপারেটিব ক্রেডিট সোসাইটিজ' বা পরস্পর-সাহায্যকারী মণ্ডলী গঠনের বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু মণ্ডলীর কার্য্যে দেশের মধ্যস্তর-স্থিত মধ্যবিত্ত ও উত্তমর্ণ সম্প্রদায় যাহাতে কোনও প্রকারে যোগ-দান করিতে না পারেন, সে বিষয়ে ভেদনীতি-কুশল গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বনে বিরত হন নাই। তাঁহারা যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে কোনও উত্তমর্ণ, মণ্ডলীর সদস্য হইতে পারিবেন না। কোনও সদস্য ২৫০৲ টাকার অধিক ব্যাঙ্কে জমা করিতে বা ধনভাণ্ডারের দশমাংশের অধিক অংশ ক্রয় করিতে পারিবেন না! একটি বৃহৎ ধনভাণ্ডার অপেক্ষা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী ও ধনভাণ্ডার স্থাপিত হওয়াই কর্ত্তৃপক্ষ অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন। শিল্পীদিগের জন্যও কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রকার মণ্ডলী স্থাপনের পক্ষপাতী। কিন্তু দুই তিনটি গ্রামের কৃষকেরা ইচ্ছা করিলে যেরূপ সমবেত হইয়া মণ্ডলী গঠন করিতে পারিবে, শিল্পিগণ সেরূপ পারিবে না। এক গ্রামের শিল্পীর সহিত অন্য গ্রামের শিল্পীর যাহাতে সংযোগ না ঘটে, সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সতর্কতা দেখিয়া কেহই প্রীতি-প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

ফলকথা, এই বিধানে ভারতের কৃষিজীবীদিগের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা অতি সামান্য। কারণ, যে সকল কৃষক বহুদিন হইতে ঋণপঙ্কে নিমগ্ন, তাহাদিগের ঋণশোধ না হইলে তাহারা ভাণ্ডারের জন্য অর্থ দান করিয়া মণ্ডলীর সদস্য হইতে পারিবে কিরূপে? অপর লোকেই বা তাহাদিগের সহিত অর্থের আদান-প্রদান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইবে কেন? জার্ম্মেনীতে যখন এইরূপ মণ্ডলী-স্থাপনের বিধান প্রণীত হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট প্রথমে কৃষকদিগের পূর্ব্বের গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে ভারত গবর্ণমেণ্ট সেইরূপ কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ফলকথা, যতদিন কর্ত্তৃপক্ষ অন্যান্য অপব্যয়ের লাঘব করিয়া প্রজার মঙ্গল-সাধনার্থ পাশ্চাত্য ভূপতিগণের ন্যায় অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে সম্মত না হইবেন, ততদিন শুদ্ধ রাজ-বিধান-প্রণয়নে ও বচন-বাগীশতায় কোনও প্রকার সুফল হইবে না।

শিক্ষা-বিভাগের ব্যয়।

প্রজাকুলের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য অর্থ-ব্যয়েও রাজপুরুষদিগের কৃপণতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নানা বিষয়ে প্রজার কর-ভার-বৃদ্ধি করিয়া যে রাজস্ব সংগৃহীত হয়, তাহার প্রায় ৭০ ভাগের এক ভাগ বা রাজ্যের সমগ্র আয়ের ১২০ ভাগের এক ভাগ ২৩ কোটী প্রজার শিক্ষা-দান কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। বিগত ১৮৯০ সাল হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে গড়ে বার্ষিক ৯১ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন নাই। তৎপরবর্ত্তী ৫ বৎসরে গড়ে বার্ষিক ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিয়াছেন। ইদানীং কয়েক বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগে কিঞ্চিৎ অধিক অর্থব্যয় করিতেছেন। কারণ, বিগত ১৮৯৯ সাল হইতে রাজকোষে বার্ষিক প্রায় ৭ কোটী টাকা হিসাবে রাজস্ব উদ্বৃত্ত হইতেছে। আলোচ্য ১৯০৪।৫ সালে শিক্ষা-বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ৪ কোটি ৮১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ও তাহার ৫ বৎসর পূর্ব্বে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। তন্মধ্যে,—

	১৯০৪—০৫ সালে	১৯০০—০১ সালে
রাজকোষ হইতে	১,৪১,১৫,৪০২ টাকা	৯৮,২১,৯৭৫ টাকা
ছাত্রদত্ত বেতন হইতে	১,৪১,৫৯,৭৯৮ "	১,২০,১০,০২১ "
চাঁদা প্রভৃতি হইতে	১,০২,৯৯,৯৫২ "	৯৩,০৩,৭৭২ "
লোক্যাল ফণ্ড হইতে	৭৬,৬০,২৪২ "	৫৭,১৭,১৩৮ "
মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে	১৮,৯৯,৬৯২ "	১৫,৭০,০৩১ "
মোট	৪,৮১,৩৫,০৮৬ টাকা	৩,৮৪,২২,৯৩৭ টাকা

ব্যয়িত হয়। তদ্ভিন্ন বৃটিশ বেলুচিস্থানের জন্য ১৯০০—০১ সালে ২৩,০৭২ টাকা ও ১৯০৬—০৫ সালে ২৯,৮৬৬ টাকা খরচ করা হইয়াছে।

বিদ্যালয়ে গমনের যোগ্য বালকের সংখ্যা বৃটিশ ভারতে প্রায় তিন কোটী। সুসভ্য ইংরাজ-রাজের অনুগ্রহে ও জনসাধারণের চেষ্টায় ইহাদিগের মধ্যে প্রায় ৫১ লক্ষ জন লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা পাই-তেছে! তন্মধ্যে এক বঙ্গদেশীয় (বঙ্গ বিহার উড়িষ্যায়) ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ১৮৸০ লক্ষ। যে দেশে ৭॥০ কোটী লোকের বাস, সে দেশের

পক্ষে এই ছাত্র-সংখ্যা কিরূপ সামান্য, সকলেই বুঝিতে পারেন। বঙ্গ দেশে দেড় শত বর্ষ-ব্যাপী ইংরাজ-শাসনের পরও লেখা পড়া জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ১৫ জন মাত্র। সমগ্র ভারতবর্ষে গড়ে শতকরা ১১ জনের অধিক পুরুষ ও হাজার করা ৯ জনের অধিক স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানে না, তথাপি গবর্ণমেণ্ট প্রজার শিক্ষাসৌকর্য্যার্থ অধিক অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। (এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য) পক্ষান্তরে শিক্ষা-সংস্কারের ব্যপদেশে শিক্ষা-সংহারের নানা উপায় অবলম্বিত হইতেছে। দেশীয় গ্রন্থকার ও মুদ্রাকরদিগের অন্নে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক একদিকে লঙ্‌ম্যান ও ম্যাক্‌মিলান্‌ কোম্পানির ধনাগমের পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অন্য দিকে দেশীয় বালকগণ সাহেবী বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া জ্ঞান-মার্গে অগ্রসর হইবার অপূর্ব্ব যোগ্যতা লাভ করিতেছে! এ সকল দেখিলে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া প্রত্যেক স্বদেশ-ভক্ত ব্যক্তিরই চিত্তে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

প্রায় দেড় শত বৎসর-ব্যাপী ইংরাজ-শাসনের পরও ভারতবর্ষে গড়ে শতকরা ৮৮ জন নিরক্ষর, ইহা অপেক্ষা সুসভ্য শাসন-কর্ত্তার পক্ষে কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা এরূপ অধিক নহে, এমন কি অনুপাতে ইহার অর্দ্ধেকও নহে। জাপান জন-সমাজে শিক্ষা-বিস্তার দ্বারা বর্ত্তমান অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে। ১৮৭২ সালে শিক্ষা সংস্কারের প্রতি যখন জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হয়, তখন জাপান-সম্রাট বলিয়াছিলেন,—

It is intended that henceforth education shall be so diffused that there may be not a village with an ignorant family, or a family with an ignorant man.

অতঃপর সম্রাট এরূপ ভাবে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে চাহেন যে, জাপানের কোনও পল্লীগ্রামে যেন একটিও অজ্ঞ পরিবার বা কোনও পরিবারে যেন একজনও নিরক্ষর লোক না থাকে।

জাপানী রাজপুরুষেরা সম্রাটের এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে এখন জাপানে বালক-বালিকা ও যুবকদিগের মধ্যে শতকরা ৮১ জন বিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ করিতেছে। জাপানে সমগ্র জন-সংখ্যার চতুর্থাংশ মাত্র নিরক্ষর। জাপানের অনুপাতে বৃটিশভারতে এক কোটী অশীতি লক্ষ ছাত্র বিদ্যালয়ে থাকা উচিত ছিল।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রায় ৫১ লক্ষের অধিক বালক-বালিকা ও যুবক এদেশে বিদ্যা শিক্ষার সুবিধা প্রাপ্ত হয় না। ক্ষুদ্র জাপানে সরকারি সেকেণ্ডারি বা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ ৫৷৷০ হাজার; কিন্তু এই বিশাল বৃটিশ-ভারতে ছয় সহস্রের অধিক নহে!

১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশন এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও এদেশে শিক্ষার বিস্তার-কল্পে রাজপুরুষদিগের তাদৃশ যত্ন প্রকাশ পায় নাই। এত দিনে কর্ত্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; কিন্তু তজ্জন্য এদেশের উচ্চ-শিক্ষার সমূহ ক্ষতি-সাধনে তাঁহাদিগের যত্ন দেখা যাইতেছে; উচ্চ শিক্ষার বিনিময়ে নিম্ন-শিক্ষার বিস্তার-কল্পনা উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু এখন নিম্নশিক্ষার জন্যও আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যে ব্যয় করিতেছেন, তাহার সহিত অন্যান্য সভ্য দেশের নিম্নশিক্ষার ব্যয়ের তুলনা করিলে সকলেই বিস্মিত হইবেন।

প্রথমতঃ নিম্ন শিক্ষার অনুপাত কোন্ দেশে কিরূপ, তাহা দেখান যাইতেছে। ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর গড়ে শতকরা ১৭৷৷০ জনের অধিক লোক নিম্নশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। ফ্রান্সে শতকরা ১৪৷৷ জন, অষ্ট্রীয়া হঙ্গেরীতে ১৫ জন, ইটালিতে ৭৷০ জন, জাপানে ৮ জন, গ্রীসে প্রায় ৭ জন, রুষিয়ায় ৩ জন, আর বৃটিশ ভারতে শতকরা দেড় জন প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়! ব্যয়ের হিসাবেও ভারতবর্ষ ইংরাজেরই কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে। ইংলণ্ডে ও প্রুশিয়ায় নিম্ন-শিক্ষার ব্যয় প্রতি জনে ৩৸০ টাকা, ফ্রান্সে ৩৷৵০, অষ্ট্রীয়ায় ১৸৶০, ইটালীতে ১৵০, রুষরাজ্যে ৷৷০, জাপানে ৷৷৵০ আর বৃটিশ ভারতে পূর্ণ এক আনাও নহে। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে দুই একটি দেশ ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্রই নিম্নশিক্ষার তিন চতুর্থাংশ ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এখন একবার উচ্চশিক্ষার অঙ্কেও দৃষ্টিপাত করুন। উচ্চশিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট ভারতে জন প্রতি এক পয়সা মাত্র ব্যয় করেন। কিন্তু রুষরাজ্যে ও গ্রীস দেশে জন প্রতি ৶০, ইটালীতে ৵১০, অষ্ট্রীয়া ও ফ্রান্সে ৷৶০, জার্ম্মানিতে ৷৵০ আনা, ক্যানেডায় ৷৷৶০, মার্কিন যুক্তরাজ্যে ও ইংলণ্ডে ৷৷৵০ হিসাবে ব্যয়িত হইয়া থাকে। অর্দ্ধসভ্য রুষও শিক্ষা-বিস্তার কার্য্যে সুসভ্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে পশ্চাৎপদ করিয়াছেন! ক্ষুদ্র সিংহল দ্বীপে ইংরাজ শিক্ষার জন্য প্রতি জনে দুই

আনা ও মরীচ দ্বীপে দশ আনা ব্যয় করেন। ১৯০৪।৫ সালে বিলাতী গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে জন প্রতি প্রায় ৭ সিলিং বা ৫।০ টাকা ও আয়রলণ্ডে ৬ শিলিং ৫॥০ পেন্স বা ৫্ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসী প্রজার মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার কার্য্যে তাঁহাদিগের বিশেষ কৃপণতা দৃষ্ট হয়।

ক্ষুদ্র ইংলণ্ডে ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। অষ্ট্রীয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭, বেলজিয়মে ৪, জার্ম্মেণীতে ৩০, তন্মধ্যে ৭টি শিল্পবাণিজ্য-বিষয়ক। জার্ম্মেনীতে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বার্ষিক প্রায় ৩০ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ আকারে ও লোক-সংখ্যায় জার্ম্মেনীর ৫॥০ গুণ; কিন্তু ভারতে সর্ব্বপ্রকারে শিক্ষার জন্য পূর্ণ ৫ কোটী টাকাও ব্যয়িত হয় না। জার্ম্মেনীতে ৮৮ লক্ষ ৩০ ত্রিশ হাজার বালক বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। বৃটিশ ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৫ লক্ষের অধিক বালক এবং ৬ লক্ষের অধিক বালিকা বিদ্যালয়ে গমন করে না। বোম্বাই ও বঙ্গদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনযোগ্য বালকদিগের মধ্যে শতকরা ২৩।২৪ জন এবং পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে শতকরা ৮।৯ জন মাত্র বালক শিক্ষায় নিযুক্ত আছে!

সকল সভ্যদেশেই দরিদ্র বালকদিগকে বিনাব্যয়ে শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড, বেলজিয়ম, জার্ম্মেনী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে পিতামাতার অনিচ্ছাসত্বেও বালকদিগকে রাজবিধানের বলে অবৈতনিক বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়। কাজেই ঐ সকল দেশে নিরক্ষর মূর্খ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। ইংলণ্ডে শতকরা ৭ জন নিরক্ষর, বেলজিয়মে ২৯ জন, জাপানে আরও অল্প। জাপানের রাজস্বে সর্ব্বপ্রকারে ৩০ কোটী টাকা আয় হয়, কিন্তু জাপানী গবর্ণমেণ্ট তন্মধ্যে উচ্চ শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে বার্ষিক ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। তদনুপাতে সুসভ্য ভারত গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৩ কোটী টাকা উচ্চ শিক্ষাবিভাগে ব্যয় করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা বিগত দশ বৎসরে গড়ে বার্ষিক এক কোটি টাকাও ব্যয় করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। রাজকোষ হইতে প্রায় প্রতি বর্ষেই যে টাকা শিক্ষা-বিভাগে ব্যয়ের জন্য মঞ্জুর হয়, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ তাহাও সম্পূর্ণ ব্যয় করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হন না! বিগত ১৯০২-৩ সালের আয়-ব্যয়ের

হিসাবে দেখা যায়, শিক্ষাবিভাগে ব্যয় করিবার সুযোগ না ঘটায় ২৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা প্রাদেশিক রাজকোষসমূহে উদ্‌বৃত্ত রহিয়াছে! পরবর্ত্তী বর্ষ-নিচয়েও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। যে দেশে শতকরা প্রায় ৮৮ জন নিরক্ষর, সে দেশে রাজপুরুষেরা শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ব্যয় করিবার উপায় দেখিতে পান না, ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে।

বলিয়াছি, সভ্য দেশসমূহে দরিদ্র বালকগণের শিক্ষার জন্য রাজব্যয়ে বহুসংখ্যক অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সরকারী ও অর্দ্ধ-সরকারী বিদ্যালয়-সমূহে "ফ্রি-ষ্টুডেণ্ট" বা অবৈতনিক ছাত্রের সংখ্যা যাহাতে প্রতি শ্রেণীতে ২।৩ জনের অধিক না হয়, সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সতর্কতা দৃষ্ট হয়। ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয়-বিষয়ক নূতন বিধান প্রণয়ন করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে উচ্চ শিক্ষা অধিক-তর ব্যয়সাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। এ বিষয়ে দেশীয় ভূপতিগণের রাজ্যে বহু পরিমাণে উদারতা পরিলক্ষিত হয়। বরোদার মহারাজ গায়কোয়াড় এবং মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর-পতি পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে স্বরাজ্যে বিনা-ব্যয়ে বিদ্যাদানের (Free education) ব্যবস্থা করিয়া সুসভ্য ইংরাজ-রাজের আদর্শ-স্থানীয় হইয়াছেন। বরোদা রাজ্যে শতকরা ৪৪ জন বালক ও ৯॥০ জন বালিকা বিদ্যালয়ে গমন করে! ফলকথা, জগতে সভ্য শাসক-মাত্রেই বিনা-ব্যয়ে বা স্বল্প-ব্যয়ে শিক্ষা-বিস্তার করা একটি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। যে চীনকে অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করা হয়, সেই চীনে শতকরা ৯৫ জন পুরুষ ও ১০ জন রমণী অল্পাধিক পরিমাণে লিখিতে পড়িতে পারে। কিন্তু ভারতে ১৫০ বৎসরের ইংরাজ-শাসনের পরও শতকরা ৮৮ জন নিরক্ষর, ইহা রাজা ও প্রজা উভয়েরই ঘোরতর কলঙ্কের কথা। এ কলঙ্ক মোচনে সকলেরই অগ্রসর হওয়া উচিত। সরকারি রিপোর্টেই নেত্রপাত করিলে উপলব্ধ হয় যে, শিক্ষা-লাভ-বিষয়ে ভারতবাসীর আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু ভারত-বাসী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ইংরাজের সমকক্ষ হইবেন, ইহা এদেশীয় ইংরাজ-সমাজের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার সংকোচে যত্ন-প্রকাশ করিতেছেন। *

---

* জাপান গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর ১৫০ জন যুবককে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়ে পাশ্চাত্য দেশে পাঠাইয়া থাকেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট তদনুরূপ কোনও

তাঁহারা নিম্নশিক্ষার বিস্তারে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে অগ্রসর হইলেও ভারতীয় শিশুদিগকে ম্যাক্‌মিলান কোম্পানির জঘন্য পুস্তকাবলী পাঠে বাধ্য করিয়া দেশীয় সাহিত্যের সমাধি-রচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। এদেশে এত মুদ্রাযন্ত্র ও গ্রন্থ-প্রকাশক ব্যবসায়ী কোম্পানি থাকিতে বিলাতী কোম্পানিকে দশ বৎসরের জন্য বই ছাপিবার ঠিকা দেওয়ায় ইহাই বুঝায় যে, এ দেশের লোক বই ছাপিয়া দুই পয়সা রোজগার করিবে, ইহাও ইংরাজ সহ্য করিতে পারেন না। অথচ বিলাতী কোম্পানি অপেক্ষা এখানকার লোকে পাঠ্য পুস্তক ভাল ছাপে, ইহা সকলেই জানেন।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-বিধানে, কলেজে না পড়িয়া এফ এ, বি এ পরীক্ষা দিবার নিয়ম এক প্রকার তুলিয়াই দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে উচ্চশিক্ষার পথ কণ্টকিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে সকল সভ্য দেশেই ঘরে পড়িয়া পরীক্ষা-দানের সুবিধা লোককে দিন দিন অধিক পরিমাণে দান করা হইতেছে। ফ্রান্সে ত প্রাথমিক পরীক্ষাগুলি না দিয়াও যে কোনও উচ্চতর পরীক্ষা দিতে পারা যায়। প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ না হইয়াও এমএ পরীক্ষা দেওয়া চলে! তাই সে দেশে এত জ্ঞানী লোকের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। কিন্তু ভারতে দেশীয়দিগের পরিচালিত মেডিকেল কলেজের ছাত্রদিগকেও সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা-দান করিবার অধিকার দেওয়া হয় না। এদিকে প্রবেশিকা পরীক্ষার কঠোরতাও দিন দিন বৃদ্ধি করা হইতেছে।

এক্ষণে বঙ্গদেশে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কিরূপ ব্যয় হইয়া থাকে এবং তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি কিরূপ, তাহা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। "লোকশিক্ষা-বিষয়ে যে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ যত্নশীল নহেন, ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। বোম্বাই প্রদেশে লোক-শিক্ষার জন্য প্রতি সহস্র জনে ১০৭ টাকা, বেরারে ৭৫ টাকা ও

ব্যবস্থা না করায় সকলেই তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছিলেন। সেই নিন্দার দায়ে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য অধুনা গবর্ণমেণ্ট প্রতিবর্ষে দশ জন করিয়া ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য দেশে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বৃত্তি দিয়া প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এই তিল-কাঞ্চনের ব্যবস্থায় রাজপুরুষদিগের কলঙ্ক দূর হইবে কি?

আসামে ৩৩ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে, কিন্তু বঙ্গদেশে জনসংখ্যার হিসাবে হাজার করা ১১ টাকার অধিক খরচ করা হয় না! এই একাদশ মুদ্রার শত ভাগের কিঞ্চিন্নূন ৮ ভাগ মাত্র রাজ-কোষ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে, ৬৭।০ ভাগ লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতি হইতে পাওয়া যায় এবং অবশিষ্ট ২৬ ভাগ ছাত্রদিগের প্রদত্ত বেতন হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। গত ১৯০৩।৪ সালের সরকারি রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, ঐ বর্ষে সমস্ত বঙ্গদেশে ৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৬১৩ টাকা উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। এই প্রায় সওয়া সাত লক্ষ টাকার মধ্যে ৪৪ হাজার ৬২২ টাকা মাত্র রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। ২ লক্ষ ২৪ হাজার ২১১ টাকা লোক্যাল ফণ্ড হইতে এবং অবশিষ্ট প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা মিউনিসিপালিটি-সমূহের ও ছাত্রদত্ত বেতনের অর্থ হইতে পাওয়া গিয়াছে। নিম্ন প্রাথমিকের জন্য ঐ সালে যে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে, তাহার মধ্যে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা, লোক্যাল বোর্ডসমূহ ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা, মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ ৫৩ হাজার টাকা, ছাত্রগণের অভিভাবকেরা বেতনরূপে ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই সকল অঙ্কে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যাইবে যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেকের অধিক দেশের দরিদ্র কৃষক ও শিল্পীদিগের নিকট হইতেই আদায় করা হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ব্যয়ের ২১ ভাগের একভাগ মাত্র দান করিয়াছেন। জেলা বোর্ডের ধনভাণ্ডার হইতে যে অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারও তিন চতুর্থাংশ দেশের কৃষিজীবী শ্রেণীর নিকট হইতে সংগৃহীত, একথা এস্থলে বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

"ইদানীং গবর্ণমেণ্ট নিম্ন শিক্ষার বিস্তারের জন্য কিছু অধিক অর্থ ব্যয়ে স্বীকৃত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু উচ্চ শিক্ষার বিস্তারেও তাঁহাদের যত্নপ্রকাশ কর্ত্তব্য। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিগত বৎসরে গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে ৫লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন অপ্রত্যক্ষভাবেও (অর্থাৎ বৃত্তিদান, পরিদর্শন, গৃহাদির নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়েও) সাড়ে চারি লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। খুব বেশী করিয়া ধরিলেও গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার জন্য মোটের উপর ১২ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন না, এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। যে দেশের লোকসংখ্যা ৭ কোটী ৪০ লক্ষ

ও রাজস্বের আয় প্রায় ৭ কোটী টাকা, সে দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় কিরূপ সামান্য, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।"

নিম্নশিক্ষার জন্য আমাদের গবর্ণমেণ্ট আজকাল অধিক অর্থব্যয় করিতেছেন বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু জাপানের সহিত তুলনা করিলে আমাদের কর্তৃপুরুষদিগের দর্পের মূল্য বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট ২৩ কোটি প্রজার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গত ১৯০৪।৫ সালে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা মাত্র ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু জাপান গবর্ণমেণ্ট ঐ সালে ৪॥০ কোটি প্রজার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন! এই অনুপাতে ব্যয় করিলে নিম্নশিক্ষার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঐ সালে ১৯ কোটি টাকা ব্যয় করা উচিত ছিল।

নিম্নশিক্ষা-বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয়-স্বীকার-সত্বেও দেশে প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষানীতির অবলম্বনে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবক-দিগের মোক্তারী পরীক্ষা-দানের অধিকার হরণ করিয়াছেন, প্রাথমিক পাঠশালা-সমূহে প্রতিযোগি-পরীক্ষার বিলোপ-সাধন এবং সুখপাঠ্য জ্ঞান-গর্ভ পুস্তকাবলীর পরিবর্ত্তে ম্যাক্‌মিলান কোম্পানির সাহেবী বাঙ্গালায় রচিত পাঠ্য-পুস্তকের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার পরিহার না করিলে যথেষ্ট অর্থ-ব্যয় সত্বেও দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার হইবে না।

হোম চার্জ্জ।

ভারত গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বোক্ত ৭৪।০ কোটি টাকা আয়ের মধ্যে আমা-দিগকে বার্ষিক পঁচিশ কোটি টাকা "হোম চার্জ্জ" বলিয়া বিলাতে পাঠা-ইতে হয়। শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী এই হোম চার্জ্জকে "ভারত-লুণ্ঠনের টাকা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা ইহাকে "সেলামী" বা আক্কেল সেলামীর টাকা নামে অভিহিত করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। পূর্ব্বে এই সেলামীর পরিমাণ বার্ষিক তিন কোটি টাকা ছিল। সিপাহী বিপ্লবের সময়েও উহা বার্ষিক ৪ কোটির অধিক হয় নাই। কিন্তু তাহার পর যখন হইতে কোম্পানির হস্তস্থিত রাজ্যভার দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া মহোদয়ার হস্তগত হয়, তদবধি রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহে

এই সেলামীর পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিংশতি বৎসরে ৪ কোটি টাকা ২০ কোটীতে পরিণত হয়। তদবধি বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল ২৪।২৫ কোটী টাকা হিসাবে দরিদ্র ভারতবাসীর নিকট হইতে বার্ষিক সেলামী গৃহীত হইতেছে। তাহার পর ইদানীং কয়েক বৎসর হইতে ২৭।২৮ কোটি টাকা গৃহীত হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই টাকার বিনিময়ে বিলাতী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভারতবাসী কোনও প্রকার উপকারই প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং প্রতি বৎসর এইরূপ অজস্র অর্থনাশে এদেশের লোক দিন দিন ধনহীন হইতেছে।

এই হোমচার্জ্জের অন্যায্যতার উল্লেখ করিয়া ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ মণ্টেগোমারি মার্টিন নামক জনৈক চিন্তাশীল লেখক পশ্চাল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"বৃটিশ ভারত হইতে প্রতি বৎসরে তিন কোটী হিসাবে বিগত ত্রিশ বৎসরে মায় সুদ (চক্রবৃদ্ধির নিয়মে শতকরা বার্ষিক ১২ টাকা হিসাবে সুদ ধরিয়া) ৭২৩,৯৯,৭৯,১৭০ টাকা হোম-চার্জ্জ স্বরূপে বিলাতে আসিয়াছে। যদি গত পঞ্চাশ বৎসরের হিসাব ধরা যায়, তাহা হইলে অতি নিম্নহারেও ৮৪০০,০০,০০,০০০ টাকা হয়। ধারাবাহিক রূপে এইরূপ অর্থ শোষিত হইলে ইংলণ্ডেরও অল্পদিনের মধ্যে দারিদ্র্য-দশা উপস্থিত হইতে পারে। যে ভারতে শ্রমজীবীরা প্রত্যহ দুই তিন আনার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না, সেই ভারতে এইরূপ অর্থ-শোষণের ফল কিরূপ ভীষণ হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"I do not think it possible for human ingenuity to avert entirely the evil effects of a continued drain (for half a century) of three or four million pounds a year from a distant country like India and *which is never returned in any shape.*

ভাবার্থ এই যে, অর্দ্ধশতাব্দী কাল বিদেশে এইরূপ অজস্র অর্থ-প্রেরণের ফলে ভারতীয় জনসমাজের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করা মানবের শক্তির অতীত বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ, এই রাশি রাশি অর্থের বিনিময়ে ভারতবাসী ইংলণ্ড হইতে কোনও আকারে এক কপর্দ্দকও ফিরিয়া পায় না।

সহৃদয় গবর্ণর জেনারেল সার জন শোর মহোদয় এ দেশের রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার Notes on Indian Affairs নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন,—

The halcyon days of India are over. She has been drained of a large proportion of the wealth she once possessed; and her energies have been cramped by a sordid system of misrule to which *the interests of millions have been sacrificed for the benefits of the few.*

অর্থাৎ ভারতের শান্তি-প্রসন্নতার দিন গত হইয়াছে। ভারতবর্ষ এককালে যে ধন-সম্পত্তির অধিকারী ছিল, তাহার অধিকাংশ বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। কু-শাসনের নীচতা-পূর্ণ পদ্ধতির দোষে ভারতবাসীর কার্য্য করিবার সমস্ত শক্তি সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। বিলাতের স্বল্পসংখ্যক লোকের মঙ্গলের জন্য (ভারতের) লক্ষ লক্ষ লোকের স্বার্থ-হানি ঘটান হইতেছে!

স্যার জর্জ্জ উইঙ্গেট এই হোমচার্জ্জের অর্থকে Cruel burden of tribute নামে অভিহিত করিয়াছেন। মিল সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডে এই অর্থশোষণের বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়—

It is an exhausting drain upon the resources of the country, the issue of which is replaced by no reflex; it is an extraction of the *life-blood* from the veins of national industry which no subsequent introduction of nourishment is furnished to restore.

ভাবার্থ এই যে, এই অর্থ-শোষণে দেশবাসীর ধন-সম্পত্তি নিঃশেষে ক্ষয়িত হইতেছে; এই ক্ষতির পূরণ কোনও প্রকারেই হইতেছে না। এই প্রকার অর্থ শোষণ রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-শক্তি রূপ ধমনী হইতে প্রাণ-সার শোণিত-মোক্ষণের নামান্তর-মাত্র। এই ভীষণ শোণিত-মোক্ষণের পর যতই পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা হউক না কেন, তাহাতে আর পুর্ব্ব স্বাস্থ্যের পুনর্লাভ কিছুতেই হইবে না!

৬৫ বর্ষ পূর্ব্বে এদেশ হইতে যে অর্থ-রাশি ইংলণ্ডে হোম চার্জ্জ-রূপে নীত হইত, তদুপলক্ষেই অর্থনীতিবিদ্ সহৃদয় লেখকেরা এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর এদেশ হইতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হারে যে অর্থ হোম-চার্জ্জের নামে বিলাতে প্রেরিত হইয়াছে, তাহার বিষয় যদি ইঁহাদিগের জানিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে ইঁহারা আতঙ্কে কিরূপ বিহ্বল হইতেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মণ্টেগোমারি মহাশয়ের প্রকাশিত হিসাবে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশ হইতে বিলাতে নীত অর্থের পরিমাণ ৮,৪০০ কোটি মুদ্রা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহার পর হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের সময় পর্য্যন্ত বিংশতি বর্ষকাল বার্ষিক ৩৪ কোটি টাকা দেশান্তরিত হইতেছিল। মণ্টেগোমারির প্রদর্শিত নিয়মানুসারে হিসাব করিলে ঐ ২০ বৎসরে সুদসহ কত মুদ্রা আমাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছিল, গণিতজ্ঞ

পাঠক তাহা সহজেই স্থির করিতে পারিবেন। সিপাহী বিপ্লবের পরবর্ত্তী দ্বাবিংশতি বৎসরে কত অর্থ ভারতবাসীর নিকট হইতে শোষিত হইয়াছিল, তাহার হিসাব পাওয়া যায় না। তবে এই সময়ে হোমচার্জ্জের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। গত আটত্রিশ বৎসর কাল হোমচার্জ্জে, শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদিগের বেতন ও বৃত্তিতে বার্ষিক অন্যূন ৪৫ কোটি টাকা হারে ১৭০০ কোটি টাকা এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে! চক্রবৃদ্ধির নিয়মানুসারে এই ১৭০০ কোটি টাকা আটত্রিশ বৎসরে সুদ সহ কত টাকায় পরিণত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে সকলকেই হতবুদ্ধি হইতে হইবে।

দেশের এইরূপ অকারণ ধন-ক্ষয় দর্শনে ব্যথিত ও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নবেম্বর তারিখে ভারত-সচিব মহোদয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পশ্চাল্লিখিত তীব্র মন্তব্য পরিদৃষ্ট হয়,—

The thoughtless past drain we may consider as our misfortune, but a similar future will, in plain English, be *deliberate plunder and destruction.*

ফলতঃ এইরূপ লোমহর্ষণ রক্ত-মোক্ষণে পৃথিবীর অত্যন্ত ধনশালী সমাজও কঙ্কাল-সার হইয়া যায়। ইহার উপর শিল্প-বাণিজ্যের বিনাশ ঘটিলে সমাজের কঙ্কালও নিষ্পেষিত হইয়া যায়, দেশ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর লীলাস্থলে পরিণত হয়। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের এই অবিশ্রান্ত অর্থ-হানি ও দশ কোটী লোকের নিত্য অর্দ্ধাশন-সত্ত্বেও রাজপুরুষেরা বলিতেছেন, ভারতবাসীর দিন দিন ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে!

সামরিক বিভাগের অপব্যয়।

ভারতীয় রাজস্বের অবশিষ্ট অর্থের মধ্যে আজকাল প্রায় ৩২ কোটি টাকা সামরিক বিভাগের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও প্রজার অর্থের প্রচুর অপব্যয় ঘটিতেছে। অতুল ধনশালী ইংলণ্ডে প্রজাপুঞ্জের নিকট হইতে যে পরিমাণ আয়-কর সংগৃহীত হয়, তাহার চতুর্গুণ অর্থ সামরিক বিভাগে ব্যয়িত হইয়া থাকে। কিন্তু অতি দরিদ্র ভারতবর্ষে রাজপুরুষেরা সামরিক বিভাগের জন্য এদেশীয় আয়করের চতুর্দ্দশ গুণ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন! এই বিভাগের প্রভূত-বেতনভোগী কর্ম্মচারীদিগের সকলেই শ্বেতাঙ্গ। সুতরাং এই টাকার অতি অল্পাংশই এদেশে থাকে—অধিকাংশ বিলাতে চলিয়া যায়।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট গোরা সৈনিকদিগের জন্য জনপ্রতি বার্ষিক ৮৯১ টাকা ব্যয় করিতেন, কিন্তু দেশীয় সিপাহীদিগের জন্য বার্ষিক গড়ে জন প্রতি ৩৪৩ টাকার অধিক ব্যয়িত হইত না! ইহার পর গোরা সৈনিকদিগের ব্যয় বার্ষিক ১২৩ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি করা হয়। গত ১৯০৪ সালের ১লা এপ্রিল হইতে তাহাদিগের বেতন বার্ষিক আরও ১৪৬ টাকা বাড়ান হইয়াছে। ফলে গোরাদিগের জন্য গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে বার্ষিক ১১৬০ টাকা হিসাবে ব্যয় করিতেছেন। গোরা সৈনিকদিগের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য যেরূপ ব্যয়-বৃদ্ধি হইতেছে, দেশীয় সিপাহীদিগের জন্য সেরূপ হয় নাই। তাহাদিগকে বার্ষিক ৩৪৩ টাকার স্থলে ৩৭০ টাকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অর্থাৎ গত ৮ বৎসরে গোরাদের বাড়িয়াছে,—২৬৯ টাকা, সিপাহীদের বাড়িয়াছে—২৭ টাকা! অথচ শৌর্য্য-বীর্য্যে অনেক স্থলেই গোরাদিগের অপেক্ষা দেশীয় সিপাহী সেনাই উৎকর্ষ দেখাইয়া থাকে।

বিগত ১৯০৩ সালের মার্চ্চ মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে মাননীয় অধ্যাপক গোখলে মহোদয় ভারতীয় সামরিক বিভাগের গঠন ও সংস্কার সম্বন্ধে কতিপয় অত্যাবশ্যক ও শুভকর প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, দেশীয় সৈনিকদিগের কার্য্যকাল হ্রাস করিলে গবর্ণমেণ্টের সামরিক বলের বৃদ্ধি ও ব্যয়ের হ্রাস হইবে। গোরা সৈনিকদিগের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে ভারতবাসীর কিছুমাত্র ইষ্ট সাধিত হয় না। কারণ, অল্পদিন মাত্র কার্য্য করিয়া গোরা সৈনিকেরা স্বদেশে চলিয়া যায়, এবং তাহাদিগের স্থানে বিলাত হইতে নূতন সৈন্যদল এদেশে আগমন করে। ফলে ভারতবাসীকে এই সকল শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের ঘন ঘন বিলাত গমনাগমনের ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। নবাগত গোরাদিগের মধ্যে অশিক্ষিত লোকের ভাগই বেশী থাকে। ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতবাসীর ব্যয়ে তাহারা যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত হয় এবং শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই কিছুদিন পরে স্বদেশে চলিয়া যায়। এইরূপে ইংলণ্ড বিনা ব্যয়ে ভারতবর্ষ হইতে কিছুদিন অন্তর একদল করিয়া সুশিক্ষিত সৈনিক প্রাপ্ত হইতেছেন, অনায়াসে বিলাতের রিজার্ভ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

দেশীয় সৈনিকদিগের সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম নাই। তাহাদিগকে

প্রায় আজীবন কার্য্য করিতে হয়। কর্ত্তৃপক্ষ যদি উভয় সৈন্যকে এক নিয়মের অধীন করেন, তাহা হইলে এদেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। দেশীয় সৈন্যগণ যদি অল্প-দিন কার্য্য করিয়াই বিদায় লাভ করে এবং তাহাদিগের স্থানে নূতন লোকের নিয়োগ হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ দেশে অনেক লোকেরই যুদ্ধ-বিদ্যা-শিক্ষা করিবার অবসর ঘটিতে পারে। দেশে এইরূপ সমর-দক্ষ ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য ঘটিলে গবর্ণমেণ্টকে আর এখনকার মত অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া সর্ব্বদা বহুল পরিমাণে সৈন্য পোষণ করিতে হইবে না। বর্ত্তমান সৈন্য-সংখ্যার চতুর্থাংশ মাত্র বেতনভোগী সৈন্য রাখিলেই গবর্ণমেণ্টের কার্য্যোদ্ধার হইবে। কারণ বিপৎকালে পুরাতন শিক্ষিত সৈনিকদিগকে আহ্বান করিলেই অত্যল্প কাল মধ্যে যত বড় ইচ্ছা সৈন্যদল গঠন করিয়া লইতে পারা যাইবে। এজন্য অবসর-প্রাপ্ত সৈনিকদিগকে নাম-মাত্র বৃত্তিদান করিয়া রিজার্ভ তালিকাভুক্ত করিয়া রাখাই সুসঙ্গত। ভারতীয় সামরিক বিভাগে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত না থাকায় শান্তির সময়েও আমাদিগকে অনর্থক অতিরিক্ত সৈন্য-পোষণের ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, বিপৎকালে নূতন সৈন্য-সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়া উঠে।

এই প্রস্তাবের সমর্থন-কল্পে অধ্যাপক গোখলে জাপানের সামরিক ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছিলেন। জাপানের স্থায়ী সৈন্য-সংখ্যা ভারতীয় সৈন্যসংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী নহে, অথচ ঐ দেশের সামরিক বিভাগের ব্যয় আমাদিগের ব্যয়ের চতুর্থাংশ মাত্র। জাপানীরা রিজার্ভ সৈন্যের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য সাধারণ সৈনিকদিগের কার্য্য-কালের হ্রাস করিয়াছেন এবং দেশের যত অধিক লোককে সামরিক শিক্ষা দান করা সম্ভবপর, তাহা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রকার ব্যবস্থার ফলে জাপান সামরিক বিভাগে আমাদিগের চতুর্থাংশ ব্যয় করিয়াও বিপদের সময়ে আমাদিগের অপেক্ষা ৫।৬ গুণ অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের সামরিক বলের কথা ভাবিলে হতাশ হইতে হয়। ইংরাজ-রাজ সমগ্র দেশটিকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। তেইশ কোটি লোকের প্রায় সকলেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ। তাহারা বিপৎকালে দেশ-রক্ষা করিবে কি প্রকারে? স্বদেশ-রক্ষার পবিত্র কার্য্যে তাহাদিগকে

বঞ্চিত রাখা যেরূপ অধর্ম্ম-জনক, একদল বেতনভোগী স্থায়ী সৈন্যের (standing army) উপর এরূপ বিশাল দেশের রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকাও সেইরূপ অসঙ্গত। পৃথিবীর কোনও দেশে এরূপ রাজ-নীতি-বিরুদ্ধ অদ্ভুত প্রথা বিদ্যমান নাই। ইংলণ্ডের বড় বড় সমর-নীতি বিশারদেরাও এই নীতির দোষ দেখিতে পাইয়াছেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সিমলায় যে "আর্ম্মি কমিশন" বসিয়াছিল, তাহাতে লর্ড রবার্টস প্রমুখ সমর-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সদস্যের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই কমিশন এদেশে পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীক্রমে রিজার্ভ সৈন্যদল গঠন বিষয়ে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন যে, দেশীয় সৈনিকদিগের কার্য্যকালের পরিমাণ হ্রাস করিয়া রিজার্ভ সৈন্যদল গঠনের চেষ্টা করিলে, প্রতি ১০ বৎসরে ৫২ হইতে ৮০ হাজার পর্য্যন্ত রিজার্ভ সৈন্য অনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারিবে। এইরূপে ভারতে সমরদক্ষ লোকের সংখ্যাধিক্য ঘটিলে যে, ইংরাজ-রাজ্যের স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে কোনও প্রকার সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইবে, এদেশের অবস্থাভিজ্ঞ কমিশনের সদস্যেরা সে আশঙ্কা মনেও স্থান দেন নাই। কিন্তু বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিসের সংশয়-কলুষিত-চিত্ত কর্ত্তারা কমিশনের প্রস্তাবে অনুমোদন করা বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিলেন। কাজেই সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না। বরং পূর্ব্বে ১৫ বৎসর কার্য্য করিলেই দেশীয় সৈনিকদিগকে যে পেন্সন দিবার প্রথা ছিল, ১৮৮৮ সাল হইতে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া ২১ বৎসর কার্য্য না করিলে দেশীয় সৈনিকেরা বৃত্তি পাইবে না,—এইরূপ নিয়ম করা হইল। ফলতঃ প্রজার প্রতি অবিশ্বাস-বশে ইংরাজকে বহু ব্যয়ে ভূরি পরিমাণে সৈন্য পোষণ করিতে হইতেছে দরিদ্র ভারতবাসীও অতিরিক্ত সৈন্যপোষণের ব্যয় দিতে বাধ্য হইয়া দিন দিন অন্নকষ্টে শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির বিষয়ে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড যে পরিমাণে সাহায্য ও উপকার লাভ করেন, সাম্রাজ্যের আর কোনও স্থান হইতেই সেরূপ লাভ করিতে পারেন না। উপনিবেশ-সমূহের রক্ষার ভার ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগের হস্তেই ন্যস্ত। সেজন্য ইংলণ্ডকে প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়, অথচ তাহার পরিবর্ত্তে ইংলণ্ডের প্রায় কিছুই লাভ হয় না। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর প্রায় বত্রিশ

কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যে বিশাল সেনা-দল পোষণ করে, তাহাতে ভারতবর্ষ-রক্ষার জন্য ইংলণ্ডকে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হয় না; বরং এসিয়ায় ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইংলণ্ডের অধিকার বিস্তার-কার্য্যে বিনা ব্যয়ে বা নামমাত্র ব্যয়ে ঐ সকল সৈন্যের সদ্ব্যবহার করিবার সুবিধাও ঘটিয়া থাকে। বিগত ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গত ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত আফ্‌গানিস্থান, চীন, পারস্য, আবিসিনিয়া, পেরাক, মিসর, সুদান, চিত্রল, সোমালি, ট্রান্সভাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানের দ্বাদশটি যুদ্ধের ফলে ইংরাজের রাজ্য-বিস্তার ঘটিয়াছে, কিন্তু উহার ব্যয়ের অধিকাংশ ভারতবাসীকেই বহন করিতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে উপনিবেশসমূহের রক্ষার জন্য নিযুক্ত সৈন্য, সমর-পোত ও রণ-সম্ভারাদির সমস্ত ব্যয় নিঃশব্দে ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে!

ভারতীয় সাম্রাজ্য হইতে যখন ইংরাজ বহু উপকার লাভ করিতে-ছেন, তখন ভারতীয় সামরিক বিভাগের ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ তাঁহাদিগের প্রদান করা উচিত। এ বিষয়ে দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষ হইতে বহুবার আবেদন নিবেদন করা হইয়াছে; কিন্তু বিলাতের গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই সে সকল কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ইহার কারণ সম্বন্ধে স্যার চার্লস ট্রিবেলিয়ান মহোদয় পার্লামেণ্টের আদেশে গঠিত ফাইন্যান্স কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য-দান-কালে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন,—

We charge Canada, Australia, the Cape of Good Hope and the whole round of British Colonies, nothing, why should we charge India anything? The only real difference is that Canada or Australia would not hear of it; whereas *India is at our mercy and we can charge her what we like.*

আমরা যে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নেটাল, ও অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশ-সমূহের নিকট হইতে কিছুমাত্র সামরিক ব্যয় গ্রহণ করি না, তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল উপনিবেশবাসীরা আমাদের দাবিতে কর্ণপাত করে না। কিন্তু ভারতবাসী প্রজারা নিরীহের ন্যায় আমাদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকে বলিয়া আমরা তাহাদের নিকট হইতে সামরিক ব্যয় হিসাবে যত টাকা ইচ্ছা আদায় করিতে পারিতেছি।

ফলতঃ ইংরাজ কিরূপ যথেচ্ছভাবে এদেশের সামরিক বিভাগের ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত তালিকা হইতে সকলের বোধগম্য হইবে।—

১৮৮৭।৮৮ সালে	২০,৪১,০০,০০০	টাকা।
১৮৯০।৯১ ,,	২০,৬৯,০০,০০০	,,
১৮৯৪।৯৫ ,,	২৪,০৯,০০,০০০	,,
১৯০২।৩ ,,	২৮,২৩,১৯,০৮০	,,
১৯০৩।৪ ,,	২৯,৩৬,০৮,৩৪৫	,,
১৯০৪।৫ ,,	৩৩,০৩,৪৩,৫০০	,,
১৯০৫।৬ ,,	৩১,৫৪,১২,৪৫৫	,,
১৯০৬।৭ ,,	৩২,৫৫,৭৯,৫০০	,,

কিন্তু এত ব্যয় করিয়াও সামরিক-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট নহেন। আমাদিগের প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনার রুষের ভারতাক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হইয়া সেনা-সংস্কারের জন্য ১৫ কোটী টাকা অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করাইয়া রাখিয়াছেন। তাহার পর তিনি যত টাকা চাহিবেন, ভারত গবর্ণমেণ্টকে তাহাই দিতে হইবে বলিয়া তিনি আবদার করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে বড়লাটের সহিত তাঁহার কলহ হয়। বড়লাট বাহাদুর সামরিক বিভাগের যথেচ্ছ ব্যয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে, প্রধান সেনাপতি যত টাকা চাহিবেন, তত টাকাই বড়লাটকে যোগাইতে হইবে! সুতরাং রাজকোষে সঞ্চিত দরিদ্র প্রজার অর্থ সামরিক-বিভাগের ব্যয় সঙ্কুলান জন্যই বহু পরিমাণে ব্যয়িত হইতেছে। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি, বিচার ও শাসন-বিভাগের পার্থক্য-সাধন, কৃষি-কার্য্যের উন্নতি-বিধান, শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি কার্য্যের জন্য রাজকোষে আর টাকা থাকিবে না।

শুনিতেছি, সংপ্রতি বিলাতে যে ঔদারনীতিক মন্ত্রি-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার শীর্ষস্থানীয় স্যার হেন্‌রি ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান মহোদয় সামরিক বিভাগের যথেচ্ছ ব্যয়-বৃদ্ধি ও অস্বাভাবিক প্রতিপত্তির ঘোর বিরোধী। তিনি নাকি ভারতের সামরিক ব্যয় বিষয়ে প্রধান সেনাপতি মহাশয়ের ক্ষমতা কিছু খর্ব্ব করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এ সংকল্প কতদিনে কার্য্যে পরিণত হইবে, অথবা আদৌ হইবে কি না, তাহা বলা যায় না। কারণ, "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।"

রুষ-ভীতির দোহাই দিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এতদিন এদেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সৈন্য পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু জাপানের বাহুবলে ইদানীং

রুষের দর্প ও শক্তি যেরূপ চূর্ণ হইয়াছে, এবং রুষ রাজ্যে যেরূপ ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছে, তাহাতে অন্ততঃ আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে রুষের যে ভারতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সুযোগ বা অবকাশ হইবে, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। এদিকে ইংরাজের সহিত রুষের মৈত্রী-মূলক সন্ধিও হইয়া গিয়াছে; সুতরাং এ সময়ে ভারতের সামরিক ব্যয়ের হ্রাস করিয়া ভারতবাসীকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও গুরু ব্যয়-ভার বহনের দায়িত্ব হইতে বিশ্রাম দান করিলে কোনও দোষ হইবে না, অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পার্লামেণ্ট মহাসভায় বিগত ১৯০৪।৫ সালের ভারতীয় বজেটের আলোচনার ২।৩ দিন পূর্ব্বে বিলাতের সামরিক সচিব মহাশয় বলেন যে, ভারতে এক্ষণে যে প্রায় ৮০ হাজার শ্বেতাঙ্গ সেনা আছে, তাহা ভারতের অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার পক্ষেই নিতান্ত প্রয়োজন। তাঁহার উক্তি এই,—

The British force in India is not there to resist aggression on the part of any of the great powers, but for the purpose of preserving internal order......The size of the force was determined at the time of the mutiny and whether it is too small or too large that standard has not been departed from.

ভাবার্থ এই যে, ভারতে যে গোরা সৈন্য আছে, তাহা কোনও বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য রাখা হয় নাই—ভারতের অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করিবার জন্যই তাহাদিগকে রাখা হইয়াছে। এ জন্য কত সৈন্য রাখিতে হইবে, তাহা বিগত সিপাহী-বিপ্লব-কালেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ সৈন্য-সংখ্যা অল্প বলিয়াই মনে হউক, আর অধিক বলিয়াই বিবেচিত হউক, সিপাহী বিপ্লবকালে এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, আমরা তাহা হইতে বিচলিত হই নাই।

একথাটা যে আদৌ সত্য নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। সিপাহী-বিপ্লবের সময়ে ভারতে ৩৭ হাজার গোরা ও ২ লক্ষ ৩০ হাজার সিপাহী সৈন্য ছিল। বিদ্রোহ শান্ত হইবার পর কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করেন, ভারতের সিপাহী সৈন্যের সংখ্যা কখনই গোরা সৈন্যের দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক রাখা হইবে না, এবং তোফখানার সহিত সিপাহীদের আর কোনও সংস্রব থাকিতে দেওয়া হইবে না। এই সময়ে গোরা সৈন্যের সংখ্যা বাড়াইয়া ৬৫ হাজার করা হয়। কিন্তু লর্ড লরেন্সের আমলে দেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রায় ৭ হাজার গোরা সৈন্য কমাইয়া দেওয়া হয়। তৎপূর্ব্বে একবার গোরা সৈন্যের সংখ্যা কমাইয়া ৫৫হাজার পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের অনুসন্ধান-সমিতির সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে লর্ড লরেন্স বলেন যে, ভারতে বিদ্রোহ-সম্ভাবনা-নিবারণের পক্ষে ৬০ হাজার গোরা সৈন্যই যথেষ্ট। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে যে সামরিক সমিতির অধিবেশন হয়, তাহাতেও স্থির হইয়াছিল যে, ভারতের অভ্যন্তরীণ শান্তি-রক্ষার পক্ষে ৬১ হাজারের অধিক গোরা সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। লর্ড লিটন ৬২ হাজার গোরা সৈন্য রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তথাপি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে ৫৫ হাজারের অধিক গোরা সৈন্য ছিল না। ইহার পর 'পাঁচদে' নামক স্থানে ইংরাজের সহিত রুষের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় ভারতে গোরা সৈন্যের সংখ্যা দশ হাজার বৃদ্ধি করা হয়। এই সৈন্য-সংখ্যা যাহাতে স্থায়িরূপে বর্দ্ধিত করা না হয়, তাহার জন্য তদানীন্তন বড়লাট সাহেবের কার্য্যকারিণী সমিতির দুই জন সদস্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তদবধি এদেশে গোরা সৈন্যের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতে থাকেন। বুয়র যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে ৭৩ হাজার গোরা সৈন্য ছিল। ১৯০৪ সালে তাহাদিগের সংখ্যা বাড়াইয়া ৭৬ হাজার ও ১৯০৫ সালে ৭৮ হাজার করা হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের সংখ্যা আরও প্রায় দুই সহস্র বাড়িয়াছে। অথচ বিলাতের ঔদারনীতিক সমর-সচিব অম্লানবদনে বলিয়া ফেলিলেন যে, সিপাহী যুদ্ধের পর হইতেই ভারতের অভ্যন্তরীণ শান্তি-রক্ষার জন্য ৮০ হাজার গোরা সৈন্য পোষণ কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং তদবধি বরাবর ঐ পরিমিত সৈন্য ভারতে রক্ষিত হইতেছে! এরূপ মিথ্যা কথার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিলেই হইত যে, রুষের ভয় থাকুক আর না থাকুক, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির জন্য রক্ষিত অতিরিক্ত গোরা সৈন্যের ব্যয় ভারতবাসীকে বহন করিতেই হইবে।

কিন্তু যে ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ইংরাজ দরিদ্র প্রজার শোণিতসম অর্থ এরূপে জলের ন্যায় অপব্যয় করিতেছেন, সেই ভারত-সাম্রাজ্যরক্ষার মূল-সূত্রনিচয়ের প্রতি তাঁহাদিগের আদৌ লক্ষ্য নাই। ভারতবর্ষের বিগত সহস্র বৎসরের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, যখনই কোন বিদেশীয় শত্রু ভারত-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে, তখনই ভারতবর্ষের রক্ষার জন্য যুদ্ধকারীদিগের পরাভব ও বৈদেশিক আক্রমণকারীদিগের বিজয়লাভ অনিবার্য্য হইয়াছে। এমন কি, বৈদেশিক আক্রমণ-

কারীদিগের হস্তে পরাজয়-লাভ যেন ভারতের অখণ্ডনীয় ভাগ্য-লিপি-রূপেই পরিণত হইয়াছে। এরূপ ঘটনার কারণ সম্বন্ধেও ইতিহাস নীরব নহেন। ইতিহাসে দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলেই ভারতবাসী বা ভারতের অধীশ্বরগণ আপনাদিগের অপেক্ষা অধিকতর বল-কৌশল-সম্পন্ন ও স্বল্প সভ্য জাতিদিগের দ্বারাই আক্রান্ত হইয়াছেন। ভারত-বিজয়ী মুসলমানেরা সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিলেও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে সকল বিষয়ে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পরন্তু সে কালের বিলাস-পরায়ণ হিন্দু রাজন্যদিগের অপেক্ষা তাঁহারা যে সমধিক শক্তিশালী ও উৎসাহ-সম্পন্ন ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার পর একদল মুসলমান ভারত-জয়-পূর্ব্বক রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া বিলাসী ও অকর্ম্মণ্য হইলে, অন্য একদল স্বল্প-সভ্য দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানের হস্তে তাঁহারা পরাস্ত হইয়াছেন। তাহার পর আর একদল আসিয়া পূর্ব্ব-বিজয়ী-দিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। ফলতঃ ভারতের বিলাস-প্রিয় ও সুসভ্য হিন্দু মুসলমানের অপেক্ষা আক্রমণকারী জাতিরা অধিকতর দুর্দ্ধর্ষ ও রণকর্কশ ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। রোমান রাজ্যও অর্দ্ধসভ্য জাতির দ্বারাই বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ভারতের বর্ত্তমান অধীশ্বরের শত্রুপক্ষও (রুষ সেনাও) অপেক্ষাকৃত অসভ্য ও রণ-কর্কশ, একথা কাহারও অবিদিত নহে।

ভারতবাসীর পুনঃপুনঃ পরাজয়ের আর একটি কারণ, তাঁহাদিগের সৈন্য-ব্যবস্থার দোষ। ভারতে দেশ-রক্ষার ভার জনসাধারণের উপর কখনই অর্পিত ছিল না। রাজার উপর দেশ-রক্ষার ভার দিয়া ও আপনারা উহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীরা চিরকাল নিশ্চিন্ত ছিল। রাজাও বেতনভোগী সৈন্যের সাহায্যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ-রক্ষার চেষ্টা করিতেন। ইউরোপে প্রজাশক্তি যেরূপ রাজশক্তিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া রাজকার্য্যের ও দেশ-রক্ষার ভার বহুলাংশে নিজের হস্তে গ্রহণ করিয়াছে, ভারতে সেরূপ কখনই হয় নাই। এদেশের হিন্দু রাজারা অপত্যবৎ প্রজাপালন করিতেন বলিয়া রাজার প্রতি প্রজাকুলের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। পাঠান আমলেও সাধারণ প্রজার উপর বৈদেশিক রাজাদিগের স্থায়ী অত্যাচার ছিল না। এই কারণে সিংহাসন লইয়া

কলহ উপস্থিত হইলে, তাহার সহিত প্রজারা কোনও সম্পর্ক রাখিত না! যিনিই রাজা হউন, খাজনা দিলেই প্রজারা নিষ্কৃতি লাভ করিত। এই কারণে রাজ্য-রক্ষার কার্য্যে রাজাকে সহায়তা করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রকৃতি-পুঞ্জ কখনও অনুভব করেন নাই। কাজেই রাজাকে বেতন-ভোগী সেনার উপর নির্ভর করিয়াই বৈদেশিক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। অন্য দিকে আক্রমণ-কারীদিগের সৈনিকেরা লুণ্ঠনের লোভে যুদ্ধে যেরূপ অধ্যবসায় প্রকাশ করিত, বেতন-ভোগী সৈনিকেরা সেরূপ করিতে পারিত না। ইহাও বিদেশীয়ের হস্তে ভারতবাসীর পরাজয়ের একটি অতি প্রধান কারণ।

মহামতি আকবর ও মহাত্মা শিবাজী এই পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া সুফল-লাভ করিয়াছিলেন। আকবরের রাজত্ব-কালে দেশের হিন্দু অধিবাসীদিগের উপর রাজ্যরক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল। তাই মোগল সাম্রাজ্য এদেশে এরূপ দৃঢ়তালাভ করিতে সমর্থ হয়। অওরঙ্গ-জেব সংকীর্ণ নীতির অবলম্বন করিয়া দেশবাসী হিন্দুদিগের হস্ত হইতে রাজ্য-রক্ষার ভার কাড়িয়া লইলেন। ফলে মোগল রাজ্য তাঁহার জীব-দ্দশাতেই দেখিতে দেখিতে ছায়ার ন্যায় বিলীন হইয়া গেল। মহাত্মা শিবাজীর অবলম্বিত নীতি আকবরের অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ছিল। তাঁহার আমলে দেশের সামান্য কৃষকদিগের উপর পর্য্যন্ত স্বদেশ-রক্ষার ভার সমর্পিত হইয়াছিল। শিবাজী প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয়ের হৃদয়ে যে স্বদেশ-রক্ষার বাসনা-বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা স্বল্পকাল মধ্যে এরূপ বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল যে, স্বয়ং সম্রাট অওরঙ্গজেব প্রায় বিংশতি লক্ষ সৈন্য লইয়াও মহারাষ্ট্র দেশ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। বিপুল সেনা-সহ বিংশতি বর্ষকাল মুষ্টিমেয় স্বদেশ-ভক্ত মহারাষ্ট্রীয়-দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া হতাশহৃদয়ে তাঁহাকে অওরঙ্গাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় ভূপতিগণ রাজ্য-রক্ষা বিষয়ে শেষ পর্য্যন্ত শিবাজীর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতে পারিলে অকালে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের বিলোপ সংঘটিত হইত না।

ফলতঃ ভারতের বিগত সহস্রাধিক বর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই দুইটি তত্ত্বই রাজ্য-রক্ষাকারীদিগের বিশেষ ভাবে শিক্ষনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তন্মধ্যে প্রথম তত্ত্ব এই যে, ভারতে রাজত্বকারীদিগের

মধ্যে বিলাসিতা বা ঐশ্বর্য্য-মদের প্রাবল্য ঘটিলে ও আক্রমণকারী বহিঃশত্রু কিয়ৎ পরিমাণে অসভ্য, রণ-কর্কশ ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন হইলে ভারতের সিংহাসন আক্রমণকারীরই কর-তল-গত হইয়া থাকে। একথা পৃথিবীর অন্য সকল দেশের সম্বন্ধে খাটিলেও ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বিশেষ-রূপে খাটে, ইহা ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যায়। ভারতীয় ইতিহাসের দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, বেতন-ভোগী সৈনিকের সাহায্যে বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে কোনও রাজাই কখনও ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই দুই তত্ত্বের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ইংরাজ ভারতীয় রাজ্য-রক্ষা-বিষয়ক সমস্যার আলোচনা করেন না। তাই, আমরা যে দুইটি রাজ্য-নাশ-কর দোষের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার একটিও দূরীভূত করিতে তাঁহারা অদ্যাপি যত্ন প্রকাশ করেন নাই।

পূর্ব্বতন ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের ন্যায় ইংরাজরাজও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিলাস-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্ব্বের ন্যায় বীর-জনোচিত কষ্ট-সহিষ্ণুতা তাঁহাদের আর নাই। তেমন দূরদর্শী রাজনীতি-বিশারদও আর ইংরাজ জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইতেছেন না। বাণিজ্য-বৃত্তি ও বিলাসপরায়ণতায় ইংরাজের বুদ্ধি ক্রমশঃ মোহ-কলুষিত হইয়া উঠিতেছে, বলবীর্য্য বহুপরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ভারতের সীমান্তে আফ্রিদি যুদ্ধে ও দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধে ইংরাজের বাহুবল-হ্রাসের পরিচয় সকলেই পাইয়াছেন। আফ্রিদি সমরে গোরা সৈন্যের তুলনায় শিখ ও গুর্খার শৌর্য্যবীর্য্যই সমধিক প্রকাশ পাইয়াছিল। বুয়র যুদ্ধে ৬০ সহস্র অশিক্ষিত কৃষকের দমনের জন্য ২।০ লক্ষ অস্ত্রাদি-সম্পন্ন গোরা সৈনিকের যত্ন-প্রকাশ আবশ্যক হইয়াছিল। অস্ত্র-শস্ত্রহীন শত-সংখ্যক বুয়র কৃষকের সমক্ষেও বহুবার সহস্র বৃটিশ সৈনিককে প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করিতে হইয়াছিল, একথা কাহারও অবিদিত নহে। রুষ-জাপানের যুদ্ধ-কালে উত্তর-সমুদ্র-ঘটিত দুর্ঘটনায় রুষ-সেনানী রোজ্‌ডেজ্‌ভেনস্কির হস্তে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হইয়াও ইংরাজ যেরূপে সে অপমান সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাও ইংরাজের এই বিলাস-জনিত দুর্ব্বলতার নিদর্শন। বিলাতের লোকেও পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। সৈনিক সংগ্রহের জন্য বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে

এখন পূর্ব্বের তুলনায় অধিক অর্থ-ব্যয় ও শ্রমস্বীকার করিতে হইতেছে। অথচ সামরিক বিভাগে কর্ম্মপ্রার্থী ইংলণ্ডবাসীর মধ্যে শতকরা ৭২ জন ঐ বিভাগে কার্য্য করিবার অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। বিলাতের জনসাধারণের মধ্যে সমর-প্রিয়তার পরিবর্ত্তে আরাম-প্রিয়তা না বাড়িলে, ইংরাজের দৈহিক অবনতি না ঘটিলে কখনই এরূপ হইত না। তাই গত ১৯০৫ সালের ৩১ শে মার্চ্চ "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস" সম্পাদক ভীত-চিত্তে লিখিয়াছিলেন,—

Many of the failings which characterised the decline and fall of the Roman Empire are witnessed this day in the Empire of Great Britain. And above all, is seen the decline of the military spirit which animated our fore-fathers in the days when no man considered any sacrifice too great for the good of his country. We see in England the steady growth and spread of frivolity, of luxury and of corruption—the whole under a weak and self-seeking Government, and with no great military spirit to support the burden. Wealth there is and success in trade and manufactures. The fleet of Britain sail on every sea, and carry our merchandise into every port of the habitable globe. But the sage philosopher Francis Bacon Verulan says regarding the vicissitude of the things ;—"In the youth of a State, arms do flourish ; in the middle age of a State, learning and then both of them together for a time ; in the declining age of a State mechanical arts and merchandise." Are not these words prophetic of the decline of our Empire ?

অর্থাৎ রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইবার পূর্ব্বে উহার যে সকল দোষ পরিদৃষ্ট হইতেছিল, বর্ত্তমান গরিষ্ঠ বৃটেন সাম্রাজ্যেও সেই সকল দোষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। শুদ্ধ তাহাই নহে, যে সমর-ব্যবসায় এককালে ইংরাজ জাতির নিকট গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইত এবং দেশের মঙ্গলের জন্য এক-কালে ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রকারে যে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেন, তাহা আজকাল ইংলণ্ড হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, ইংলণ্ডে এখন দিন দিন ক্ষুদ্রাশয়তা, বিলাস-পরায়ণতা ও উৎকোচ-প্রিয়তা বর্দ্ধিত ও চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। ইংলণ্ডের গবর্ণমেন্ট বা মন্ত্রিসমাজ দুর্ব্বল ও স্বার্থ-পরায়ণ। এত বড় সাম্রাজ্যের রক্ষা করিবার জন্য দেশে যেরূপ বীর-ভাবের প্রয়োজন, বৃটিশ জাতির মধ্যে তাহাও দৃষ্ট হইতেছে না। এ সকল কখনই শুভলক্ষণ নহে। সত্য বটে, ইংরাজের বাণিজ্য-পোত এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র মহাসাগরের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, ইংরাজের ধন-সমৃদ্ধির অভাব নাই। কিন্তু ব্যবসায় বাণিজ্যের এইরূপ প্রসার বৃদ্ধি সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও চিন্তাশীল লেখক ফ্রান্সিস বেকন লিখিয়াছেন,—"সকল রাজ্যেরই যৌবন-কালে সমরপ্রিয়তা প্রবল থাকে, মধ্যাবস্থায় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চা বৃদ্ধি পায়, তাহার পর কিছুদিন অস্ত্র-শস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞান উভয়েরই চর্চ্চা সমান থাকে। রাজ্যের অবনতি-কালে শিল্প-বাণিজ্য ও যন্ত্র-তন্ত্রাদির উন্নতি ও প্রসার-বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।"

এই তত্ত্বজ্ঞ চিন্তাশীল লেখকের উক্তি অনুসারে কি আমাদের বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবনতি ও ভাবী পরিণামের স্পষ্ট চিত্র সূচিত হইতেছে না?

"ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের" এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত নহে। বল-গর্ব্বিত ইংরাজের তেজ কত হ্রাস পাইয়াছে, দুর্ব্বলতা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা তাঁহাদের চিরশত্রু ফরাসী ও রুষ এবং অ-খ্রীষ্টান জাপানের সহিত সন্ধি-বন্ধনেই সকলের গোচর হইয়াছে। ইংরাজের বলবীর্য্য যদি পূর্ব্ববৎ উগ্র থাকিত, তাহা হইলে কখনই তাঁহারা রুষের ভয়ে ফরাসী ও জাপানের সহিত মৈত্রী-স্থাপনে অগ্রসর হইতেন না। সে যাহা হউক, ইংরাজ এখনও সতর্কতা অবলম্বন করিলে ধ্বংসমুখ হইতে তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যকে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারেন। ইংরাজ যদি ইম্পিরিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ, বিলাসিতা ও দুর্দ্দমনীয় বাণিজ্য-লালসা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে, সন্দেহ নাই। অনেক বিজ্ঞ রাজনীতি-বিশারদ এবিষয়ে এই প্রকার অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন।

এইত গেল ইংরাজের বিলাসিতার কথা। বেতন-ভোগী সৈনিকের সাহায্যে রাজ্য-রক্ষার চেষ্টা বিষয়েও ইংরাজের দোষ সামান্য নহে। বরং পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের তুলনায় ইংরাজের আমলে এই দোষ অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ, ইংরাজ ভারতবাসীকে বিশ্বাস করেন না। এই কারণে এদেশের প্রকৃতিপুঞ্জকে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-কৃষক-নির্ব্বিশেষে, মহাত্মা শিবাজীর ন্যায়, পবিত্র দেশরক্ষা-ব্রতে দীক্ষিত করিতে তাঁহারা সাহসী নহেন।

ইংরাজ মুখে বলেন, তাঁহারা কেবল ভারতীয় বীরজাতি-সমূহের মধ্য হইতে সৈনিক সংগ্রহ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদিগকে অন্য-প্রকার নীতির অবলম্বন করিতে দেখা যায়। দক্ষিণা-পথের মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা বিগত ১৮শ শতাব্দীতে আপনাদিগের শৌর্য্য-বীর্য্য ও রণকৌশলে সমগ্র ভারতবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, একথা কাহারও অবিদিত নহে। ব্রাহ্মণ পেশওয়ের ব্রাহ্মণ সর্দ্দারদিগকে জয় করিতে ইংরাজকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহিলারা পর্য্যন্ত কিরূপ শৌর্য্য সাহসের আধার, তাহা ঝাঁশীর রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের ১৮৫৭ সালের কার্য্যকলাপে সকলেই দেখিয়াছেন। তথাপি

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ যুবকদিগকে ইংরাজের সেনা-বিভাগে প্রবেশের অনুমতি প্রদত্ত হয় না। ইংরাজ-রাজ্যে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের শৌর্য্য-সাহস প্রকাশের পথ নিরুদ্ধ! বলা বাহুল্য, রাজপুরুষগণের এই ব্যবহার ১৮৩৩ সালের পার্লামেণ্টের আদেশ ও ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণা-পত্রের বিরোধী। শৌর্য্য-বীর্য্যশালী জাতিকে শৌর্য্য-প্রকাশের অবসর না দিয়া ও নির্ম্মম অস্ত্র আইনের কঠোর নিগড়ে বদ্ধ করিয়া ভীরু ও কাপুরুষ জাতিতে পরিণত করা অপেক্ষা অত্যাচার-মূলক কার্য্য আর কি হইতে পারে?

বাঙ্গালীরও প্রতি ইংরাজ রাজপুরুষেরা এইরূপ অত্যাচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। বাঙ্গালী আজ ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র নিন্দিত হইতেছে সত্য, কিন্তু বাঙ্গালীকে এরূপ ভীরু ও কাপুরুষ করিল কে? অতি প্রাচীন কাল হইতে মোহনলালের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর নামে কেহ ভীরুতাপবাদ রটনা করিতে সাহসী হয় নাই। বাঙ্গালীর বলবীর্য্যের ভয়েই মহাবীর সেকন্দর (আলেকৃজাণ্ডার দি গ্রেট) বঙ্গদেশের অভিমুখে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই, একথা ম্যাগেস্থানিস স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় রাজ-কুমার বিজয়সিংহ, কতিপয় রণপোত সহ সিংহলদ্বীপ আক্রমণ-পূর্ব্বক তথায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সিংহ-বাহুর নামানুসারেই ঐ দ্বীপের নাম "সিংহল" হইয়াছে। বিশাল কলিঙ্গ রাজ্য বাঙ্গালীরই বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যবদ্বীপ বালী প্রভৃতি পূর্ব্বসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বাঙ্গালীই উপনিবেশ-স্থাপন-পূর্ব্বক ঐ সকল স্থানে আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর শৌর্য্য সাহসের পরিচয় কাশ্মীরের ইতিহাস গ্রন্থ "রাজতরঙ্গিণী"তেও দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও বঙ্গীয় ভূপতির রাজ্য বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুসল-মানেরা তিন শত বৎসরেও বাঙ্গালা দেশ জয় করিতে পারেন নাই। উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় বাঙ্গালী রাজারা রাঢ়ীয় সৈনিকগণের সাহায্যে উদ্ধত পাঠানদিগকে তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত যেরূপ শাসিত রাখিয়াছিলেন, চিতোড়ের রাজ-বংশ ভিন্ন আর কোনও হিন্দু রাজবংশ সেরূপ পারেন নাই। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের সহচরেরা বাঙ্গালীর শৌর্য্য সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ ভাস্কর পণ্ডিতের বংশধরের রচনায় দেখিতে পাই। রাজা গণেশ ও কংস, মহারাজ প্রতা-পাদিত্য ও রাজা সীতারাম রায় প্রভৃতির কথা তুলিতে চাহি না, কিন্তু

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার ৫০ বৎসর পরেও বাঙ্গালীর শারীরিক গঠন যেরূপ মল্লজনোচিত ছিল, তাহাতে বাঙ্গালী ইংরাজের সেনাদলে প্রবেশাধিকার পাইলে ইংরাজ সেনার গৌরব বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস প্রাপ্ত হইত না। কোম্পানীর আমলের অন্যতম বড়লাট লর্ড মিণ্টো ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের একখানি পত্রে বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইবে। তিনি লিখিয়াছিলেন,—

I never saw so handsome a race. They are much *superior to* the Madras people whose form I admired also. Those were slender. These are *tall, muscular, athletic figures, perfectly shaped* and with the finest possible cast of countenance and features. Their features are of the most *classical European models* with great veriety at the same time.

ভাবার্থ এই যে,—বাঙ্গালীর ন্যায় সুশ্রী জাতি আমি আর কখনও দেখি নাই। মান্দ্রাজবাসীর গঠনের আমি প্রশংসা করিয়াছি সত্য, কিন্তু বাঙ্গালীর গঠন মান্দ্রাজীদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। মান্দ্রাজীরা ক্ষীণকায়; বাঙ্গালীরা উন্নতদেহ, বলিষ্ঠ ও মল্লজনোচিত কান্তিসম্পন্ন। ইহাদিগের অবয়বসমূহ সম্পূর্ণ ও সুগঠিত, মুখাবয়ব সৌষ্ঠবযুক্ত ও পরম রমণীয়। বাঙ্গালীর অবয়বে ইউরোপের আদর্শ-স্থানীয় প্রাচীন সভ্য জাতি সমূহের অর্থাৎ গ্রীক ও রোমানদিগের সাদৃশ্য বহু পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

১৮০৭ সালের "উন্নত-দেহ, বলিষ্ঠ, ও মল্লজনোচিত কান্তি-সম্পন্ন" বাঙ্গালীর সহিত বর্ত্তমান ১৯০৭ সালের ম্যালেরিয়া-জীর্ণ 'মসীজীবী' ক্ষীণকায় ভীরু বাঙ্গালীর তুলনাই হয় না। একশত বৎসরের ইংরাজ-শাসনে বাঙ্গালীর কি শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিলেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া যায়। পলাশী যুদ্ধের পরও বহুদিন পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনাদলে ভর্ত্তি হইয়া বাঙ্গালী অসীম সাহস-প্রকাশ-পূর্ব্বক এ দেশে ইংরাজের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে এখন আমাদিগের বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। যে বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজীরা আজ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল জাতি বলিয়া তিরস্কৃত হইয়া থাকে, সেই বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজী সৈন্যের বলেই ক্লাইব, কুট, লরেন্স, কর্ণওয়ালিস, ওয়েলেস্‌লি ও লেক প্রভৃতি ইংরাজ সেনানীরা বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এ দেশে আপনাদিগের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। মান্দ্রাজী অপেক্ষাও বাঙ্গালী সমধিক শৌর্য্যশালী ছিল, ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সহস্র বৎসরে এ দেশে যাহা হয় নাই, একশত বর্ষের ইংরাজ-শাসনে তাহাই হইয়াছে। শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী একশত বর্ষের ইংরাজ-শাসনে ভীরু ও কাপুরুষগণের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক শত বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর শারীরিক গঠন কিরূপ বীরোচিত ছিল, আর এখন উহা কিরূপ কঙ্কাল-সার ও ব্যাধির আধার-স্বরূপ হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলেও বিস্মিত হইতে হয়।

বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের" দ্বিতীয় ভাগের ১২৫ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছেন যে, "ইদানীং একশত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয়দের যেরূপ বলবীর্য্য-ক্ষয় ঘটিয়াছে, পূর্ব্বে সহস্র বৎসরেও কোনও কারণে সেরূপ কিছুই হয় নাই। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যেরূপ বলবান্ লোক বিদ্যমান ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এ দেশীয় লোকের শরীর কোনও স্থলে অর্দ্ধ হস্ত ও কোথায় বা এক হস্ত প্রমাণ হ্রস্ব হইয়া পড়িয়াছে! বলবীর্য্যের পরিমাণের ত কথাই নাই। ভদ্রলোকের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে, বংশ-বিশেষের লোপাপত্তির সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। অধিক স্থলে ইতর লোকের বিষয়েও এইরূপ ঘটিতেছে।" ফলতঃ ইংরাজ যদি রাজনীতিক কুটিলতার বশবর্ত্তী না হইয়া বাঙ্গালীকে সামরিক বিভাগে প্রবেশ-পূর্ব্বক শৌর্য্য-সাহসের পরিচয় দিবার অবসর ও উৎসাহ দান করিতেন, তাহা হইলে আজ কখনই বাঙ্গালীর এরূপ ভীরুতাপবাদ রটিত না, বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্যেরও এরূপ অপচয় ঘটিত না। কিন্তু বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালীকে সমরবিদ্যায় বিশারদ করিয়া তুলিতে ইংরাজের সাহসে কুলায় না। ইংরাজ এ দেশে জ্ঞান-বল ও বাহু-বলের একত্র সমাবেশ দেখিতে বাসনা করেন না। কাজেই কি বাঙ্গালী কি মহারাষ্ট্রীয় কাহারও ইংরাজের সেনা-বিভাগে প্রবেশ করিবার পথ উন্মুক্ত রাখা হয় নাই।

রাজনীতিক স্বার্থের বশীভূত হইয়া এখনকার রাজপুরুষেরা বাঙ্গালীকে যতই ভীরু, কাপুরুষ ও অপদার্থ নামে অভিহিত করুন, যে জাতি অতীতকালে শৌর্য্য বীর্য্যের মহিমায় গৌরবান্বিত ছিল, সে জাতি সুযোগ পাইলে ভবিষ্যতেও যে সেই মহিমার অধিকারী হইতে পারিবে না, এমন কথা কেমন করিয়া বলিব? অন্ততঃ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ

হণ্টার এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীর অভ্যুদয়ের কাল নিকটবর্ত্তী। তাঁহার উক্তি এই,—

In Budhist era the Bengalis sent *warlike fleets* to the east and the west and colonised the islands of the Archipelago. * * Religious prejudices combined with the changes of Nature to make the Bengalis unenterprising upon Ocean. But *what they have been, may under a higher civilisation again become.* * * * To any one acquainted with the revolutions of races, it must seem mere impertinence ever to despair of a people, and in maratime courage, as in other national virtues, *I firmly believe that the inhabitants of Bengal have a new career before them under British rule.—Orissa. 314|15-pp.*

অর্থাৎ বৌদ্ধ-যুগে বাঙ্গালীরা পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরণ করিত। তাহারা পূর্ব্বসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু ইহার পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মপ্রচারের সহিত সমুদ্র গমন নিষিদ্ধ বলিয়া বঙ্গদেশ-বাসীর ধারণা জন্মে। তদ্ভিন্ন তাম্রলিপ্তি (তমোলুক, প্রভৃতি স্থানসমূহও গঙ্গার পলি পড়িয়া বাণিজ্যের অযোগ্য হইয়া উঠে। এইরূপে একদিকে ধর্ম্ম-জনিত কুসংস্কার ও অন্য দিকে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা বাঙ্গালীকে সমুদ্র-গমন-ব্যাপারে উৎসাহ-হীন করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীরা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, উচ্চতর সভ্যতার সংস্পর্শে আবার সেইরূপ হইতে পারে। যাঁহারা মানবজাতির উত্থান ও পতনের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কোনও জাতির ভাবী উন্নতি সম্বন্ধে হতাশ হওয়া মূর্খতা বলিয়া মনে করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বৃটিশ আমলে সমুদ্র-গমন-বিষয়ক সাহস-প্রকাশে ও অন্যান্য জাতীয় গুণের বিকাশে বাঙ্গালীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইবার সুযোগ পাইবে।

ডাঃ হণ্টার এই কথা চিন্তা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় গুণের ও শৌর্য্য-সাহসের বিকাশকে তিনি বৃটিশ-শাসনের গৌরব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এখনকার ইংরাজ-সমাজের অধুনা এরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে যে, তাঁহারা এই প্রকার ঘটনার কথা কল্পনা করিতেও আতঙ্ক বোধ করেন। তাঁহাদিগের এই অতিরিক্ত স্বার্থ-প্রণোদিত আতঙ্কের ফল, তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য-রক্ষার পক্ষে কখনই শুভকর হইবে না। তাঁহারা এক দিকে যেমন ভারতের প্রাচীন শৌর্য্য-সম্পন্ন জাতি-সমূহকে অলীক আশঙ্কার বশীভূত হইয়া সমর-চর্চ্চার অবসর দান করিতে অনিচ্ছুক, অন্যদিকে আবার সেইরূপ শিখ, গুর্খা, পাঠান প্রভৃতি দেশীয় সৈনিকদিগকে উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র দান করিতেও তাঁহারা সাহসী নহেন। আর্কট অবরোধ-কালে যখন ইংরাজ শিবিরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন যে সিপাহী সেনা স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া গোরাদিগকে "অন্ন" দিয়া আপনারা কেবল "মণ্ড" পান করিয়া ইংরাজের জন্য যুদ্ধ

করিয়াছিল, ভরতপুর ও কুদ্দালোরের যুদ্ধে যখন গোরা সৈন্য শত্রু-মুখে অগ্রসর হইতে অসম্মতি-প্রকাশ-পূর্ব্বক পলায়ন করে, তখনও যে সিপাহী সেনা ইংরাজের জন্য প্রাণদানে অগ্রসর হইয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল, গোরাদিগের মত যাহাদিগের পান-দোষ নাই,—চরিত্র-দোষ নাই, শৌর্য্য-সাহসে ও বাধ্যতা-গুণে যাহারা গোরা সৈনিকদিগের অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অধিকাংশ রাজপুরুষই স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই সিপাহী সেনার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে ইংরাজ কিছুতেই সম্মত নহেন, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? সিপাহী-বিপ্লবের ইতিহাস-লেখক কে (Keay) সাহেব দেখাইয়াছেন যে, ইংরাজ সেনানীদিগের দুর্ব্ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়াই ১৮৫৭সালে সিপাহীরা বিপ্লব সংঘটন করিয়াছিল। একদা একদল সিপাহী উপযুক্ত পরিচ্ছদের (proper clothing) অভাবে কুচ করিবার আদেশ পালন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল। এই অপরাধে ইংরাজ সেনানী ঐ সিপাহী দলকে (regiment) পশুবৎ হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করেন। এই নিষ্ঠুর আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতি-পালিত হইয়াছিল! ঈদৃশ দুর্ব্ব্যবহারের পরিণামে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের ন্যায় ভীষণ ঘটনার অভিনয় না হওয়াই বিচিত্র।

১৮৫৭ সালের পর হইতে সিপাহী সেনার অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা শৌর্য্য-সাহসে গোরাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহাদিগকে প্রায় সকল বিষয়েই অবজ্ঞাত করা হইতেছে। তাহাদিগের রাজভক্তি বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে, তাহাদিগকে আর কামান স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। গোরাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, দেশীয় সিপাহী সৈন্যের সেরূপ দূরে থাকুক, তাহার অর্দ্ধেকও নাই। রাজ-প্রাসাদের সহিত দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরের যে পার্থক্য, গোরা বারিকগুলির সহিত সিপাহীদিগের 'লাইনের' (বাসস্থানের) সেই রূপ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। গোরা সৈনিকেরা এদেশে যেরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, স্বদেশে সেরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় তাহারা স্বপ্নেও ভোগ করিতে পায় না। কুচ করি-বার সময় গোরাদিগকে যত ভার বহন করিতে হয়, সিপাহীদিগকে তদ-পেক্ষা অধিকতর (প্রায় দ্বিগুণ) ভার বহন করিতে বাধ্য করা হয়।

যে শ্রেণীর রাইফেল (বন্দুক) গোরাদিগকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়, তাহা অপেক্ষা হীন শ্রেণীর রাইফেল সিপাহীদিগকে প্রদত্ত হইয়া থাকে। আবার সেই হীন শ্রেণীর রাইফেলও সিপাহীরা সর্ব্ব সময়ে আপনাদের নিকটে রাখিবার অনুমতি পায় না। গোরাদিগের যেরূপ স্বেচ্ছামত শিকার করিতে যাইবার ব্যবস্থা আছে, সিপাহীদের সেরূপ নাই। ফলে গোরারা লক্ষ্য-ভেদে সুপটু হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, সিপাহীরা আদৌ তাহা পায় না। স্বেচ্ছামত যত্র তত্র ভ্রমণের স্বাধীনতাও সিপাহীদিগের নাই। কিন্তু গোরাদিগের জন্য নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া প্রভৃতির ব্যবস্থাও আছে। গোরা বারিকে সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলে, কিন্তু সিপাহীদিগের লাইনে রাত্রি দশটার পর আর আলো রাখা হয় না। ইদানীং খনকের ও বিল্ডিং লাইনে কুলি মজুরের কার্য্য পর্য্যন্ত সিপাহীদিগকে দিয়া সময়ে সময়ে করাইয়া লওয়া হয়, কিন্তু সে জন্য তাহাদিগকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক প্রদত্ত হয় না। পূর্ব্বে তাহাদিগকে এসব কার্য্য করিতে হইত না। সামরিক বিচারালয়ে গোরাদিগের প্রতি আর বেত্র-দণ্ড বিহিত হয় না; কিন্তু অপরাধী সিপাহীদিগকে বেত মারিয়া জর্জ্জরিত করিবার বর্ব্বর ব্যবস্থা অদ্যাপি প্রচলিত রাখা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন গোরারা যে অপরাধে যেরূপ দণ্ড পায়, সিপাহীদিগকে সেই অপরাধে তদপেক্ষা কঠোরতর দণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে। গোরাদিগকে বেতন ভিন্ন আবার খোরাকীও দেওয়া হয়, কিন্তু সিপাহীদের বেলায় সে ব্যবস্থা নাই। এই দুর্ম্মূল্যতার দিনেও তাহাদিগকে সামান্য বেতনের পয়সা হইতে উদর-পূরণের ব্যবস্থা করিতে হয়। এজন্য অনেক সিপাহী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, অথবা কদর্য্য অন্ন ভক্ষণ করিয়া কোনরূপে জঠর-জ্বালা নিবৃত্ত করে। ইহার উপর তাহাদিগকে আবার গোরাদের অপেক্ষা অধিক ক্ষণ ও অধিক বার ব্যূহাভ্যাস (প্যারেড ও ড্রিল) করিতে বাধ্য করা হয়। এই ব্যূহাভ্যাসেই তাহাদের এত সময় অতিবাহিত হয় যে, সকল সময়ে তাহারা সুস্থির ভাবে রন্ধন-পূর্ব্বক আহার ও তৎপরে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের অবসর প্রাপ্ত হয় না। এই সকল কারণে শীঘ্রই অনেক সিপাহীর স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয় ও হতভাগ্যেরা পেন্সন (বৃত্তি) লাভের পূর্ব্বেই বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সিপাহীরা ১৫ বৎসর কার্য্য করিলেই বৃত্তি পাইত, ১৮৮৮ সাল হইতে তাহাদিগের কার্য্য-কাল বাড়াইয়া ২১ বৎসর করা

হইয়াছে। (১) রিজার্ভ সিপাহী সৈনিকদিগকে পূর্ব্বে মাসিক তিন টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হইত, কিন্তু ইদানীং দুই টাকার অধিক তাহাদিগকে প্রদত্ত হয় না। ফল কথা, এক দিকে অতিরিক্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও আদরে গোরা সৈনিকেরা যেমন বিলাসী ও অপদার্থ হইয়া উঠিতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ নানা দুর্ব্যবহারে দেশীয় সিপাহী সেনাকে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিবার চেষ্টারও ক্রটী নাই। সিপাহীদিগের মধ্যে যাহাতে একতা না জন্মে, তাহার জন্য ভারতের বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগকে লইয়া এক একটি দল গঠিত করা হয়,—এক এক জাতীয় সিপাহী লইয়া এক একটি দল গঠন করা হয় না। ইহাও সিপাহী সেনার দুর্ব্বলতার একটি কারণ। তাহার পর দেশীয় সেনার হাবিলদার, সুবাদার প্রভৃতি পদস্থ কর্ম্মচারীরা যাহাতে সুশিক্ষা লাভ করিয়া গোরা কর্ম্মচারীদের সমকক্ষ হইতে না পারে, সে জন্যও ইংরাজ যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। বহুদিন পূর্ব্বে একবার রাজকুমার ডিউক অব্ কনট মহোদয় এ দেশে সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড রবার্টস্ প্রমুখ সামরিক কর্ম্মচারীরা সে প্রস্তাবে আপত্তি করায় উহা পরিত্যক্ত হয়। সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ত দূরের কথা, অনেক রাজপুরুষ দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের ইংরাজী ভাষা শিক্ষারও বিরোধী। দেশীয় সামরিক কর্ম্মচারীদিগের উন্নতিপথে এইরূপে কণ্টকারোপ করিয়া রাজপুরুষেরা দিন দিন এদেশে শ্বেতাঙ্গ সামরিক কর্ম্মচারীর আমদানি বৃদ্ধি করিতেছেন। বুয়র যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে সিপাহী সেনার অধিনায়করূপে যত শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী বিরাজ করিতেছিলেন, এখন তদপেক্ষা অধিক কর্ম্মচারী বিরাজ করিতেছেন, দেখিতে পাই। ফলে, সামরিক বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। (২)

দেশীয় সেনার প্রতি বিশ্বাসের অভাবে ইংরাজ সিপাহীদিগকে নানা প্রকারে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণে বিগত বুয়র যুদ্ধকালে যখন ভারতীয় সিপাহী সেনাকে ট্রান্সভালে পাঠাইবার প্রস্তাব উপস্থিত হয়, তখন পাইওনীয়র পত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল.—

---

(১) ইদানীং সিপাহীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাদের কার্য্যকাল কিঞ্চিৎ কমাইয়া ১৯ বৎসর করা হইয়াছে।

(২) Modren Review. June, 1907.

To send Native infantry or cavalry into the field with their worn out Martinies against the Mausers of the Boers would be putting them at a quite injustifiable disadvantage.—*Pioneer*. 26-2-1900.

অর্থাৎ দেশীয় পদাতি বা তুরগ সেনাকে তাহাদিগের জীর্ণ হেনরি মার্টিনি বন্দুক লইয়া উৎকৃষ্ট মসার-বন্দুকধারী বুয়রদিগের সম্মুখীন হইতে বলিলে তাহাদিগকে ঘোর অসুবিধায় ফেলা হইবে। প্রত্যুত তাহাদিগকে এইরূপে বিপদ্‌গ্রস্ত করা কখনই ন্যায়ানুমোদিত হইবে না।

দেশীয় সেনাকে এই রূপ অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখা ইংরাজের পক্ষে কতদূর বুদ্ধিমানের কার্য্য হইতেছে, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু সিপাহী-বিপ্লবের পর রাজপুরুষেরা অনেক জল্পনা কল্পনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সিপাহী সেনাকে নানাপ্রকারে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করিয়া না রাখিলে এদেশে ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে না।

শিখ, গুর্‌খা প্রভৃতি সিপাহী সেনাকেও ইংরাজ উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্রাদি দান করেন না, অন্যদিকে বিলাতের বেতনভোগী সৈনিকেরা ভারত রক্ষার জন্য স্বদেশ-ত্যাগ-পূর্ব্বক এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আগমন করিতেও বড় ইচ্ছুক থাকে না। অনেক ইংরাজই এরূপ আশঙ্কা করেন যে, ইংলণ্ড-রক্ষার জন্য গোরা সৈনিকেরা যেরূপ প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে, ভারত-রক্ষার জন্য সেরূপ ভাবে যুদ্ধ করিতে চাহিবে না। সুতরাং বেতনভোগী সৈনিকের দোষাবলী ভারতীয় গোরা সৈনিকের মধ্যেও সম্পূর্ণরূপেই বিদ্যমান দেখিতেছি। কিন্তু ভারতবাসী যদি যুদ্ধ-বিদ্যায় দীক্ষিত হয়, তাহা হইলে স্বদেশ-রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া বৈদেশিক আক্রমণ-কারীর পরাজয়-সাধন করিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইংরাজ যদি সুশাসনে ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট রাখেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর যুদ্ধ-বিদ্যা-শিক্ষা ইংরাজের পক্ষে পরম মঙ্গলেরই কারণ হইবে, সামরিক বিভাগের ব্যয় বহু পরিমাণে কমিয়া যাইবে এবং দরিদ্র প্রজার কর-ভার লাঘব করিতে সমর্থ হইয়া ইংরাজ-রাজ ভারতবাসী প্রজার অসীম কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইতে পারিবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভারতবাসী প্রজাকে অস্ত্র-দান করিতে ইংরাজ-রাজ কিছুতেই সম্মত নহেন। এদিকে দীর্ঘকাল অস্ত্র-চর্চ্চার অভাবে এদেশবাসীর সামরিক গুণসমূহও বিলুপ্ত হইতেছে। 'ইংলিশম্যান' পত্রের সম্পাদক একদা প্রসঙ্গক্রমে যথার্থ ই বলিয়াছেন যে,—

Seeing how men degenerate in ease and security, and *nations absolutely rot in peace*, it is evident that there are worse evils than war. War and war alone, has made the nations of Europe strong. On war and the hard-bought strength and energy it bestows, have been founded all Europe's liberties and progress. The day civilised nations forget war that day they degenerate.—*Englishman.* April, 1907.

ভাবার্থ এই যে,—নির্ব্বিঘ্নে ও সুখে শান্তিতে বাস করিতে পাইলে মনুষ্যের কিরূপ অবনতি ঘটে, শান্তিতে বাস করিয়া সকল জাতিই কিরূপ একেবারে পচিয়া যায়, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয়, যুদ্ধ-বিগ্রহাদির অপেক্ষাও মানুষের অধিকতর অনিষ্টকারী শত্রু এই জগতে আছে। কেবল যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াই ইউরোপীয় জাতি-সমূহ এরূপ শক্তি লাভ করিয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহ ও তাহা হইতে লব্ধ শক্তি-সাহসই ইউরোপবাসীর যাবতীয় স্বাধীনতা ও উন্নতির মূল। যে দিন সভ্যজাতি-সমূহ যুদ্ধ-বিগ্রহ বিস্মৃত হইবেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাদিগের অবনতির সূত্রপাত হইবে।

বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজ দীর্ঘকাল হইতে ইংরাজের প্রত্যক্ষ-শাসনাধীন থাকায় ঐ দুই প্রদেশে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ফলেই বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজীদের যুদ্ধোপযোগী বৃত্তিসমূহ বিলুপ্ত হইয়াছে, লোকের ধন প্রাণ নিরাপদ হওয়ায় বাহু-বল ও অস্ত্র-চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা লোকে অনুভব করে না।—Journal of the United Service Institution of India নামক মাসিকপত্রের ১৮৯৭ সালের জুলাই মাসের সংখ্যায় জনৈক ইংরাজ-লেখক এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই—

"Undoubtedly the more southern and eastern races of India have each in turn lost their martiali nstincts, as securiy to life and property due to British rule has rendered reliance on their own arms unnecessary."

একে এই সর্ব্বনাশকর শান্তি, তাহার উপর ইংরাজের কঠোর ফৌজ-দারী বিধান। ফৌজদারী বিধানের কঠোরতায় ভারতবাসীর হৃদয়ের বল ও মনের তেজস্বিতা বিলুপ্ত হইয়াছে। মোগল পাঠানের আমলে আমরা নামে পরাধীন হইলেও কার্য্যতঃ স্বাধীন, অন্ততঃ বহুল পরিমাণে স্বাধীন ছিলাম। তাই স্বাধীন ভারতবাসীর শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্ত্তির পথ পাঠান বা মোগল আমলে এরূপ রুদ্ধ হয় নাই।

দেশ হইতে পৌরুষ-চর্চ্চার এরূপ বিলোপ ঘটিয়াছে যে, ইংরাজেরাও সামরিক বিভাগে কার্য্য করিবার উপযোগী লোক ভারতবর্ষে আর সহজে খুঁজিয়া পাইতেছেন না, বেলুচিস্থান হইতেই আজকাল অধিকাংশ সিপাহীসেনা সংগৃহীত হইতেছে বলিয়া শুনিতে পাই। এ অবস্থা কিরূপ ভীষণ, সকলেই অনুভব করিতে পারেন। ইংরাজও যে ইহা না বুঝেন,

তাহা নহে। তাই রুষের আক্রমণের কথায় ইঁহারা এরূপ ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়েন। সে যাহা হউক, ভারতবর্ষে রিজার্ভ সৈন্য বাড়াইবার কোনও উপায় এখনও হইতে পারে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় অতীত হয় নাই। এখনও রিজার্ভ সৈন্যের সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করিলে ইংরাজ অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই দেশরক্ষাব্রতে দীক্ষিত লক্ষ লক্ষ সিপাহী সেনা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন। এখনও এদেশের পুরুষত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও চেষ্টা করিলে—বিশ্বাস করিয়া শিক্ষা দান করিলে, লক্ষ লক্ষ ভারতীয় যুবক অল্পদিনের চেষ্টায় উৎকৃষ্ট সৈনিকে পরিণত হইতে পারেন। যদি লর্ড রবার্টসের ন্যায় সমর-নীতিজ্ঞের মতানুসারে কর্ত্তৃপক্ষ চলিতে সম্মত হন, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে ভারতে অপূর্ব্ব শৌর্য্যবীর্য্যশালী দেশ-রক্ষক সেনাদলের সৃষ্টি হইতে পারে। তখন রুষ বিংশতি লক্ষ সেনা লইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেও জয়-লাভের আশা করিতে পারিবেন না। এমন কি, ইংরাজের অন্ততঃ ৫ কোটী প্রজাকেও সশস্ত্র-ভাবে ইংরাজের পৃষ্ঠ-রক্ষায় নিযুক্ত দেখিলে রুষ পক্ষ ভারতাক্রমণের কল্পনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন, একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু ইংরাজ তাঁহাদের এই অকৃত্রিম রাজভক্ত প্রজাকে প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা দেড় লক্ষ সৈন্য লইয়া রুষের বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হইতে পারিবেন না জানিয়া জাপানের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। ইহাতে ভারতীয় প্রজার প্রতি ইংরাজের যে ঘোর অবিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ভারতবাসি-মাত্রেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। রাজভক্ত প্রজাকে এরূপ মর্ম্মপীড়া দেওয়া কখনই প্রকৃষ্ট রাজনীতির অনুমোদিত নহে।

ফলকথা, একদল বেতনভোগী স্থায়ী সৈন্যের উপর এরূপ বিশাল দেশের রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। কারণ, স্বদেশ-রক্ষার পবিত্র-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া যাহারা যুদ্ধ করে, তাহাদের সহিত বেতনভোগী সৈন্যের তুলনাই হয় না। রুষ-জাপ যুদ্ধে আমরা এ কথার প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রত্যহ প্রতিপদে দেখিতে পাইয়াছি। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে স্বদেশ-রক্ষাব্রতে দীক্ষিত সেনাদল একটীও নাই, স্বদেশরক্ষার পবিত্র কার্য্যে ভারতবাসী একেবারে বঞ্চিত! এদিকে দেড়লক্ষ বা দুই লক্ষ বেতন-ভোগী সেনার সাহায্যে রুষের ন্যায় প্রবল শত্রুর

আক্রমণ হইতে এই বিশাল দেশকে রক্ষা করাও অসম্ভব। অতএব ইংরাজ! এখনও দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ কর! ভারতবাসীকে বিশ্বাস কর রাজভক্ত প্রজাকে এরূপ অস্ত্রহীন, বল-হীন, পৌরুষহীন করিয়া রাখিও না। যে মিউটিনীর ভয়ে তোমরা অস্থির, সেই মিউটিনী তোমাদেরই অত্যাচার-পীড়িত সৈনিকেরা করিয়াছিল। সাধারণ প্রজা কখনও বিদ্রোহের চেষ্টা করে নাই, বরং তাহারা সহায়তা করিয়াছিল বলিয়াই তোমরা সিপাহীদিগের বিপ্লব-দমনে সমর্থ হইয়াছিলে! পূর্ব্বের ন্যায় অস্ত্রবলে বলীয়ান্ হইলে ও তোমাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকিলে ভারত-বাসী এখনও ইংরাজের জন্য উৎসাহের সহিত রুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে ফলে, রাজা প্রজা উভয়েরই মঙ্গল হইবে। তোমাদের সাম্রাজ্য-রক্ষার ভাবনা দূর হইবে, দরিদ্র প্রজার অর্থের অপব্যয়ও নিবারিত হইবে।

শ্বেতাঙ্গ-পোষণ।

শাসন-ব্যবস্থা-বিভাগেও অপব্যয়ের সীমা নাই। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট হইতে আদেশ প্রচারিত হয় যে, শাসন-বিভাগের উচ্চপদ-সমূহেও দেশীয় কর্ম্মচারীর নিয়োগ করিতে হইবে। ১৮৫৮ সালে পর-লোকগতা মহারাণীর ঘোষণাপত্রে সেই আদেশ সমর্থিত হয়। কিন্তু লর্ড লিটনের কথাতেই প্রকাশ যে, ঐ আদেশ-প্রচারের পরদিন হইতেই ভারত গবর্ণমেণ্ট আদেশ লঙ্ঘন করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইলেন। ফলে, উচ্চপদ-লাভের পথ এদেশবাসীর পক্ষে পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ রহিল। স্যার জন শোর লিখিয়াছেন,—

The Indians have been excluded from every honour, dignity or office, which the lowest Englishman could be prevailed upon to accept.

অর্থাৎ প্রত্যেক সম্মান, গৌরব ও উচ্চপদ হইতে দেশীয়দিগকে বঞ্চিত করা হইয়া থাকে। যে পদ-গ্রহণে কোনও প্রকারে অতি গুণ-হীন ইংরাজকেও সম্মত করিতে পারা যায়, সে পদে আর দেশীয়ের নিয়োগ হয় না।

ইহা অবশ্যই ১৮৩৮ সালের কথা। তাহার পর বিগত ৭০ বৎসরে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কতদূর সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের ফাইন্যান্স কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য-দান-কালে স্যার চার্লস ট্রিবেলিয়ান মহোদয় বলিয়াছিলেন,—

All sorts of young men who fail at the compititive examinations in this country, or who do not even venture to go into them, go out to India with recommendations and they have been put into the police and then into lower department of the Revenue as Deputy Collectors etc.

ভাবার্থ, যে সকল ইংরাজ যুবক প্রতিযোগী পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে পারে না, অথবা যাহারা উক্ত পরীক্ষার জন্য অগ্রসর হইতেও সাহস করে না, তাহারা ভদ্রাভদ্র নির্ব্বিশেষে এক এক খানি অনুরোধ-পত্র লইয়া ভারতবর্ষে গমন করে। সুপারিশের জোরে তাহারা অনায়াসে ভারতীয় পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত হয়, অনেকে আবার রাজস্ব বিভাগের ডেপুটী কলেক্টার প্রভৃতি অধস্তন পদও লাভ করে।

বিভাগীয় কর্ত্তৃ-পুরুষদিগের অনুগ্রহে ইদানীং অনেক সরকারী আফিসে ৫০৲ টাকার অপেক্ষা অধিক বেতনের কার্য্যে যথাসম্ভব ফিরিঙ্গী-নিয়োগেরই ব্যবস্থা হইতেছে! ১৮৯২ সালে পার্লামেণ্টে যে হিসাব দাখিল হইয়াছিল, তাহাতে নেত্রপাত করিলে উপলব্ধ হয় যে, যে সকল শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী ১২৫ টাকা বা তদপেক্ষা অধিক বেতন পান, তাঁহাদিগের জন্য ভারতীয় রাজকোষ হইতে বৎসরে ২১ কোটী টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গীদিগের বেতন-স্বরূপ বার্ষিক দেড় কোটী মুদ্রা প্রদত্ত হয়। পক্ষান্তরে ভারত-সন্তানদিগকে বেতন-প্রদানার্থ গবর্ণমেণ্ট বৎসরে ৫ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন না! এই ৫।০ কোটী ও ফিরিঙ্গীদিগের প্রাপ্ত ১।।০ কোটী টাকাই এদেশে থাকে। শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদিগের লব্ধ ২১ কোটী টাকার অধিকাংশই হোমচার্জ্জের টাকার ন্যায় দেশান্তরিত হয়। ঐ সালেই পার্লামেণ্টে জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে তদানীন্তন ভারতসচিবের অণ্ডার-সেক্রেটারি মিঃ কর্জ্জন (এখন লর্ড কর্জ্জন) বলিয়াছিলেন, বার্ষিক ৫০ সহস্র মুদ্রা বা তদধিক বেতনভোগী ২৭ জন রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে একজন মাত্র দেশীয়! যাহারা বার্ষিক ত্রিশ সহস্র হইতে পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা বেতন পাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তিনজন মাত্র দেশীয় ও ১৭২ জন ইউরোপীয়!

১৮৯২ সালের পর অনেক শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ ও ফিরিঙ্গীর সংখ্যা বাড়িয়াছে; তদনুপাতে ব্যয়েরও বৃদ্ধি হইয়াছে। সামরিক বিভাগে ব্যয়-বৃদ্ধির সীমা নাই। সিবিল বিভাগে ইদানীং প্রায় ৮ সহস্রাধিক বৈদেশিক বা শ্বেতাঙ্গ কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদিগকে আমাদের রাজকোষ হইতে বৎসরে কিঞ্চিদধিক অষ্ট কোটী মুদ্রা বেতন-স্বরূপ প্রদত্ত হইয়া

থাকে। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল রাজপুরুষের ভাতা প্রভৃতির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। পক্ষান্তরে ঐ সিবিল বিভাগেই সর্ব্বসমেত এক লক্ষ ত্রিশ সহস্র দেশীয় কর্ম্মচারী কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহাদিগের বার্ষিক বেতনে কর্তৃপক্ষ সাত কোটী মাত্র টাকা ব্যয় করেন। ছয় সহস্র ফিরিঙ্গী ৭৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা পায়। অর্থাৎ গড়ে প্রতি ইংরাজ বৎসরে ৯,০০৫ টাকা, প্রত্যেক ফিরিঙ্গী ১,২১৫ টাকা ও প্রতি দেশীয় কর্ম্মচারী ৫৪০ টাকা মাত্র পাইয়া থাকে।

কেবল শাসন বিভাগে নহে, রেলবিভাগেও প্রায় সপ্তসহস্র বৈদেশিক শ্বেতাঙ্গ উচ্চপদ-সমূহ অধিকার করিয়া দেশীয়দিগের অধিক বেতন-লাভের পথে বিঘ্ন-স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, রেলের কাজে লোকসান হইলে, রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহে দরিদ্র দেশীয়দিগের প্রদত্ত রাজস্ব হইতেই ক্ষতি-পূরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ফলে, রেলের লাভের ভাগী শ্বেতাঙ্গেরা ও লোকসানের ভাগী কৃষ্ণাঙ্গ প্রজা, এইরূপ দাঁড়াইয়াছে রেলের কারবারে ভারত গবর্ণমেন্টের এপর্য্যন্ত ৪ কোটী পাউণ্ড বা প্রায় ৬০ কোটী টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই ক্ষতি-পূরণের জন্য ভারতীয় রাজকোষ হইতে রাজপুরুষেরা দরিদ্র প্রজার শোণিত-সম-অর্থ-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উচ্চপদ সমূহে দেশীয়ের নিয়োগ হইলে, অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে কর্তৃপক্ষের কার্য্য সিদ্ধি হইত, ক্ষতির পরিমাণও এরূপ ভয়ঙ্কর হইত না, দেশবাসীরাও "দু পয়সা" পাইয়া তাহাদিগের দারিদ্র্য-কষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিতে পারিত। কিন্তু সেদিকে বৈদেশিক রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি নাই ভারতবাসীর যতই আর্থিক ক্ষতি ঘটুক, শ্বেতাঙ্গ-সমাজের স্বার্থ-রক্ষার বিষয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে।

লর্ড কর্জ্জনের আমলেই উচ্চপদে দেশীয়ের সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। বিগত ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে তিনি আয়-ব্যয়ের (বজেট) বিচার-কালে রাজকার্য্যে এদেশবাসীর সংখ্যা-বাহুল্যের উল্লেখ করিয়া গর্ব্ব-প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী বর্ষেই গোখলে মহোদয় ১৮৯৭ সাল ও ১৯০৩ সালের কর্ম্মচারীদিগের সংখ্যার তালিকা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে,—এক বিচার-বিভাগ ভিন্ন প্রায় সকল বিভাগেই হিন্দু কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। শিক্ষা-বিভাগেও

হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় কমিয়াছে। সহস্রাধিক মুদ্রা বেতনের পদে এই বিভাগে একজনের অধিক দেশীয় নাই। ১৮৯৭ সালে এই বিভাগে সহস্রাধিক মুদ্রা বেতন-ভোগী ইউরোপীয়ের সংখ্যা ৩৯ ছিল, ১৯০৩ সালে তৎস্থলে ৪৮ হইয়াছে! পূর্ত্ত-বিভাগে ৫ জন দেশীয় বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু মাসিক ১২ শত টাকার অধিক বেতন-যুক্ত পদে এক জনও কৃষ্ণাঙ্গ নাই। কেবল তাহাই নহে, ১৮৯৭ সালে ঐ বেতনের পদে ৪০জন শ্বেতাঙ্গ ছিল, ১৯০৩ সালে ৬১জন হইয়াছে, অর্থাৎ যে সময়ে অপেক্ষাকৃত অধিক বেতনের পদে ৫ জন মাত্র দেশীয়ের নিয়োগ হইয়াছে. সেই সময়ের মধ্যে ২১ জন শ্বেতাঙ্গকে ১২ শতাধিক মুদ্রা বেতনের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে!

রেল-বিভাগেও এইরূপ নিম্ন পদে শ্বেতাঙ্গদিগের সংখ্যা হ্রাস করিয়া জন কয়েক ফিরিঙ্গী ও এক জন কৃষ্ণাঙ্গকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু ১২ শতাধিক মুদ্রা বেতনের পদে পূর্ব্বের তুলনায় ৫ জন শ্বেতাঙ্গ ও দুই জন ফিরিঙ্গীকে নিয়োগ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ অতুলনীয় উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন? এতদ্ভিন্ন কৃষি-বিভাগ, স্থাপত্য-বিভাগ প্রভৃতি কয়েকটা নূতন বিভাগ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণাঙ্গদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। পশু-চিকিৎসা, যাদুঘর ও ডাক প্রভৃতি বিভাগেও শ্বেতাঙ্গের সংখ্যাই বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

রেল, সামরিক ও শাসনাদি বিভাগে নিযুক্ত শ্বেত হস্তীদিগের পোষণার্থ অর্থদান করিয়াই আমাদিগের অব্যাহতি-লাভ ঘটে না। এই শ্বেতকায়গণকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার ব্যয়ও আমাদিগকেই প্রদান করিতে হয়। এজন্য বৎসরে প্রায় অর্দ্ধকোটী মুদ্রা আমাদের রাজকোষ হইতে ব্যয়িত হইয়া থাকে। শ্বেতাঙ্গ-রাজপুরুষদিগের ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৃদ্ধি বিষয়ে যদি মিশনরি মহাশয়েরা সত্য সত্যই সহায়তা করিতে পারিতেন, যদি তাঁহাদিগের রাজনীতিক কপটতার মাত্রা কমাইতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে আমরা সানন্দে মিশনরিদিগের পোষণ-ভার গ্রহণ করিতে পারিতাম। কিন্তু এই খ্রীষ্টীয় পুরোহিত মহাশয়েরা আমাদিগের এই প্রকার হিতসাধনে তাদৃশ মনোযোগী নহেন। এরূপ বিড়ম্বনা আর কোনও দেশে কি সম্ভবপর? "বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ঃ" আর কাহাকে বলে?

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন,—

The Government of a people by itself has a meaning and a reality, but such a thing as the government of one people by another does not and cannot exist. One people may keep another for its own use, a place to make money in, a *human cattlefirm* to be worked for the profit of its own inhabitants.

ভাবার্থ এই যে, স্বদেশীয় রাজ-শক্তির দ্বারা শাসিত হওয়ার একটা সার্থকতা ও যাথার্থ্য আছে। কিন্তু এক জাতির দ্বারা অন্য জাতির শাসনের কোনও অর্থই হয় না। এক জাতি অপর জাতিকে নিজের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য রাখিতে পারে, অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্র-স্বরূপ করিতে পারে, "মনুষ্যের গোশালায়" পরিণত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা (ঘানিটানা প্রভৃতি) প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইতে পারে।

রমেশ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন,—"কিন্তু এমনই বিড়ম্বনা যে, গরু মরিয়া যায়, ঘানি টানিবে কে?" তিনি আরও বলিয়াছেন, "মিলের এই তীব্র উক্তির মধ্যে, প্রথমে যতটা সত্য আছে বলিয়া মনে হয়, তাহার অপেক্ষাও গভীরতর সত্য নিহিত আছে। এক জাতি অন্য জাতিকে শাসন করিতেছে, অথচ শাসিত জাতির স্বার্থ সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষিত হইতেছে—পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ উদাহরণও একটিও নাই। বিজাতীয় শাসকের হস্তে বিজিত জাতির স্বার্থ সম্পূর্ণ রূপে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, মনুষ্য জাতি অদ্যাপি এমন কোনও উপায়ের উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে এই অনিষ্ট নিবারণের একটি মাত্র উপায় আছে। সে উপায় এই যে, বিজিত জাতির হস্তে দেশের আংশিক শাসনভার সমর্পণ। ইহাতে জেতা ও বিজিত উভয় জাতিরই যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হয়।"

ফলতঃ দেশ হইতে সংগৃহীত করের অধিকাংশ দেশের মধ্যেই ব্যয়িত না হইলে প্রজার দুর্দ্দশা-বৃদ্ধি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ভূতপূর্ব্ব হিন্দু ও মোগল আমলে, প্রজাপীড়ক রাজার শাসনকালেও দেশের টাকার অধিকাংশ দেশেই ব্যয়িত হইত। প্রজারা যে রাজকর প্রদান করিত, তাহার প্রায় সমস্তই নানা সূত্রে তাহারা ফিরিয়া পাইত। এইজন্য মুসলমান-দিগের আমলে ভারতীয় প্রজাকুলের আর যত কষ্টই থাকুক, ভাত-কাপড়ের এরূপ কষ্ট কখনই ছিল না। ভারতবাসী হিন্দু-সন্তান নবাব বাদশাহের প্রধান মন্ত্রীর পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতেন। মুসলমান রাজপুরুষেরা যে বেতন পাইতেন, বা প্রজালুণ্ঠন করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিতেন, তাহা এদেশেই থাকিত, এখনকার ন্যায় তাহা চির দিনের জন্য সপ্তসমুদ্র-পারে গমন করিত না। নানা আকারে প্রজারা তাহা ফিরিয়া পাইত। তদ্ভিন্ন

মুসলমান নরপতিরা দেশীয় শিল্পিগণের প্রধান আশ্রয়-দাতা ছিলেন। প্রজারাও "পেটে খাইতে" পাইত বলিয়া রাজপুরুষদিগের অত্যাচার তাহাদিগের "পিঠে সহিত"। কিন্তু বর্ত্তমানকালে তাহা ঘটিতেছে না। যে কপর্দ্দকটি ইংরাজের হাতে বা ইংলণ্ডে যাইতেছে, সেটী আর এ দেশে ফিরিয়া আসিতেছে না। কাজেই প্রজার দারিদ্র্য বাড়িয়াছে, নানা বিষয়ে ভারতবাসী তাহাদিগের পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। ফলে "আমরা যে কাজে হাত দিতে যাই, সেই কাজই শেষ পর্য্যন্ত পণ্ড হইয়া পড়ে। অন্য দেশে যে কার্য্য যে প্রণালীতে সম্পন্ন হয়, আমাদের দেশে সে প্রণালীতে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে গেলে, শেষ পর্য্যন্ত নিষ্ফল হইতে হয়। আমরা পূর্ব্ব হইতে গণনা করিয়া যে ফলের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকি, সে ফল যথাসময়ে উপস্থিত হয় না, পরন্তু যাহা আমরা মনে ভাবি না, তাহাই আসিয়া উপস্থিত হয়।" শ্রদ্ধেয় নৌরোজী মহোদয়ও এই কথাই বলিয়াছেন,—

In India's present condition the very *sweets* of every other nation appear to act on it as *poison*. With this continuous and ever increasing drain by innumerable channels, as our normal condition at present, the most well-intentioned acts of the Government become disadvantageous.

এই অস্বাভাবিক অবস্থার নিরাকরণ-পূর্ব্বক ভারতীয় সমাজকে প্রকৃতিস্থ করিতে হইলে, রমেশ বাবুর ব্যবস্থিত ঔষধই সর্ব্বাগ্রে ব্যবহার্য্য। সুবিজ্ঞ নৌরোজী মহাশয়ও ঐ ব্যবস্থার পক্ষপাতী। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার হণ্টার সাহেব, England's work in India নামক গ্রন্থে উচ্চ রাজকার্য্যে বহুসংখ্যক দেশীয়ের নিয়োগ করিবার পরামর্শ দান করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এখন যেরূপ দুই দশ জন দেশীয়কে সিবিল-সার্ব্বিসের কার্য্য দান করিয়া আপ্যায়িত করা হইতেছে, সেরূপ করিলে, এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না। উচ্চ পদসমূহে বহুসংখ্যক দেশীয়ের নিয়োগ করিতে হইবে। তাঁহাদের কার্য্য-পরিদর্শনের জন্যও সকল স্থানে শ্বেতাঙ্গের নিয়োগ সুফল-প্রদ হইবে না। হণ্টার সাহেব শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদের সংখ্যা একেবারে কমাইবার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ডিউক অব ডিবনসায়ার মহোদয়ও এই মতাবলম্বী। তিনি বলেন, উচ্চ রাজকার্য্যে বহুল ভাবে দেশীয়দিগের নিয়োগ না করিলে, ভারতে সুশাসন কখনই প্রবর্ত্তিত হইবে না। স্যার জর্জ উইঙ্গেট, কেবল

যে অধিক সংখ্যায় দেশীয় নিয়োগেরই পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা নহে; তিনি ভারতবাসীকে হোমচার্জ্জের দায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি-দান করিতেও পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ইংলণ্ডের সংঘর্ষে ভারতের যে অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে, হোম চার্জ্জের সম্পূর্ণ বিলোপ ও ভারতবাসীর প্রদত্ত সমস্ত কর ভারতেই ব্যয় করিবার ব্যবস্থা না করিলে তাহার পূরণ হইবে না। আরও অনেক বিজ্ঞ মনীষী এই প্রকার মতই ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদিগের জাতীয় মহাসমিতিও ১৮৮৪ সাল হইতে এই প্রার্থনাই করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি এদেশের ক্ষমতা-প্রিয় রাজপুরুষেরা এবিষয়ে সম্যক্ কর্ণপাত করা নাই।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রদ্ধেয় দাদা ভাই নৌরোজী মহোদয়ের আন্দোলনের ফলে, বিলাতের ন্যায় ভারতেও যাহাতে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা গৃহীত হয়, সে বিষয়ে পার্লামেণ্ট মহাসভা আদেশ দান করিয়াছিলেন। এই আদেশানুসারে কার্য্য হইলে ভারতবর্ষীয় যুবকগণ বহু অর্থ-ব্যয়-পূর্ব্বক বিলাতে গিয়া সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষাদানের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন, প্রতি বৎসর শত শত যুবক বিনা আয়াসে সিবিলিয়ান হইয়া রাজ্যের উচ্চপদসমূহ লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু তাহা হইলে বিলাতের পরশ্রী-কাতর মধ্যবিত্ত ইংরাজ ও ক্ষুধিত স্কচ যুবকদিগের ভারতে বড় বড় চাকরী পাইবার ও রাশি রাশি অর্থ-লুণ্ঠনের সুবিধা হইত না। এই কারণে তদানীন্তন ভারত-সচিব ও অন্যান্য রাজপুরুষেরা স্পষ্টাক্ষরে পার্লামেণ্ট মহাসভার আদেশ পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন! বর্ত্তমান ঔদারনীতিক ভারত-সচিব মিঃ জন মর্লি মহোদয়ের নিকটও এ বিষয়ে প্রার্থনা করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনিও এ বিষয়ে পার্লামেণ্টের আদেশ পালন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভূতপূর্ব্ব রক্ষণশীল অনুদার-চিত্ত রাজনীতিকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল যথার্থই বলিয়াছেন—

It is not certain that the despotism of twenty millions is necessarily better than that of a few or of one.

অর্থাৎ একজন বা কয়েক জনের যথেচ্ছাচার অপেক্ষা দুই কোটী লোকের যথেচ্ছাচার অধিকতর শ্রেয়স্কর, এমন কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায় না।

ফল কথা, মুসলমান আমলে একজন নবাব বা বাদশাহের জন্য ভার-

তীয় প্রজাবর্গকে যে অত্যাচার সহ্য করিতে হইত, এখন তদপেক্ষা অনেক অধিক অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে। তখন একজন বাদসাহের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমাদিগকে যে উৎপীড়ন সহিতে হইত, এখন চারি-কোটী [জনষ্টুয়ার্ট মিলের সময় দুই কোটী ছিল] ইংলণ্ডবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তদপেক্ষা কত অধিক অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে, চারি কোটী ক্ষুধিত স্কচ ও পরশ্রীকাতর বৃটনের জন্য আমাদিগের মুখের গ্রাস কিরূপ নানা ছলে কাড়িয়া লওয়া হইতেছে, তাহা এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

মিশনরিদিগের যুক্তি।

এদিকে ধর্ম্মব্যবসায়ী মিশনরি মহাশয়েরা দেশের তরলমতি যুবক-দিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে,—"তোমাদের সামাজিক কু-শিক্ষার দোষেই তোমরা দারিদ্র্য ভোগ করিতেছ। নচেৎ বর্ত্তমান বৃটিশ আমলে তোমাদিগের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সেরূপ কোনও কালে হয় নাই। তোমাদের ধন যথেষ্ট বাড়িয়াছে ; কিন্তু তোমরা (১) বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াই সব খোয়াইতেছ। (২) তোমাদের ঋণ করিবার প্রবৃত্তি বড় প্রবল এবং (৩) তোমরা সরকারি চাকরি পাইবার জন্য লালায়িত, এই তিন কারণেই তোমাদের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে। (৪) তোমরা অলঙ্কার-পত্রে টাকা আটকাইয়া রাখ, আর অবিচারে যাহাকে তাহাকে ভিক্ষা দিয়া থাক, (৬) মদ, গাঁজা, আফিম খাইয়াও অনেক টাকা উড়াইয়া ফেল। তোমাদের দানের দোষে ভারতবর্ষ এক দিকে যেমন Land of Charity (দানশীলতার দেশ), অন্য দিকে তেমনই Land of beggars (ভিক্ষুকের দেশ) হইয়া পড়িয়াছে! সমগ্র ভারতে ৪১ লক্ষ লোক কেবল ভিক্ষা করিয়া দিন-পাত করে, ইহা কি সামান্য লজ্জার বিষয়? কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের কু-শিক্ষায় তোমাদের দেশের লোকের এই লজ্জাবোধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে! তোমাদের মধ্যে অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ধারণা আছে যে, সাহেবেরা দেশের সব বড় বড় চাকরি পায় বলিয়াই তোমাদের ধন-বৃদ্ধির একটা বড় পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেটা তোমাদের বিষম ভ্রান্তি। ভারতে ইংরাজ সিবিলিয়ানেরা যে বেতন পান, তাহার হিসাব করিলে

দেখিতে পাইবে যে, ঐ বেতনের জন্য তোমাদের গড়ে জন প্রতি বার্ষিক দুই পয়সার অধিক দিতে হয় না। ঐ সকল পদে অর্দ্ধ বেতনে দেশীয় লোকের নিয়োগ করিলে তোমাদিগের গড়ে বড় জোর এক পয়সা করিয়া ব্যয় লাঘব হইতে পারে। বৎসরে এক পয়সা বেশী বা কম খরচে কিছু যায় আসে না। ফল কথা, বৃটিশ আমলে তোমাদের প্রকৃত পক্ষে ধনবৃদ্ধি হইলেও উল্লিখিত "ষট্‌চক্রে" পড়িয়া তোমরা ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছ।" এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ আমাদিগের "মরালিটি" বা ধর্ম্মভীরুতার অভাব ও একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথাকে দারিদ্র্য-বৃদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যীশুখ্রীষ্টকে না ভজিলে ও সাপে মানুষে কথা কয়, ইত্যাদি বাইবেলীয় উপকথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিলে, ভারতবাসীর মঙ্গল হইবে না, এইরূপ উপদেশ-দানেও ইঁহারা বিরত নহেন। হোমচার্জ্জ প্রভৃতির ব্যপদেশে দেশের অর্থ শোষিত হওয়ায় ও রাজানুগ্রহ-পুষ্ট বিলাতী বাণিজ্যের সংঘর্ষে যে, ভারতবাসীর দিন দিন ধনক্ষয় হইতেছে, তাহার উল্লেখ, এই সকল ভারত-প্রবাসী মিশনরির মুখে প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না।

যাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত কারণাবলীর নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক ভারতীয় দারিদ্র্য-সমস্যার মূল তত্ত্ব-সমূহ সংগোপন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে অর্থব্যয় কি এ দেশের চির-ন্তন প্রথা নহে? বর্ত্তমান কালেই কি আমাদিগের পল্লীসমূহে এই সকল বিষয়ে অকস্মাৎ ব্যয়-বাহুল্যের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে? বরং পল্লী সমাজে কি অধুনা পূর্ব্বের তুলনায় এ সকল কার্য্যে সমারোহের মাত্রা হ্রাস পায় নাই? যদি তাহা না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও কি এই সকল কার্য্য দেশের দরিদ্রতা-বৃদ্ধির সহায়? এতদুপলক্ষে ব্যয়িত অর্থ কি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই বণ্টিত (distributed) হয় না? এরূপ সামাজিক আদান-প্রদানে কি দেশ ধন-হীন হয়? না, যে টাকা একবার দেশত্যাগ-পূর্ব্বক সমুদ্র-পারে গমন করে ও আর তাহার স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার কোনও উপায় থাকে না, তাহাতেই দেশের দারিদ্র্য-বৃদ্ধি পাইয়া থাকে?

তাহার পর মহাজনের ও ঋণ-প্রবৃত্তির কথা। পুরাকালে কি এদেশে মহাজন ছিল না? অধুনা সুদের হার যদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তবে

তাহার কারণ কি? দেশে টাকা বেশী থাকিলে স্থদের হার কমে, না, অর্থাভাব ঘটিলে স্থদের হার বাড়ে? লোকের অর্থাভাবই কি ঋণ-প্রবৃত্তির কারণ নহে? অর্থের অভাব অনুভূত না হইলে কেহ ঋণ করিতে অগ্রসর হয় কি? ঋণের কারণ অভাব, না, অভাবের কারণ ঋণ? পূর্ব্বে মহাজনেরা দেশবাসীর অনুগত ভৃত্যবৎ ছিল, একালে তাহারা গ্রামবাসীর প্রভুর আসন গ্রহণ করিল কিরূপে? এবিষয়ে মিঃ থরবরণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ কেহ করিতে পারেন কি?

রাজার প্রতিকূলতায় দেশের লোকের শিল্প বাণিজ্য বিনষ্ট হইলে, বৈদেশিক শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় প্রজাকুল রাজার আনুকূল্য-লাভে বঞ্চিত হইলে, বিদ্যালয়াদিতে স্বাধীন-জীবিকার অবলম্বন-যোগ্য শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে, লোকে চাকরি ভিন্ন আর কোন্ পথে ধাবিত হইতে পারে? স্যার ই, সি, বক্ (কে সি এস আই) মহোদয় বিগত ১৯০৬ সালে ২৩শে মার্চ্চের ইংলিশম্যান পত্রে লিখিত একটি প্রবন্ধের বাঙ্গালীর চাকুরি-প্রিয়তার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

The education which we had given them was one which had led to professions of culture rather than to professions involving industrial development.—"*Nostra culpa* !"

তারপর রাজশক্তি যেথানে মাদক-সেবনে উৎসাহদায়িনী, সেথানে প্রজার মাদক-দ্রব্যে অনুরক্তি-নিবারণ কি নিতান্তই কষ্ট-সাধ্য নহে? প্রাচ্য জাপান খ্রীষ্ট-ভক্ত না হইয়াও চণ্ডু-সেবীর মুণ্ড-চ্ছেদের ব্যবস্থা করে, আর চীনদেশ-বাসী অহিফেন-সেবনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে স্থসভ্য ইংরাজ বন্দুকের গুলিতে ও সঙ্গীনের প্রহারে তাহাদিগকে জর্জ্জরিত করিয়া অহিফেন-ক্রয়ে বাধ্য করেন, ইহার কারণ কি? (১)

দানকালে পাত্রাপাত্র-বিচারে আমাদিগের আগ্রহ প্রকাশ পায় না। পাছে প্রকৃত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি সাহায্য না পায়, পাছে সাধু-সজ্জনের সেবায় ব্যাঘাত ঘটিয়া ধর্ম্মহানি হয়, এই ভয়ে আমরা যাচক-মাত্রকেই দান করিতে অগ্রসর হই, (ইদানীং সে প্রবৃত্তিও লোপ পাইতেছে) ইহা

---

(১) অধুনা এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। চীন-সম্রাটের অনুরোধক্রমে ১৯০৮ সাল হইতে চীনে ভারতীয় অহিফেনের রপ্তানি কমাইতে ইংরাজ-রাজ সম্মত হইয়াছেন।

আমাদিগের দোষ হইতে পারে; কিন্তু যে দেশে ত্রিশ কোটি লোকের বাস, যে দেশের প্রায় দশ কোটি লোক চিরকাল একবেলা খাইয়া কাল-যাপনে বাধ্য হয়, সে দেশে যদি ৪১লক্ষ লোক ভিক্ষা-জীবী থাকে,—প্রতি সত্তর জনের মধ্যে একজন ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাহা হইলে কি ঐ দেশকে Land of beggars বা ভিক্ষুকের দেশ বলিয়া উপহাস করা শোভা পায়? এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের কু-শিক্ষায় দেশ-বাসীর লজ্জা-বোধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া নিন্দা করা কি যুক্তিসঙ্গত? অলঙ্কার-পত্রে আমাদের কিছু টাকা আটকাইয়া থাকে সত্য, কিন্তু অলঙ্কার-পত্রের সংখ্যাও কি দিন দিন কমিয়া আসিতেছে না? পূর্ব্বে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ও কৃষকদিগের গৃহে যে পরিমাণে "সোণাদানা" দৃষ্ট হইত, এখন কি তদপেক্ষা অল্প দৃষ্ট হয় না? বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য, ভূমির উর্ব্বরতার জন্য ও পাটের চাষের জন্য কৃষকসমাজের অবস্থা সকল স্থানে অধিক শোচনীয় না হইতে পারে, কিন্তু ভারতের অন্য সর্ব্বত্র কি তাহা-দিগের দুরবস্থার একশেষ হইতেছে না? মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে পূর্ব্বে যত অলঙ্কার-পত্র ছিল, অনেক স্থলে এখন তাহার অর্দ্ধাংশও দেখিতে পাই না। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অল্প টাকা অলঙ্কারাদিতে আবদ্ধ থাকিতেছে; কিন্তু তদনুপাতে আমাদের সমাজ সমৃদ্ধিশালী-হইয়াছে কি?

শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ান ও কর্ম্মচারীদিগের মোটা বেতন যোগাইতে গিয়া আমাদের মুখে রক্ত উঠিতেছে বলিয়া যাঁহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তি প্রদর্শন-কল্পে যে অপূর্ব্ব যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অতীব কৌতুককর। রাজকার্য্যে দেশীয়ের সংখ্যা-ধিক্য হইলে ভারতীয় প্রজার ব্যয়-ভার বৎসরে প্রতি জনে গড়ে এক পয়সা মাত্র লাঘব হইতে পারে, কিন্তু সেই এক পয়সার মূল্য কত? ত্রিশ কোটী প্রজার প্রদত্ত ত্রিশ কোটি পয়সায় বৎসরে অন্যূন ৪৭ লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন ৪৭ লক্ষ টাকা দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের হস্তগত হয়। কিন্তু বড়লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য সদাশয় সিবিলিয়ান মিঃ ডোনাল্ড স্মীটন বাহাদুর দেখাইয়াছেন যে, শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদিগের সংখ্যা হ্রাস করিলে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রায় ১৪ কোটী টাকা ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে। এই ১৪ কোটি মুদ্রা প্রজার মঙ্গলের জন্য কত প্রকারে ব্যয়িত হইতে পারে, তাহা এই শ্রেণীর উপ-

দেষ্টারা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষেপ্রতি বৎসর চতুর্দ্দশ কোটী মুদ্রা কূপ, তড়াগ,পুষ্করিণী প্রভৃতির খনন ও পঙ্কোদ্ধার কার্য্যে ব্যয় করিলে কি প্রকৃতি-পুঞ্জ সামান্য উপকার-লাভ করিবে? গ্রাম্য পথ-ঘাটের সংস্কার, দেশের পরিচ্ছন্নতা-বর্দ্ধন ও চিকিৎসালয়াদির প্রতিষ্ঠা, শাসন ও বিচার বিভাগের পার্থক্য-বিধান, উচ্চ শ্রেণীর শিল্প-বিদ্যালয়াদির স্থাপন প্রভৃতি বহু প্রকার অভাব এদেশে বিদ্যমান। বার্ষিক চতুর্দ্দশ কোটী মুদ্রায় এসকল অভাব কি ক্রমশঃ আংশিকভাবেও মোচিত হইতে পারে না? আর এই ১৪ কোটীর সহিত যদি হোমচার্জ্জের অর্দ্ধাংশ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি দেশের সামান্য উপকার হয়? যে দেশে ২২ কোটী লোকের বাস, সে দেশে অন্ততঃ ২২টি শিল্প-কলা-শিক্ষার কলেজ থাকা কি নিতান্ত আবশ্যক নহে? এখন দেশশুদ্ধ লোক "দেশীয় শিল্প চাই" "দেশীয় শিল্প চাই" করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অর্থাভাবে ২।৪টা বড় বড় শিল্প-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিতেও সমর্থ হইতেছেন না। এই সকল কথা চিন্তা করিলে গড়ে দুই এক পয়সা ব্যয়-লাঘবের মূল্য কত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

মিঃ ডোনাল্ড স্মীটনের সারগর্ভ উক্তি।

প্রবীণ সিবিলিয়ন মিঃ ডোনাল্ড স্মীটন সি, আই, ই, বাহাদুর বিগত ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এডিনবরা নগরে ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির সংস্কার বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে প্রভূত-বেতন-ভোগী সিবিলিয়ন-পোষণের অনিষ্টকারিতা অতি যুক্তিযুক্ত ভাষায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাঁহার ঐ বক্তৃতার একাংশের মর্ম্ম এইরূপ,—

বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর দোষে সমস্ত ভারতবাসী দরিদ্র হইয়া গিয়াছে। প্রায় চারি কোটী পরিবার দৈনিক তিন আনা মাত্র আয়ে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইতেছে। অথচ তাহাদিগের নিকট হইতে জন-প্রতি গড়ে বার্ষিক তিন টাকা হিসাবে কর আদায় করা হইয়া থাকে! পাঁচজন লইয়া যে পরিবার গঠিত, সে পরিবারকে ১৫ টাকা রাজ-করই দিতে হয়. এইরূপে ভারতবাসীর নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১১০ কোটী টাকা রাজস্ব আদায় করিতেছেন। প্রজার এই কষ্ট-দত্ত অর্থ, বৈদেশিক সিবিলিয়ানদিগের বিলাস-বিভ্রম-পূর্ণ জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য এবং সামরিক কর্ম্মচারীদিগের সমর-কণ্ডূতি নিবৃত্তির আয়োজনে যদৃচ্ছা ব্যয়িত হইতেছে। এই সকল অপব্যয়ের গুরু-ভার ভারতবাসীর পক্ষে এক্ষণে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

যে সকল কারণে ভারতবাসীর দারিদ্র্য-বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই সকল কারণের মূলোচ্ছেদ করিলেই ভারতবাসী ধনশালী হইতে পারিবে। ভারতীয় রাজ-কোষ হইতে প্রতি বৎসর ২৪ কোটী টাকা সামরিক বিভাগে, ১৫।১৬ কোটী টাকা সিবিল ব্যবস্থার জন্য, ৪।৫ কোটী টাকা শ্বেতাঙ্গদিগের পেন্সন বা বৃত্তি-দানে, ৬ কোটী টাকা পূর্ত্ত-বিভাগে ও ৬।৭ কোটী টাকা রাজস্ব-সংগ্রহ-কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। আমার বিশ্বাস, এই ৬০ কোটী টাকার বিনিময়ে ভারতবাসী কোনও উপকার লাভ করিতে পারে না বলিলেও বিশেষ দোষ হয় না। ভারতের অর্থ-পুষ্ট সামরিক বিভাগের দ্বারা ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ডেরই সমধিক উপকার হয়। উপকারের তুলনায় ব্যয়ের বিভাগ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, ভারতীয় সামরিক ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ বা ৮ কোটী (এখন ১০ কোটী) টাকা ইংলণ্ডের রাজ-কোষ হইতে প্রদান করা কর্ত্তব্য। দেওয়ানি বিভাগের কার্য্যে শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর আবশ্যকতা আদৌ নাই বলিলে দোষ হয় না। মহীশূর প্রভৃতির ন্যায় দেশীয় রাজ্যে অল্পবেতনের দেশীয় কর্ম্মচারীরা সুচারুরূপে সমস্ত রাজ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বৃটিশ ভারতেও সেইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা ব্যয়-লাঘব করিতে যত্ন-প্রকাশ কর্ত্তব্য। আমার প্রস্তাব-মত কার্য্য হইলে এই বিভাগে অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ ৮ কোটী টাকা ব্যয় সংক্ষেপ করা যাইতে পারে, পেন্সনের ব্যয়ও ২ কোটী টাকা কমিতে পারে। রাজস্ব আদায় বিভাগে শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদিগের সংখ্যা হ্রাস করিয়া বার্ষিক তিন কোটী টাকা ও পূর্ত্তবিভাগে প্রায় তিন কোটী টাকা খরচ অনায়াসে কমান যাইতে পারে।

এইরূপে ব্যয় লাঘব করিলে পূর্ব্বোক্ত চারিটি বিভাগ হইতেই রাজকোষে বার্ষিক ২২।২৩ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। বৎসরে ২৩ কোটী টাকার খরচ কমিলে গবর্ণমেণ্ট কৃষকদিগকে অর্দ্ধেক ভূমিকর ছাড়িয়া দিতে পারিবেন, লবণের শুল্ক অর্দ্ধেকেরও অধিক কমাইতে পারিবেন এবং বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকার অনধিক আয়ে আয়করও ছাড়িয়া দিতে সমর্থ হইবেন। যাহারা তিন আনা দৈনিক আয়ে পরিবার প্রতিপালন করিতে বাধ্য হয়, এই প্রকার ব্যয়-সংক্ষেপে তাহাদিগের যথেষ্ট উপকার হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যত দিন ভারত-সচিব ও বড়লাটদিগের হস্তে অ-সীম ক্ষমতা থাকিবে, ততদিন এই সকল সংস্কার ঘটিবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

ভারত-শাসনের বর্ত্তমান পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন ভিন্ন কোনও পক্ষেরই মঙ্গল নাই। কেবল পার্লামেণ্টে ভারতীয় সদস্যদিগকে প্রবেশের অধিকার প্রদান করিলে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাইবে না। প্রথমে ভারত-সচিব ও বড়লাটের ক্ষমতার হ্রাস করিতে হইবে। বস্তা বস্তা টাকা বেতন না দিলে যাঁহাদিগকে পাওয়া যায় না, এরূপ কর্ম্মচারীর সংখ্যা ও প্রভাব প্রতিপত্তি কমাইতে হইবে। অবশ্য বর্ত্তমান কালের অবৈধ ক্ষমতাপ্রিয় রাজপুরুষেরা এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইবেন না। কিন্তু যদি ইংলণ্ড ও ভারতের স্থায়ী মঙ্গল প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করাই নিতান্ত আবশ্যক।

আমাদের জাতীয় মহাসমিতির বিগত একবিংশ অধিবেশনের সভা-

পতিরূপে মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহোদয় সংক্ষেপে ভারতের আয়-ব্যয়ের কথা এইরূপে বুঝাইয়াছেন,—

"ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রজার নিকট হইতে রাজস্বরূপে (আদায়ের ব্যয় বাদে) ৬৬কোটী টাকা আদায় করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে ৩০ কোটি টাকা সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয়িত হয়। হোমচার্জ্জ-স্বরূপ ২১ কোটি টাকা (বিলাতি সামরিক ব্যয় বাদে) বিলাতে পাঠান হয়। সিবিল বিভাগের শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদিগের পোষণে ব্যয়িত হয়, ৪॥০ কোটির অধিক টাকা। অবশিষ্ট ১০॥০ কোটি টাকা গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকে। এই সামান্য টাকায় তাঁহাদিগকে প্রজার হিতকর সমস্ত কার্য্যই অল্লাধিক পরিমাণে সম্পাদন করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় শিক্ষা-বিস্তার, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি কার্য্যের জন্য অর্থের অভাব অনুভূত হওয়া কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নহে।"

সরকার পক্ষ-সমর্থক মিঃ জে, এম, ম্যাক্‌লীন পর্য্যন্ত এই কথা স্বীকার করিয়াছেন,—

"It is literally true that at the present out of the fifty millions of nett revenue of India, half comes to England to pay the Home Charges, while probably another third is spent on the army, which is mainly employed in guarding the frontier. Very little of the Indian revenue is spent in fact in India at all.

বিগত ১৯০৬ সালের মার্চ্চ এপ্রিল মাসে মিঃ ব্রায়ান নামক জনৈক সুপ্রসিদ্ধ মার্কিণ রাজনীতিবিৎ ভারতবর্ষে ভ্রমণের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ "টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া" পত্রের ঐ সালের ২৮শে মার্চ্চ তারিখের সংখ্যায় ব্রায়ান সাহেবকে "a man of world-wide fame," "one of the greatest of living Americans" অর্থাৎ জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি ও বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমেরিকানদিগের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রায়ান সাহেবকে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট বা অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য বলিয়া অনেকেই মনে করেন। এই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই,—

British rule in India is far worse, far more burdensome to the people and far more unjust—if I understand the meaning of the word—than I had supposed. The more I read about it, the more unjust it seemed. The Government of India is as arbitrary and despotic as the Government of Russia ever was, and in two respects it is worse. First, it is administered by an alien people, whereas the officials of Russia are Russians. Secondly, it drains a large part of the taxes out of the country, whereas the Russian Government spends at home the money which it collects from the people.

ভারতীয় শাসন-পদ্ধতিকে আমি যত দূর দোষ-পূর্ণ, ন্যায়-বিগর্হিত ও প্রজা-

সাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতাম, প্রকৃতপক্ষে উহা তদপেক্ষা অনেক অধিক দোষপূর্ণ, ন্যায়-বিগর্হিত ও অনিষ্টকর। আমি ঐ বিষয়ে যতই আলোচনা করিয়াছি, ততই উহা আমার নিকট অধিকতর ন্যায়-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী অপেক্ষা রুষ গবর্ণমেন্টের শাসন পদ্ধতি কখনই অধিক অত্যাচার-মূলক ছিল না। বরং দুইটি বিষয়ে রুষ গবর্ণমেন্ট অপেক্ষাও ভারতের বৃটিশ গবর্ণমেন্ট অধিকতর দোষপূর্ণ। ১ম, ভারতের শাসন-দণ্ড বৈদেশিকদিগের দ্বারা পরিচালিত হয়; কিন্তু রুষ রাজ্যে রুষীয় রাজপুরুষেরাই শাসন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ২য়, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতীয় প্রজার প্রদত্ত করের অধিকাংশ শোষণ করিয়া বিলাতে লইয়া যান; কিন্তু রুষ গবর্ণমেন্ট প্রজার প্রদত্ত কর রুষ রাজ্যের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করিয়া থাকেন।

ইংরাজের এই শাসন-প্রণালী এদেশবাসীর পক্ষে কিরূপ সংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এদেশের মৃত্যু তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। গবর্ণমেণ্ট দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন বলিয়া শুনা যায়। নিতান্ত পক্ষে সুসভ্য ইংরাজের চেষ্টায় দেশের স্বাস্থ্য পূর্ব্বের অপেক্ষা অবনত হয় নাই, এ কথা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। তথাপি মৃত্যুর হার ভারতে বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? ১৮৮৪-৮৫ সালে ভারতে মৃত্যুর হার হাজারকরা ২৬ জন ছিল, ইদানীং উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫।৩৬ হইয়াছে! ভারতবাসীর অনশন-ক্লেশ ও ঘোর দারিদ্র্যই মৃত্যু-সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পাইবার একমাত্র কারণ। আদম-সুমারির তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেও জানা যায় যে, ১৮৭২ সাল হইতে ১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত নয় বৎসরে ভারতবর্ষে হাজারকরা ২৩ জন লোক বাড়িয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী দশ বৎসরে বৃদ্ধির হার ১৩ অপেক্ষা অধিক হয় নাই। ১৮৯১ সাল হইতে ১৯০১ সালের মধ্যে জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার হাজারকরা পূর্ণ আড়াই অপেক্ষাও কমিয়াছে। ইংলণ্ডে হাজারকরা যত লোক জন্মগ্রহণ করে, তাহার অর্দ্ধেকের কিঞ্চিৎদধিক লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। কিন্তু এদেশে জন্মের পরিমাণ হাজারকরা ৪১ হইলে মৃত্যুর হার ৩৫ হয়! বিগত কয়েক বৎসর হইতে এদেশে যেরূপ লোকক্ষয় হইতেছে, তাহাতে আগামী আদমসুমারির সময় দেশের জন-সংখ্যার পরিমাণ কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! লণ্টন নামক জনৈক পার্লামেন্টের সদস্য বলেন,—বিলাতে ট্যাক্স আদায় কার্য্যে শত-করা ৩৲ টাকা মাত্র খরচ হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতে একশত টাকা

আদায় করিতে ১২ টাকা খরচ হয়! মিঃ লণ্টনের মতে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিক বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া থাকে। ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন-শ্রেণীর একজন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীকেও ৪০ জন "নেটিব" কর্ম্মচারীর বেতন প্রদান করিতে হয় কাজেই নানা উপায়ে বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে ইংরাজকে রাজ-কোষের মোট আয় শতকরা ৪৪ টাকা এবং ভূমি-রাজস্বের আয় শতকরা ৩২ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। এরূপ শোষণে প্রজার দারিদ্র্য-বৃদ্ধি না হওয়াই বিচিত্র।

তাই সুবিজ্ঞ দাদা ভাই নৌরোজী মহাশয় বলিয়াছেন,—

The romance is that there is security of life and property in India, the reality is that there is no such thing.

ভাবার্থ ইংরাজ শাসনে ভারতবাসীর জীবন ও ধন সম্পত্তি নিরাপদ হইয়াছে বলিয়া যে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কবি-কল্পনা-মাত্র; প্রকৃত পক্ষে ইংরাজের গ্রাস হইতে ভারতবাসীর ধন প্রাণ সুরক্ষিত নহে।

ইংরাজের সহিত বাণিজ্য-সংগ্রামে পরাভব, ভূমি-রাজস্বের কঠোরতা, হোমচার্জ্জ ব্যপদেশে ভারতবাসীর রুধির-শোষণ, সামরিক বিভাগের ব্যয়-বৃদ্ধি ও প্রায় সমুদায় অধিক বেতনের পদেই বিদেশীয়গণের একাধিপত্য প্রভৃতি বিবিধ কারণে দেশবাসীর কিরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পশ্চাদ্বর্ণিত মন্তব্যে তাহা অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে,—

"আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কাপড় যোগাইয়াছে, আজ সে পরের কাপড় পরিয়া লজ্জা বাড়াইতেছে—এক সময়ে ভারতভূমি অন্নপূর্ণা ছিল, আজ "হাদে লক্ষ্মী হইল লক্ষ্মীছাড়া"—এক সময়ে ভারতে পৌরুষ রক্ষা করিবার অস্ত্র ছিল, আজ কেবল কেরাণীদিগের কলম কাটিবার ছুরীটুকু আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজত্ব পাইয়া অবধি ইচ্ছাপূর্ব্বক ছলে বলে কৌশলে ভারতের শিল্পকে পঙ্গু করিয়া সমস্ত দেশকে কৃষি-কার্য্যে দীক্ষিত করিয়াছে। আজ আবার সেই কৃষকের খাজনা বাড়িতে বাড়িতে সেই হতভাগ্য ঋণ-সমুদ্রের মধ্যে চিরদিনের মত নিমগ্ন হইয়াছে। এই ত গেল বাণিজ্য এবং কৃষি।—তাহার পর বীর্য্য এবং অস্ত্র; সে কথার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।……এদিকে দেশ হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় পাঁচ শত কোটি টাকা, খাজনায় এবং মহাজনের লাভে বিদেশ চলিয়া যাইতেছে। ব্যবসায়ের জন্য মূল ধন থাকে কোথায়? এই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছি।...রোমের শাসনে, স্পেনের শাসনে, মোগলের-শাসনে, এত বড় একটা বৃহৎ দেশ কি এমন নিঃশেষে উপায়বিহীন হইয়াছে?"—[বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়) ১৩১০ সাল, কার্ত্তিক—"অত্যুক্তি" শীর্ষক-প্রবন্ধ।]

প্রতিকারের উপায়।

"স্বরাজ্য" বা স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠা।

বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটিলে অচিরাৎ আমাদের অস্তিত্ব ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে, একথা এক্ষণে সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। দেশের মনীষী ব্যক্তিগণের বহু চিন্তার ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতের প্রচলিত যথেচ্ছাচার-মূলক শাসন-পদ্ধতির আমূল সংস্কার ও পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর প্রবর্ত্তন ভিন্ন আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কিছুতেই মোচন হইবে না। এই সংস্কার ও পরিবর্ত্তন রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সমবেত চেষ্টা ভিন্ন সহজে সংসাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রজা-পক্ষ হইতে আমাদিগের জাতীয় মহাসমিতি এই অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্ব্বোল্লিখিত দুরবস্থার প্রতিকার বিষয়ে রাজ-শক্তি ও প্রজা-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। রাজপুরুষেরা আপাততঃ মহাসমিতির কথায় বিশেষ কর্ণপাত করিতেছেন না বটে, কিন্তু কালে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া মহাসমিতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হইবে, এরূপ যথেচ্ছাচার শাসন কখনই এদেশে স্থায়ী হইবে না। এদিকে মহাসমিতির বিগত কয়েক বর্ষের চেষ্টায় আমাদের জাতীয় জীবন বহুপরিমাণে গঠিত হইয়াছে, বিবিধ বৈষম্যের লীলা-স্থল ভারতবর্ষে এই শুভানুষ্ঠান উপলক্ষে অপূর্ব্ব একতার সঞ্চার হইয়াছে,—হিন্দু, মুসলমান, ফিরিঙ্গী, খ্রীষ্টান, বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রীয়, পার্শী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী, উড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ এক সূত্রে বদ্ধ ও একই মহান্ উদ্দেশ্য-পথে অগ্রসর হইতেছেন। জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলন ও আলোচনার ফলে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে। আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি, কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদিগকে শ্রমস্বীকার করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কিরূপ কঠোর সাধনা ও আত্ম-বিসর্জ্জনের প্রয়োজন, তাহাও এক্ষণে আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ধর্ম্মভেদ বা জাতিভেদগত পার্থক্য-হেতু দেশের কার্য্যে মিলিত হইতে এক্ষণে আর কাহারও তেমন

দ্বিধা বোধ হইতেছে না। কংগ্রেসের ফলে আজ আমরা পরস্পরকে চিনিতে পারিতেছি, এক প্রদেশবাসীর সুখ-দুঃখে অপর প্রদেশবাসীর হৃদয়ে আজ আনন্দ ও বেদনার সঞ্চার হইতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের সর্ব্বব্যাপিতা কংগ্রেসের ফল। আমাদের রাজনীতিক অভাব অভিযোগ কি, তাহাও কংগ্রেসের ফলে দেশবাসীর হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

কিন্তু এরূপ অনুষ্ঠান এদেশে পূর্ব্বে ছিল না। সুতরাং, ইহা যে দেশের সামগ্রী, সেই দেশের রীতির অনুকরণে ইহাকে পরিচালিত করিতে না পারিলে, সুফল-লাভের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত হইবে। পাশ্চাত্য দেশে প্রজার রাজনীতিক আন্দোলনে যে আশু সুফল লাভ হয়, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তত্রত্য প্রজাসমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত এই সকল আন্দোলনে অন্তরের সহিত যোগদান করে। আমাদের দেশে অজ্ঞতার জন্য অনেকেই এই সকল আন্দোলনের সংবাদ পর্য্যন্ত রাখেন না, সমাজের সকলে জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যে সমান উৎসাহ প্রকাশ করেন না। কাজেই ক্ষমতাপ্রিয় রাজপুরুষেরা আন্দোলনকারীদিগের মুষ্টিমেয়তা বা সংখ্যাল্পতা অনুভব করিয়া প্রতীকারে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাতে কংগ্রেসের অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন হয় না, আমাদেরই অকর্ম্মণ্যতা ও অজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

যদি জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলনে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি প্রকাশ পায়, যদি তদুদ্দেশ্যে সমগ্র সমাজ আমূল আলোড়িত হয়, রাজপুরুষেরা যদি বুঝিতে পারেন যে, মহাসমিতির প্রস্তাব-সমূহ সমগ্র দেশবাসীর আন্তরিক অনুমোদন লাভ করিয়াছে এবং সেই সকল প্রস্তাবানুসারে কার্য্য না করিলে ভারতীয় সমাজের অন্তস্তল পর্য্যন্ত মর্ম্মবেদনায় বিক্ষোভিত হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে তাঁহারা কংগ্রেসের প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতে অবশ্যই আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। এই কারণে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া, দেশের বর্দ্ধনশীল দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা, আমাদের শোচনীয় অধোগতির কথা, তাহাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া কংগ্রেসের প্রতি সকলের অনুরাগবর্দ্ধন-পূর্ব্বক এই শুভানুষ্ঠানের শক্তি-বৃদ্ধি করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর অবশ্য কর্ত্তব্য। দেশের প্রত্যেক সুসন্তানের এই কর্ত্তব্য-ভার স্কন্ধে গ্রহণ করা উচিত।

জাতীয় মহাসমিতির জন্মাবধি আমাদিগের সমক্ষে স্বায়ত্ত-শাসনের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত ১৯০৬ সালের অধিবেশনে আমাদিগের ঋষি-কল্প নেতা শ্রদ্ধেয় দাদাভাই নৌরোজী মহোদয় যেরূপ পরিস্ফুটভাবে "স্বরাজ্য" বা স্বায়ত্ত-শাসনের চিত্র আমাদিগের সমক্ষে স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেরই হৃদয়ে এখন স্বরাজ্যলাভের বাসনা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। নৌরোজী মহোদয় বলেন,—আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী বলিয়া আমাদিগের স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বরাজ্যলাভ করিবার জন্মগত অধিকার আছে। ভারতে প্রথম অধিকার স্থাপনকালে ইংরাজ আমাদের এই অধিকারের কথা স্বীকার-পূর্ব্বক ঘোষণা করিয়াছিলেন। বোম্বাই প্রদেশ যখন ইংরাজের প্রথম হস্তগত হয়, তখন ইংলণ্ডেশ্বর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ্চ তারিখে যে সনন্দ দান করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল,—

"And it is declared that all persons being His Majesty's subjects inhabiting within the said Island and their children and their posterity born within the limits there of, shall be deemed free denizers and natural subjects as if living and born in England.

"এবং ইহা ঘোষণা করা হইতেছে যে, এই বোম্বাই দ্বীপের মধ্যে ইংলণ্ডেশ্বরের যে সকল প্রজা বাস করে, তাহারা এবং তাহাদের ভবিষ্যদ্বংশধরগণ সকলেই ইংলণ্ডবাসীর ন্যায় সাম্রাজ্যের স্বাধীন অধিবাসী ও স্বাভাবিক প্রজা বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

অধিকন্তু ঐ সনন্দ-পত্রে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে যে সকল প্রদেশ বৃটিশসাম্রাজ্যভুক্ত হইবে, সেই সকল প্রদেশের অধিবাসিগণও উক্ত অধিকার-সমূহ লাভ করিবে। ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিলে সেখানকার লোকে যে সকল অধিকার ও যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করে, বৃটিশ ভারতের অধিবাসীরাও সেই সকল অধিকার ও সেইরূপ স্বাধীনতা লাভ করিবে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট মহাসভা হইতে ভারতীয় শাসনপদ্ধতির সংস্কারোদ্দেশ্যে যে বিধান প্রণীত হয়, তাহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেও সেকালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টারেরা বলিয়াছিলেন,—

The Court conceive this section to mean that *there should be no governing caste in Brislsh India.*

অর্থাৎ ভারতে "রাজার জাতি" ও "প্রজার জাতি" ইত্যাকার ভেদ থাকা পার্লামেণ্ট মহাসভার অভিপ্রেত নহে।

১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে ঘোষণা-পত্রের প্রচার করেন, তাহা লিখিবার জন্য অনুরোধকালে তিনি লর্ড ডার্ব্বিকে বলিয়াছিলেন—

And point out the privileges which the Indians will recieve in being placed on an equality with the subjects of the British Crown.

ভারতবাসী বৃটিশরাজ্যের অন্যান্য প্রজাবর্গের সহিত এক সমতলে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে সকল অধিকার লাভ করিবে, তাহার কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

বৃটিশ প্রজার সমস্ত অধিকারের মূল সূত্র—No taxation without representation অর্থাৎ রাজকার্য্যে প্রজার মতামত গ্রহণ না করিলে রাজা ট্যাক্স আদায় করিতে পারিবেন না, রাজকার্য্য প্রজার মতানুসারে না চলিলে ট্যাক্সের জন্য প্রজা দায়ী হইবে না। বিলাতের ঔদারনীতিকদিগের মতে Taxation without representetion is tyranny অর্থাৎ রাজকার্য্যে প্রজার মতামত না লইয়া কর গ্রহণ করা ঘোর অত্যাচার-মূলক কার্য্য। এই মূল সূত্র হইতেই পার্লামেণ্টের উৎপত্তি। যে পার্লামেণ্টের আদেশে দেশ শাসিত হইতেছে, সেই পার্লামেণ্ট সকল শ্রেণীর প্রজার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বারা গঠিত। এই প্রতিনিধিগণের মতাধিক্য অনুসারে শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েরই ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের মত গ্রহণ না করিয়া রাজপুরুষেরা, এমন কি, প্রধান মন্ত্রী ও স্বয়ং সম্রাট্ পর্য্যন্ত কোনও বিষয়ে একটি কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে পারেন না। ইহাই প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন। ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক প্রজারা এই স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার লাভ করিয়াছেন।

বৃটিশ প্রজা বলিয়া ভারতবাসীও ন্যায়ানুসারে এই স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বরাজ্য-লাভের অধিকারী। এই স্বায়ত্তশাসন লাভ করিলে ভারতবাসী আপনাদের মঙ্গলের জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিবেন, তাহাতে বাধা দিবার কেহই থাকিবে না। দেশবাসীর প্রয়োজন ও অভাব অনুসারে দেশের আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হইবে। পররাষ্ট্রের সহিত ভারতবর্ষের কিরূপ সম্বন্ধ থাকিবে, তাহাই কেবল ইংরাজ-রাজ সার্ব্বভৌম শক্তিরূপে নির্ণয় করিয়া দিবেন, বড় লাট ও গবর্ণর-নিয়োগের ক্ষমতাও ইংলণ্ডীয় শক্তিরই হস্তে ন্যস্ত থাকিবে; কিন্তু গবর্ণরদিগের ব্যবস্থাপক সভার প্রায় সকল সদস্যই এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অধিকাংশ সদস্য ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া ইংরাজ গবর্ণরদিগকে রাজ্য-শাসন-কার্য্যে সহায়তা করিবেন। তখন হোম চার্জ্জ ও বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিসের ব্যয়-ভার আমাদিগকে বহন করিতে হইবে না। সামরিক বিভাগের ব্যয়ও প্রজার

ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত বৃদ্ধি করা রাজপুরুষদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। ৮ ভারতীয় সরকারি ঋণের জন্য সমস্ত দায়িত্ব বিলাতী গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতে হইবে। স্বদেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি-কল্পে ভারতবাসী বিদেশ হইতে, এমন কি ইংলণ্ড হইতে আমদানি মালের উপরেও, যথেচ্ছভাবে আমদানি শুল্ক স্থাপন করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে আমরা যোগ্যতা দেখাইয়া, ইংলণ্ডের সেনা বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদও, লাভ করিতে পারিব। দেশে শিক্ষার বিস্তার, জল-প্রণালীর খনন ও স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি লোক-হিত-কর কার্য্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিবার সুবিধা ঘটিবে। এই প্রকার স্বায়ত্ত-শাসন যে আমাদিগের প্রাপ্য, তাহা লর্ড মেকলে হইতে ডাঃ হণ্টার ও স্যার হেনরি কটন পর্য্যন্ত সকল রাজনীতিবিশারদ সহৃদয় ইংরাজই স্বীকার করিয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরের সনন্দ-পত্রে ও মহারাণীর ঘোষণা-পত্রেও বৃটিশ প্রজার এই স্বত্ব আমা-দিগকে প্রদত্ত হইয়াছে। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয়ও সিংহাসনা-রোহণকালে পরলোকগতা মহারাণীর প্রতিজ্ঞা-পালন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু রাজপুরুষগণের কুটিলতায় আমরা বিগত দেড় শত বৎসর কাল এই সকল স্বত্বে বঞ্চিত আছি।

এদেশে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-কালে ও উত্তেজিত জনসমাজকে শান্ত করি-বার সময় ইংরাজ এদেশবাসীকে যে সকল অধিকার-দানের আশ্বাস দিয়া-ছিলেন, কার্য্যকালে কখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করেন নাই; এবং লর্ড সল্‌সবরির ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও ঐ সকল প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস-বাক্যকে political hypocrisy বা রাজনীতিক কপটতা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ক্ষমতা-প্রিয় রাজ-পুরুষ-দিগের ঐরূপ কপটতায় কখনও আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন-লাভের অধিকার বিলুপ্ত হইতে পারে না। রাজা ঈশ্বরের নামে শপথ-পূর্ব্বক আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, যে স্বায়ত্ত-শাসন-লাভ মনুষ্যমাত্রেরই ঈশ্বর-দত্ত স্বাভাবিক অধিকার, যে স্বায়ত্ত-শাসনের অভাবে মনুষ্য কখনই সুখী হইতে পারে না বলিয়া সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডমহোদয়ও স্বীকার করিয়াছেন, তাহা লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতেই হইবে। চেষ্টার অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। সুতরাং আমাদিগের ন্যায্য, রাজ-বিধি-সঙ্গত ও ঈশ্বর-দত্ত অধিকার প্রাপ্তির জন্য যদি আমরা ত্রিশকোটি ভারতবাসী

কায়-মনোবাক্যে চেষ্টা করি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে আমাদিগের সে চেষ্টা ফলবতী হইবে, দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার অবসান হইবে।

কিন্তু রাজ-দত্ত সনন্দ-পত্রে, ১৮৩৩ সালের পার্লামেণ্ট সভার প্রণীত বিধানে ও ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণা-পত্রে আমরা যে সকল অধিকার পাইয়াছি, যে সু-শাসনের আশ্বাস পাইয়াছি, তাহা দেশের অনেকেই সম্যক্ অবগত নহেন। তাই আমরা সেই সকল অধিকারে বঞ্চিত হইয়া অবনতির খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি। বৃটিশ ভারতের সকল প্রজা,—অতি নিম্নশ্রেণীর প্রজা পর্য্যন্ত,—যাহাতে আমাদের রাজ-দত্ত প্রকৃত অধিকারের বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া, সে অধিকারের পূর্ণফল লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, দেশের প্রত্যেক সু-সন্তানকে সে চেষ্টা করিতে হইবে। অজ্ঞতার জন্যই এতদিন আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু বহুদিন পূর্ব্বে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই,—

"সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না, সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই। * * * * বাঙ্গালায় ছয় কোটী ষাটি লক্ষ (এখন প্রায় ৮ কোটী) লোকের দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় লোক-শিক্ষা নাই।" [বঙ্গদর্শন ১২৮৫ সাল, অগ্রহায়ণ সংখ্যা—"লোক-শিক্ষা" প্রবন্ধ]

শ্রদ্ধেয় নৌরোজী মহাশয় বলেন, এই কার্য্যের জন্য একটি ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার অর্থে ভারতের প্রতি গ্রামে রাজনীতিক প্রচারক প্রেরণ করা উচিত। এই প্রচারকেরা গ্রামে গ্রামে গিয়া দেশের অজ্ঞ জনসাধারণকে কংগ্রেসের পরিচয়, দেশের দুরবস্থা, তাহা নিবারণের উপায় ও তাহাদের ন্যায্য অধিকার প্রভৃতি-বিষয়ক তত্ত্ব-সমূহ বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন। ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে এইরূপে স্বরাজ্য বা স্বায়ত্ত-শাসন-লাভের বাসনা জাগরূক ও বলবতী করিয়া, সেই বাসনার বিষয় ইংলণ্ডের রাজপুরুষদিগকে জ্ঞাপন করিবার ব্যবস্থা করিতেও নৌরোজী মহোদয় উপদেশ দিয়াছেন। ইংরাজ যদি নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারেন যে, ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, স্বায়ত্ত-শাসন লাভ না করিলে তাহাদের আকাঙ্ক্ষার ও ক্লেশের কিছুতেই নিবৃত্তি হইবে না, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ অধিকার প্রদান করিতে অবশ্যই প্রস্তুত

হইবেন। একবার প্রকৃতি-পুঞ্জের আশা ও আকাঙ্ক্ষায় উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া ইংরাজ আমেরিকায় বিষম ঠকিয়াছেন; ভারতে যে আবার তাঁহারা ঐরূপে ঠকিতে প্রস্তুত হইবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

পরলোকগত ডিগ্‌বী মহোদয় গত ১৯০৪ সালের জুন মাসে লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান সোসাইটিতে বক্তৃতা-কালে বলিয়াছিলেন,—

I say again, India might obtain Philipino self-government within ten years from now. But how? By every Indian throwing himself whole-heartedly into the struggle, by exhibition of a like energy to that which the Japanese have exhibited in obtaining their present position.

অর্থাৎ আমি আবার বলিতেছি যে, ফিলিপাইন দ্বীপবাসীরা যেরূপ স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিয়াছে, ভারতবাসী সেইরূপ স্বায়ত্ত-শাসন অদ্য হইতে দশ বৎসরের মধ্যেই প্রাপ্ত হইতে পারে। তবে সে জন্য অবশ্যই প্রত্যেক ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত শাসন-লাভ-মূলক আন্দোলনে যোগদান করিতে হইবে, জাপানীরা তাহাদের বর্তমান অবস্থা লাভ করিবার জন্য যেরূপ কায়-মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াছিল, প্রত্যেক ভারতবাসীকে সেইরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

ফল কথা, এক্ষণে যাহাতে দেশবাসীর বর্তমান অজ্ঞতার নিরাকরণ হয়, দেশের আপামর জনসাধারণে আপনাদিগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে, প্রতীকারের চেষ্টায় সকলে সাগ্রহে জাতীয় মহাসমিতির সহিত যোগদান করিতে পারে, স্বরাজ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা যাহাতে সকলের হৃদয়ে প্রবল হয়, রাজপুরুষেরা যাহাতে মুষ্টিমেয় আন্দোলনকারী বলিয়া আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষায় উপেক্ষা প্রকাশ করিতে না পারেন, তাহার উপায় অবলম্বনই আমাদের কর্তব্য। এই সুমহান্ পবিত্র কর্তব্য-সাধনে উৎসাহ-প্রকাশ না করিয়া যাঁহারা জাতীয় মহাসমিতির প্রতি উপহাস বা উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা দেশের শত্রু বলিয়া সুধী-সমাজের ঘৃণা-ভাজন হইবেন।

যাঁহারা জাতীয় মহাসমিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এস্থলে আলোচনা করা অনাবশ্যক। তবে যাঁহারা মহাসমিতির কার্য্য-প্রণালীর পরিবর্তন কামনা করেন, প্রাচীন কার্য্য-পদ্ধতির প্রতি যাঁহাদের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহাদের বক্তব্যে সকলেরই মনোযোগ করা উচিত। এই নব্য তন্ত্রের স্বদেশ-সেবকদিগের মধ্যে এক-জনের মন্তব্য যুক্তি-সঙ্গত-বোধে এস্থলে আংশিক উদ্ধৃত হইল,—

রাজার কার্য্যের সমালোচনা করিয়া বা তাঁহাকে উপদেশ দিয়াই পর-পদানত জাতির রাজনীতিক কর্ত্তব্য শেষ হয় না। রাজনীতিক আন্দোলন যে রাজনীতিক শিক্ষার একটি প্রধান উপায়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। আর কিছুর জন্য না হইলেও, এই শিক্ষার জন্যই রাজনীতিক আন্দোলন প্রয়োজন। তবে আমাদের কথা এই যে, কেবল ইহাতেই যেন আমাদের শক্তিসামর্থ্য নিঃশেষিত হইয়া না যায়, বা যেন ইহাকেই আমরা সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে না করি। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য। আমাদের রাজনীতিক প্রস্তাবগুলি যেন সর্ব্বদাই respectfully request করিয়াই কৃতার্থ না হয়, সময়ে সময়ে যেন firmly demand করিতেও সাহসী হয়। কেন না, যে দাবী করিতে অসমর্থ, তাহার অনুরোধ অর্থহীন। আমরা কংগ্রেসের বিরোধী নহি। ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস অনেক মহৎকার্য্য সাধন করিয়াছে। আমরা কেবল তাহার কার্য্য-প্রণালীর আংশিক পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করি। যে খাদ্য পাঁচ বৎসরের শিশুর পক্ষে পর্য্যাপ্ত, কুড়ি বৎসরের যুবকের তাহাতে চলিবে কেন? * * * আমরা চাই যে, রাজনীতিক অধিকার-লাভের জন্য কেবল অনুরোধ না করিয়া দাবী করিতে হইলে, পশ্চাতে যে শক্তির প্রয়োজন, কংগ্রেস এখন সেই শক্তি-সাধনে ব্রতী হউন। এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কংগ্রেসের প্রাচীন কার্য্যপ্রণালীর ও প্রস্তাব-সমূহের সংস্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কংগ্রেস শিল্প-প্রদর্শনীকে স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া ইতঃপূর্ব্বেই সময়ের গতির অনুসরণ করিয়াছেন। আমরা আরও অগ্রসর হইতে বলিতেছি। জাতীয় জীবন-স্রোতের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইলে কংগ্রেসের মতেরও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে। কারণ, পঞ্চবিংশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমাদের অনেক শিক্ষা হইয়াছে। "ভারতের প্রজানীতি" শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ-প্রণীত (নব্যভারত, ভাদ্র ১৩১২ সাল)

এই প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্র বাবু সাধারণ জন-মণ্ডলীর মধ্যে রাজনীতিক শিক্ষার প্রচার-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন,তাহারও একাংশ উদ্ধারের যোগ্য।

"সাধারণ শিক্ষা প্রচারিত না হইলে, রাজনীতিক শিক্ষা প্রচারিত হইতে পারে না, বা সাধারণ জনমধ্যে স্বদেশ-প্রীতি জাগ্রৎ হইতে পারে না, একথা আমরা আদৌ বিশ্বাস করি না। কথকতা প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ জনমণ্ডলীর মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মের অতি উচ্চ উচ্চ কথা সর্ব্বদা প্রচারিত হইতেছে, লোকে তাহা ধারণা করিতেছে ও তদনুসারে কার্য্য করিতেছে, তাহাতে তাহাদের কোনই কষ্ট-বোধ হইতেছে না; আর অন্নবস্ত্রের কথা, সাধারণ সুখদুঃখের কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলে যে, তাহারা বুঝিতে পারিবে না, ইহা অতি অসার কথা। জীবন সংগ্রাম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা কে না বুঝে? সংপ্রতি গ্রামে গিয়াছিলাম। সর্ব্বসাধারণকে ডাকিয়া আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম, সে চেষ্টায় আশাতিরিক্ত ফল হইল। লোকে যখন দুঃখ কষ্টের কোনও কারণ হাতের কাছে না পায়, তখন অদৃষ্টের দোহাই দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে; কিন্তু বুঝাইয়া দিলে

বুঝিতে একমুহূর্ত্ত দেরী হয় না। আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, এমন চাষা নাই, যাহাকে বছরের শেষে এক মাস, দুই মাস বা তিনমাস কিনিয়া খাইতে না হয়। অতি-বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নাই, তবু এই দুর্ভিক্ষ কেন? সাধারণ প্রজা কারণ খুঁজিয়া পায় না বলিয়া অদৃষ্টের দোহাই দেয়। কিন্তু কারণ যে অদৃষ্ট নয়,—দৃষ্ট, এ লীলা যে দৈবী নহে, মানুষী ও নিবার্য্য, ইহা যখন বুঝাইয়া দেওয়া হইল, তখন যেন অনেকের বুকের একটা ভার কমিয়া গেল। এই দুঃখ দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য যখন তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করা যাইবে, তখন তাহারা আগ্রহের সহিত সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে, অন্য কোনও শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজন হইবে না। দুঃখের কারণ কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়া নীলকরের অত্যাচারের সময় যে প্রজা কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে পারিয়াছিল, প্রয়োজন হইলে তাহারা অত্যাচার নিবারণের জন্য আবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারিবে না, তাহা কে বলিল? যাহাদের তুলনা করিবার শক্তি আছে, তাহারা সাধারণ ভাবে বুঝিতে পারে যে, দৈন্যের কারণ অদৃষ্ট নহে। কিছু দিন পূর্ব্বে কটকের একজন শতায়ুঃ মৎস্য-জীবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—মারহাট্টা আমল ভাল ছিল, না, ইংরাজ আমল ভাল? বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—বাবু! বাবার কাছে শুনেছি, দুই পয়সার দুধ ঘিতে তখন ভাসিয়া যাইত; এখন দু'মাসে একটু দুধের মুখ দেখ্‌তে পাই না। উড়িষ্যায় মারহাট্টা আমল শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই বৃদ্ধের জন্ম হইয়াছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, এরূপ কেন হইল? বৃদ্ধ বলিল,—কোম্পানী সব লুটে নিয়ে গেল। এখন কোম্পানী কিরূপে লুটে নিয়ে গেল, তাহা বুঝাইয়া দিলে ইহারা বুঝিবে না, এবং ঐ লুট নিবারণের জন্য সাহায্য চাহিলে তাহারা সাহায্য করিবে না কেন, আমরা তাহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাই না। আমরা চেষ্টা করিতেছি না, তাই এই অনর্থ। * * *

সাধারণ প্রজামণ্ডলী যদি স্বদেশের হিত-কল্পে শিক্ষিতমণ্ডলীর সঙ্গে যোগ দেয়, তবে আর শিক্ষিতমণ্ডলীকে "বালানাং রোদনং বলম্" এই নীতির অনুসরণ করিতে হইবে না। কংগ্রেস এই নিদ্রা-ভঙ্গের উদ্যোগ করুন। ইংলণ্ডে Political deputation না পাঠাইয়া, সাধারণ প্রজামণ্ডলীকে রাজনীতিক সমাচার প্রদান করিবার জন্য দেশ-ব্যাপী আয়োজন করিতে পারিলে অল্প ব্যয়ে কোটিগুণ বেশী কাজ হইতে পারিবে।"

মাননীয় গোখলে মহোদয়ও তাঁহার এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় বলিয়াছেন, আমাদিগকে দশভাগের নয়ভাগ কার্য্য স্বদেশে থাকিয়া ও একভাগ কার্য্য বিলাতে গিয়া সাধন করিতে হইবে। সে যাহা হউক, আর একটি গুরুতর বিষয়ে ধীরেন্দ্র বাবু জাতীয় মহাসমিতির নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সর্ব্বাগ্রে গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য-সমিতি স্থাপন করা আবশ্যক।"

আমরা বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করিতেছি, কিন্তু ধীরে ধীরে যে আর এক অনর্থের সূত্রপাত হইতেছে, সে বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করিতেছি না। স্যাভেজ

সাহেবের পঞ্চায়েত পুনর্গঠন-রূপ শক্ত শাসনের শক্তিশেল যে আমাদের গ্রামের বুকেই বসাইবার আয়োজন হইতেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের রাজনীতিক নেতৃগণ এত উদাসীন কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদেশী রাজা যে পরিমাণে আমাদের ভিতরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন, সেই পরিমাণে দেশের অধোগতি ও বন্ধন হইবে। এই সংস্কৃত পঞ্চায়েৎ, আমাদের বন্ধন ও দাসত্বের পূর্ণতা সম্পাদন করিতে যাইতেছে। দেশে যদি কিছু তেজ, বীর্য্য থাকে, যদি কিছু স্বাবলম্বন ও নির্ভীকতা থাকে, তবে তাহা গ্রামেই আছে। তাহারও মূলোৎপাটন করিয়া জাতীয় জীবনকে ভিত্তিশূন্য করিবার আয়োজন হইতেছে। সময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে রোগ দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিবে। গ্রাম্য সমিতি (Village union) সকল স্থাপন করিয়া কোথায় আমরা এখন স্বায়ত্ত-শাসনের সম্প্রসারণ করিব, না, যে টুকুও ছিল, তাহারও উচ্ছেদের আয়োজন হইতেছে। আমাদের রাজনীতিক নেতাগণ সচেষ্ট হউন, যাহাতে গ্রাম্য সমিতি সকল স্থাপিত হইয়া এই সরকারী পঞ্চায়তের স্থান পূর্ব্ব হইতেই অধিকৃত হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন।"

এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার—"অবস্থা ও ব্যবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—

এক সময়ে পঞ্চায়েৎ আমাদের দেশের জিনিষ ছিল, এখন পঞ্চায়েৎ গবর্ণমেণ্টের আপিসে গড়া জিনিষ হইতে চলিল। যদি ফল বিচার করা যায়, তবে এই দুই পঞ্চায়তের প্রকৃতি একেবারে পরস্পরের বিপরীত বলিয়াই প্রতীত হইবে। যে পঞ্চায়তের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃপ্রদত্ত নহে, যাহা গবর্ণমেণ্টের দত্ত, তাহা বাহিরের জিনিষ হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একটা অশান্তির মত চাপিয়া বসিবে—তাহা ঈর্ষার সৃষ্টি করিবে—এই পঞ্চায়ৎ পদ লাভ করিবার জন্য অযোগ্য লোকে এমন সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে, যাহাতে বিরোধ জন্মিতে থাকিবে—পঞ্চায়ৎ, ম্যাজিষ্ট্রেট্-বর্গকেই স্বপক্ষ এবং গ্রামকে অপরপক্ষ বলিয়া জানিবে, এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বাহবা পাইবার জন্য গোপনে বা প্রকাশ্যে গ্রামের বিশ্বাস-ভঙ্গ করিবে। ইহারা গ্রামের লোক হইয়া গ্রামের পরের কাজ করিতে বাধ্য হইবে এবং যে পঞ্চায়েৎ গ্রামের বল-স্বরূপ ছিল, সেই পঞ্চায়েতই গ্রামের দুর্ব্বলতার কারণ হইবে। ভারতবর্ষের যে সকল গ্রামে এখনও গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রভাব বর্ত্তমান আছে, যে পঞ্চায়ৎ কাল-ক্রমে শিক্ষার বিস্তার ও অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে স্বভাবতই স্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে পারিত—যে গ্রাম্য পঞ্চায়েৎগণ একদিন স্বদেশের সাধারণ কার্য্যে পরস্পরের মধ্যে যোগ বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এমন আশা করা যাইত, সেই সকল গ্রামের পঞ্চায়েৎগণের মধ্যে একবার যদি গবর্ণমেণ্টের বেনো-জল প্রবেশ করে, তবে পঞ্চায়েতের পঞ্চায়তত্ব চিরদিনের মত ঘুচিল। দেশের জিনিষ হইয়া তাহারা যে কাজ করিত, গবর্ণমেণ্টের জিনিষ হইয়া তাহার সম্পূর্ণ উল্টা রকম কাজ করিবে।" বঙ্গদর্শন (নব-পর্য্যায়)।

সুখের বিষয়, এদিকে এক্ষণে দেশের নেতৃবর্গের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে।

ভারত-হিতৈষী হিউম সাহেব কংগ্রেসের বিগত ১৯শ অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজনীতিক অধিকার-লাভের উপায় সম্বন্ধে ভারতবাসীকে যে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও প্রত্যেকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"তোমরা কি মুহূর্ত্তের জন্যও মনে কল্পনা কর যে, কোনও রাজশক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাদিগকে রাজনীতিক অধিকার প্রদান করিবেন? যে সকল অধিকার তোমাদিগকে প্রদান করিলে শক্তি-প্রিয় শাসকদিগের শক্তির হ্রাস ঘটে, ন্যায়ের হিসাবে তোমাদিগের সহস্র দাবী থাকিলেও কি গবর্ণমেণ্ট সে সমুদায় সহজে ছাড়িবেন? যে ক্ষমতা ত্যাগ করিলে রাজজাতীয় ব্যক্তিগণ উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত হইবেন, তাহা রাজপুরুষেরা সহজে ত্যাগ করিবেন না। তোমরা কি স্বপ্নেও ভাব যে, ঔদারনীতিক বা অন্য কোনও গবর্ণমেণ্ট কেবল ন্যায়-ধর্ম্মের অনুরোধে তোমাদিগের দুঃখ বিমোচনে অগ্রসর হইবেন? এরূপ অলীক চিন্তায় কদাপি আত্ম-বঞ্চনা করিও না। ভারতে এবং বিলাতে অবিশ্রান্ত ভাবে অদম্য অধ্যবসায় ও উৎসাহ সহকারে আন্দোলন করিতে হইবে। এইরূপে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গবর্ণমেণ্টকে যদি ক্রমাগত উত্ত্যক্ত ও জ্বালাতন করিতে পার, তবেই তোমাদিগের ইষ্টসিদ্ধির পথ প্রসারিত হইবে। রাজনীতিক আন্দোলনের সুফলে আমার অবিশ্বাস নাই, কিন্তু তোমরা যেরূপ ঔদাসীন্য সহকারে আন্দোলন কর, তাহাতে কিছুই হইবে না। আন্দোলনে একাগ্রতা অবলম্বন কর, ভারতে সংবৎসর ব্যাপিয়া কংগ্রেসের আন্দোলন প্রদীপ্ত রাখ, কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রূভঙ্গীতে ভীত হইও না। প্রাণপণে ইংরাজ জাতির হৃদয়ে এই ধারণা অঙ্কিত কর যে, তোমরা যাহা ধরিয়াছ, তাহা ছাড়িবে না, তোমাদিগের প্রার্থনার পূরণ না হইলে, ইংরাজ জাতিকে তোমরা এক দিনের জন্যও বিশ্রাম দিবে না। জগতের সমক্ষে প্রতিপন্ন কর যে, তোমরা সময়, অর্থ, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত পাত করিয়া সংকল্প-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কার্য্য দ্বারা আপনাদিগের যোগ্যতা প্রতিপাদন কর। দেখিবে, গ্রীষ্মাগমে তুষারের ন্যায় তোমাদিগের উন্নতি-পথের কণ্টক তিরোহিত হইয়াছে।

"তোমাদিগের উন্নতি তোমাদিগেরই চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা সমস্ত সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত মতভেদ বিস্মৃত হও, পরস্পকরে

বিশ্বাস কর ; ভণ্ডামি ও কপটতা পরিত্যাগ কর ; সকলে এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও ; রাত্রিদিন ভুলিয়া এক মনে, এক ধ্যানে উদ্দেশ্য-সাধন-পথে অগ্রসর হও ; অবিচলিত, অক্ষুব্ধ ও অসন্দিগ্ধচিত্তে কার্য্যে ব্যাপৃত হও ; দেখিবে, তোমাদিগের কামনা আশু পূর্ণ হইবে। এক্ষণে তোমাদিগের আন্দোলনে যে একাগ্রতা ও আন্তরিকতার অভাব প্রবল রহিয়াছে, তাহা দূরীভূত না হইলে কিছুই ফললাভ হইবে না।

"অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্টের ন্যায় তোমাদের গবর্ণমেণ্টও আপনাকে সর্ব্ববিষয়ে সমধিক জ্ঞানবান্ ও শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া কখনই তোমাদিগকে এক তিলার্দ্ধ অধিকার প্রদান করিবেন না, বরং প্রদত্ত অধিকারের উত্তরোত্তর সঙ্কোচ-সাধনেরই প্রয়াস পাইবেন। যে দেশে প্রজা-শক্তি হীন-বল, সে দেশে রাজ-শক্তির এইরূপ ব্যবহারই ঘটিয়া থাকে ! রাজ-শক্তির এরূপ অত্যাচার-নিবারণে প্রজা-সাধারণের সর্ব্বদা চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রজারা যদি রাজার অবিচার বন্ধ করিতে না পাবে, তবে সে দোষ প্রজাদিগের—রাজার নহে, একথা তোমরা মনে রাখিও।"

বিগত ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের প্রারম্ভে মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে বিলাত হইতে বিদায় দান-কালে মিঃ ওডোনেল সাহেব এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তির একাংশ এই—

"বিধি-সঙ্গত উপায়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের গলা টিপিয়া ধরিবার কোনও প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারিলে, রাজ-শক্তির নিকট হইতে ভারতবাসীর কখনই কোনও অধিকার পাইবার আশা নাই, একথা আপনি (গোখলে মহাশয়) আপনার দেশের লোকদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিবেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতীকার-কল্পে যে বিলাতী-পণ্য-বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞায় আপনারা আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহা রোগের উপযুক্ত ঔষধ-স্বরূপ হইয়াছে। আপনারা কিছুকাল এই বিলাতী-পণ্য-বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা স্থায়ী করিতে পারিলে ভারতীয় শাসন-পদ্ধতির আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ইংলণ্ডবাসীর হৃদয়ঙ্গম হইবে।"

মিঃ হিউম ও ওডোনেল সাহেবের এই উপদেশ আমাদের দেশের অনেক বিজ্ঞতাভিমানী ব্যক্তি অদ্যাপি গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। গবর্ণমেণ্ট চটিবেন, এই ভয়েই ইঁহারা অস্থির কিন্তু

রাজপুরুষদিগের অকারণ বিরক্তির ভয়ে কি আমাদিগকে বৃটিশ প্রজার ন্যায্য অধিকার হইতে চিরকাল বঞ্চিত থাকিতে হইবে? রাজপুরুষদিগের অবৈধ কার্য্যাবলীতে প্রশ্রয় দিয়া কি আমরা এই বিশাল ভারতভূমিকে প্রকৃতই মহাশ্মশানে পরিণত হইতে দেখিব? "অন্ন-চিন্তা" কিরূপ "চমৎকারা", তাহা যাঁহাদিগকে নিত্য অনুভব করিতে হয় না, তাঁহারা দেশের দশ-কোটি অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট, ও রোগ-শোক-প্রপীড়িত লোকের যন্ত্রণা বা পরিণাম সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা স্বয়ং সে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, যাহারা "বুকের রক্ত মুখে উঠা" পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও শিশুসন্তানদিগের মুখে দুই বেলা দুই গ্রাস অন্ন দিতে পারিতেছে না, অথচ যাহাদের উপার্জ্জনের অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ-পোষণে ও বৈদেশিক বণিক্‌দিগের ধন-ভাণ্ডারের পুষ্টিবিধানে ব্যয়িত হইতেছে, তাহারা রাজপুরুষদের অকারণ রক্ত চক্ষুঃ দেখিয়া কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচ্যুত হইবে কেন? রাজা আমাদিগকে যে অধিকার দিয়াছেন, তাঁহার নায়েব ও গোমস্তারা তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ-সাধনে অগ্রসর হইলে আমরা তাহা নীরবে সহ্য করিব কেন? যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে বিধি-সঙ্গত উপায়ে আমাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করিবার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতেই হইবে।

ভারতবর্ষে যে প্রকার শাসন-নীতির অবলম্বন করিলে কালে ভারতীয় প্রজা স্বরাজ্য বা স্বায়ত্ত-শাসন-লাভের যোগ্য হইতে পারিবে, সেইরূপ শাসন-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে ভারতীয় ইংরাজ রাজপুরুষেরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য, একথা পৃথিবীর সকল সভ্য জাতিই অবগত আছেন। তাই কিছু দিন পূর্ব্বে ষ্ট্রেট সেটেল্‌মেণ্টের ইংরাজ শাসন-কর্ত্তা স্যার এণ্ড্রু ক্লার্ক মহোদয়কে আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী বোষ্টন নগরের মিঃ মুরফীল্ড ষ্টোরে একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

Have these centuries of British rule brought the Indian people any nearer to self-government than they were when British rule began?

অর্থাৎ এই দেড়শত বৎসরের বৃটিশ শাসন ভারতবাসীকে কিয়ৎপরিমাণেও স্বায়ত্ত-শাসন-লাভের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে কি? উত্তরে স্যার এণ্ড্রু ক্লার্ক বলিলেন, "বৃটিশ শাসনাধীন থাকিয়া ভারতবাসী এক

তিল পরিমাণও (Not a bit) স্বায়ত্ত-শাসন-লাভ করিতে পারে নাই।" এই উত্তর শুনিয়া অনেক সহৃদয় ইংরাজের হৃদয়ে লজ্জার সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় রাজপুরুষেরা বলেন যে, "ভারতবাসী শিক্ষা-দীক্ষায় ও মানসিক বলে এরূপ হীন যে, তাহাদিগকে এখনও দীর্ঘকাল স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার প্রদান করা যাইতে পারিবে না। অগ্রে ভারতবাসী যোগ্যতা লাভ করুক, তাহার পর তাহাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে।" কিন্তু "আগে সাঁতার শিখুক, তাহার পর জলে নামিতে দেওয়া হইবে" বলাও যেরূপ সঙ্গত, ভারতীয় রাজপুরুষগণের এই যুক্তিও সেইরূপ সমীচীন, একথা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। জলে নামিতে না দিলে যেরূপ সন্তরণ শিক্ষা করা যায় না, সেইরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে ক্ষমতা-পরিচালনের শক্তিও লাভ করিতে পারা যায় না। তাই মহামতি গ্লাডষ্টোন বলিতেন,—

It is liberty alone which fits men for liberty.

গত ১৯০৭ সালে বিলাতে ঔপনিবেশিক প্রতিনিধিদের যে সম্মিলন-সভা হইয়াছিল, তাহাতে ইংলণ্ডের নিকট হইতে স্বদেশবাসীর জন্য স্বতন্ত্র নৌ-সেনা-বিভাগ প্রতিষ্ঠার অধিকার-প্রার্থনা-কালে অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডিকিন মহোদয় বলিয়াছিলেন যে,—

They could not have manhood without the responsibilities of manhood.

ভাবার্থ এই যে, মনুষ্যোচিত দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে কাহারও মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইতে পারে না। আর একজন মনীষী বলিয়াছেন,—

Liberty is the best educator. Its atmosphere is pure and bracing, through which the lark of genius sores high beyond the reach of the shafts of despotism and clouds of ignorance.

স্বাধীনতাই মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক। স্বাধীনতার সংস্পর্শ অতি পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর। স্বাধীন অবস্থায় মনুষ্যের প্রতিভা যথেচ্ছাচারের বন্ধন ও অজ্ঞতার ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া অনন্ত উন্নতির পথে ধাবিত হইয়া থাকে।

ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসন-দানের, বিশেষতঃ ভারতীয় রাজকোষ হইতে অর্থব্যয়-কালে ভারতবাসীর মতামত গ্রহণের প্রস্তাব মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যার চার্লস ট্রিভেলিয়ন মহোদয় ১৮৭২ সালের অনুসন্ধান সমিতির সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই। ট্রিভেলিয়ান মহাশয় তৎকালে বলিয়াছিলেন,—

Give them the raising and spending of their own money, and the motive will be supplied, and life and reality will be imported into the whole system. All would act under real personal responsibility, under the eye of those who would be familiar with all the details and would have the strongest possible interest in maintaining a vigilant control over them. And it would be a school of Self-Government for the whole of India—the longest step yet taken towards teaching its 200,000,000 of people to govern themselves, which is the end and object of our connection with that country,

ভাবার্থ এই যে, ভারতবাসীকে কর-স্থাপন ও স্বদেশীয় রাজ-কোষের অর্থ ব্যয় করিবার অধিকার প্রদান করিলে উহার সদ্ব্যবহার করিবার বুদ্ধি তাহাদিগের মধ্যে আপনি আসিয়া যোগাইবে এবং সমগ্র সমাজে প্রাণ-স্ফূর্ত্তি হইবে, সমাজ আপনার প্রকৃত অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। সকলেই ব্যক্তিগত দায়িত্ব বুঝিয়া কার্য্য করিবে। অবশ্য যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের অধীন থাকিয়া অবশিষ্ট সকলকে কার্য্য করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্ত্তিত হইলে উহা বিংশতি কোটি প্রজার স্বায়ত্ত শাসন শিক্ষার বিদ্যালয় বা সোপান স্বরূপ হইবে। বলা বাহুল্য যে, ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসন-বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তোলাই ভারতের সহিত আমাদিগের বর্ত্তমান সম্বন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

পার্লামেণ্টের অনুসন্ধান সমিতির সমক্ষে এই মন্তব্য প্রকাশিত হইবার পর ৩৬ বৎসর অতীত হইল; কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে প্রজাকে রাজকোষের অর্থব্যয়-বিষয়ে কোনও প্রকার অধিকারই প্রদত্ত হয় নাই। এখনও রাজপুরুষেরা প্রজার মতামত না লইয়াই যথেচ্ছভাবে প্রজার অর্থের অপব্যয় করিয়া থাকেন।

আমাদের রাজপুরুষেরা বলেন যে, ভারতবর্ষে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি সামান্য; এই কারণে ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষমতা প্রদত্ত হইতে পারে না। লর্ড রে বিগত ১৯০৬ সালের ১১ই জুলাই লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে সভাপতি-রূপে বক্তৃতা-কালে বলেন,—

Self-Government in England and the Colonies is the result of compulsory and general education. The masses in India are not fit to exercise the voting power . and until they are, I will strongly depricate an attempt to govern India on principles of self-government which is applied to races in a totally different stage of development.

ভাবার্থ এই যে,—ইংলণ্ডে ও উপনিবেশসমূহে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অত্যন্ত বিস্তারের ফলেই স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতের জনসাধারণ, শিক্ষার অভাবহেতু, প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের ক্ষমতা পরিচালন করিবার যোগ্য নহে। যতদিন সে যোগ্যতা তাহারা না লাভ করে, ততদিন ভারতে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না।

লর্ড রে মহোদয়ের এই উক্তি আদৌ সত্য নহে; ইতিহাস-পাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন যে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লণ্ডন সহরের তিন চতুর্থাংশ বালক বিদ্যালয়ে গমন বা কোনও প্রকার শিক্ষাই লাভ করিত না। রাজধানীর অবস্থাই যখন এইরূপ ছিল, তখন ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম-সমূহের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের রাজত্বকালে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র ইংলণ্ডে যখন ৩৫৯টির অধিক বিদ্যালয় ছিল না, তখনও ইংলণ্ডবাসী "হাউস অব কমন্‌স" মহাসভা বা সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন-লাভ করিয়াছিল, এ তত্ত্ব আমাদিগের অগোচর নহে। পক্ষান্তরে কিউবা, ফিলিপাইন ও লাইবেরিয়া প্রদেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা ভারতবাসী শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতায় কোনও অংশে হীন নহে,—একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তথাপি ঐ সকল প্রদেশের লোক মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল অধিকার পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা সে সকল অধিকার লাভের যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছি না। পশ্চিম আফরিকার অন্তর্ভুক্ত লাইবেরিয়া নামক প্রদেশের নিগ্রোরা ২৫ বৎসর কাল আমেরিকার শাসনাধীন থাকিয়া প্রজাতন্ত্র-মূলক শাসন-প্রণালী (republic) লাভ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিল এবং ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে আপনাদিগের স্বাধীন-তন্ত্রের ঘোষণা করিল; আর ১৫০ বর্ষব্যাপী বৃটিশ-শাসনের পরও ভারতবাসী বড় লাট বাহাদুরের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সদস্য-পদগ্রহণের পর্য্যন্ত উপযুক্ত হইল না! ইহা কি বৃটিশ শাসন-প্রণালীর দোষ, শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদিগের কুটিলতা, অথবা ভারতবাসীর শিক্ষা, দীক্ষা ও কার্য্যদক্ষতার অভাবের পরিচায়ক? ভারতবাসী কি লাইবেরিয়ার নিগ্রোদিগের অপেক্ষাও মানসিক শক্তিতে হীন? যদি তাহাই হয়, তবে যে স্যার আর্থর কটনের নাম ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার-শ্রেণীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, সেই আর্থর কটন জলপূর্ত্ত ও স্থাপত্য বিদ্যা বিষয়ে ভারতবাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন কেন? *

* "The natives have shown practical talent (in Engineering), and on the main point of all, that of irrigation, nothing can be better than the ancient irrigation works of Southern India. *In fact they have been a model to ourselves.* Sir Arthur Cotton is merely an *imitator* on a grand scale and with considerable personal genius, of the ancient native Indian Engineers." *Sir Charles Trevellyan* Report of 1873. Qeustion 1547.

লর্ড রে মহোদয় যাহাই বলুন, ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজনীতিক অধিকার লাভের পর সেখানকার প্রকৃতিপুঞ্জের মনে সাধারণ-শিক্ষা-বিস্তারের কল্পনা উদিত হয়। তাহার পর লোকের রাজনীতিক অধিকার যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাদিগের শিক্ষার বিস্তার-বাসনাও সেইরূপ বাড়িয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ইতিহাসেও অগ্রে রাজনীতিক অধিকার-লাভ ও তাহার পর শিক্ষার বিস্তারের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। প্রসিদ্ধ কোষকার ওয়েবষ্টার বলেন, "স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ-ঘোষণা করিবার কালেও মার্কিণ সমাজে শিক্ষকদিগের অবস্থা সামান্য কুলি মজুরের অপেক্ষা কোনও অংশে উন্নত ছিল না। শিক্ষকদিগের সংখ্যাও অতি অল্প ছিল। লোকেও শিক্ষকদিগের প্রতি শ্রমজীবীদিগের অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিত না।" শিক্ষা বিষয়ে সেকালের আমেরিকাবাসী অপেক্ষা যে বর্ত্তমান ভারতবাসী বহু উন্নত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি সেকালের মার্কিণ সমাজ ইংরাজের সহিত কলহে যখন জয়ী হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তখন আমরা শিক্ষা-দীক্ষায় তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বরাজ্য চালাইতে পারিব না, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

এ বিষয়ে সুবিজ্ঞ আনন্দমোহন বসু মহাশয় বিলাতী কৃষক-সমাজের সহিত এদেশের ঐ সম্প্রদায়ের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন,—

I have had, I think I may say, a fair amount of acquaintance with the English agricultural labourer with whom I have come into contact, and whom I have addressed in connection with several election meetings, and I know our ryots, at least in Bengal. And I have not the slightest hesitation in saying that whether in intelligence, sobriety or power of grasp over different questions, the average Indian ryot is superior to the average English labourer who delights in the possession of a vote. And for me quite unexpectedly, I have had the testimony of many Anglo-Indians whom I have met in England to the same effect.—*Open Letter to the Presedent of the 19th National Congress.*

অর্থাৎ ইংলণ্ডে অবস্থানকালে সেখানকার কৃষক-সমাজের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ঘটিবার সুবিধা হইয়াছিল। পার্লামেণ্টের সদস্য-নির্ব্বাচন-ব্যাপারে সভাসমিতি করিয়া তাহাদিগের সমক্ষে বক্তৃতা করিবার সুযোগও আমি কয়েকবার পাইয়াছিলাম। ভারতের, নিতান্ত পক্ষে, বঙ্গদেশের কৃষক সম্প্রদায়েরও সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে। এই উভয় দেশের কৃষকের তুলনা করিয়া আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডীয় কৃষি-সমাজ নির্ব্বাচনাধিকার লাভ করিয়াও ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায় অপেক্ষা

বুদ্ধিমত্তায়, গাম্ভীর্য্যে ও বিবিধ সমস্তার মর্ম্ম-গ্রহণ-শক্তিতেই নিকৃষ্ট। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেক ভারত-প্রবাসী ইংরাজও একথা স্বীকার করিয়া থাকেন।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ব্রায়ান্ সাহেবও ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ভারতবাসীর স্বরাজ্য-লাভের যোগ্যতা-প্রসঙ্গে এই কথাই লিখিয়াছেন,—

"There are enough informed, college-trained men in India, not to speak of those who like our own ancestors a few centuries ago have practical sense and good judgment without book learning to guide public opinion.

অর্থাৎ "ভারতে অভিজ্ঞ ও কলেজে শিক্ষিত লোক অনেক আছেন। তদ্ভিন্ন দেশের অশিক্ষিত লোকেরও বুদ্ধি বিবেচনা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষা ন্যূন নহে।" স্বরাজ্য-পরিচালনের যোগ্যতা ভারতবাসীর যথেষ্ট আছে, একথা ব্রায়ান সাহেব স্থানান্তরে স্পষ্টতই স্বীকার করিয়াছেন।

ভারতবাসীকে স্বরাজ্য-লাভের চেষ্টা হইতে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে একদল ইংরাজ বহুদিন হইতে আমাদিগকে বুঝাইতেছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে জাতিভেদ, ভাষাভেদ, ধর্ম্মভেদ, জন-সাধারণের অজ্ঞতা, সামাজিক কুসংস্কার ও নৈতিক বলের অভাব প্রভৃতি দোষ দূরীভূত না হইলে তোমরা কখনই স্বরাজ্য-লাভের যোগ্য হইতে পারিবে না। ঐ সকল গুরুতর দোষ ভারতীয় সমাজ হইতে দূরীভূত হইবার পূর্ব্বে যদি কোনরূপে ভারতবাসী ইংরাজের শাসন-পাশ হইতে মুক্তি-লাভ করে, তাহা হইলেও তাহারা সে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না। দার্শনিক পণ্ডিত জন মর্লিও সে দিন বলিয়াছেন, ভারতবাসীর হস্তে দায়িত্বপূর্ণ শাসনভার প্রদান করিলে তাহারা এক সপ্তাহকালও সে ভার বহন করিতে পারিবে না। কিন্তু ঐ সকল দোষ যে মার্কিণ জাতির স্বাধীনতা-লাভের পক্ষে আদৌ বিঘ্নকর হয় নাই, তাহা ইঁহারা বিস্মৃত হইয়া যান। শুদ্ধ মার্কিণ নহে, মহাত্মা শিবাজীর সময়ে মহারাষ্ট্রে ও মহাবীর গ্যারিবল্ডীর সময়ে ইটালীতেও ঐ সকল দোষ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল; তথাপি মহারাষ্ট্রে ও ইটালীতে সম্পূর্ণ স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র অসম্ভব হয় নাই। এ কথা অনেকেরই মনে থাকে না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

যে মার্কিণ জাতি আজ জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধন, সম্পত্তি, শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই জগতে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা যখন ইংলণ্ডের অধীনতাপাশ ছেদন-পূর্ব্বক স্বাধীনতা-লাভের জন্য

ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে উক্ত দোষাবলীর কিরূপ প্রাবল্য ছিল, তাহা মিঃ লেকি প্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাসের ৪র্থ খণ্ডে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। সে বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, সে কালের আমেরিকাবাসী শ্বেতাঙ্গদিগের অপেক্ষা এ কালের ভারতবাসী আমরা স্বরাজ্য-লাভ করিবার অধিকতর যোগ্য হইয়াছি। কথাটা অনেকের নিকট অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে পারে, এই জন্য সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশদ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ভারতবর্ষ নানা জাতির আবাস-স্থান এবং ঐ সকল জাতির মধ্যে নানাপ্রকার অনৈক্যও বিদ্যমান। আমাদের ইংরাজ প্রভুদিগের মতে ইহার জন্য ভারতবাসী স্বরাজ্য-লাভের অযোগ্য। কিন্তু খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার প্রায় সমসময়ে আমেরিকাবাসী শ্বেতাঙ্গদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল, শুনিবেন? ঐতিহাসিক লেকি বলেন, "বর্ত্তমান যুক্ত-রাজ্যের তদানীন্তন ইংরাজ বংশধরদিগের সহিত ডচ, জার্ম্মান, ফরাসী, সুইডিশ, স্কচ, আইরিশ প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক মিলিত হওয়ায় মার্কিণ সমাজ অত্যন্ত বিসদৃশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ঐ সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বৈচিত্র্য, সামাজিক রীতিনীতির বৈষম্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য-গত স্বার্থের বিরোধ ও শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য এরূপ অধিক ছিল যে, তাহাদিগের মধ্যে ঐক্য-সংঘটন কখনও সম্ভবপর হইবে, একথা কেহ রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।" (১২ পৃঃ)

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ বর্ণাবী নামক একজন ভ্রমণকারী আমেরিকার নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া মার্কিণ সমাজের তদানীন্তন অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—আমেরিকার বিভিন্ন জাতীয় ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে যেরূপ বিদ্বেষ ও কলহের বাহুল্য দৃষ্ট হইল, তাহা জল ও অগ্নির বিরোধ অপেক্ষাও গুরুতর বলিয়া বোধ হয়। তাহারা পরস্পরের প্রতি মাৎসর্য্য ও বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে। আপনাদিগের অধিকৃত ভূমিসমূহের সীমানির্দ্দেশ উপলক্ষে তাহাদিগের মধ্যে ঘন ঘন দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিয়া থাকে। রীতিনীতি, ধর্ম্ম-বিশ্বাস, স্বভাব-চরিত্র, হিতাহিত দৃষ্টি প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েই ইহাদিগের মধ্যে বিষম বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়। ঈদৃশ বৈষম্য-বিশিষ্ট মার্কিণ জাতিকে স্বাধীনতা দান করিলে দেশের

একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যান্ত অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হইবে এবং সেই অরাজকতার সুযোগে রক্তবর্ণ 'ইণ্ডিয়ান' ও কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোজাতি এই সকল পরস্পর-বিবদমান শ্বেতাঙ্গদিগকে সমূলে সংহার করিবে!"

আজকালকার এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান শাসক-সম্প্রদায়ের মুখে কি আমরা ঠিক এইরূপ উক্তি শুনিতে পাই না? অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখন আমাদের দেশের কোন কোন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি যেরূপ মনে করেন যে, আমরা অদ্যাপি স্বরাজ্য-লাভ করিবার যোগ্য হই নাই, সেকালে আমেরিকার কোন কোনও পণ্ডিত-মূর্খও সেইরূপই মনে করিতেন। ওটিস নামক একজন আমেরিকান দেশ-ভক্ত স্বাতন্ত্র্য-লাভের জন্য দেশবাসীর চাঞ্চল্য-দর্শনে ভীত হইয়া ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন,— "আমাদের মাতৃভূমি ইংলণ্ডের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিবার প্রবৃত্তি যেন এই সকল ঔপনিবেশিকদিগকে ভগবান্ কখনও না দান করেন। যদি কখনও ঔপনিবেশিকদিগের ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটে, তাহা হইলে এই উপনিবেশে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনের সূচনা হইবে। ঔপনিবেশিকেরা স্বাতন্ত্র্য-লাভ করিলে সমগ্র আমেরিকা শোণিত স্রোতে রক্তবর্ণ ধারণ করিবে, এই দেশ অরাজকতার লীলাভূমি হইবে।" (ক) বলা বাহুল্য, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়া দূরে থাকুক, ইংরাজের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া মার্কিণ জাতি আজ সভ্য জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে!

জাতিভেদের ন্যায় ভাষা-ভেদও মার্কিণদিগের স্বাতন্ত্র্য-লাভের পথে

(ক) ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমেরিকার অনেক লোকেরই এইরূপ ধারণা ছিল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে টমাস পেন নামক এক প্রতিভাবান্ লেখক "কমন সেন্স" নামক এক ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া জনসাধারণের এই ভ্রান্তি দূরীভূত করেন। তিনি এইমত প্রচার করেন যে, স্বাধীনতাই ঐক্য-লাভের একমাত্র পন্থা। স্বাধীনতা লাভে যত বিলম্ব ঘটে, স্বাধীনতা লাভ করা ততই দুষ্কর হইয়া উঠে। এতৎসম্বন্ধে এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা নামক বৃহদভিধানে এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—

Thomas paine turned the scale (jan 9. 1776) by the publication of his Pamphlet *Common Sense*. His argument was that independence was the only consitent line to pursue ; that "it must come to that some time or other" ; that it would only be more difficult the more it was delayd ; and that independuce was the surest road to union. Written in simple language, it was read everywhere, and open movement to independence dates from its publication.—*Encyclopædia Britannica*—United States pp 742. (9th Ed.)

বিঘ্নকর হয় নাই। ঐতিহাসিক লেকি বলেন, "নিউ ইয়র্ক ও তন্নিকট-বর্ত্তী প্রদেশসমূহে সেকালে ১৮টি বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল এবং এখনও যুক্তরাজ্যে ১২।১৩টি পৃথক্ ভাষা প্রচলিত আছে।" (১৮ পৃঃ) পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় অবগত নহেন যে, যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট-নির্ব্বাচনকালে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের করদাতাদিগের ভোট পাইবার জন্য সেখানকার রাজনীতিক দলপতিদিগকে এখনও ১২।১৩টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় পুস্তিকা প্রকাশ করিতে হয়। ভারতবর্ষের অবস্থা কি এ বিষয়ে ইহা অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট ?

স্বদেশ-ভক্তির সম্বন্ধেও সেই কথা। লেকির ইতিহাসে লিখিত আছে,—"উত্তর আমেরিকায় সে সময়ে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জাতি অল্পদিন মাত্র আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য ছিল, দেশে রাস্তাঘাট বেশী না থাকায় তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর-সাক্ষাৎকার ও মিলন ঘটিবার সম্ভাবনাও অল্প ছিল; ব্যবসায়ি-স্বভাব-সুলভ অর্থ-গৃধ্নুতা অধিক থাকায় তাহাদিগের মধ্যে স্বদেশ-প্রীতি বা স্বজাতি-প্রীতি সম্ভূত হইবার কোনও সম্ভাবনাও ছিল না।" এই অংশে ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা সেকালের মার্কিণদিগের অপেক্ষা স্বরাজ্য-লাভের অধিকতর অনুকূল, সন্দেহ নাই।

শিক্ষা বিষয়ে সেকালের আমেরিকানেরা যে আমাদের অপেক্ষা বহু পশ্চাৎপদ ছিলেন, তাহা প্রসিদ্ধ কোষকার ওয়েবষ্টারের উক্তি হইতে ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার পর আমাদিগের কংগ্রেস যেরূপ প্রধানতঃ উকিল, মোক্তার ও ব্যারিষ্টাদিগকে লইয়া গঠিত, আমেরিকার কংগ্রেসও সেইরূপ ছিল। এখানকার ন্যায় সেখানকার তদানীন্তন রাজপুরু-ষেরা মার্কিণ কংগ্রেসকে উকিল-মোক্তারের সভা বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। আমেরিকার ধনিসন্তানেরা আমাদের দেশের বড়লোকদিগের অপেক্ষাও যে অধিকতর অলস, বিলাসপ্রিয় ও দেশের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, মার্কিণ জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সে কালের মার্কিণ জাতির নৈতিক বল সম্বন্ধে স্বীয় গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩৫ পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক লেকি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও আমাদিগকে মার্কিণ জাতি অপেক্ষা স্বরাজ্য-লাভের অধিকতর যোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ, সেকালের মার্কিণ সমাজ ইউরোপ হইতে নির্ব্বা-

সিত অসচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তাহাদিগের নীতি-হীনতার ও বর্ব্বরতার যে সকল উদাহরণ লেকি সাহেবের ইতি-হাসে সঙ্কলিত হইয়াছে, সেরূপ নীতিহীনতা ভারতীয় সমাজে আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। এই সকল দোষ-সত্ত্বেও যদি মার্কিণ জাতি স্বাধীনতা-লাভের ও ভোগের অযোগ্য না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসন-লাভের অযোগ্য হইবে কেন? (১)

কেবল আমেরিকার কথাই বলি কেন? সুইজার ল্যাণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র দেশে দুইটি ধর্ম্ম ও তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বিদ্যমানতা-সত্ত্বেও সুইসদিগের মধ্যে জাতীয় ভাব, স্বদেশ-প্রীতি ও স্বাধীনতার অভাব নাই। ফ্রান্সেও ধর্ম্মগত ও ভাষাগত বিষম পার্থক্য বিদ্যমান্। হল্যাণ্ডের অবস্থাও তদ্রূপ। অষ্ট্রীয়ায় জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ ও ভাষাভেদ ভারতবর্ষের অপেক্ষা অধিক ভিন্ন অল্প নহে। ইটালি ও জার্ম্মেনীর দৃষ্টান্তও এক্ষেত্রে আমাদের অনুকূল। ঐ সকল দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন, প্রকৃতির লোকে যদি ধর্ম্মগত ও ভাষাগত পার্থক্য-সত্ত্বেও একবিধ রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া স্বরাজ্য-পরিচালন করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতবাসী তাহা না পারিবে কেন,

(১) স্বদেশী শিল্প-পণ্য-রক্ষায় আগ্রহ-সম্পন্ন হইয়া অধুনা ভারতবাসী যেরূপ বিলাতী পণ্য-বর্জ্জন-নীতির (বয়কটের) পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে, সেকালের আমেরিকাবাসীও সেইরূপ হইয়াছিলেন। কেবল একটী বিষয়ে মার্কিণদিগের সুবিধা আমাদের অপেক্ষা অধিক ছিল। মার্কিণ জাতি আমাদিগের মত নিরস্ত্র হয় নাই—আমেরিকায় অস্ত্র আইন ছিল না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। Pearson's National Life and National Character নামক গ্রন্থের ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে,—

The supremacy of the inferior race in future is likely to be achieved by industrial progress rather than by military conquest

অর্থাৎ যেমন দিনকাল পড়িতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে দুর্ব্বল জাতি-সমূহ কেবল শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির বলেই জগতের বলবান জাতি সমূহের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিবে—সামরিক অয়োজনের আর প্রয়োজন হইবে না। ফল কথা, আমরা যে বিলাতী-পণ্য-বর্জ্জন ও স্বদেশি-গ্রহণ-নীতির অবলম্বন করিয়াছি, তাহা পরিত্যাগ না করিলে শীঘ্রই আমাদের স্বরাজ্য-লাভের যোগ্যতা সম্বন্ধে ইংরাজ জাতির সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে।

আমরা বুঝিতে পারি না। রাষ্ট্রীয় স্বার্থগত ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ হইবার পক্ষে ভারতবর্ষে কোনও অন্তরায়ই আমরা দেখিতে পাই না। যদি সেবিষয়ে কোনও অন্তরায় থাকে, তাহা হইলে স্বরাজ্য-লাভ করিলে তাহা অচিরাৎ দূরীভূত হইবে। যথেচ্ছাচার রাজপুরুষদিগের অবলম্বিত দুর্নীতির ফলে ইতোমধ্যেই সে অন্তরায় ক্রমশঃ দূরীভূত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষেরা বলেন, এমন কি প্রসিদ্ধ ঔদারনীতিক ভারত-সচিব জন মর্লিও বলিয়াছেন, প্রাচ্যদেশ-বাসীর প্রকৃতি ইউরোপের ন্যায় প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন-পদ্ধতির অনুকূল নহে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, জাপানে বিলাতের অনুরূপ পার্লামেণ্ট গঠিত হইয়াছে এবং তাহার সাহায্যে দেশের শাসন-কার্য্য উত্তমরূপে পরিচালিত হইতেছে। জাপানের দৃষ্টান্তে চীন সম্রাটও প্রকৃতি-পুঞ্জকে নিয়ম-তন্ত্র-মূলক শাসনাধিকার দান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। পারস্য রাজ্যের প্রজারা পার্লামেণ্ট সভা করিয়া রাজশক্তিকে দেশের শাসন-কার্য্যে সহায়তা করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। শ্যাম ও আফগানিস্থানের নরপতিগণ দেশের উন্নতি ও শাসন-পদ্ধতির সংস্কার-কল্পে যেরূপ মনোযোগী হইয়াছেন, তাহাতে অচিরাৎ ঐ সকল দেশেও বিলাতী পার্লামেণ্টের অনুরূপ শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইউরোপের পূর্ব্বাঞ্চল-স্থিত রুষ রাজ্যেও প্রজারা ডুমার (পার্লামেণ্টের) প্রতিষ্ঠার সহিত নূতন শাসন-তন্ত্র লাভ করিয়াছে। অতি অল্পদিন মাত্র আমেরিকার শাসনাধীন থাকিয়া ফিলি-পাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা স্বায়ত্ত-শাসন পাইয়াছে। কিন্তু সভ্যতা-ভিমানী ইংরাজ দেড় শত বর্ষকাল শাসন-দণ্ড পরিচালনের পরও ভারত-বাসীকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভের কথা মুখে আনিতে দিতেছেন না! আমাদের প্রার্থনার উত্তরে তাঁহারা কখনও বলিতেছেন, "তোমরা এখনও বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত হও নাই; কখনও বলিতেছেন, "East is east and west is west"—"You can't transplant British institutions wholesale into India. Even if it could be done, it would not be for the good of India. অর্থাৎ প্রাচ্যদেশ বাসীকে প্রাচ্য যথে-চ্ছাচার প্রণালী-ক্রমে শাসন করাই মঙ্গলকর, প্রাচ্যদেশে, প্রতীচ্য নিয়ম-তন্ত্র-মূলকশাসন প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না; ভারতে বিলাতের ন্যায় প্রজা-তন্ত্র-মূলক শাসন প্রবর্ত্তিত করিলে তাহা কখনই সুফলপ্রদ হইবে না।

কখনও বা বলিতেছেন যে, ভারতে জাতি-ভেদ ও ধর্ম্ম-ভেদের এরূপ বাহুল্য যে, ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসন দান করিলে তাহারা আপনাদিগের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিবে।

বুদ্ধি ও শিক্ষা-বিষয়ক আপত্তির উত্তর প্রথমেই প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় আপত্তি জাপান, চীন, ফিলিপাইন ও পারস্যের দৃষ্টান্তেই অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। তৃতীয় আপত্তিও যে ভিত্তিহীন, মার্কিণ জাতির ইতিহাস হইতে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর এক কথা, দেশীয় রাজ্যসমূহ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই দেশীয়দিগের দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে—একজন রেসিডেণ্ট ভিন্ন সেখানে আর কোনও ইংরাজই শাসন-কার্য্যের পরিদর্শন করেন না। কিন্তু কে কবে শুনিয়াছেন যে, দেশীয় রাজ্যের প্রজারা ধর্ম্ম ভেদ ও বর্ণ-ভেদ-বশে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে! সুতরাং বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদিগকে ঔপনিবেশিকদিগের ন্যায় স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিলে এবং দুই একজন ইংরাজ গবর্ণর তাহাদের কার্য্য-প্রণালীর উপর দৃষ্টি রাখিলে তাহারা যে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাদিগের ন্যায় সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারিবে না, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এই প্রসঙ্গে একথাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, ইউরোপেও এককালে ধর্ম্ম-ভেদের জন্য প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে বহু বিপ্লব ও রক্তপাত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর জ্ঞান ও সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের লোকসমাজে যেরূপ ধর্ম্মবিষয়ে সহিষ্ণুতা বা উদারতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভারতেও সেইরূপ ইংরাজ-শাসনের গুণে ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ধর্ম্মবিষয়ক অসহিষ্ণুতা ক্রমেই লোপ পাইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার অভাবেও ভারতবাসীর মধ্যে ধর্ম্ম-বিষয়ক উদারতা স্বভাবতঃ কতদূর বিদ্যমান, পরবর্ত্তী প্রকরণে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

যাঁহারা চিরকাল আমাদের শত্রুতা-সাধন করিয়া আসিতেছেন, যাঁহারা চিরকাল আমাদের উন্নতির বিরোধী, যাঁহারা চিরকাল আমাদিগকে পদানত রাখিতে ও পদ-দলিত করিতে চান, তাঁহাদের মুখপত্র "ইংলিশম্যান"কেও এ সকল কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। গত ১৯০৬ সালের জাতীয় মহাসমিতিতে যখন শ্রদ্ধেয় দাদাভাই নৌরোজী মহাশয় ভারতে স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপিত করেন, তখন 'ইংলিশম্যান' লিখিয়াছিলেন,—

"Out of the turmoil of political and social strivings, at present confusing India, some sane ideal must presently emerge. What? That is a question puzzling many thoughtful men in this country. One thing may be asserted with some kind of certainty. The present form of administration cannot endure. It is obsolete in a country rapidly advancing in education and where the antagonism between caste and caste and, class and class is steadily decaying. * * India as a whole has begun to show a definite consciousness of herself, and one begins to see the beginning of an Indian nationality, as opposed to the racial types that were prominent in the last century. * * On the whole, India is at the present moment not less civilised than Japan or Persia, both of which countries have a constitutional form of Government."

অর্থাৎ "ভারতে বর্ত্তমান সময়ে রাজনীতিক ও সামাজিক আন্দোলনের যে কলরব শুনা যাইতেছে, তাহার মধ্য হইতে শীঘ্রই একটি যুক্তি-সঙ্গত আদর্শ প্রকটিত হইবে। সে আদর্শ কি? বর্ত্তমান সময়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। ভারতের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী যে আর অধিক দিন টিকিবে না, এ কথা অনেকটা নিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে। এদেশে শিক্ষার যেরূপ উন্নতি হইতেছে, এবং জাতিগত ও সম্প্রদায়গত পার্থক্য যেরূপ দ্রুতবেগে তিরোহিত হইতেছে, তাহাতে এ দেশের পক্ষে বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী বাতিল হইয়া গিয়াছে। সমগ্র ভারতবাসী প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে এবং বিগত শতাব্দীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর-বিদ্বেষের স্থানে ভারতবাসীর মধ্যে একটী জাতীয়তার সূচনা দেখা যাইতেছে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, যে জাপান ও পারস্যরাজ্যে জাতীয় শাসন-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই জাপান ও পারস্য অপেক্ষা বর্ত্তমান ভারত কোনও অংশে কম সভ্য নহে।"

ইংলিশম্যান ঐ প্রবন্ধে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজও ভারতবাসীর "স্বরাজ্য" (Home Rule) পাইবার চেষ্টায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। ভারতের শাসন ও বিচার বিভাগ শীঘ্রই যে পৃথক্ হওয়া উচিত, একথা বলিতেও "ইংলিশম্যান" কুণ্ঠিত হন নাই। ঐ সময়ে প্রয়াগের অর্দ্ধ-সরকারি সংবাদ পত্র পাইওনীয়ারও লিখিয়াছিলেন যে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহ যদি এই সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সাহায্য গ্রহণ করিয়া দেশে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন, এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভাসমূহকে যদি প্রাদেশিক পার্লামেণ্টে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে রাজা প্রজা উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হইবে। পাইওনীয়ারের পরামর্শ অনুসারে এদেশের ব্যবস্থাপক সভাসমূহকে প্রাদেশিক পার্লামেণ্টে পরিণত করিলে রাজকোষের অর্থব্যয় সম্বন্ধে রাজপুরুষদিগের যথেচ্ছাচার করিবার পথ নিরুদ্ধ হইবে—দেশবাসীর ইচ্ছানুসারে রাজকোষের অর্থ ব্যয় করিতে রাজপুরু-

ষেরা বাধ্য হইবেন। (১) এই ব্যবস্থায় আমাদের স্বরাজ্য-লাভের পথ বহু-পরিমাণে পরিষ্কৃত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্ষমতা-প্রিয় রাজপুরুষেরা, এমন কি, বিলাতের আদর্শ "সাধু পুরুষ" জন মর্লি পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে সম্মত হন নাই; বরং রাজপুরুষদিগের অবৈধ-ক্ষমতা-পরিচালনের পথ যাহাতে সুপরিষ্কৃত হয়, তিনি তাহার ব্যবস্থাই করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক "জন মর্লি" বাহাদুর ভারত-সচিবের পদ-গ্রহণের পর একাধিকবার বলিয়াছেন যে, ভারতে চিরকাল ইংরাজের যথেচ্ছাচার-শাসনই অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে এবং সে জন্য প্রয়োজন হইলে ভারতবাসীর স্বাধীনভাবে মনোভাব প্রকাশের ও সভাসমিতি করিবার অধিকারও সঙ্কুচিত করিতে তিনি পশ্চাৎপদ হইবেন না! রাজ-পুরুষদিগের সাম্রাজ্য-মদ-মত্ততা কত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছে, জন মর্লির এই উক্তি হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে ভারত-সন্তান ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিলে পার্লামেণ্ট মহাসভার প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারে, এবং স্বয়ং নির্ব্বাচিত হইয়া বিলাতের লোকের প্রতিনিধি রূপে পার্লামেণ্টে আসনও গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু ভারতে ফিরিয়া আসিলেই তাহার সে ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়—সেই ভারত-সন্তান এখানকার লাটসাহেবদিগের কার্য্যকারিণী সভায় পর্য্যন্ত প্রবেশ করিবার অযোগ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়! ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ও ঘোর অন্যায়-মূলক ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে?

প্রকৃত কথা এই যে, প্রকৃতিপুঞ্জকে যে ক্ষমতা প্রদান করিলে রাজ-পুরুষদিগের যথেচ্ছাচারের পথ নিরুদ্ধ বা সঙ্কীর্ণ হইবে, সে ক্ষমতা তাঁহারা কিছুতেই আমাদিগকে সহজে দান করিবেন না। তাই ভারত-বাসীর অযোগ্যতা প্রভৃতি নানা কল্পিত আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে।

---

(১) পরলোকগত শ্রদ্ধেয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় ১৯০৫ সালের জাতীয় মহা-সমিতির অধ্যক্ষ মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহোদয়কে যে প্রকাশ্য পত্র লিখিয়া-ছিলেন, তাহাতেও তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন,—"We must now take a bold step forward and try to get Local Councils based wholly on election, with power of financial control, for at least three of the older Presidencies.

এই সকল কল্পিত আপত্তির প্রকৃত উত্তর পুনঃপুনঃ দান করিয়াও কোনও ফল হইতেছে না দেখিয়া শ্রদ্ধেয় নৌরোজী মহোদয় নিতান্ত বিরক্ত হইয়া একদা কোনও বিলাতী সংবাদ-পত্রে লিখিয়াছিলেন যে,—

It would be better for the Indian people to be governed by their own "*corrupt*" countrymen than by the *angelic European leeches.*

অর্থাৎ দেবভাবাপন্ন ইউরোপীয় জলৌকা-নিচয়ের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হওয়া অপেক্ষা স্বদেশের ভ্রষ্ট-চরিত্র ব্যক্তিদিগের দ্বারা শাসিত হওয়াও ভারতাসীর পক্ষে অধিকতর মঙ্গল-জনক। ইংলণ্ডের ঔদার-নীতিক রাজমন্ত্রী স্যার হেন্‌রি ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান্ মহোদয়ের নিম্ন-লিখিত উক্তিতে দৃষ্টিপাত করিলে নৌরোজী মহাশয়ের মন্তব্যের সারবত্তা সহজেই উপলব্ধ হইবে,—

To secure good administration was one thing, but good government could never be a substitute for government by the people themselves.

ভাবার্থ এই যে,—বৈদেশিক সুশাসন যতই ভাল হউক না কেন, তাহা কখনই দেশবাসী জন-সাধারণের স্বায়ত্ত শাসনের তুল্য হইতে পারে না।

আমাদের স্বদেশীয় কবিও গায়িয়াছেন—

"যদি দেয় পরে স্বরগের সুখে।
তবু তুল্য নহে স্ব-বশের দুখে॥"

তাই ভারতবাসী স্ব-রাজ্য বা স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের ব্যাকুলতা যতই বাড়িতেছে, রাজ-পুরুষেরা ততই যথেচ্ছাচার শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের উচ্চাকাঙ্ক্ষার দমনে যত্ন প্রকাশ করিতেছেন।

এরূপ অবস্থায় আমরা যদি আন্দোলন ও স্বার্থ-ত্যাগ করিয়া ইংরাজ জাতির হৃদয়ে এ ধারণা অঙ্কিত করিতে না পারি যে, বৃটিশ প্রজার প্রাপ্য অধিকার না পাইলে আমরা কিছুতেই ইংরাজ জাতিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম করিতে দিব না, যদি বিধি-সঙ্গত উপায়ে রাজকার্য্যে বাধা-দান (passive resistance) করিয়া, বা ইংরাজকে রাজ-কার্য্যে সহায়তা করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া ইংরাজের শাসন-যন্ত্রকে অচল করিয়া তুলিতে না পারি, তাহা হইলে ইংরাজ কেন আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দান করিতে অগ্রসর হইবেন? ইংলণ্ডবাসী জন-সাধারণের সহৃদয়তায় আমাদের অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ

নাই, রাজ-দত্ত সনন্দ, পার্লামেণ্টের আদেশ ও মহারাণীর ঘোষণা-বাণীর মর্য্যাদা যাহাতে রক্ষিত হয়, সে বাসনাও তাঁহাদিগের হৃদয়ে অল্প বলবতী নহে। কিন্তু তাঁহারা এদেশের প্রকৃতি-পুঞ্জের প্রকৃত অবস্থা জানিবার অবকাশ আদৌ প্রাপ্ত হন না। একে আপন আপন কার্য্য লইয়াই তাঁহাদের অনেকেই ব্যস্ত, তাহার উপর যে সকল লোককে ভারত-শাসনের জন্য প্রেরণ করা হয়, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত, ন্যায়-পরায়ণ ও উদার-প্রকৃতি বলিয়া ইংলণ্ডবাসীর বিশ্বাস। সরকারি কাগজ-পত্র ও অবসর-প্রাপ্ত সিবিলিয়ানদিগের পক্ষপাতপূর্ণ বর্ণনা পাঠ করিয়াও তাঁহাদিগের ধারণা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের শাসন-কার্য্য সুচারুরূপেই পরিচালিত হইতেছে। এজন্য ভারতীয় রাজপুরুষদিগের অত্যাচার-নিবারণে তাঁহাদিগের কখনই আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে মাননীয় গোখলে ও লালা লজপৎ রায় মহোদয়ের ন্যায় লোকে বিলাতে গিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝাইবার চেষ্টা করিলে ভারতীয় প্রজার দুর্দ্দশার প্রতি বিলাতবাসীর কিয়ৎপরিমাণে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এই কার্য্যও সহজসাধ্য নহে। কারণ, বহু অর্থব্যয়ে আমরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, বিলাতে ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থনের জন্য একদল বক্তৃতাকারীর আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে; এবং সেরূপ ঘটিলে বিলাতের লোকের পক্ষে উভয় দলের বক্তাদিগের পরস্পর-বিরোধী কথার বিচার-পূর্ব্বক সত্য-নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। সত্য কথা বলিতে কি, ইতোমধ্যে বিলাতের জনসাধারণের মতিভ্রম ঘটাইবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। জাতীয় মহাসমিতি স্পষ্টাক্ষরে স্বরাজ্য বা স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী করায় একদল এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান ও বিলাতী সংবাদপত্রসমূহ ইংলণ্ডবাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, ভারতে মুসলমান ও অন্যান্য সমর-প্রিয় জাতি-সমূহ ইংরাজের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীরই পক্ষপাতী—স্বায়ত্ত-শাসনকে তাহারা ঘৃণা করে, এবং হিন্দুরা স্বায়ত্ত-শাসন চাহিতেছে বলিয়া তাহারা এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে যে, অচিরাৎ ভারতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ভারতবাসীর প্রকৃত অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষা বিলাতের চারি কোটি লোককে বক্তৃতা করিয়া বুঝান কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তাই প্রসিদ্ধ মনীষী জন ষ্টুয়ার্ট মিলও বলিয়াছেন,—

If the good of the governed is the proper business of a government it is utterly impossible that a people should directly attend to it.

অর্থাৎ যদি প্রজাগণের হিত-সাধন রাজ্য-শাসনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, একটী সমগ্র জাতি কখন সাক্ষাৎ ভাবে সে উদ্দেশ্য সাধনে মনোযোগী হইতে পারে না।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

It is always under great difficulties and very imperfectly, that a country can be governed by foreigners.—Foreigners do not feel with the the people.

ভাবার্থ,—বৈদেশিক রাজ-শক্তির দ্বারা কোনও দেশের শাসন-কার্য্যেই কখনও স্বল্পায়াসে ও সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় না। কারণ,বৈদেশিক শাসনকর্ত্তারা দেশের লোকের মনোভাব বুঝিতে বা তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি-সম্পন্ন হইতে পারেন না।

এ অবস্থায় আমাদের প্রতিকারের উপায় কি? ভারতীয় প্রজার অবস্থার প্রতি ইংলণ্ডীয় জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের উপায় কি? দেশের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্থির করিয়াছেন যে, বিলাতী পণ্য-দ্রব্যের বর্জ্জনই ভারতের প্রতি বিলাতের সাধারণ লোকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার একটি প্রধান ও বিধি-সঙ্গত উপায়।

কারণ, ইংরাজ বাণিজ্য-জীবী জাতি। বাণিজ্য-ব্যবসায় লইয়া তাঁহারা এরূপ মত্ত থাকেন যে, অপরের সুখ-দুঃখে দৃষ্টি-পাত করিবার তাঁহাদের অবকাশ প্রায়ই থাকে না, ব্যবসায়ে ক্ষতি না হইলে তাঁহাদের ললাটের "টনক" কখনও নড়ে না। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের বিলাতী পণ্য-বর্জ্জনের চেষ্টায় যদি বিলাতী বাণিজ্যের বিশেষরূপে সঙ্কোচ ঘটে, তাহা হইলে এইরূপ ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তাঁহাদিগের সহজেই প্রবৃত্তি হইবে, সন্দেহ নাই। যখন ইংরাজ জাতি বুঝিবেন যে, মুষ্টিমেয় কর্ম্মচারীর অবৈধ ক্ষমতা-প্রিয়তার জন্য ভারতের কোটি কোটি অধিবাসী অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের সন্তোষ-সাধন না করিলে চারি কোটি ইংরাজের ভারতীয় বাণিজ্য নষ্ট হইবে, এমন কি, ত্রিশ কোটি প্রজার অসন্তোষের ফলে ভারতে গুরুতর রাজনীতিক বিপদও সংঘটিত হইতে পারে, তখন স্বভাবতই ভারতীয় শাসন-প্রণালীর আমূল সংস্কার সাধন করাইবার জন্য তাঁহাদিগের আগ্রহ জন্মিবে। তাঁহারা মুষ্টিমেয় কর্ম্মচারীর অবৈধ ক্ষমতা-প্রিয়তায় প্রশ্রয় দিতে কখনই সম্মত হইবেন না। প্রজার অসন্তোষ রাজ্যের পক্ষে অশুভকর, ইহা ভাবিয়াও ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারে

তাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। সুতরাং বিলাতী পণ্য-বর্জ্জনে প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক ভারতের অবস্থার প্রতি বিলাতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাই এখন আমাদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন সমাজের শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া সমাজের মঙ্গলকর কার্য্যে উহার নিয়োগ-পূর্ব্বক ভারতের প্রজা-শক্তির পরিপুষ্টি-সাধনে সহায়তা করিবার চেষ্টা করাও উচিত।

এখানকার ইংরাজ রাজপুরুষেরা এইসব কথা বুঝিতে পারিয়াই স্বদেশী আন্দোলনের দমনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এদেশে যে স্বদেশি-গ্রহণ ও বিলাতী-বর্জ্জনের চেষ্টা চলিতেছে, তাহা যথেচ্ছাচার রাজশক্তিকে প্রজার অভিযোগে কর্ণপাত করিতে বাধ্য করিবার একমাত্র অব্যর্থ উপায়। এ উপায় সফল হইলে প্রজার ধনবৃদ্ধির সহিত রাজনীতিক অধিকারেরও বৃদ্ধি ঘটিবে, শাসন-বিভাগের আমূল সংস্কার হইবে, রাজপুরুষেরা আর পূর্ব্বের ন্যায় যথেচ্ছা-চার করিবার অবসর প্রাপ্ত হইবেন না, তাঁহাদিগকে প্রজার মতামতের প্রতি যথোচিত সম্মান-প্রকাশ করিয়া চলিতেই হইবে। যাঁহারা চিরকাল যথেচ্ছভাবে শাসন-দণ্ডের পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এরূপ শক্তি-সঙ্কোচের সম্ভাবনা যে অতীব ভয়াবহ ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। গারিবল্ডী ও ম্যাজি-নির (ম্যাট্‌সিনির) আবির্ভাব-কালে ইটালীবাসীও এইরূপ স্বদেশী আন্দো-লন ও বয়কট-নীতির অবলম্বন করিয়া অষ্ট্রীয় রাজপুরুষদিগের যথেচ্ছা-চার বহু পরিমাণে লাঘব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কথা চিন্তা করিয়াও ইংরাজ রাজপুরুষগণের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হইতেছে। তাই রাজপুরুষেরা গুর্‌খার লগুড়াঘাত, হিন্দু-মুসলমানে কলহ-সংঘটন, সভাসমিতির অধিবেশন বন্ধ করিবার নিয়ম প্রচার, ছাত্র-দমনের অভি-নব ব্যবস্থা ও কথায় কথায় স্বদেশ-হিতৈষীদিগকে রাজদ্রোহের চক্রে ফেলিয়া স্বদেশী আন্দোলনের দমনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এই অত্যাচারে লোকের স্বদেশী পণ্য ব্যবহারে দিন দিন আগ্রহ বাড়িতেছে। তবে লোকে আর পূর্ব্বের মত আন্দোলন আলোচনা ও সভা-সমিতির আড়ম্বর করিতে পারিতেছে না, অনেকে যথোচিত সতর্ক-তার সহিত কার্য্য করিতেছেন। বিলাতী দ্রব্য-ক্রয়ে বাধা প্রদান না করিয়া সামাজিক শাসনে বৈদেশিক পণ্যের ব্যবহারকারীকে দণ্ডিত ও

নিরস্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। ফলতঃ স্বদেশী পণ্যের প্রতি লোকের যে অনুরাগ জন্মিয়াছে, ইংরাজের ব্যাঘ্র-প্রকৃতির পরিচয়ে, তাহা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। কারণ, শিক্ষিত ভারতবাসী, বিশেষতঃ বঙ্গবাসী বুঝিয়াছেন যে, এই স্বদেশী আন্দোলন আমাদিগের অধিকতর রাজনীতিক অধিকার-লাভে ও বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিবারণে আমাদিগকে বিশেষ সহায়তা করিবে। অশিক্ষিত লোকে বুঝিয়াছে, ইহাতে তাহাদের অন্নের সংস্থান হইবে। সুতরাং কেহই এই পরম কল্যাণকর স্বদেশীয় পণ্য-গ্রহণ ও বিলাতী পণ্য-বর্জ্জন-মূলক আন্দোলন পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। ফলতঃ বর্ত্তমান বৈদেশিক পণ্য-দ্রব্য-বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা-মূলক স্বদেশী আন্দোলনই আমাদিগের রাজনীতিক অধিকার-লাভার্থ আরব্ধ যুদ্ধের এক মাত্র ব্রহ্মাস্ত্র। এই ব্রহ্মাস্ত্রের সদ্ব্যবহার যদি আমরা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগের আর কখনও মঙ্গল হইবে না।

প্রতিকারের দ্বিতীয় উপায়—বিধিসঙ্গত ভাবে রাজপুরুষদিগের যথেচ্ছাচারে বাধা প্রদান। এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য ভারতবাসীর সাহায্যেই ইংরাজ শাসন করিতেছেন। দেশ-বাসী সাহায্য না করিলে ইংরাজ শাসন-কর্ত্তাদিগের পক্ষে ভারতবর্ষে যদৃচ্ছা শাসন-দণ্ড-পরিচালন করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। অধ্যাপক সীলি বলেন,—

> If the feeling of a common nationality began to exist there (in India) only feebly, if without inspiring any active desire to drive out the foreigner, it only created a notion that it was shameful to assist him in maintaining his dominion, from that day almost our Empire would cease to exist * * * For we are not really conquerors of India, and we cannot rule her as conquerors if we undertook to do so, it is not necessary to enquire whether we could succeed, for we should assuredly be ruined financially by the mere attempt. *The Expansion of England* pp. 227 & 34.

ভাবার্থ—ভারতে যদি কখনও জাতীয় ভাবের সঞ্চার অতি ক্ষীণভাবেও হয়, এবং যদি সেই ভাবের বশীভূত হইয়া লোকে বৈদেশিকদিগকে বাহুবলে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা না করিয়া, কেবল তাহাদিগের সাম্রাজ্য-শাসন ব্যাপারে সহায়তা করা আপনাদিগের পক্ষে লজ্জা-জনক ব্যাপার বলিয়াও মনে করে, তাহা হইলেই আমাদের ভারত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব এক দিনের মধ্যে বিলুপ্ত হয়। কারণ, আমরা কখনও ভারতবর্ষকে প্রকৃতপক্ষে জয় করি নাই, আমরা বিজেতার ন্যায় সেখানকার লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ শাসনও করিতে পারি না। যদি আমরা বিজেতার ন্যায় ভারতবর্ষে শাসনা-দণ্ড পরিচালন করিবার ভার গ্রহণ করি, তাহা হইলে সে বিষয়ে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না, তাহার বিচার করিবার কোনও প্রয়োজ

জন নাই—ঐরূপ করিবার চেষ্টা করিতে গেলেই আমাদের যে অর্থ-ব্যয়ের সম্ভাবনা, তাহাতেই আমাদের বিনাশ ঘটিবে, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

ফলকথা, আমরা যদি আইনের সীমা কোনরূপে লঙ্ঘন না করিয়া কেবল ইংরাজের যথেচ্ছাচারে সহায়তা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি, যদি ইংরাজের আইন আদালতের সহিত যথাসাধ্য সংস্রব ত্যাগ করিয়া আমাদের প্রাচীন গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রথার অবলম্বন করিতে অগ্রসর হই, পল্লী-সমিতির গঠন-পূর্ব্বক প্রজাশক্তির পুষ্টিবিধান করিতে প্রবৃত্ত হই, স্বদেশ-বাসীর ধর্ম্ম-সঙ্গত অভ্যুদয়-চেষ্টার বিরুদ্ধে বৈদেশিক ইংরাজকে পরোক্ষ ভাবেও সহায়তা না করি এবং কঠোর সামাজিক শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়া দেশ-দ্রোহী ও সমাজ-দ্রোহীর দমনের ব্যবস্থা করি, সেই সঙ্গে দেশের আপামর জন-সাধারণকে আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে স্বদেশ-প্রীতির সঞ্চার করিতে পারি, তাহা হইলে ইংরাজের পক্ষে বর্ত্তমান যথেচ্ছাচার-প্রণালীক্রমে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে, দেশের শাসন-কার্য্যে ইংরাজ শাসন-কর্ত্তারা দেশবাসীর মতামত গ্রহণ করিতে অবশ্যই আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। বৃদ্ধ ভারত-হিতৈষী হিউম সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "প্রজারা যদি রাজার অবিচার বন্ধ করিতে না পারে, সে দোষ প্রজা-দিগের—রাজার নহে, একথা তোমরা মনে রাখিও।" ইউরোপের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, "প্রজার দ্বারা নিবারিত না হইলে, রাজার যথেচ্ছা-চার করিবার অধিকার আছে"—ইহাই পাশ্চাত্য রাজ-পুরুষদিগের ধারণা। ইংরাজ রাজপুরুষেরাও সেই ধারণার বশীভূত। সুতরাং তাঁহাদের যথেচ্ছাচারে বাধা দান করিবার জন্য আমাদিগকেই সর্ব্বপ্রকার বিধি-সঙ্গত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। (১) নচেৎ বিলাতের ও ভারতীয় রাজ-পুরুষগণের শাসনে ও শোষণে আমাদিগের অস্তিত্ব অচিরাৎ বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

---

(১) বিধি-সঙ্গত আন্দোলন-সম্বন্ধে মাননীয় গোখলে মহোদয় বিগত ১৯০৭ সালের প্রারম্ভে এলাহাবাদে বক্তৃতাকালে যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি দেশবাসীর বিশেষ মনোযোগ প্রার্থনীয়। তাঁহার উক্তি এই,—The *loose* talk in which *some* people indulged namely *that constitutional agitation has failed in this country,*' was unjustified as *they had not yet exhausted even a*

বর্ত্তমান সময়েই আমরা অবনতির চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মিঃ ডিগবী মহোদয় গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবাসীর দৈনিক আয় গড়ে জন প্রতি দুই আনা ছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে উহা ছয় পয়সায় পরিণত হয়। অধুনা উহা দৈনিক তিন পয়সায় দাঁড়াইয়াছে! অন্নপূর্ণার সন্তানদিগের আর কি দুরবস্থা হইতে পারে! অতএব আর ঔদাস্য প্রকাশের সময় নাই। ক্ষমতা-প্রিয় রাজপুরুষদিগের কুটিলতায় আমরা যে বৈধ অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সময় থাকিতে বদ্ধপরিকর ভাবে চেষ্টা না করিলে পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে। মিঃ ডিগবী দেখাইয়াছেন,—ইংরাজের শোষণে ভারতবাসীর যেরূপ ভীষণ রক্ত-মোক্ষণ হইতেছে, তাহাতে—

"India is not far from collapse".

---

thousandth part of the possibilities of real constitutional agitation. ° ° ° Three things were excluded, rebellion, aiding or abetting a foreign invasion and crime. Barring these three things all else was constitutional. ° * ° Prayers and appeals to justice lay at one end; *Passive resistance,* including even its extreme form, *non-payment of taxes till redress was obtained*—lay at the other.

অর্থাৎ যাঁহারা বলেন, বিধিসঙ্গত আন্দোলন এদেশে নিষ্ফল হইয়াছে, তাঁহারা প্রকৃত বিধিসঙ্গত আন্দোলনের সহস্রাংশের একাংশও কখনও অবলম্বন করেন নাই। রাজশক্তির অত্যাচার নিবারণের জন্য, বিদ্রোহ-ঘোষণা, বৈদেশিক শত্রুকে দেশ আক্রমণে সহায়তা এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা হত্যাবা এই তিনটি উপায় ভিন্ন আর যে কোনও প্রকার উপায়ের অবলম্বন করা হউক না কেন, তাহা বিধিসঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইবে। গোখলে মহোদয়ের মতে প্রজার কথায় কর্ণপাত করিতে রাজ-পুরুষদিগকে বাধ্য করিবার জন্য খাজানা বন্ধ করা, সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ে দেশের লোককে নিরস্ত করা ও গর্ণমেন্টের শাসনকার্য্য অচল হইয়া যায়, এমন যে কোনও উপায় অবলম্বন করা বিধিসঙ্গত আন্দোলনের অন্তর্গত।

শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়ও গত ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুণার গণপতি-উৎসবে বক্তৃতা-কালে এই কথাই বলিয়াছেন,—

Undaunted by fear of harassment, prosecutions and deportations, we must pursue all the *lawful methods of agitation to the bitter end.*

সম্মোহন—চিত্ত-বিজয়।

History records in its annals no greater marvel of one race over-mastering another in all matters alike of mind and body.

Prosperous British India.

"শারীর যুদ্ধে" ভারতবাসীর বাহু-বল ও বাণিজ্য-সংগ্রামে তাহাদিগের ধন-বল হরণ করিয়াই ইংরাজ নিশ্চিন্ত নহেন। ভারতীয় সমাজের ধন-বল ও বাহু-বলই বৈদেশিক রাজার নিকট একমাত্র আশঙ্কার কারণ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। বুদ্ধি-বলেও মানুষ অনেক অসাধ্য-সাধন করিতে পারে। নীতিজ্ঞদিগের মতে "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।" সুতরাং বুদ্ধি-বল উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্যজাতির বুদ্ধি কখনই উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না। কাজেই বুদ্ধিমান্ ইংরাজকে ভারতবাসীর বুদ্ধি-বিপ্লব ঘটাইয়া তাহাদিগের চিত্ত-বৃত্তি-নিচয়কে সম্মোহিত করিয়া রাখিবার জন্যও সংগ্রামের আয়োজন করিতে হইয়াছে। এদেশে অভিনব শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন দ্বারা দেশবাসীর চিন্তা-স্রোতকে নূতন পথে পরিচালিত করা, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব-পরিচয়ে দেশবাসীর বুদ্ধি-বৃত্তিকে মোহাভিভূত করিয়া, তাঁহাদিগের আত্মাভিমান ও আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস নষ্ট করা এই সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য।

এই সংগ্রামের ফলে পরাধীন জাতির চিত্ত-ক্ষেত্র বিজেতৃ-জাতির সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া যায়। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতির বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটাইবার ও চিত্তের দৃঢ়তা হ্রাস করিবার পক্ষে এই প্রকার সংগ্রামই অমোঘ উপায় বলিয়া পাশ্চাত্য রাজনীতি-বিশারদেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মিশরের অন্তর্গত খার্টুম নগরে "গর্ডন কলেজ" ও পিকিনে "হানলিং" ও "টংওয়েং কলেজ" প্রভৃতি এইরূপ উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে মিশনরিগণ এই বুদ্ধি-ভ্রংশকর সংগ্রামে প্রধান অস্ত্ররূপে কার্য্য করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষে এই চিত্ত-বিজয়-ব্যাপারে ইংরাজ সামান্য সফলতা লাভ করেন নাই।

ভারতে এই অভিনব সংগ্রাম আরব্ধ হওয়ায় দেশবাসীর চিন্তাস্রোতঃ

ইংরাজের প্রদর্শিত নূতন পথে ধাবিত হইল, স্ব-দেশ, স্ব-সমাজ ও স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস এবং বৈদেশিক সকল বিষয়েরই প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় যাঁহারা স্বভাবতঃ পর-দুঃখ-কাতর, তাঁহাদের অনেকে বুদ্ধি-মার্গে বিভ্রান্ত হইয়া সমাজের আমূল সংস্কার ও পাশ্চাত্য আদর্শে উহার পুনর্গঠনকেই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। এইরূপে সংস্কারক সমাজের প্রাদুর্ভাবে হিন্দু সমাজ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নূতন শিক্ষার গুণে ও মিশনরিদের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, সমাজে এক-তার বন্ধন শিথিল হইয়াছে। তদবধি নূতন হিংসা-বিদ্বেষ ও নূতন দলা-দলির স্রোত অব্যাহত ভাবে আমাদের সমাজে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

সাধারণ দলাদলি ও গৃহকলহ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান ; উহা এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে, পূর্ব্বেও ছিল। কোন্ সংসার গার্হস্থ্য-কলহ-পরিশূন্য ? কোন্ সমাজে দলাদলি নাই ? কোন্ সভায় স্বাধীন মতাব-লম্বী সদস্যেরা নির্ব্বিরোধ ? এমন যে সুসংযত বৃটিশ পার্লামেণ্ট, তাহাতেও সদস্যদিগের মধ্যে অসম্প্রীতির নিদর্শন দৃষ্ট হয়। এমন কি, সুশিক্ষিত নেতৃবৃন্দের মধ্যেও সময়ে সময়ে বাক্যালাপ বন্ধ হয়। কিন্তু এ দেশে যে দলাদলির বাহুল্য দৃষ্ট হয় ও তাহার ফলে আরব্ধ কার্য্য পণ্ড হয়, তাহার কারণ ভারতবাসীর পরাধীনতা। পরাধীনতায় চিত্ত-বৃত্তিসমূহের বিশেষ অবনতি ঘটে, হিংসা দ্বেষ বৃদ্ধি পায়, সমবেতভাবে কার্য্য করিবার শক্তি বিনষ্ট হয়। স্বাধীন জাতি দেশের জন্য সকল বিভিন্নতা ভুলিতে পারে ; তজ্জন্য তাহাদের সাধনক্ষেত্র আছে বলিয়া সেই শিক্ষাটুকু তাহাদের হইয়াছে। আমাদের সেই সাধন-ক্ষেত্রের অভাবেই সামান্য দলাদলিগুলি এরূপ সর্ব্বগ্রাসী হইয়া উঠে। ক্রমশঃ আমাদের জাতীয় জীবনের লক্ষ্য যেমন উচ্চ ও মহান্ হইয়া উঠিবে, তেমনি আমরাও অল্পে অল্পে স্বার্থ-প্রণোদিত তুচ্ছ কলহ বিস্মৃত হইতে শিখিব। স্বাধীন জাতির আত্ম-বিশ্বাস অটল থাকে ; শত-বিরোধ থাকা সত্ত্বেও, আমাদের ন্যায় তাহারা, তাহাতে জাতীয় জীবনের অবসানের কল্পনা করিয়া নিশ্চেষ্ট হয় না। সে যাহা হউক, মিশনরিদিগের শিক্ষায় এ দেশে যে দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূল ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ ও সমাজ-বিদ্বেষ। এই কারণে ইহাকে "নূতন" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

নূতন শিক্ষার "হিড়িকে" পড়ায় দেশের অনেক পুরাতন উৎকৃষ্ট প্রথাও এক্ষণে আমাদিগের নিকট বর্ব্বরোচিত বলিয়া বোধ হইতেছে, পূর্ব্বপুরুষগণ অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন। পুরাতনের প্রতি বিরাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ব্বগৌরবের পুনরুদ্ধারে আমাদিগের আগ্রহও হ্রাস পাইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রকৃত-মর্ম্ম-গ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় সকলেই স্ব-প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন, পরাধীনতা-বশতঃ সমাজের জন্ত স্বার্থ-ত্যাগের প্রবৃত্তি ক্রমে লোপ পাইয়াছে, সমাজে যথেচ্ছাচার বাড়িয়াছে। স্বাধীন জাতি জানে, দেশ-রক্ষার ও সমাজ-রক্ষার ভার তাহার নিজের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। সেই দায়িত্ব-জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া সে প্রয়োজন কালে স্বার্থ-বিসর্জ্জনে অগ্রসর হয়। পরাধীন জাতির দেশ-রক্ষার ও লোক-রক্ষার ভার পরের হস্তে ন্যস্ত থাকায়, সে বিষয়ের দায়িত্ব হইতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকে। দায়িত্বের অভাবে স্বার্থ-ত্যাগ-প্রবৃত্তির ক্রমশঃ বিলোপ ঘটে। আমাদিগের তাহাই হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের পল্লী-সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমগ্র সমাজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থপিপাসাকে বহু-পরিমাণে সংযত রাখিতে হইত। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার জন্ত তখন সমাজে ঐক্য-রক্ষার প্রয়োজন সকলেই অনুভব করিতেন। কিন্তু ইংরাজ দেশের সম্পূর্ণ শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া দেশে ঘোর শান্তি প্রতিষ্ঠিত করায় সমাজে ঐক্য-রক্ষার প্রয়োজন আর তেমন রহিল না, আত্ম-রক্ষার জন্য সামাজিকদিগের বা প্রতিবেশিগণের অনুগ্রহ ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করা অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় পরের জন্য বা সমাজের জন্য লোকের স্বার্থ-ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল।* পরন্তু এদেশের পল্লী-সমাজগুলিকে বিনষ্ট করিয়া ইংরাজ

"* In the earlier days,...each member of the commune was bound by his own self-interest to subordinate his personal desires to the general interest of the community. In the new days (*i. e.* under foreign rule) he began to assert his own private desires and interests, ***because he has nothing to gain by surpessing them.*** The joint and united action of the community was no longer necessary for his protection from outside enemies, and he no longer felt himself dependent on the good will, and sympathy of his neighbour, so he was less and less inclined to give in to them individually or as a body in any matter on which his private interests were opposed to theirs."—Mr. G. Adams C. S. (**East and West.**)

আমাদিগের আত্ম-নির্ভর-শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। ইহার উপর ইংরাজের প্রবর্ত্তিত একদেশীয়, অসম্পূর্ণ ও বিকৃত শিক্ষার ফলে আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া আমরা কেবল পর-সেবার যোগ্যতা লাভ করিতেছি। এইরূপ বুদ্ধি-বিপ্লবের ফলে আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের মেরু-দণ্ড পর্য্যন্ত বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইংরাজের আরব্ধ তৃতীয় সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া, আমরা প্রাচীন গৌরবে আস্থা-হীন ও ভবিষ্যৎ উন্নতি-বিষয়ে আশা-হীন জীব-বিশেষে পরিণত হইতেছি।

স্বর্গীয় ভূদেব বাবু যথার্থই বলিয়াছেন,—"যদি ভারতবর্ষ আজি রাজনীতি সম্বন্ধে ইংরাজের দ্বারা পরিচালিত না হইত, তবে কি ভার-তেরও সুশিক্ষিত সৈন্য, সুদৃঢ় পোতবাহিনী এবং ইউরোপীয় বিষয়-বিদ্যায় সুবিদ্বান্ লোক সকলের অভাব থাকিত? কিছুরই অভাব থাকিত বলিয়া বোধ হয় না। কাজ অপরে করিয়া দিলে, কাজ করিবার সম্বল অপহরণ করিলে, কাজ করিতে পারি না বলিয়া অনুক্ষণ ভর্ৎসনা ও অবজ্ঞা করিলে, কাজ করিবার উপক্রম করিবামাত্র মাথার উপর বসিয়া টিক্ টিক্ করিলে, কেহই কোন কাজ করিতে পারে না। আজ হিন্দুরা সেই জন্যই শান্তশীল হইয়া আছেন; সাধনশীল হইয়া উঠিতেছেন না। হিন্দুর অপেক্ষা জাপানীয়ের কোনও গুণই অধিক নাই। তাহারা যেরূপ অবলীলা-ক্রমে ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষতা করিতেছে, পরাধীন না থাকিলে হিন্দুরাও সেরূপ সমকক্ষতায় সমর্থ হইত, সন্দেহ নাই।" দুঃখের বিষয়, এই তত্ত্ব ইংরাজী শিক্ষার মোহে আমরা সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, আপনাদিগকে পাশ্চাত্যদিগের অপেক্ষা স্বভাবতঃ হীন বলিয়া মনে করি।

ইংরাজ বলিতেছেন, "আমরা তোমাদিগকে সুসভ্য করিতেছি।" আমরাও ভাবিতেছি, "আমরা ইংরাজের সাহচর্য্যে সভ্য হইতেছি।" এই প্রহেলিকার মীমাংসা-প্রসঙ্গে স্যার টমাস মনরো বলিয়াছেন,—

I do not exactly know what is meant by civilising the people of India. In the theory and practice of good government they may be deficient, but if a good system of agriculture, if unrivalled manufactures, if a capacity to produce what convenience and luxury demand, if the establishment of schools in every village for reading and writing, if the general practice of kindness and hospitality, and above all, if a scrupulous respect and delicacy towards the female sex are amongst the points that denote a civilized people, then the Hindus are not inferior in civilisation to the people of Europe.

ভারতবাসীকে সভ্য করা মানে কি, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারি না। ভারতবাসী হয় ত দেশে সুশাসন প্রবর্ত্তনে তেমন দক্ষ নহে, সু-শাসন-সম্বন্ধে তাহাদের ধারণাও নির্দ্দোষ না হইতে পারে ; কিন্তু যদি কৃষিকার্য্যের উৎকৃষ্ট প্রণালী, অতুলনীয় শিল্প-নির্ম্মাণ-কৌশল, প্রয়োজনীয় অভাবসমূহের পূরণ ও বিলাসোপকরণ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা, প্রত্যেক গ্রামে লেখাপড়া শিখিবার জন্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, দয়া, দাক্ষিণ্য, আতিথেয়তা, এবং সর্ব্বোপরি নারীজাতির প্রতি সর্ব্বথা সম্মান-প্রকাশে তৎপরতা প্রভৃতি গুণ সভ্যতার অঙ্গ হয়, তাহা হইলে হিন্দুগণ ইউরোপের কোনও জাতি অপেক্ষাই সভ্যতায় হীন নহে।

ফলতঃ আমাদের সাহচর্য্যে ইংরাজ কোন্ বিষয়ে কতদূর সভ্য হইয়াছেন ও আমরা ইংরাজের সাহচর্য্যে কোন্ বিষয়ে কতদূর সভ্য হইয়াছি, তাহা মনরো মহোদয়ের বর্ণিত এই মান-দণ্ডের সাহায্যে ধীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। মিঃ ব্রুকস্ এডমাসের যে উক্তি ১৯০ পৃষ্ঠে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে অনুধাবন করিবার যোগ্য। পরলোকগত ডিগ্‌বী মহোদয় লিখিয়াছেন,—

It was a L. G. of Bengal still living and engaged in strenuons work in London, who, a few years ago, remarked in response to a suggestion that closer co-operation on the higher spheres of rule betwen Europeans and Indians would give the latter an opportunity of teaching us many thing. we did not know

অর্থাৎ বঙ্গের একজন ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট ইদানীং লণ্ডনে থাকিয়া বহু জনহিতকর কার্য্য সাধন করিতেছেন। ইনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উচ্চ পদে দেশীয়গণের নিয়োগ-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, শাসনবিভাগের উচ্চস্তরে দেশীয়দিগের নিয়োগ হইলে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের দেশীয় সহকারিগণের নিকট অনেক নূতন বিষয় শিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন।

কলিকাতা আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হাভেল সাহেব বলেন,—"এদেশের লোকের শিল্প সম্বন্ধে রুচি অনেকটা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এদেশে অট্টালিকা-নির্ম্মাণ-বিদ্যার বহু উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল—প্রাচীন অট্টালিকা ও মন্দিরসমূহে এদেশের স্থাপত্য-বিদ্যার বিচিত্র নিদর্শন রহিয়াছে। বিগত ১৫০ বৎসরে বিলাতে অট্টালিকা-নির্ম্মাণে এক প্রকার বিকৃত রুচি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এদেশের সরকারি আফিসসমূহ সেই বিকৃত বিলাতী শিল্পের আদর্শ রচিত হওয়াতে এদেশীয় লোকের রুচিও বিগড়াইয়া গিয়াছে। ফলে দেশীয় কারিকরগণ দেশীয় রাজন্যবর্গ দ্বারা উপেক্ষিত হইতেছে, কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার "অসবরন" প্রাসাদ সজ্জিত

করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় কারিকরগণকে বিলাতে লইয়া গিয়াছিলেন। দেশে উৎকৃষ্ট স্থাপত্যের আদর্শ বিদ্যমান থাকিতে দেশীয় রাজন্যবর্গ আপনাদের প্রাসাদসমূহ কেন যে, বিকৃত বিলাতী আদর্শের অনুকরণে শ্রীহীন করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। এদেশে উৎকৃষ্ট ও গৌরবান্বিত স্থাপত্য-বিদ্যার যে অসংখ্য নিদর্শন রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে এদেশের লোকের ভালরূপ জ্ঞান জন্মিলে ভারতীয় শিল্প নবজীবন লাভ করিবে।"

কলিকাতার চৈতন্য লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসব সভায় বক্তৃতাকালে এই সকল কথার পুনরুক্তি করিয়া হাভেল সাহেব বলেন,—

"জাতীয় কলা-শিল্পের অবনতি জাতীয় অবনতির নিদর্শন, জাতীয় কলা-শিল্প এক কালে বিলুপ্ত হইলে জাতীয় জীবনের অস্তিত্বও থাকে না, ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। জাপান রাজনীতিক ব্যবস্থা বিষয়ে পাশ্চাত্যদিগের অনুকরণ করিলেও আপনার কলা-শিল্পাদির প্রতি অমনোযোগ করে নাই। জাপানের অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ জাতীয় ভাবেই হইয়াছে। জাপানের জাপানত্ব যে রক্ষা পাইয়াছে, জাপানের সমর-নৈপুণ্য তাহার কারণ নহে, জাতীয় কলা-শিল্পের রক্ষাকল্পে জাপানীদিগের চেষ্টাই তাহাদের জাতীয়ত্ব-সংরক্ষণের প্রধান সহায় হইয়াছে। যে জাতির হৃদয়ে কলা-শিল্পের প্রতি অনুরাগ নিহিত আছে, সে জাতির আচার, ব্যবহার, ভ্রমণ, উপবেশন, কথোপকথন প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপীয়দিগের সে অনুরাগ আদৌ নাই। ইউরোপীয়েরা ইদানীং বাণিজ্যাদি অর্থ-কর ব্যাপারে কায়-মনঃ সমর্পণ করিয়াছেন। শিল্প-কলার যে একটা প্রয়োজন আছে, ইউরোপীয়েরা তাহা এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছে। ইউরোপের যে কোন নগরে গমন কর; দেখিবে, সৌন্দর্য্য-বিহীন, কদর্য্য ইষ্টক-রাশি-স্বরূপ অট্টালিকা-সমূহে ধনি-গণ সন্তুষ্ট-চিত্তে বাস করিতেছেন, হয়ত বাটীর ভিতরে দুই দশ খানি চিত্রাদি আছে। সকলেই কিসে অধিক অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবেন, সেই চিন্তায় উন্মত্ত। দরিদ্রেরা অতি কদর্য্য ভাবে জীবন যাপন করিতেছে। এ সকল কখনই কলা-শিল্পের প্রতি অনুরাগের নিদর্শন নহে। তথাপি ভারতবাসী আপনাদিগের প্রাচীন কীর্ত্তির বিষয় বিস্মৃত হইয়া অন্ধভাবে পাশ্চাত্যদিগেরই অনুকরণ করিতেছে! যাহারা পূর্ব্বে তাজমহল ও অন্যান্য সুন্দর অট্টা-

লিকাদির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাদিগের বংশধরেরা এক্ষণে পাশ্চাত্য শিল্পীদিগের কদর্য্য প্রণালীর অনুসরণ করিতেছে, ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে? ইউরোপীয়েরা এদেশে যে সকল বৃহৎ অট্টালিকাদির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে কলা-নৈপুণ্য ত আদৌ নাই, অধিকন্তু রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক উপসর্গের পক্ষেও তৎসমুদায় নিরাপদ নহে। তথাপি ভারতবাসী অন্ধের ন্যায় পাশ্চাত্য প্রণালীর অবলম্বন করিয়াছে! ভারতের অভ্যুদয়-সাধন করিতে হইলে ভারতীয় শিল্পাদির পুনরুদ্ধার-সাধন একান্ত আবশ্যক।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—

A system of education which excluded both art and religion could never succeed : because it shuts out the two great influences which mould the national character. There were obvious reasons why State-aided University could not indentify itself with religious teaching, but art was neutral ground upon whish all creeds and schools of thought could meet.

অর্থাৎ যে শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিল্প ও ধর্ম্মের স্থান নাই, হাবেল সাহেবের মতে তাহা দ্বারা কখনই জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্ম-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত না হইতে পারে, কিন্তু শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় না কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। (১)

বিজ্ঞান-শাস্ত্রের চর্চ্চা পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বর্ত্তমান উন্নতির মূল। তাই আমরা বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছি। কিন্তু আমরা এমনই মোহান্ধ যে, ইংরাজী পুস্তকে বিজ্ঞান-বিদ্যার আভাস

---

(১) জাপানী অধ্যাপক "কাকাসা ওকাকুরা"—প্রণীত Ideals of East নামক গ্রন্থের ভূমিকায় সিষ্টার নিবেদিতা লিখিয়াছেন,—

Arts can only be developed by nations that are in a state of freedom. It is at once indeed the great means and fruitage of that gladness of liberty which we call the sense of nationality. It is not therefore very surprising that India, divorced from spontaniety by a thousand years of oppression, should have lost her place in the world of the joy and beauty of labour.

স্বাধীন অবস্থায় মনে যে স্ফূর্ত্তি থাকে তাহা শিল্প-কলার উন্নতি-সাধনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতবাসী বহুদিন হইতে পরাধীন থাকায় শিল্প জগতের উন্নতি সাধন করিতে পারে নাই। এই কথা বলিয়া লেখিকা দেখাইয়াছেন, ভারতবাসী যখন স্বাধীন ছিল, তখন শিল্প বিষয়ে সমস্ত এশিয়াখণ্ডের শিক্ষা-গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল।

পাইয়াই আত্ম-হারা হইয়াছি। তাই সকল বিষয়েই বৈজ্ঞানিকতা-প্রকাশে আমাদের আগ্রহ বাড়িতেছে। আমাদের প্রাচীন সংস্কার-সমূহকে বিজ্ঞান-বিরোধী ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতেও আমরা অগ্রসর হইয়াছি। কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্যার সহিত প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের অদ্যাপি যে আদৌ পরিচয় হয় নাই, তাহা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছি না। এদেশে বিজ্ঞান-বিদ্যা এখনও পুস্তক-গতা রহিয়াছে, "উহা দ্বারা আমাদিগের বুদ্ধি বা চিত্তের কোনও সংস্কারই হয় নাই; দেশের উপভোগ্য শিল্পজাতও সংবর্দ্ধিত বা স্বল্প-মূল্য হইয়া উঠে নাই।" অধিক কি, আমাদের ছাত্রেরা অদ্যাপি জাপানীদিগের ন্যায় শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকদিগকে বলিতে শিখে নাই—Please, sir, we don't want to read American or European history any more. We want to read how balloons are made. (মহাশয়! আমরা আর আমেরিকা বা ইউরোপের ইতিহাস পড়িতে চাই না; ব্যোম-যান কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাই এখন আমরা শিখিতে চাই!)। দেড়শত বৎসরের ইংরাজ-সংসর্গ ও ইংরাজী শিক্ষার পরও আমাদিগের মধ্যে যে বিজ্ঞান-প্রীতির সঞ্চার হয় নাই, জাপানীদিগের মধ্যে ত্রিশ বৎসরে সেই বিজ্ঞান-প্রীতি অভূতপূর্ব্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে। তাই জাপানী শিল্প-পণ্যে ভারতীয় বিপণীশ্রেণী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এদেশে ইংরাজের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা কিরূপ অন্তঃ-সার-শূন্য, তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অথচ এই শূন্য-গর্ভ শিক্ষার মোহে আমরা অভিভূত হইয়া আত্ম-দৃষ্টি হারাইতেছি!

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মহোপকারক অংশ যাহাতে এদেশে প্রচারিত না হয়, সে বিষয়ে রাজ-পুরুষদিগের যত্ন ও সতর্কতার ত্রুটি নাই। পরলোকগত টাটা মহাশয়ের অসীম-বদান্যতা-প্রসূত "রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট" নামক বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলতায় এতদিনেও যথোচিত ভাবে কার্য্যে পরিণত হইল না। টাটা মহোদয় ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এদেশে প্রকৃত বিজ্ঞান-চর্চ্চার সূত্র-পাত করিতে চাহিয়াছিলেন, মহীশূরের মহারাজ তাহাতে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই শুভানুষ্ঠানের সূচনা-দর্শনে বিশেষ প্রীত নহেন। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যে অংশের দ্বারা এদেশীয়

সমাজে অকারণ বিপ্লবের সঞ্চার হইতে পারে, এদেশে বহুদিন হইতে সেই অংশের প্রচার করা হইয়াছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের মোহকর বিরোধ-প্রবণতা আমরা আয়ত্ত করিয়া বিবিধ সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছি। সেই বিপ্লবের আবর্ত্তনে পড়িয়া আমাদিগের কর্ম্ম-শক্তি বহু-পরিমাণে জড়ীভূত হইয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিশ্লেষণ-কার্য্যে বিশেষ পটু। জগতে ঐক্যের মধ্যে কোথায় অনৈক্য আছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একটা প্রধান কার্য্য। পক্ষান্তরে, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান—এই বৈচিত্র্যময় জগতে, চর্ম্ম-চক্ষে প্রতীয়মান পার্থক্যের বিনাশ-পুরঃসর বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা না করিয়া, তাহার মধ্যস্থিত নিগূঢ় ঐক্য-সূত্র অধিকার-পূর্ব্বক, ঋজু-কুটিল নানা পথে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন হওয়াই প্রাচ্য প্রতিভার প্রকৃতি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপ-দর্শন অধ্যায়ে এই তত্ত্ব বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

"আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বহুকাল হইতেই নানা বিভিন্ন মত পরিপুষ্ট হইয়া মনটিকে এমনই করিয়া তুলিয়াছে যে, সকল বিরোধের মধ্যেই সেখানে নির্ব্বিবাদে কেমন একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়া আসে। কর্ম্ম-ফলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াও আমাদের দেবভক্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় না; বিশ্ব-সংসারকে মায়া এবং মোহ বলিয়া উড়াইয়া দিই, আবার সমগ্র বিশ্বে দেবতার আবির্ভাব দেখিয়া, তরুলতা-গুল্ম হইতে সর্ব্বলোকে মায়াতীত বিশ্বেশ্বরের মহতী মঙ্গল-ইচ্ছার বিকাশ অনুভব করিয়া, প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়ি; দেবতা এক এবং অদ্বিতীয় জানিয়া ইতর বস্তুর পূজা নিষ্ফল বলিয়া বুঝি, আবার প্রতি ক্ষুদ্র পাষাণ-খণ্ডের চরণে নৈবেদ্য নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারি না; দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদকে সমান ভাবে অন্তরে স্থান দিয়া থাকি। ব্রহ্মকে নির্গুণও বলি, আবার সগুণ জানিয়াও পূজা করি; যেখানে বিভিন্ন মতের মধ্যে স্পষ্ট বিরোধ দেখা যায়, সেখানেও আমরা উভয়কেই অকাতরে আত্মসাৎ করিয়া লই। নানা মতের সংঘর্ষে আমাদের মনের, বোধ করি, নানা বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখিবার শক্তি একটু বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখি বলিয়াই আমাদের মনে বিরোধ সহজেই ভঞ্জন হইয়া আসে।

"যে সমস্ত বড় বড় ধর্ম্ম-তত্ত্ব ইংরাজ সংস্কারকেরা হালে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করাইতেছেন,—যেমন, জাতি-উচ্ছেদ, মানবে মানবে সাম্য, ঈশ্বরের একমাত্রতা, এবং প্রতিমার অকিঞ্চিৎকরতা,—সে সকলই আমাদের দেশের অশিক্ষিত জন-সাধারণের মধ্যেও নূতন কথা নহে। সামান্য কুটীর-বাসী কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলে সেও বলিবে, ধর্ম্মের নিকট জাতি নাই, সকলেই সেই একমাত্র প্রত্যক্ষের অগোচর পরমেশ্বরের সৃষ্টি,

এবং সেই মহান্ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে ও সর্ব্ব ঘটে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন। যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তবে শিলাখণ্ডকে পূজা করিয়া ফল কি? পিতৃপিতামহাগত লোকাচারের উল্লেখ করিয়া সেও বলিবে, ইহার মধ্যেও ত পরমেশ্বর আছেন, এবং সেই সঙ্গে নিরাকারকে ধারণ করিবার সামর্থ্য অস্বীকার করিয়া বিনীতভাবে সর্ব্বসমক্ষে আপনার অজ্ঞতা নিবেদন করিবে। কিন্তু নিজে শিলাখণ্ডের পূজা করে বলিয়া অপ্রতিম ব্রহ্মোপাসনার মহত্ত্ব অস্বীকার করিবে না।

"ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে দেখিবার অভ্যাসে মনের এইরূপ প্রসর বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই এবং সৃষ্টির সর্ব্বত্র নানা বিরোধের মধ্যে এক চিরন্তন নিগূঢ় অবিরোধ আবিষ্কার করিয়া চিত্ত সমগ্র বহির্জগৎকে অন্তরে আয়ত্ত করিতে শিখে।" "সাধনা"—৺ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "খণ্ডগিরি" শীর্ষক প্রবন্ধ।

বলেন্দ্র বাবু যথার্থই বলিয়াছেন, যে,—"এই বিরোধ-গ্রাসিতাই হিন্দুধর্ম্মের জীবন এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে এইটুকু ছিল বলিয়াই, বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে স্থায়ী হইতে পারিল না। ব্রাহ্মণেরা আবার বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং বৌদ্ধ-মূর্ত্তি লইয়া যদি বা কোন কালে গোলযোগ উঠিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাও মিটান হইয়াছে।"*

মুসলমানদিগের সম্বন্ধেও এই কথা। হিন্দুধর্ম্মের এই "বিরোধ-গ্রাসিতা" বা সামঞ্জস্য-সাধনী শক্তির জন্য ইস্লাম-ভক্ত মুসলমানও হিন্দুর চির-বিদ্বেষের পাত্র হন নাই।

"ছাপরা-নগরবাসী কয়েকটি ব্রাহ্মণ তত্রত্য একটি সুপ্রসিদ্ধ মৌলবীর সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন,—মহাশয়, মৌলবী সাহেব মুসলমান হইলে কি হয়, উনি এমনি পবিত্রাচার ও পবিত্রমনা ব্যক্তি যে, আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি উঁহার উচ্ছিষ্ট

---

* নানা বিরোধের মধ্যে এক চিরন্তন ঐক্যের আবিষ্কারই অদ্বৈতবাদের প্রধান শিক্ষা। এ শিক্ষাও ভক্তির প্রতিকূল নহে। এই উদার শিক্ষা ভারতবর্ষে যত প্রচারিত হইবে, ততই আমাদের তুচ্ছ বিরোধে উপেক্ষা ও জাতীয় ভাবের পরিপুষ্টি ঘটিবে। খ্রীষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে একনাথ, রামদাস ও তুকারাম প্রভৃতি সাধু পুরুষদিগের চেষ্টায় দেশে অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হওয়ায় বর্ণ-ভেদময় মহারাষ্ট্র সমাজে অসাধারণ একতা ও একাগ্রতার সঞ্চার এবং স্বাধীন মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই অদ্বৈতবাদের বলেই শক-যবন-হূণ-পহ্লবাদি বহিঃশত্রুর ও বৌদ্ধ, চার্ব্বাক নানক, কবীরপন্থী প্রভৃতি অন্তঃশত্রুর পুনঃপুনঃ সংঘর্ষে হিন্দু সমাজ আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, ইংরাজী শিক্ষার ফলে অদ্বৈতবাদের উদারতা আমরা এখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারি না। খ্রীষ্টীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির বিরোধ-প্রবণতা ক্রমে আমাদিগের উপরে আধিপত্য-বিস্তার করিতেছে।

ভোজন করি, তাহাতে আমরা অপবিত্র হইলাম, এমন মনে করিতে পারি না।" বাস্তবিক মুসলমানদিগের মধ্যে এমনি উদারচেতা পবিত্রকর্ম্মা মহাশয় সকল আছেন বটে। আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মোলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে, প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানেরা অত্যুন্নত আর্য্যমত-বাদই গ্রহণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগেরই মধ্যে এক জনের সহিত কথোপকথন-কালে যখন শুনিলাম, "উওঃ ইয়ে হ্যায়", আমার বোধ হইল, যেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-এই বৈদিক মহাবাক্যটি কোন প্রাচীন ঋষির মুখ হইতে বিনির্গত হইল।

যে জাতির মধ্যে আজিও এমন সকল লোক বিদ্যমান আছেন, সেই জাতি যে আপনার অভ্যুদয়কালে নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারকারীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কদাপি বিশ্বসনীয় নহে। মুসলমানদিগের ভারত-রাজ্য-শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই ভারতবর্ষ একটি সর্ব্ব-প্রদেশ-সাধারণ-প্রায় হিন্দী ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে, হর্ম্ম্য-শিল্প একটি উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সুসংযত হইয়াছে এবং সৌজন্য-রীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমান-দিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থই মহা-ঋণগ্রস্ত। কোন কোন মুসলমান শাসন-কর্ত্তা প্রজা-পীড়ন করিয়াছেন সত্য; কিন্তু অনেকেই ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন। আর যাঁহারা অন্যায়াচারী ছিলেন, তাঁহাদিগেরও অত্যাচার প্রায়ই দেশব্যাপী হয় নাই,—দুই চারিটি ধনশালী ও পদস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল।''—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত "সামাজিক প্রবন্ধ।"

"মুসলমান শাসন-প্রণালী কষ্টকর ছিল, এ কথা আমরা স্বীকার করি না। যখন অল্প আয়ে এত অভাব হইত না, দেশের লোকে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে রাজ সরকারে সর্ব্বোচ্চ পদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইত, দেশের টাকা দেশেই থাকিত, একখানা বড় ছোরা রাখিতে হইলে "পাশ" লইতে হইত না, এত লোক অনাহারে কষ্ট পাইত না, তখন-কার অবস্থা যে বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় ছিল, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? হিন্দু-রাজ্যে মুসলমান গুণীর আদর ছিল, মুসলমান রাজ্যে হিন্দু গুণবানের উন্নতি হইত। এ সকল কথা আমরা ইংরাজের কল্পিত কথায় ভুলিতে পারি না (১)। ফলতঃ সত্য কথা বলিতে হইলে, বলিতে হয়, পাশ্চাত্য সভ্যতা-দর্শনে আমরা ইউ-রোপের প্রতি বিশেষ ভক্তি-সম্পন্ন হইতে পারি নাই।"—হিতবাদী।

সুবিজ্ঞ ভূদেব বাবুর ও কাব্যবিশারদ মহাশয়ের এই সকল উক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভেদনীতির বলে যাঁহারা ভারত-শাসন করিতে চাহেন, তাঁহারা হিন্দু মুসলমানে বিরোধ-বর্দ্ধনের জন্য

(১) ভারতের অনেক দেশীয় হিন্দুরাজ্যে মুসলমান মন্ত্রী ও মুসলমান রাজ্যে হিন্দু মন্ত্রীর অদ্যাপি নিয়োগ হইয়া থাকে। বিশাল নিজাম রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী একজন হিন্দু; বরোদা রাজ্যের মন্ত্রী একজন মুসলমান।

মুসলমানদিগকে অত্যাচার-পরায়ণ ও অসভ্য-রূপে ভারতীয় কোমল হৃদয় ছাত্রদিগের সমক্ষে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই আমরা বাল্যকাল হইতে শিখিয়াছি, মুসলমানেরা এক হস্তে তীক্ষ্ণ কৃপাণ ও অপর হস্তে কোরাণ লইয়া কৃতান্তের বেশে নানা দেশ উৎসাদিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন হইল, লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক টমাস আরণল্ড সাহেব 'Preaching of Islam' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সমগ্র সভ্য জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্ম-বিষয়ে বক্তৃতার দ্বারা কেবল মুসলমান বণিকেরাই সমস্ত পৃথিবীতে ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এসিয়ার প্রত্যেক-প্রদেশে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে কিরূপ শান্ত ভাবে 'ইস্‌লাম' প্রচারিত হইয়াছে, প্রত্যেক প্রচারকের নাম ধাম লিখিয়া তিনি তাহা অতি বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। চীন-সাম্রাজ্যের প্রায় এক চতুর্থাংশ লোক যে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন, তাহা কি তরবারির বলে? চীনে কোনও সময়েই মুসলমানগণ দিগ্বিজয়ি-রূপে প্রবেশ করেন নাই, বা রাজত্ব করেন নাই। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বর্ণিও এবং আফ্রিকায় আরব বণিক্‌দিগের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের দ্বারাই ইস্‌লাম প্রচারিত হইয়াছে। খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার একদল লোকের ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানের প্রত্যেকেই তাঁহাদিগের স্ব-ধর্ম্মের প্রচারক; তাঁহাদের ধর্ম্মে পুরোহিত-প্রথা না থাকাতে সকল লোকেই, বিশেষতঃ আরব বণিগ্‌গণ অবসর-মত ধর্ম্ম-বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া এবং সুদৃষ্টান্তের দ্বারা বহু দেশে ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিস্তার করিয়াছেন। কোরাণে বিধর্ম্মীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার জন্য ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

আরণল্ড সাহেব বলেন, "যদিও মুসলমানেরা সময়ে সময়ে অত্যাচার করিয়াছেন, তথাপি সমস্ত মুসলমান জাতির ইতিহাস পাঠে সহজে অনুমিত হয় যে, মুসলমান রাজত্ব-কালে ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বিগণ ধর্ম্ম-বিষয়ে যেরূপ স্বাধীনতা-ভোগ করিতেন, বর্ত্তমান কালের ভারতবর্ষ ব্যতীত খ্রীষ্টান জগতে তাঁহারা কোনও সময়ে সেরূপ ধর্ম্ম-বিষয়ক স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারেন নাই।" কোরাণের ইংরাজী অনুবাদক ঘোর ইস্‌লাম-বিদ্বেষী খ্রীষ্টান জজ সেল সাহেব কোরাণের উপক্রমণিকার ১১১ পৃষ্ঠায়

বলিয়াছেন, They (Christians) have shewn a more violent spirit of intolerance than either of the former (the Jews and the Mahomedans) অর্থাৎ খ্রীষ্টানগণ য়িহুদী ও মুসলমানগণ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক-পরিমাণে ধর্ম্ম-বিষয়ে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছে। মহম্মদের এক হস্তে কোরাণ ও অন্য হস্তে কৃপাণ-ধারণপূর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রচারের আদেশ-দানের কথা সম্পূর্ণ অলীক। ভেদনীতি-কুশল ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণের কল্যাণেই এইরূপ নানা অমূলক সংস্কার দেশের লোকের, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষিত লোকের মনে স্থান পাইয়াছে। মিঃ আর্ণেষ্ট পেরিয়ন নামক জনৈক ফরাসী লেখক ও ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন,—সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া আমি দেখিয়াছি যে, ভারতের কুত্রাপি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনোমালিন্য নাই। হিন্দু মুসলমান-ঘটিত অধিকাংশ বিবাদই ইংরাজ রাজপুরুষদিগের কুটিলতায় সংঘটিত হইয়া থাকে!

পরকীয় শাসন সকল দেশেই সকল জাতির পক্ষেই ক্লেশকর ও সমাজের অবনতি-সাধক, সন্দেহ নাই। কিন্তু মুসলমান শাসন এদেশের পক্ষে যেরূপ অল্প ক্ষতিকর হইয়াছিল, ইংরাজ শাসন সেরূপ হয় নাই। ভারতে পঞ্চশত-বর্ষব্যাপী মুসলমান-শাসনের পর হিন্দু জাতি নবতেজে আবার আপনাদিগের প্রভাব-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিল। মুসলমান-শাসনে হিন্দুগণের শক্তি-বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত থাকায় দিল্লীর মোগল শক্তি বিলাস-ব্যসনে দুর্ব্বল হইয়া যাইবার পর হিন্দুগণ পঞ্জাব, মধ্য-ভারত ও দক্ষিণাপথে সুবিস্তৃত-রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন। মুসলমানের নিকট হিন্দুগণ শাসন-নীতি ও যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে অনেক অভিনব তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর-পূর্ব্বক বীরেন্দ্র-সমাজে ও রাজনৈতিক জগতে বরণীয় হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজের আমলে আমাদিগের শক্তি এরূপ নষ্ট হইয়াছে যে, লর্ড কর্জ্জনের মতে, ইংরাজেরা আজ ভারত-ত্যাগ করিলে ভারতীয় সমাজ তাসের ঘরের ন্যায় দেখিতে দেখিতে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। মুসলমান শাসনে হিন্দুগণ নব-প্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। বারুদ, কামান, কাচ, মোমবাতী, ঘরের আসবাব, ঘোড়ার জিন, প্রভৃতি নির্ম্মাণের উন্নত কৌশল মুসলমানেরাই এদেশে প্রবর্ত্তিত করেন। মুসলমানদিগের চেষ্টায় ভারতীয় সঙ্গীত,

চিকিৎসা, জ্যোতিষ, স্থাপত্যবিদ্যা, উদ্যানশাস্ত্র, প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। মুসলমানদিগের দৃষ্টান্তে হিন্দুদিগের ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতিরও উন্নতি সাধিত হয়। রাস্তা, ঘাট, খাল, পান্থশালা, ডাকঘর প্রভৃতি বিষয়ে মুসলমান শাসনে ভারতের সামান্য উন্নতি হয় নাই। ইংরাজ লেখকেরা স্বার্থ-বশে যাহাই বলুন, এ সকল কথা কোনও হিন্দুরই বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

মৌলবীগঞ্জের জনৈক বিজ্ঞ মুসলমান হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য-বৃদ্ধি-বিষয়ক আলোচনা-প্রসঙ্গে একদা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার নিম্নলিখিত অংশ বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।—

"মুসলমানেরা অর্থ-শোষণের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই। মহমুদ-গজনবী ও তৈরমুরলঙ্গের কার্য্য লুণ্ঠন নামে অভিহিত হইতে পারে। কিন্তু লুণ্ঠন ও শোষণ এক কথা নহে। চিরকাল বুকে বসিয়া হৃদয়ের শোণিত পান করা, আর একবার বা দ্বাদশবার অর্থ লুণ্ঠন করা সমান নহে। অন্য জাতির ন্যায় যদি ভারতের অর্থশোষণ করিয়া নিজ দেশের উন্নতি-সাধনই মুসলমানের লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে ভারতভূমি মুসলমানগণের দীর্ঘকালব্যাপী শাসনে মরুভূমি হইয়া উঠিত, কিন্তু তাহা না হইয়া মুসলমান শাসন-কালে যে ভারতের লোকের আর্থিক এবং শারীরিক অবস্থা এখনকার অপেক্ষা ঢের ভাল ছিল, তাহা বোধ হয় বিদেশী ঐতিহাসিকেরাও অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

"আকবর শাহের মানসিংহ, টোডরমল; অওরঙ্গজেবের যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ; আলিবর্দ্দী খাঁর ফতে চাঁদ জগৎশেঠ, রামজীবন, এবং সিরাজদ্দৌলার মীরমদন, মোহনলাল প্রভৃতি হিন্দু সেনাধ্যক্ষ বা মন্ত্রিদল হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অগাধ বিশ্বাস ও প্রীতিই সূচনা করিতেছে। ঐরূপ, শিবাজী মহারাজের মুসলমান নৌ-সেনাধ্যক্ষ, প্রতাপাদিত্যের মুসলমান সেনাপতি, মহারাজ সীতারাম রায়ের বক্তিয়ার খাঁ, এমন কি, অধুনাতন জমিদারগণের মুসলমান সর্দ্দারগণও মুসলমানের প্রতি হিন্দুর সমধিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পরিচয়ই প্রদান করিতেছে।

"বহুদিন মুসলমান-শাসনে বাস করিয়া হিন্দুগণ মুসলমান-প্রাধান্য স্বীকার করিতে শিখিয়াছেন। মুসলমানগণও অধিকাংশ স্থলেই হিন্দু মহাজন বা জমিদারগণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে শিখিয়াছেন। মুসলমান বলিয়া সরকার বাহাদুর একটী কপর্দ্দক রাজকর খাতির করেন না, কিন্তু অনেক হিন্দু জমিদারের অধীনতায় এখনও পীরোত্তর বা দরগা বা মসজিদ রহিয়াছে; বিপদে এখনও অনেক মুসলমান হাত বাড়াইলে এক হিন্দুর নিকটেই সাহায্য পাইতেছে।

১৯০৩ সালের নবেম্বর মাসে "আউধ আখ্‌বার" নামক পত্রে আফ্‌গানিস্থান-প্রবাসী হিন্দুদিগের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়,—

"কাবুল নগরে দুইটী হিন্দুপল্লী, দুইটী হিন্দু ধর্ম্মশালা এবং একটী শব-দাহের ঘাট আছে। নগরে বহুসংখ্যক হিন্দু বণিক্ ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া থাকেন। তত্রত্য হিন্দু রমণীগণ তাঁহাদিগের মুসলমান ভগিনীদিগের ন্যায় আপাদ-মস্তক অবগুণ্ঠনাবৃত করিয়া নির্ভয়ে প্রকাশ্য রাজপথে গমনাগমন করিয়া থাকেন। আমীর মহোদয়ের রাজস্ব-বিভাগের অধিকাংশ কার্য্যই হিন্দু কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ন্যস্ত আছে। সে জন্য কখনও কোন মুসলমান অনুযোগ করেন না। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-কর্ম্মাচরণেও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। মুসলমানেরা সে জন্য কখনও আপত্তি করেন না। শুক্রবারে মুসলমানদিগের সার্ব্বজনিক উপাসনা উৎসবে হিন্দুগণ উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রীতি-সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। আমীরের দরবারে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অধিকার-গত কোন বৈষম্য আদৌ নাই। কাবুল গবর্ণমেণ্ট বর্ণভেদ বা ধর্ম্মভেদে ব্যবস্থা-ভেদ করেন না।"

গত ১৯০৭ সালের প্রারম্ভে কাবুলের আমীর হবিবুল্লা খাঁ বাহাদুর ভারতে পরিভ্রমণ করিতে আসিয়া হিন্দু মুসলমানের প্রীতি-রক্ষা সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন এবং স্বয়ং যেরূপ ব্যবহার করিয়া (অর্থাৎ দিল্লীতে বকর্-ইদের সময় গোহত্যা-নিবারণের আদেশ দিয়া) উপদেশের সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অদ্যাপি সকলের স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে।

ফলতঃ হিন্দু মুসলমানের প্রীত-বর্দ্ধনের পথে ইংরাজ রাজপুরুষেরাই বর্ত্তমান সময়ে প্রধান অন্তরায়। নচেৎ ভারতবর্ষের সামাজিক প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে এখানে ধর্ম্মের বা আচারের বিভিন্নতার জন্য তীব্র বিদ্বেষ অধিক দিন স্থায়ী হয় না। আহার ব্যবহারে ঐক্য না থাকিয়াও লোকের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি রক্ষিত হওয়া এই দেশে চিরাভ্যস্ত ঘটনা। একটু অনুধাবন করিলে দৃষ্ট হইবে যে, দেশের প্রকৃতি-গুণে এখানকার মুসলমানদিগের মধ্যেও এই সামঞ্জস্য-সাধনী শক্তির পরিপুষ্টি ঘটিয়াছে। হিন্দু-রমণীর পাণি-গ্রহণ, হিন্দু-জননীর স্তন্যপান ও হিন্দুদিগকে স্ব-সমাজে আশ্রয়-দান করায় তাঁহাদিগের মধ্যেও হিন্দুর বিরোধ-গ্রাসিতা বিশেষভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে। এখন ভারতে—

"এমন প্রদেশ নাই, যেথানকার অধিকাংশ মুসলমান (হিন্দু) জ্যোতির্ব্বিদ ও অপরাপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কিছু সম্মান বা সমাদর না করেন—যেথানে গো-বধ করিতে

এবং গো-মাংস ভক্ষণ করিতে কিছু না কিছু সঙ্কুচিত না হন—যেখানে হিন্দুদিগের পর্ব্বোৎসবে আমোদপ্রমোদ না করেন—যেখানে আপনাদিগের বিবাহকার্য্যে প্রতিবেশী হিন্দুদিগকে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ না করেন। বাঙ্গালার ও দাক্ষিণাত্যের ত কথাই নাই। কারণ ঐ ঐ প্রদেশবাসী অতি উচ্চ বংশীয় মুসলমানের মধ্যেও কেহ কেহ গোপনে প্রতিনিধি ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা আপনাদিগের নামে সঙ্কল্প করাইয়া দুর্গোৎসব এবং রথ-যাত্রার মহোৎসব করাইয়া থাকেন। অপরে অনেকে অনুগত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা অর্থব্যয়ে ব্রাহ্মণ-সজ্জনের আতিথ্য করেন"—৺ভূদেব বাবুর "সামাজিক প্রবন্ধ।"

পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পুরাণ-পাঠ ও কথকতা শ্রবণ করিতে অনেক মুসলমান ভক্তি-পূত-চিত্তে উপস্থিত হইয়া থাকেন, এ কথাও অনেকের বিদিত থাকিতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে দিনাজপুরে কোনও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের কথকতা শ্রবণ করিবার জন্য স্থানীয় বহুসংখ্যক মুসলমান যথানিয়মে প্রত্যহ সমাগত হইতেন, এ সংবাদ "হিতবাদী" পত্রের সাহায্যে অনেকের গোচর হইয়াছে। বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ দরাফ্ খাঁর গঙ্গা-ভক্তি-বিষয়ক আখ্যায়িকা বোধ হয় অনেকেই জানেন। পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধেও মুসলমানেরা বহু স্থলেই হিন্দু-ব্যবস্থারই অনুসরণ করিয়া থাকেন—তাঁহাদিগের কন্যাগণ ইস্‌লাম শাস্ত্রের বিধানানুসারে পিতৃধনের অংশভাগিনী হইলেও ভারতে সে বিধান প্রায়ই পালিত হয় না। হিন্দুগণ যে মুসলমানদিগের ধর্ম্মোৎসবে অন্তরের সহিত যোগদান করিয়া থাকেন, মুসলমান দেবতার নিকট মানসিক করিয়া পূজা দিয়া থাকেন, ইহাও আমাদের দেশে কাহারও অবিদিত নহে।

হিন্দু-মুসলমানে কোথাও মন ভাঙ্গাভাঙ্গি নাই। আমরা পল্লীগ্রামে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মুসলমান ঘরামিকে এক সঙ্গে ঘরের চালা বাঁধিতে দেখিয়াছি। দুর্গা-পূজার সময় পল্লীগ্রামে হিন্দুর উৎসবে মুসলমানেরা মন খুলিয়া যোগ দিয়া থাকেন। পূজার সময় তাঁহারা ছেলেমেয়ের নূতন কাপড় কিনিয়া দেন, আপনারা নূতন কাপড় ক্রয় ও সারিগান করেন। এই সারিগানে চলিত বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানেরা দুর্গাদেবীর যে "ভজন" গান করেন, তাহাতে সকলেরই প্রাণে ভক্তিরস উথলিয়া উঠে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানেই দেবী-বিসর্জ্জনের দিনে নদী-বক্ষে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যায়—অনেক বড় বড় প্রতিমার নৌকা ও তাহার পাশে পাশে মুসলমানদের নৌকা। আমাদের পল্লীজীবনের পরিচয় যাহারা জানে না, তাহারাই মনে করে যে, হিন্দু-মুসলমানে সর্ব্বত্রই মন কসাকসি চলে। যখন মুস্কিল আসানের

মধুর গান করিতে করিতে 'চেরাক' লইয়া মুসলমান ফকির হিন্দুর দ্বারে আসে, তখন কোন্ গৃহ-লক্ষ্মী সেই চেরাককে দেব-বুদ্ধিতে ভক্তি না করেন? মুসলমান বৃদ্ধারা আমাদের প্রতিগৃহ হইতে সিন্নির জন্য, বা ফতেমার পূজার জন্য পয়সা লইয়া যান, ইহা আমরা বাল্যকালে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের অনেক বাঙ্গালী পারসীতে সুপণ্ডিত। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাব-শতকের অধিকাংশ কবিতাই হাফেজের কবিতার অবিকল অনুবাদ। হাফেজের কবিতায় যে প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব আছে, তাহাতে প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। তাই সরকারি আদম সুমারির বিবরণী-লেখক বিস্ময়-সহকারে বলিয়াছেন,—

In social as in religious matters the people of India are curiously catholic in their tastes. Just as Muhammadans worship Hindu saints and both Hindus and Mussulmans attend and take a more or less active part in each other's religious festivals, so there is a tendency towards the adoption of any matrimonial custom that seem to imply a degree of social superiority. Census Report. (1901) vol. I. part II. pp 435.

মুসলমানেরা ভারতীয় সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন বিষয়েও যত্নের ত্রুটি করেন নাই। হিন্দী সাহিত্য কবীরের রচনায় কতদূর প্রভাবান্বিত, তাহা অনেকের বিদিত থাকিতে পারে। দক্ষিণাপথের মুসলমান কবি ও সিদ্ধ পুরুষেরা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় "যোগসংগ্রাম" নামক গ্রন্থ ও বিবিধ জ্ঞান-ভক্তিপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া মহারাষ্ট্র সাহিত্যের পরিপুষ্টি-বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। তুকারাম, একনাথ প্রভৃতি মহারাষ্ট্র কবিগণও তাঁহাদিগের মুসলমান বন্ধুগণের জন্য উর্দ্দু ভাষায় ঐশ্বরিক-তত্ত্বপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। গদ্য ইতিহাস-রচনার আদর্শ মহারাষ্ট্রীয়গণ মুসলমানের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গে আলওয়াল কবি, পরাগল খাঁ, হুসেন শাহ ও ছুটি খাঁ প্রভৃতি মনীষী মুসলমান গ্রন্থকারের নাম শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থের সাহায্যে অনেকের গোচর হইয়াছে। চট্টগ্রামের মুন্সী আবদুল করিম মহোদয় ঐ অঞ্চলের মুসলমান কবিদিগের যে তালিকা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহাতে ৮৮ জন গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। এই প্রায় শত-সংখ্যক মুসলমান কবি বিবিধ কাব্য রচনা করিয়া এককালে বঙ্গীয় সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিশ জন কবি ষট্‌চক্রভেদ, রাধা-কৃষ্ণলীলা এবং শ্যামা-বিষয়ক কাব্য ও কবিতাদি

রচনা করিয়াছেন। এক চট্টগ্রামেই যখন শত-সংখ্যক মুসলমান কবির দর্শন পাইলাম, তখন সমগ্র বঙ্গে কত শত মুসলমান বঙ্গ-বাণীর সেবায় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহোদয়ের ন্যায় অনুসন্ধিৎসু সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা-বৃদ্ধি বিশেষভাবে প্রার্থনীয়।

ফলকথা, ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ অপেক্ষা মৈত্রীই সমধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হিন্দু-শিক্ষা এই মৈত্রীর বিশেষ অনুকূল। দুঃখের বিষয়, ইদানীং এদেশে কথকতাদির বিলোপের সহিত হিন্দু-ধর্ম্মের এই উদার শিক্ষার প্রচার হ্রাস পাইতেছে। পরন্তু ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা হিন্দু ছাত্রদিগের হৃদয়ে মুসলমান-বিদ্বেষ প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য যথোচিত যত্নপ্রকাশ করিতেছেন। পরিতাপের বিষয়,কোন কোনও অদূরদর্শী হিন্দু লেখক কাব্য-নাটকাদিতে অনর্থক মুসলমান ভ্রাতাদিগের নিন্দাবাদ করিয়া ইংরাজের উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন। রাজপুরুষেরা কখন হিন্দুর প্রতি, কখনও বা মুসলমানের প্রতি পক্ষ-পাত-প্রদর্শন করিয়া পরস্পারের চিত্তে বিদ্বেষ-উৎপাদনে যত্নশীল রহিয়াছেন। যেখানে ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ রাজপুরুষগণের প্রভাব অল্প, সেখানে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি অদ্যাপি বিনষ্ট হয় নাই। তবে দুষ্ট লোকের উত্তেজনায় ইতর-শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানে সময়ে সময়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া থাকে; কিন্তু এরূপ ঘটনা বিলাতেও প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে বিরল নহে, বরং অত্যন্ত অধিক। তাহাতে যদি ইংরাজের জাতীয় ভাবের ব্যাঘাত না ঘটে, আমাদেরই বা ঘটিবে কেন?

ইংরাজের বাক্য-কৌশলে মুগ্ধ হইয়া অনেক মুসলমানের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিয়াছে যে, ইংরাজেরা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের প্রতি সমধিক সদয়। ইংরাজ লেখকেরাও বলেন যে, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের প্রতি ইংরাজের সমধিক প্রীতি নিতান্ত স্বাভাবিক। কারণ, খ্রীষ্টান ইংরাজ একেশ্বরবাদী, মুসলমানও একেশ্বরবাদী, ইংরাজ জাতি-ভেদ মানেন না, মুসলমানও উহা মানেন না, ইংরাজ দেব-প্রতিমা-পূজার বিরোধী, মুসলমানও দেব-প্রতিমা-পূজার বিরোধী। এই সকল বিষয়ে ও অন্যান্য আচার ব্যবহারে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের সহিত ইংরাজের

অধিকতর সাম্য আছে। তাই মুসলমানের প্রতি ইংরাজের সহানুভূতি ও প্রীতি স্বভাবতই অধিক। কিন্তু ইংরাজের শূকর-ভক্ষণ ও স্ত্রী-স্বাধীনতা মুসলমানের চক্ষে কিরূপ বীভৎস ব্যাপার, ইঁহারা তাহার উল্লেখও করেন না। দুঃখের বিষয়, ইংরাজের এই বচন-কৌশলে অনেক মুসলমানই মুগ্ধ হইয়া হিন্দু অপেক্ষা ইংরাজকে আপনাদিগের অধিকতর অন্তরঙ্গ ও হিতৈষী বলিয়া মনে করেন। স্বজাতীয়দিগের এই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য মাদারিপুর-হবিগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত গোলাম মৌলা চৌধুরী সাহেব বরিশালে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা-কালে বলিয়াছিলেন,—

গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে অধিক ভালবাসেন, এই ধাঁধাঁ যদি আমাদের মনে থাকে, তবে আমাদের মুসলমান ভাইদের বলি, চাহিয়া দেখ—গবর্ণমেণ্ট তোমাদের জাতির প্রতি ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ কলিকাতার অন্ধকূপটি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ সিরাজ-উদ্দৌলার চরিত্রটী কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভালবাসার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আরও দেখ, এই যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসিগণ বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কয়জন হিন্দু? প্রায় সকলেই মুসলমান; তবে তাহাদের ভাল অবস্থা হইলেও কেন কুলী নামে তাহারা অভিহিত হয়? তাহাদের থাকিবার জন্য লোক-সমাজের বহির্ভূত স্থান, নগরের বাহিরে স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় কেন? অবস্থায় কুলাইলেও তাহারা গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে পারে না কেন? শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত তাহারা ফুটপাথের উপর দিয়া পর্য্যন্ত চলিতে সমর্থ নহে! সিরিয়া দেশের নিকৃষ্ট শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদিগের যে অধিকার আছে, মহান্ সাম্রাজ্যের অধিবাসী হইয়া, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রজা হইয়া, গবর্ণমেণ্টের ভালবাসার পাত্র হইয়া, কেন মুসলমানেরা সেই সকল অধিকারে বঞ্চিত? তাই বলি, মুসলমান ভাইগণ, আর ভালবাসার মোহান্ধকারে আত্মহারা হইও না, নিজেদের মূল্য নিজেরা বুঝিতে শিখ।"

সংপ্রতি পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদিগকে সামান্য বেতনের চাকরী দিবার লোভ দেখাইয়া অনেক রাজপুরুষ তাঁহাদিগকে হিন্দুর সহকারিতা হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই ঘটনায় ব্যথিত হইয়া বীরভূম হইতে জনৈক বিজ্ঞ মুসলমান সংবাদ-পত্রে পত্র লিখিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

"ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কতিপয় কর্ম্মচারী বঙ্গীয় মুসলমান জাতির শোচনীয় অবনতিতে দুঃখিত হইয়া গরিব মুসলমানগণকে রাজ-সরকারে চাকরী দিবার প্রলোভনে এতই মুগ্ধ করিয়াছেন যে, আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজ-সভায় শ্বেতাঙ্গ বীরের বাইবেল-গ্রন্থ স্পর্শ-পূর্ব্বক কৃত প্রতিজ্ঞা ও স্বজাতি-দ্রোহী মীরজাফরের লাঞ্ছনার বিষয় ভাবিবার অবসর পাইতেছেন না।

"মীরজাফর শ্বেতাঙ্গ বণিক্‌গণের জন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, সেরূপ কার্য্য কি আর কাহারও দ্বারা সাধিত হইয়াছে? কিন্তু তাহার পরিণাম একবার চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি। আর এই হাতে হাতে হায়দ্রাবাদের বেরার প্রদেশ লইয়া কি ব্যাপার হইয়া গেল, তাহা কি কেহ জানেন না? ইংরাজের সে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা কোথায় গেল? কূটনীতিকুশল ভারত গবর্ণমেণ্টের এইরূপ প্রলোভনপূর্ণ প্রতিজ্ঞা নূতন নহে।

"আসল কথা এই যে, পাছে আমাদিগের স্বদেশী আন্দোলনে বিলাতী বাণিজ্যের কোন অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে রাজপুরুষেরা, যাহাতে হিন্দু মুসলমান একত্র সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে না পারে, তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই নানা কুটিল কৌশল অবলম্বন-পূর্ব্বক হিন্দু মুসলমানের সৌহৃদ্য-নাশের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু মানুষ এক বিষয়ে দুইবার, তিনবার প্রবঞ্চিত হইতে পারে, বার বার কে প্রতারিত হয়? অদূরদর্শী ও অপরিণত-বুদ্ধি হিন্দু ও মুসলমানগণ মধ্যে মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু সুদীর্ঘকাল একত্র সহবাসে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে; এ সম্বন্ধ তাঁহারা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। হৃদয়ের আবেগ প্রতিহত হইবার নহে। সেই জন্য হিন্দুর পর্ব্বে মুসলমান ও মুসলমানদের পর্ব্বে হিন্দুরা যথাসম্ভব উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিগত গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধে জগন্মান্য, সমগ্র মুসলমান জাতির খলিফা আমিরুল মোমেনীন তুর্কী সুলতানের জয়লাভে ভারতের মুসলমানের সহিত হিন্দুগণ উৎসব করিয়াছিলেন। কই, তখন সম্বন্ধ তো ছাড়িতে পারেন নাই? আর আমাদের হিতৈষী শ্বেতাঙ্গগণ সে সময়ে কি করিয়াছিলেন, মনে আছে তো?"

ফলকথা, রাজপুরুষেরা কুটিল নীতির বশবর্ত্তী হইয়া সময়ে সময়ে জাতি-বিশেষের প্রতি যতই পক্ষপাত প্রদর্শন করুন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন-নীতি মুসলমানের বিশেষ অনুকূল নহে। একই শাসন-সূত্রে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান আবদ্ধ। উভয়ের সুখ ও দুঃখ একই প্রকার। একের অমঙ্গলে অপরের মঙ্গল কখনই হইতে পারে না। সুতরাং ইংরাজ মুখে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের প্রতি অধিকতর প্রীতি প্রকাশ করিলেও কার্য্যতঃ মুসলমানের বিশেষ উপকার-লাভের আশা নাই।

রুষ রাজ্যে মুসলমান প্রজার অধিকার তত্রত্য শ্বেতাঙ্গ রুষীয় প্রজাবর্গের অধিকার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। জার মহোদয় প্রকৃতিপুঞ্জের উপর যতই যথেচ্ছাচার করুন, তিনি তাঁহার স্বজাতীয় ও বিজাতীয় প্রজার প্রতি সমান ব্যবহার করিয়া থাকেন। রুষীয় অভিনব পার্লামেণ্ট "ডুমা" সভায় প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার রুষীয় অন্যান্য প্রজার ন্যায় তত্রত্য মুসলমান প্রজারাও প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু রুষরাজ অত্যাচারী

নামে পরিচিত হইয়াও মুসলমানদিগকে যে অধিকার দান করিয়াছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা দান করিতে পারিতেছেন না।

পক্ষান্তরে, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় আমীর আলি সাহেব বলেন,—বৃটিশ-শাসনে ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায় বরং অল্লাধিক পরিমাণে উন্নতির সোপানে অধিরোহণ করিয়াছে, কিন্তু মুসলমানগণের শোচনীয় দুরবস্থা ঘটিয়াছে।—

Whilst all other nationalities have prospered under the British rule, the Mussulmans have alone declined.—*A cry from Indian **Mussalmans.*** The Nineteenth Century, August, 1882

This important community, as history goes, probably the most important only a short time ago, has suffered the most under the British rule. —*An Indian Retrospect.* The Nineteenth Century, October, 1905.

আমীর আলি মহাশয় আরও বলেন,—মুসলমানের নিকট ইংরাজ বঙ্গদেশ লাভ করেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ ১২ই আগষ্ট দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ আলম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে বঙ্গের দেওয়ানি অর্পণ করেন। এই ক্ষমতালাভের পর কিছুকাল পর্য্যন্ত ইংরাজ রাজপুরুষগণ রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় সম্পূর্ণ শাসন ভার মুসলমানদিগের হস্তে রাখিয়াছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, তাহার ফলে শাসন-বিভাগের সমস্ত উচ্চপদগুলি শ্বেতাঙ্গগণের "একচেটিয়া" হইয়া যায়। কিন্তু বাদশাহ্ যখন ইংরাজের হস্তে দেওয়ানি অর্পণ করেন, তখন ইংরাজগণ যথাসাধ্য মুসলমান-পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শাসন-কার্য্য পরিচালন করিবেন, অবশ্যই এইরূপ একটি সর্ত্ত হইয়াছিল। অন্ততঃ উভয় পক্ষই এইরূপ সর্ত্তের অনুমান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিক ডাঃ হণ্টার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজ এই সর্ত্ত রক্ষা করিয়া চলেন নাই। কিছু দিন পরেই তাঁহারা মুসলমান জায়গীরদারদিগের হস্ত হইতে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া ঐ কার্য্যে শ্বেতাঙ্গ কলেক্টার নিযুক্ত করেন। ইহাতে মুসলমানের সম্ভ্রম ও ক্ষমতা নষ্ট হইল। ইহার পর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে আয়মাদার ও লাখরাজদারগণের দলিলপত্র পরীক্ষা করিবার আদেশ করিয়া মুসলমানের সর্ব্বনাশ করিলেন। এই তদন্তের জন্য স্বতন্ত্র আদালত স্থাপিত হইল, এবং ইহার পরবর্ত্তী ১৮ বৎসর কাল সমগ্র বাঙ্গালাদেশ গোয়েন্দা, মিথ্যা সাক্ষী ও স্বত্বাপহারক কর্ম্মচারিবৃন্দের কোলাহল-জনিত অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইল।

নবপ্রতিষ্ঠিত আদালতে আইনের কুটিল তর্কজালে জড়িত হইয়া অনেক মুসলমান ভূস্বামী আপনাদের স্বত্ব প্রতিপাদন করিতে না পারায় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। দীর্ঘকাল পুরুষানুক্রমে সম্পত্তির ভোগদখল করিতেছিলেন বলিয়া মুসলমান জমিদারেরা আপনাদিগের স্বত্বসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন ও দলিল দস্তাবেজ রক্ষা-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন নাই। কাজেই তাঁহাদিগের অনেকে দিল্লীর বাদশাহের সনন্দ-পত্র উপস্থিত করিতে না পারিয়া সম্পত্তির স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন। মারাঠা সর্দ্দারেরাও যে সকল সম্পত্তি হইতে মুসলমানদিগকে বঞ্চিত করেন নাই, দেশে বর্গীর হাঙ্গামা-সত্ত্বেও তাঁহাদিগের যে অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল, সুচতুর ইংরাজ এই কৌশলে তাহা আত্মসাৎ করিলেন! ইংরাজের এই ব্যবহারে শত শত সম্ভ্রান্ত মুসলমান-পরিবার রম্য হর্ম্ম্য পরিত্যাগ করিয়া দীনের ন্যায় জীর্ণ কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। নিষ্কর ভূ-সম্পত্তির আয়ে মুসলমানের যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান ও শিক্ষানুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হইত, সেগুলিও এই দুর্ঘটনায় বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

তাহার পর সাতশত বর্ষের মুসলমান সংস্রবে পারসী ভাষা ভারতের অধিকাংশস্থানেই রাজ-সরকারের ভাষা ও উর্দ্দু প্রায় সমগ্র ভারতবাসীর ভাব-বিনিময়ের একটী সাধারণ ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। আমীর আলি মহাশয় বলেন, ইংরাজ ভেদ-নীতির বশবর্ত্তী হইয়া সরকারি কার্য্যে ইংরাজী ও প্রাদেশিক ভাষাসমূহের ব্যবহার করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। ইহার ফলে ভারতে এক-ভাষা-জনিত ঐক্য নষ্ট হইল, পারসীর নির্ব্বাসনে মুসলমান সমাজের শক্তি আরও কমিয়া গেল। সহসা পারসীর এইরূপে উচ্ছেদ ঘটায় সহস্র সহস্র পারসী-নবিশ কর্ম্মচারী—মুন্সী, মৌলবী—কার্য্যচ্যুত হইয়া অন্নের জন্য হাহাকার করিতে লাগিল। ক্রমে ইংরাজী শিক্ষার আদর রাজ-সরকারে বাড়িতে লাগিল। কিন্তু মুসলমানেরা কিয়ৎ-পরিমাণে অজ্ঞতা-বশে ও কিয়ৎ-পরিমাণে অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ঘোর দারিদ্র্য-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া ইংরাজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। এখনও দারিদ্র্য-বশেই অনেক মুসলমান ইচ্ছাসত্ত্বেও ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতে পারেন না। এদিকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হিন্দু মুসলমান প্রজার প্রদত্ত করের অর্থ হইতে ইউরোপিয়ান বা ফিরিঙ্গী বালকগণের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত করিতেছেন।

এতদিন রাজকার্য্য-লাভক্ষেত্রে হিন্দুগণ মুসলমানদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, এখন হইতে গবর্ণমেণ্ট ফিরিঙ্গীদিগকেও তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিলেন। এইরূপে রাজ-ভক্ত মুসলমানের উন্নতির পথ ইংরাজ-রাজই নানারূপে সঙ্কুচিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। অথচ মুখে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানে প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রকাশ করা হইতেছে !

আমীর আলি মহোদয় মুসলমানদিগের আর একটি গুরুতর ভ্রান্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজ রাজপুরুষগণের মৌখিক মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইয়া অনেক মুসলমানই ইংরাজের প্রিয়-পাত্র হইবার কামনায় হিন্দুর সহিত কোনও রাজনীতিক আন্দোলনে প্রাণ খুলিয়া যোগদান করেন নাই। ইহাতেও মুসলমানের উন্নতির গতি প্রতিহত হইয়াছে। আমীর আলি মহোদয় বলেন,—

The very fact that he (Mussalman) has so far stood aloof from political agitation has caused him a disservice.

অর্থাৎ "রাজনীতিক আন্দোলন হইতে দূরে থাকায় মুসলমানের অনিষ্ট ঘটিয়াছে।"

আমীর আলি মহাশয়ের এই উক্তির প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃগণের বিশেষ মনোযোগ প্রার্থনীয়। তাঁহারা রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ-দান না করিলে তাঁহাদের জাতীয় জীবনে কখনই নূতন স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইবে না।

ইংরাজের আর একটি ব্যবস্থায় মুসলমান সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সম্পত্তি যাহাতে বংশধরগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া না যায়, তাহার জন্য মুসলমান-শাস্ত্রকারেরা "ওয়াকফ্ প্রথার" প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই প্রথা অনুসারে যে কোনও মুসলমান দেবোদ্দেশে সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া কোনও সুযোগ্য আত্মীয়ের হস্তে উহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিতে বা স্থানবিশেষে স্বহস্তেও রাখিতে পারেন। এই সম্পত্তি এক দিকে যেমন দান-বিক্রয়ের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্যদিকে সেইরূপ ট্রষ্টী বা "মোতওয়াল্লী" উহা বংশ-পরম্পরাক্রমে ভোগ করিয়া আপনার বংশ-মর্য্যাদা-রক্ষা করত দাতার অভীষ্ট সদনুষ্ঠানে যথোচিত অর্থব্যয় করিলে তাহাও বৈধ বলিয়াই গণ্য হয়। এই ব্যবস্থায় শত শত মুসলমান পরিবার পুরুষানুক্রমে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া নানা সদনুষ্ঠানে রত থাকিবার সুবিধা পাইতেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী কাল

এই প্রথা মুসলমান-সমাজে প্রচলিত আছে। "ওয়াকফ্" সম্পত্তিই বহু-সংখ্যক শ্রীসম্পন্ন উচ্চবংশীয় মুসলমানের আশ্রয়-স্থল ছিল। আমীর আলি মহোদয় বলেন, ইংরাজ মুসলমানদিগের এই চিরাগত প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া শত শত সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারকে ঘোর বিপন্ন করিয়াছেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, ওয়াকফ্-ঘটিত ব্যবস্থার প্রতিকূলতা করিতে যাইয়া ইংরাজ অনেক স্থলে 'ওয়াকফ্' সংশ্লিষ্ট সদনুষ্ঠানগুলির অনিষ্ট সাধন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপে নানাপ্রকারে মুসলমানের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়াও ইংরাজ আজ অনেক মুসলমানের নিকট সুহৃৎ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, ইহা ইংরাজের সামান্য সম্মোহন-শক্তির পরিচায়ক নহে! (১)

(১) বিগত ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "নবনূর" পত্রে এই সকল বিষয় "মুসলমানের সর্ব্বনাশ"-শীর্ষক প্রবন্ধে অতি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক মুসলমানের ঐ প্রবন্ধটি পাঠ করা উচিত।

ইংরাজের সম্মোহন-কৌশলে যে কেবল হিন্দু মুসলমানে ভ্রাতৃভাব লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে তাহা নহে, তাঁহাদিগের স্বদেশের ও স্ব-সমাজের প্রতি সদ্ভাব ও অনুরাগও ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। কূটনীতি-বিশারদ ইংরাজের সৃষ্ট কুহেলিকায় আমাদিগের—

"দেশের ইতিহাসই আমাদিগের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ কাল হইতে লর্ড কর্জ্জনের সাম্রাজ্য-গর্ব্বোদ্‌গারকাল পর্য্যন্ত যে কিছু ইতিহাস-কথা, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা—তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে, যাহাতে আমাদের দেশের দিক্‌টাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়।"—বঙ্গদর্শন (নব পর্য্যায়) "ভারতবর্ষের ইতিহাস-শীর্ষক প্রবন্ধ।

অপিচ, রবীন্দ্র বাবু উক্ত প্রবন্ধে আরও বলিয়াছেন—

"ছেলে বেলা হইতে আমরা যে প্রণালীতে যে শিক্ষা পাই, তাহাতে প্রতিদিন দেশের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া ক্রমে দেশের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ ভাব জন্মে। বাল্যকাল হইতে আমাদের জ্ঞান-প্রেম-কল্পনার দ্বারে গোরা সৈন্যের পাহারা বসে—আমাদের প্রকৃতির অন্তঃপুরের মধ্যে স্বদেশ-লক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পান না—বিদেশ হইতে আনীত যুক্তি, সংশয় প্রভৃতি কতকগুলা কিঙ্কর-কিঙ্করী সেখানে ভিড় করিয়া বেড়ায়; কিন্তু যিনি তাহাদের কর্ত্রী হইয়া তাহাদিগকে আপন কল্যাণের কাজে, ঐক্যের মহোৎসবে খাটাইতে পারিতেন, তিনি নাই। তাই আমাদের এমন লক্ষ্মী-ছাড়ার দশা, তাই এই ভিক্ষা-বৃত্তি, এই উচ্ছৃঙ্খলতা। তাই এমন বারবার

আড়ম্বর-পূর্ণ অকৃতকার্য্যতা; বাক্যে ও কর্ম্মে, শিক্ষায় ও ব্যবহারে তাই পদে পদে অসামঞ্জস্য। সেই মহালক্ষ্মী যিনি পিতার সহিত পুত্রকে, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতাকে, নিকটের সহিত দূরকে, অনাগতের সহিত অতীতকে, ভিতরের সহিত বাহিরকে অদৃশ্য ঐক্য-বন্ধনে চিরকাল গ্রথিত করিতেছেন, তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দাও। তিনি সমস্ত জ্যামিতি, বীজগণিত, ব্যাকরণ, ভূগোল ও অর্থপুস্তকের পর্ব্বত-স্তূপ বিদীর্ণ করিয়া আমাদের হৃদয়ের অন্তঃপুরে তাঁহার চিরন্তন সিংহাসনে আসিয়া বসুন—সমস্ত শূন্য পূর্ণ হইবে, সমস্ত সংশয় দূর হইবে।

"কিন্তু আমাদের প্রকৃতির দ্বারের কাছে এই যে সকল জঞ্জাল জমিয়া আছে, যাহাতে বাহিরের আলো আমাদের বাহিরেই পড়িয়া থাকে এবং অন্তরের ধন আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহার মধ্য দিয়া পথ করিবে কে? প্রতিদিন প্রহসন ও পরিণামের বিভীষিকা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে কে?

"ভারতবর্ষের একখানি প্রকৃত ইতিহাস এই হাস্যকর—এই শোকাবহ বিড়ম্বনা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার একমাত্র উপায়।"

এই ইতিহাস যেরূপে লিখিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে রবীন্দ্র বাবু বলেন,—বিদেশী বিচারের আদর্শ পরিহার করিয়া শ্রদ্ধার সাহায্যে পিতামহগণের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। এই শ্রদ্ধা না থাকিলে আমরা ভুল করিব। কারণ, যে সকল আধুনিক বিদেশী সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহাদিগকে সংযত করিয়া না রাখিলে, তাহারা অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান যাইতে পারে, জাতি-ভেদ। এই জাতি-ভেদের উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা থাকিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস ঠিক ভাবে লেখা একেবারেই অসম্ভব হয়। * * * তাহা ছাড়া ইউরোপের আদর্শ-কেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ আদর্শ কল্পনা করিয়া, তাহারই দিকে দাঁড়াইয়া বিপর্য্যস্ত দূরবীক্ষণ দিয়া ভারতবর্ষকে অতি ক্ষুদ্র করিয়া দেখিলে ভারত-বর্ষকে দেখা হইবে না। * * * কেবল বিদেশী বাঁধা বুলির দ্বারা কখনও স্বদেশকে বুঝা যায় না। ইত্যাদি।

ইংরাজের সম্মোহন-মূলক শিক্ষায় নানা বিষয়েই আমাদিগের বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার" নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে লিখিয়াছেন,—

"আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীন চিন্তার অবকাশ পাইয়াছি বলিয়া ঘটা করিয়া বক্তৃতা করি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের সেই চিন্তা কি আমাদেরই চিন্তা? আমি রাজ-নীতির সম্পর্ক একেবারে বর্জ্জন করিয়া নিতান্ত 'একাডেমিক' অর্থে জিজ্ঞাসা করিতেছি—প্রবলের সাহায্যে যে দুর্ব্বল মুগ্ধ, তাহার স্বাতন্ত্র্য কোথায়?

* * * * আমরা বর্ত্তমানকালে যে সর্ব্বাঙ্গীণ শান্তি ও আরাম উপভোগ করিতেছি, সেই অবস্থা কি মনুষ্য-সমাজের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পারে? * * * আমাদের বর্ত্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের উদ্যমের নিষ্ফলতাই স্বাভাবিক। * * * বর্ত্তমান কালকে যাঁহারা জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়-কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমি কখনই তাঁহাদের মতের অনুমোদন করিতে পারি নাই, শত শত বৎসরের অন্ধকারের পর যাঁহারা নূতন জ্যোতির আবির্ভাব দেখেন, তাঁহাদের নেত্র-দ্বয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।"—সাহিত্য, আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা ১৩০৬ সাল।

শান্তি সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য সুপ্রসিদ্ধ রোমক পণ্ডিত সিসিরোর (Cecero) উক্তি হইতেও উপলব্ধি হয়;—

Peace indeed is both sweet in name and wholesome in reality, but there is all the difference in the world between peace and slavery. Peace is the calmness of freedom, slavery the worst of all evils, to be kept off at cost not only of war, but of life itself.

অর্থাৎ প্রকৃত শান্তি, নামে যেরূপ মধুর, বাস্তবপক্ষেও উহা সেইরূপ হিতকর। কিন্তু শান্তি ও দাসত্বের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ বিদ্যমান। স্বাধীনতার ফলে সমাজে যে স্থৈর্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাকেই শান্তি বলে; কিন্তু দাসত্ব অপেক্ষা সমাজের পক্ষে গুরুতর অমঙ্গল আর কিছুই হইতে পারে না। দাসত্ব-পাশ দূর করিবার জন্য কেবল যুদ্ধ-ঘোষণাই নহে—প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করা শ্রেয়স্কর।

আমেরিকার অন্যতম প্রসিদ্ধ দেশভক্ত হেন্‌রি প্যাট্রিক ১৭৭৫ সালে বোধ হয় সিসিরোর কথা স্মরণ করিয়াই বলিয়াছিলেন,—

Is life so dear, or *peace* so sweet, as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God!—I know not what course others may take; but as for me, give me, liberty or give me death.

জীবন কি এতই প্রিয় অথবা শান্তি কি এতই মধুর, যে দাসত্ব ও শৃঙ্খলের বিনিময়ে তাহা ক্রয় করিতে হইবে? হে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, এরূপ যেন কখনও না হয়! এরূপ ঘটিলে অপরে কি করিবে, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমার নিজের সম্বন্ধে আমি বলিতে এই বলিব যে, আমাকে হয় স্বাধীনতা দাও—না হয় মৃত্যু দাও।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও চিত্রকর রস্কিন তাঁহার যুদ্ধ-বিষয়ক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে শান্তি-সম্বন্ধে এদেশবাসীর অনেক ধারণাই ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। তিনি বলিয়াছেন,—

All the pure and noble arts of peace are founded on *war*; no great art ever yet rose on earth, but among a nation of soldiers. There is no art among a shepherd people, if it remains at peace. There is no art among an agricultural people, if it remains at peace...There is no great art possible to a nation but that which is based on battle. When I tell you that war is the foundation of all the arts, I mean also that it is the foundation of all the high virtues and faculties of men.

It is very strange to me to discover this ; and very dreadful—but I saw it to be quite an undeniable fact. The common notion that peace and the virtues of civil life flourished together, I found to be wholly untenable. Peace and the *vices* of civil life only flourish together. We talk of peace and learning, and of peace and plenty, and of peace and civilisation ; but I find that those were not the words which the Muse of History coupled together : that, on her lips, the words were—*peace, and sensuality—peace, and selfishness—peace, and death.* I found in brief, that all great nations learned their truth of world, and strength of thought, in war ; that they were nourished in war, and wasted by peace ; taught by war, and deceived by peace ; trained by war, and betrayed by peace ;—in a word, that they were born in war, and expired in peace."—Ruskin's *The Crown of the Wild Olive.*

ভাবার্থ,—শান্তিকালের যাবতীয় পবিত্র ও উৎকৃষ্ট শিল্প কলাই যুদ্ধবিগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত বীরেন্দ্র-সমাজে ভিন্ন আর কুত্রাপি কোন প্রসিদ্ধ শিল্পের উৎপত্তি হয় নাই। শান্তি-প্রিয় মেষপালক ও কৃষিজীবীর সমাজে কখনও শিল্প-বিদ্যার অস্তিত্ব থাকি না। যে জাতির অস্তিত্ব যুদ্ধ-বিগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সে জাতির মধ্যে উচ্চ অঙ্গের কলা বিদ্যার অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। আমার মতে যুদ্ধ-বিগ্রহ যে কেবল কলা বিদ্যারই ভিত্তিভূমি তাহা নহে, মনুষ্যের যাবতীয় শ্রেষ্ঠগুণ ও মনোবৃত্তি-বিকাশেরও উহাই কারণ স্বরূপ।

আমার নিকট এই তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া অতি বিস্ময়কর ও অতি ভীষণ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আমি দেখিতেছি যে, ইহা একটি অখণ্ডনীয় সত্য বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। অনেকের ধারণা যে, শান্তিকালেই সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ-সমূহের বিকাশ ঘটে, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, এ ধারণা নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ। বরং শান্তিকালে সামাজিক জীবনের পাপের অংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমরা সাধারণতঃ শান্তি ও জ্ঞান, শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং শান্তি ও সভ্যতার কথাই বলিয়া থাকি ; কিন্তু আমি দেখিতেছি, ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঐরূপ যুগল-শব্দ-মালার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মুখে শান্তি ও ইন্দ্রিয়-লালসা, শান্তি ও স্বার্থপরতা এবং শান্তি ও মৃত্যু—ইত্যাকার শব্দ-যুগলের ঘনিষ্ঠতার কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপতঃ আমি দেখিতেছি, জগতের যাবতীয় প্রসিদ্ধ জাতি যুদ্ধবিগ্রহ হইতেই জাগতিক সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ ও চিন্তা করিবার শক্তিলাভ করিয়াছেন ; তাঁহারা যুদ্ধে পরিপোষিত হইয়াছেন, শান্তিতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, যুদ্ধে তাঁহারা শিক্ষা-লাভ করিয়াছেন, শান্তিতে প্রতারিত হইয়াছেন, যুদ্ধে অনুশাসিত হইয়াছেন, এবং শান্তিতে বিপথে পরিচালিত হইয়াছেন ;—এক কথায় যুদ্ধে তাঁহাদিগের জন্ম হইয়াছে এবং শান্তিতে তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

তাই ইংলিশম্যান বলিয়াছেন যে, শান্তিতে মানুষ পচিয়া যায়। বিগত ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রদ্ধেয় দাদাভাই নৌরোজী মহোদয় ইংলণ্ডের ওয়ালওয়ার্থ নামক স্থানে নিউইংটন রিফর্মক্লাবে বক্তৃতা-কালে এদেশে ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত শান্তি-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, যে ভারতে

শান্তি না থাকিলে ইংরাজের পক্ষে এক সপ্তাহকালও ঐদেশে অবস্থান করা সম্ভবপর হয় না বলিয়াই ইংরাজেরা এদেশে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার উক্তি এই,—

Law and order were vitally important and necessary to the existence of Englishmen in India. That was the reason why they were so anxious for law and order, for without it Englishmen could not stay there one week."

ইংরাজ শিক্ষকেরা আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন যে, প্রাচ্য দেশের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান নরপতিগণ চিরকালই স্বেচ্ছাচার ছিলেন, তাঁহাদিগের খেয়ালের জন্য প্রজাদিগকে নিরন্তর উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত। রাজার নিকট প্রজার মতামতের কোনও মূল্য ছিল না। প্রজার "স্বত্ব বা অধিকার'' বলিয়া কোনও পদার্থ সে কালে ছিল না। পাশ্চাত্য রাজ্য-তন্ত্রে এ সকল অসভ্যতা ছিল না—অন্ততঃ ইদানীং নাই। সেখানে প্রজার মতামত ভিন্ন কোনও কার্য্য হয় না। আমরাও ইহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও ইউরোপীয় রাজারা যে প্রজার পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক সমস্ত কার্য্যেই অন্যায়রূপে হস্তক্ষেপ করিতেন, বজ্র-বন্ধনে তাঁহাদিগের দেহ ও মনকে বাঁধিতে চাহিতেন, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা রাজাই করিতেন, নীতির ও মুক্তির পন্থা দেখাইবার অধিকারও তিনি স্বহস্তে রাখিতেন, কোনও প্রজা এ সকলের বিরুদ্ধে উচ্যবাচ্য করিলে তাহাকে তুষানলে দগ্ধ হইতে হইত; ডাকিনী বলিয়া সন্দেহ হইলে রাজাদেশে লক্ষ লক্ষ রমণীকে জল-সমাধি দান করা হইত, কোন মনীষী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন কথা প্রচার করিলে, তিনি রাজার আদেশে চিতানলে ভস্মীভূত হইতেন, রাজা লোকের স্বাধীন চিন্তায় বাধা দান করিতেন—এ সকল কথা ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রতিপৃষ্ঠে পাঠ করিয়াও আমাদের ভ্রান্তি ঘুচিতেছে না। ইউরোপে রাজা-প্রজায় সনাতন দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, তজ্জন্য মুহুর্মুহুঃ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে। "পুত্রবৎ পালয়েৎ প্রজাঃ" এই নীতি-বাক্য পাশ্চাত্য দেশে অপরিজ্ঞাত ছিল, এখনও রহিয়াছে। তাই রাজা প্রজার বিবাদ সে দেশে অদ্যাপি থামে নাই, রাজ-শক্তিকে খর্ব্ব করিবার জন্য প্রজাকুল এখনও যত্নশীল। রাজা অত্যাচারী (Despotic) না হইলে এরূপ ঘটে না, নিহিলিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট, এনার্কিষ্ট প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় না, একথা আমরা সহজে বুঝিতে চাহি না। ইংরাজী শিক্ষার মোহ এমনই

প্রবল! প্রাচ্য ভূপতিরা এ সকল বর্ব্বরতার অনুষ্ঠান কখনও করেন নাই, সকল বিষয়ে প্রজার এরূপ নিগ্রহ করিবার বাসনাও কখনও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। হিন্দু-মুসলমান শাসনে ভারতবাসী একালের ইউরোপীয় প্রজার অপেক্ষা অধিকতর স্বাতন্ত্র্য-সম্ভোগ করিয়াছে। * বঙ্কিমবাবুও একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীস্থ লোকে স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ এবং মর্য্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধি-সঞ্চালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণ-বৈষম্যগুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। আর এক্ষণে রাজকার্য্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে—আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়া নিজে কোনও কার্য্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালন বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না—জাতীয় গুণের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা এদিকে উন্নতি-রোধক।" বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ—"স্বাধীনতা ও পরাধীনতা" প্রবন্ধ।

মুসলমান আমলেও এ "গুরুতর অত্যাচার" এদেশে ছিল না। তথাপি আমরা সেকালের হিন্দু মুসলমান নরপতিগণকে despotic বা অত্যাচারী বলিতে শিখিয়াছি। শব্দ-শাস্ত্রের এরূপ অপব্যবহার অন্য কোনও দেশে পরিদৃষ্ট হয় না। জাপান, চীন, শ্যাম ও পারস্যের অধিপতিগণ বিনা দ্বন্দ্বে প্রকৃতিপুঞ্জকে নিয়মতন্ত্র-মূলক (constitutional government) শাসনপ্রণালী দান করিয়াছেন বা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয়গণ বিনা রক্তপাতে উহা প্রজাদিগকে দান করে নাই। তথাপি কি বলিতে হইবে যে, প্রাচ্যদেশীয় রাজারাই স্বেচ্ছাচার-প্রিয়?

ভারতবাসীর শাস্ত্রানুসারে রাজ-কর প্রজা-রক্ষণের বেতন ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু বৃটিশ ভারতে প্রজার প্রদত্ত ভূমি-করকে ইংরাজ ভূ-স্বামিত্ব সম্বন্ধে আপনার প্রাপ্য বলিয়া মনে করেন। ইংলণ্ডে যেমন

---

* এই কথাগুলি বিগত ১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "সাহিত্য" পত্রে পরাধীনতা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন। ঐ প্রবন্ধটি প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের পাঠ করা উচিত। সেই সঙ্গে ৺ভূদেব বাবুর "সামাজিক প্রবন্ধ" ও "ভারতবর্ষের স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস"ও সকলের অবশ্যপাঠ্য।

প্রজার "খোরাকী মাত্র বাদে" ভূমির সমস্ত উৎপন্নই জমিদারের প্রাপ্য বলিয়া ধরা হয়, এখানেও ইংরাজ যেন কতকটা সেইরূপ করেন!

"স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম্"।

এই ভারতীয় নীতি তাঁহারা বুঝেন না; যে বন কাটিয়া জমি আবাদ করে, ভূমির স্বামিত্ব তাহারই—রাজা উহার রক্ষা করিবার জন্য বেতন-স্বরূপ কর গ্রহণ করিবেন, এই তত্ত্ব ইংরাজ স্বীকার করেন না। কাজেই প্রজার জন্য তাঁহারা যাহা কিছু করেন, তাহারই জন্য নূতন নূতন কর আদায় করা হইয়া থাকে। এমন কি, রাজার অবশ্য-করণীয় ধর্ম্মাধিকরণের—ন্যায়ান্যায় বিচারের কার্য্যেও স্বতন্ত্র কর (ষ্ট্যাম্প) স্থাপন করা হইয়াছে। যাঁহারা এইরূপে ভূমিতে প্রজার চিরন্তন স্বত্ব-লোপ ও বিবিধ কর-ভারে প্রজাকে নিষ্পেষিত করেন, তাঁহারা সুসভ্য ও প্রজাবৎসল, আর যাঁহারা এরূপ করেন নাই, তাঁহারা অসভ্য ও despotic বা যথেচ্ছাচার-পরায়ণ? শব্দ-শাস্ত্রের অপপ্রয়োগ আর কাহাকে বলে? ফলতঃ মধ্যযুগের পাশ্চাত্য নরপতিদিগের স্বাভাবিক বর্ব্বরতা ও স্বৈরাচার ইংরাজেরা সুসভ্য হইয়াও অদ্যাপি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই।

ইংরাজ জাতির মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল মহাশয় "ভারতী" পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩১২ সাল) "ইংরাজ-স্বার্থ ও দেশের হিত" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"ইংরাজেরা স্বভাবতঃ অত্যন্ত দাম্ভিক, এবং পরের গুণ বা মাহাত্ম্য-দর্শনে অত্যন্ত অনুৎসাহী। একথা অনেক ইংরাজই স্বীকার করিয়া থাকেন; ষ্টিভেন্সন সাহেবের প্রবন্ধ গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাই। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, যদিও এদেশ ইংরাজের, তবুও এ দেশের প্রত্ন-তত্ত্ব অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির পণ্ডিতেরা যত উদ্ধার করিয়াছেন, ইংরাজেরা তাহার শতাংশের একাংশও করেন নাই। যাহাকে বিদ্যার জন্য বিদ্যালাভ বলে, প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য নিঃস্বার্থ অনুসন্ধান বলে, সে ভাবটী প্রায়শঃ ইংরাজদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি প্রত্নতত্ত্ব (উদ্ধার) করিতে গেলে কোনও একটা শাসন-কার্য্যের সুবিধা হয়, তবে ইংরাজ তাহা করিতে অগ্রসর হন, সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রত্নতত্ত্বটা ফুটিয়া উঠে, ভালই।" যাঁহারা মনে করেন, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য ইংরাজ এদেশে রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও ডাক বিভাগ প্র-

ভৃতির সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রান্তিপ্রদর্শন-কল্পে বিজয় বাবু লিখিয়াছেন,—"এই বিশাল দেশের শাসন এবং রক্ষা-কার্য্যের সুবিধার জন্য রেল চাই, টেলিগ্রাফ চাই, ডাক বিভাগ চাই। মনে কর, যদি আমরা সকলেই থিয়সফির মহিমায় যোগ-বল-সম্পন্ন হইতাম এবং ঐ ব্যবস্থা-গুলি আমাদের প্রয়োজনে না লাগিত, তাহা হইলেও সুদৃঢ় ও শান্তি-পূর্ণ একচ্ছত্র রাজত্বের জন্য ইংরাজকে (এদেশে) ঐ গুলি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইত। তোমার আমার সুবিধা সর্ব্বত্রই এইরূপ গৌণ-ভাবে হইয়া থাকে।"

এই উক্তির যাথার্থ্য, গত ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গের নূতন প্রদেশের অন্তর্গত বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের গুর্‌খা-শাসন ও অন্যান্য অত্যাচারের সময় অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ঐ সকল স্থানের অত্যাচার-পীড়িত লোকেরা কলিকাতার বন্ধুগণের বা উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া তারযোগে যে সংবাদ প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ ও বিলি করিতে সম্মত হন নাই! ইহাতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া একজন ভদ্রলোক সেই সময়েই সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্যে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

"ভারতবাসীরা অর্থ দিয়া কর্ত্তৃপক্ষের যে টেলিগ্রাফ, রেল-ষ্টীমার ও ডাক বিভাগের পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা বিপৎকালে ভারতবাসীর এক কড়ারও উপকারে আসিবার কোন আশা নাই। তুমি ঘোর দুঃখে পড়িয়া তারে সংবাদ দিতে পারিবে না, ষ্টীমারে চড়িতে পারিবে না, রেলে যাইতে পারিবে না এবং ডাকে পত্র পাঠাইতে পারিবে না! সুতরাং আমরা উহার খোরাক যোগাইয়া কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিতেছি! বিদেশীর প্রদত্ত আরাম ভোগ করার বিষময় ফল এক্ষণে আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি।"

তাহার পর বিজয় বাবু বলিতেছেন,—"বঙ্গদেশে দেখিতে পাই যে, অনেক অনার্য্য নিম্নশ্রেণীর জাতি ব্রাহ্মণদিগকে আদর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতি অবলম্বন করিয়াছে। ধোবারাও বিধবা-বিবাহ দেয় না, এবং অবস্থা ভাল হইলে উহাদের বিধবারা একাদশীও করে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে এবং অনার্য্য-বহুল অন্যান্য স্থানে এখনও অনেক অনার্য্য হিন্দু

প্রতিবেশীর আচার এবং ধর্ম্ম ধীরে ধীরে গ্রহণ করিয়া অল্পাধিক পরিমাণে হিন্দুদিগের সহিত অলক্ষ্যে মিলনের উপায় করিতেছে। বঙ্গ প্রভৃতি দেশের বিষময় ফল দেখিয়া ইংরেজ-সরকার এই মিলনকে প্রার্থনীয় মনে করেন না। তাই প্রত্নতত্ত্ব এবং জাতি-তত্ত্বের গভীর গবেষণা প্রদর্শন করিয়া, রিজলী এবং গেট সাহেব আদম স্নুমারির রিপোর্টে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—হায় হায়! অনার্য্যেরা ভ্রমে পড়িয়া আপনাদের জাতীয়ত্ব হারাইতেছে এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন নষ্ট করিতেছে! উহারা যখন দলে দলে খ্রীষ্টান হয়, তখন এই মহাত্মাদের অশ্রুপাত হয় না; কিন্তু ব্রাহ্মণের আদর্শ, স্বদেশের আদর্শ, গ্রহণ করিলে যত দুঃখের উদ্রেক হয়; এবং ইতিহাসের কথা মনে পড়ে! আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর উচ্চ শ্রেণীর লোকের প্রভাব যত কম বিস্তৃত হয়, ততই তাহা বৃটিশসিংহের উদার রাষ্ট্রনীতির অনুকূল হয়। আমরা পথও চিনি, ঘাটও চিনি, ইতিহাসও বুঝি, প্রত্ন-তত্ত্বও বুঝি, কি বলিব মরিয়া আছি।"

ইংরাজের ভ্রান্ত-শিক্ষায় আমরা ভারতীয় সমাজের জাতিভেদ, বাল্য-বিবাহ, অবরোধ-প্রথার কঠোরতা ও ব্রাহ্মণাদি ২।১টি উচ্চ বর্ণের বিধবা-দিগের পুনর্বিবাহ-নিষেধ প্রভৃতি প্রথা দেখিয়া এদেশবাসীর ভবিষ্যৎ উন্নতি বিষয়ে এক প্রকার আশাহীন হইয়াছি। কিন্তু বোম্বাই হাই-কোর্টের মাননীয় বিচারপতি চন্দাবরকর মহোদয় গত ১৯০৩ সালের সামাজিক সমিতির অধিবেশনে বলিয়াছিলেন,—

It is a superficial view to take of the cause of the degeneracy of a community of people to say that it has gone down solely because it is divided into innumerable castes, it enforces infant marriage, it prohibits widow marriage and keeps women in seclusion.

উল্লিখিত বাক্যে যে সকল দোষের কথা বলা হইয়াছে, ব্রহ্মদেশীয় সমাজে তাহার একটিও বিদ্যমান নাই। তথাপি ব্রহ্মবাসীর জাতীয় জীবন আমাদিগেরই ন্যায় নিষ্প্রভ। ভারতীয় মুসলমানসমাজে পরস্পরের অন্নগ্রহণ এবং বিধবার বিবাহাদি বিষয়ে কোনও বিধি নিষেধ না থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদিগের জাতীয় জীবনের অধঃপতন ঘটিয়াছে। ফলতঃ জ্ঞান-চর্চ্চায় অমনোযোগ, ভোগ-বিলাসে অতিরিক্ত আসক্তি ও রাজনীতিক সতর্কতার অভাব প্রভৃতি দোষে সকল সমাজেই জাতীয় জীবন হীনপ্রভ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষেও প্রধানতঃ সেই সকল কারণেই জাতীয় জীব-

নের শক্তি-ক্ষয় ঘটিয়াছে। তাহার উপর আমাদের সামাজিক কুসংস্কার-সমূহও জাতীয় জীবনের শক্তি-ক্ষয়ে আংশিক সহায়তা করিয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। সঙ্কর-বিবাহের প্রবর্ত্তনে যে এ সমাজের উৎকর্ষ লাভ অসম্ভব, বরং তাহাতে ফিরিঙ্গী ও আমেরিকার মিশ্র জাতির ন্যায় এদেশীয় সমাজের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী, তাহা মহামনীষী সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক স্পেন্সার মহোদয়ের কথায় প্রতিপন্ন হয়। পণ্ডিত-প্রবরের এতদ্বিষয়ক পত্র তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পরে সমস্ত সংবাদ-পত্রেই প্রকাশিত হইয়াছে। * এদেশবাসী হিন্দু মুসলমানের সামাজিক প্রকৃতি পাশ্চাত্য-

---

* এই পত্রের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। জাপানী ব্যারণ ক্যাণ্টারে কানেকো মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে স্পেন্সার মহোদয় ১৮৯২ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখের পত্রে বলিয়াছেন—

"Respecting the further question you ask, let me, in the first place, answer generally that the *Japanese policy* should, I think, be that of "*keeping Americans and Europeans as much as possible at arm's length.*" In presence of the more powerful races your position is one of chronic danger, and you should take every precaution to give *as little foot-hold as possible to foreigners.*

"It seems to me that the only forms of intercourse which you may with advantage permit are those which are indispensable for the exchange of commodities—importation and exportation of physical and mental products. *If you wish to see what is likely to happen, study the history of India.* Once let one of the more powerful races gain a *point a' appui*, and there will inevitably in course of time grow up an aggressive policy which will lead to collision with the Japanese : these collisions will be represented as attacks by the Japanese which must be avanged, as the case may be ; a portion of territory will be seized and required to be made over as a foreign settlement, and from this time there will grow eventually subjugation of the entire Japanese Empire.

ইহার পর জাপানী খনিসমূহে পাশ্চাত্যদিগকে নিযুক্ত করিতে ও উপকূল-বাণিজ্য বিষয়ে তাহাদিগকে কোন প্রকার অধিকার দান করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া, তিনি বলিয়াছেন,—

"To your remaining question respecting *the inter-marriage of foreigners and Japanese* my reply is, it *should be positively forbidden.* It is not at root a question of biology. There is, abundant proof, alike furnished by the *intermarriage of human races* and by the interbreeding of animals, that when the varities mingled diverge beyond a certain slight degree, *the result is inevitably a bad one* in the long run.

The physiological basis of this experience appears to be that any one variety of creatures *in course of many generations acquires a certain constitutional adaptation to its particular form of life* and every other variety similarly acquires its own special adaptation. The consequence

দিগের সামাজিক প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এই কারণে ইউরোপীয় সমাজকে আদর্শ করিয়া সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলে, এদেশবাসীর মঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। স্বাধীন দেশে সামাজিক রীতিনীতি সংশোধিত ও সংস্কৃত হইবার পক্ষে যে সকল শক্তি কার্য্য করিতে পারে, পরাধীন দেশে সে সকল শক্তি সম্পূর্ণভাবে কার্য্য করিবার সুবিধা পায় না। পরাধীন দেশে সমাজ-হৃদয়ে একটা সঙ্কোচ ও ত্রস্ততার ভাব সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। এই কারণে সমাজ আপনার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তিকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত বা ব্যক্ত করিতে পারে না। অভ্যন্তরীণ বিকৃতি বা ব্যাধির প্রতীকার করিবার যে স্বাভাবিক শক্তি স্বাধীন ও সুস্থ সমাজে বিদ্যমান থাকে, তাহাও পরাধীনতা-পীড়িত সমাজে বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া উঠে। পরাধীনতায় সমাজের প্রাণ-শক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হয়—মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইতে থাকে। এই কারণে একদিকে যেমন উহার সংস্কার-চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হয় না, অন্যদিকে সেইরূপ নূতন কুরীতি-সমূহ উহাতে প্রবেশ-লাভ করিবার সুবিধা পায়। আমাদের দেশের উন্নতিশীল সম্প্রদায় হইতে, সেই জন্য দেশীয় কুরীতিগুলি নিরাকৃত হইতে না হইতে বহুসংখ্যক বৈদেশিক কুরীতি উহাতে লব্ধ-প্রবেশ হইয়াছে। ফলকথা, পরাধীনতায় যখন মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হয়, তখন সমাজ উন্নত দশা লাভ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় সামাজিক কুরীতি সংশোধনের জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় শক্তি-ক্ষয় না করিয়া, রাজনীতিক আন্দোলনের দ্বারা পরাধীনতার বন্ধন কিয়ৎপরিমাণে শিথিল করিবার চেষ্টা করিলে অভীষ্ট ফললাভের বিশেষ সম্ভাবনা। সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা কখনই নিন্দনীয় নহে, সমাজের সংস্কার-চেষ্টায় যাঁহারা জীবনপাত করিতেছেন, তাঁহাদিগের সহৃদয়তা ও স্বদেশ-প্রীতি নিঃসন্দেহ প্রশংসনীয়। তথাপি দেশের রাজনীতিক অবস্থার সংস্কার অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এ কথার

---

is that, if you *mix the constitution* of two widely divergent varieties which have severally become adapted to widely divergent modes of life, *you get a constitution which is adapted to the mode of life of neither*—a constitution which will not work properly, because it is not fitted for any set condition whatever. *By all means, therefore peremptorily interdict marriages of Japanese with foreigners.*"

উদাহরণ-স্বরূপে মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের উল্লেখ করিতে পারা যায়। মহারাষ্ট্র দেশে একনাথ ও তুকারামের ন্যায় বহুসংখ্যক সাধু পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজ-সংস্কারের চেষ্টায় জীবনপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরাধীনতা-পীড়িত মহারাষ্ট্র-সমাজে তাঁহাদিগের চেষ্টা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই, বরং তাঁহাদিগকে ঐরূপ সাধু চেষ্টার জন্য যথেষ্ট সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল। পক্ষান্তরে মহাত্মা শিবাজীর চেষ্টায় মহারাষ্ট্রদেশ যখন পরকীয় দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিল, তখন হইতে অতি সামান্য চেষ্টায় বা বিনা চেষ্টাতেও অনেক বড় বড় সমাজ-সংস্কার সংসাধিত হইয়াছিল। তাহার পর আবার কালক্রমে যেমন মহারাষ্ট্র দেশের স্বাধীন রাজ-শক্তির ক্ষীণতা ঘটিতে লাগিল, তেমনই বহুবিধ সঙ্কীর্ণতা সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া অধঃপতনের গতি দ্রুত করিয়া দিল। মহাত্মা শিবাজীর ও তৎপরবর্ত্তী পেশওয়েদিগের আমলে মহারাষ্ট্র-সমাজে সংস্কার কার্য্য কিরূপ অনায়াসে সম্পন্ন হইত, এবং এখন উহার গতি কিরূপ হ্রাস পাইয়াছে, তাহা বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বনাম-প্রসিদ্ধ কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলঙ্গ মহোদয় ১৮৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডেক্কান কলেজ ইউনিয়ন সমিতিতে পঠিত Gleanings from Maratha Chronicles প্রবন্ধে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে তেলঙ্গ মহাশয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্রদেশ ইংরাজের শাসনাধীন না হইলে মহারাষ্ট্রীয় সমাজে যে আরও নানা বিষয়ে সংস্কার ঘটিতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজের শাসনে এদেশে স্বাভাবিক নিয়মে সমাজ-সংস্কার হওয়া স্থগিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ পরাধীনতায় আমাদের সমাজ-হৃদয়ে সর্ব্বদা একটা সঙ্কোচ ও ত্রস্ততার ভাব জাগরূক না থাকিলে সমাজ-সংস্কারের গতি কখনই এরূপে কুণ্ঠিত হইত না। এ বিষয়ে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল। ("স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" দ্রষ্টব্য।)

আমরা যে পাশ্চাত্য নূতন সভ্যতার মোহে এরূপ অন্ধ হইয়াছি, তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে কাউন্ট টলষ্টয় মহোদয়ের মত অনুধাবন করিবার যোগ্য। তিনি বলেন,—

"Why should I place civilisation in Europe? Is it because the Eu-

ropeans have created for themselves *artificial needs* and because they have invented the railway, the telegraph, the telephone, and I do not know what beside? To me all these acquisitions of so-called civilisation seem *the invention of barbarism*. They serve and pander to all that is basest in man. I fail to see that they confer on him any sort of moral superiority, while I perceive that, on the other hand, the use he makes of his intelligence is most often for evil and not for good."—

ইতঃপূর্ব্বে The Wonderful Century ও Moral and Religious Crisis নামক গ্রন্থ হইতে ৭১।৭২ পৃষ্ঠে যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও এই মতের পরিপোষক। ফলতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার অকিঞ্চিৎকরতা এক্ষণে অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই নব্য সভ্যতায় যেরূপ কুফল ফলিয়াছে, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন সহৃদয় ইংরাজ বলিয়াছেন,—

It is not more science, but more sympathy that is demanded of us by an ancient civilisation like that of Indian......Wherever we have superseded, instead of *supervising*, native officials and headmen, wherever we have *poisoned* the social organism with English reforms, *instead of purifying* it by the light of the best native traditions, *there the seeds of demoralisation and disaster have been sown broadcast*. The wisest men in India are begining to recognise the fact—A. K. Connell's *Paper on Indian Pauperism, Free Trade and Railways* (1884).

এই সভ্যতা-বিষে ইউরোপ পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত। কল-কারখানার বাহুল্যে ইউরোপে রমণীগণের জীবন কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সম্পাদকের নিম্নলিখিত মন্তব্য হইতে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন,—

There are in all western Countries a growing number of women who go out into the world to earn their own living, and who have but a very small chance of ever becoming wives and mothers......They go out to work not because their grand-mothers had no work, but because the work that the grandmothers did was done in the home, whereas the same work is now done in the factory.—27-5-05.

পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে গিয়া জাপানেও রমণী-সমস্যা এইরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান-সম্পাদক বলেন,—

The woman problem in Japan is practically identical with the woman problem in Europe and America. In Japan the old ideal which tied the woman to the home more rigidly than she was ever tied in Europe seems to be breaking down. Women are being educated, and educated women are going out to work. In the purely economic side the causes which are now sending Japanese women out, into the world are the same as those that operate in Europe and America.

অতএব ভারতবাসীর সময় থাকিতে সাবধান হওয়া উচিত।

রাজনীতিক উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এই মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভের পক্ষে স্বদেশপ্রীতিই একমাত্র মহৌষধ। পাশ্চাত্য সংস্রবে আমাদিগের সমাজশরীরে যে বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, যে জাতীয় ও নৈতিক অধঃপতনের বীজ সর্ব্বত্র উপ্ত হইয়াছে, তাহার অনিষ্টকারিতা দূর করিবার পক্ষে স্বজাতি-প্রেমই একমাত্র উপায়।

আমাদের জাতীয় জীবনের যে স্রোত এখন অল্প বেগে চলিয়াছে, সেই স্রোতে বেগ উৎপাদনের জন্য এইরূপ (দেশীয়) ভাবের উদ্দীপনা প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশ-বাৎসল্য সেই উদ্দীপনা প্রদানে সমর্থ। এবং এই স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশ-বাৎসল্য জন্মাইবার জন্য সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতার পরিচয় স্থাপন আবশ্যক। সমাজের কোথায় কি আছে, সমাজ-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, কোথায় কয়খানা হাড় আছে, কোথায় কয়টা শিরা আছে, কোন্ খাতে রক্ত চলে, কোন স্নায়ু দিয়া চেষ্টা-শক্তি পরিচালিত হয়, অনুরক্ত ভাবে সন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। কোথায় কোন্ ক্ষত আছে, কোথায় কোন্ ব্রণ আছে, তাহারও অনুসন্ধান চাই; কিন্তু বৃত্তিগ্রাহী মমত্ব-হীন সার্জ্জনের অনুসন্ধানে চলিবে না, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত সকরুণ সপ্রেম অনুসন্ধান আবশ্যক। তাহার পর সেই সমাজ-শরীরের ভ্রূণাবস্থা হইতে শৈশব, শৈশব হইতে যৌবন, যৌবন হইতে প্রৌঢ় দশা, সমস্তেরই আনুপূর্ব্বিক ধারাবাহিকভাবে তন্ন তন্ন করিয়া তত্ত্ব লইতে হইবে। সমাজের প্রাচীন ইতিহাস যথাসাধ্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। তবেই সেই সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে, শ্রদ্ধা ভক্তিতে, ভক্তি প্রেমে ও প্রেম শেষ পর্য্যন্ত মহাভাবে পরিণত হইবে। সমাজের যাঁহারা নেতা, যাঁহারা শিক্ষিত, যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা চিন্তাপটু, তাঁহারা সেই মহাভাবের উদ্বোধন করিবেন ও সেই মহাভাবকে শিরায় শিরায় সঞ্চালিত ও স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রবাহিত করিয়া দিবেন। এই মহাভাবের স্ফূর্ত্তিলাভে সমাজ-শরীর কণ্টকিত হইবে, ধমনীতে রক্তপ্রবাহ বেগে ছুটিবে, হৃৎপিণ্ড মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতে থাকিবে। নবজীবন সঞ্চারে হর্ষোদ্‌গত অশ্রু-প্রবাহে বন্যা আসিবে; সেই বন্যা-স্রোতে বিঘ্ন-বিপত্তি কোন্ অকূলে ভাসিয়া যাইবে। ইহাই আমাদের সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা, ইহাই আমাদের সকল রোগের একমাত্র প্রতীকার।—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার।"

কিন্তু সরকারি স্কুল-কলেজ প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালী আমাদিগের কোমলমতি বালকগণের হৃদয়ে স্বদেশ-প্রীতি উৎপন্ন হইবার পক্ষে এক প্রধান অন্তরায়-স্বরূপ হইয়াছে। কারণ, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে বালকগণের মানসিক বৃত্তিসমূহ স্বাধীনভাবে বিকশিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। দেশের মনীষিগণ বহু দিন হইতে একথা বুঝিয়াছেন, বহুদিন হইতে ভারত-সন্তানগণকে জাতীয় ভাবে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা

করিবার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-বিধান প্রণীত হওয়ার পর হইতে অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, বালকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা স্ব-হস্তে গ্রহণ না করিলে আর আমাদিগের ভদ্রস্থতা নাই। স্বদেশী আন্দোলনে জনসাধারণের হৃদয়ে এই ভাব দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। দেশের বিদ্যালয়সমূহের কর্তৃত্বভার হস্তে থাকায় রাজপুরুষেরা ছাত্র-সমাজকে স্বদেশ-সেবার কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য নানা প্রকার অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছেন। ইংরাজের প্রবর্ত্তিত সম্মোহন-মূলক শিক্ষায় আমরা যে ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া স্বদেশের প্রতি বিমুখ হইয়াছিলাম, সে ভ্রান্তিজাল নানা ঘটনা-পরম্পরায় অদ্য অকস্মাৎ ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাই রাজপুরুষেরা "চক্ষুলজ্জা" ত্যাগ করিয়া আমাদিগের বালকগণের হৃদয় হইতে স্বদেশ-ভক্তি ও স্বজাতি-প্রেমের অঙ্কুর বিনষ্ট করিবার জন্য পশুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এতদিন যাহা কৌশলে সাধিত হইতেছিল, তাহার জন্য এখন বল-প্রয়োগ বা উৎপীড়ন করা হইতেছে। এই চেষ্টার আরম্ভ-কালে শিক্ষা বিভাগীয় কোনও শ্বেতাঙ্গ ইন্‌স্পেক্টার আদেশ করিয়াছিলেন, যে সকল ছাত্র "বন্দে মাতরম্" বলিতেছে, তাহাদিগকে পাঁচ শতবার করিয়া লিখিয়া দিতে হইবে যে, "বন্দে মাতরম্ বলা মূর্খতা ও অসভ্যতার কার্য্য"! যে শিক্ষা-প্রণালীর সংস্রবে থাকিলে বালকদিগকে এইরূপ স্বদেশ-দ্রোহিতা শিক্ষা করিতে হয়, সে শিক্ষা-প্রণালীর সহিত বালকদিগের সংস্রব যত শীঘ্র ছিন্ন হয়, ততই মঙ্গল। ফলতঃ রাজপুরুষেরা দিন দিন যেরূপ নীতির অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে অচিরাৎ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা আমাদের বালকগণের জাতীয়ভাবে শিক্ষা-লাভের সুব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সুখের বিষয়, দেশের নেতৃবৃন্দের এদিকে মনোযোগ হইয়াছে। তাঁহারা ইতোমধ্যে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ সময়ে তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সহায়তা করা দেশের প্রত্যেক বালকের অভিভাবকের অবশ্যকর্ত্তব্য। বালকদিগকে সরকারি বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করাইয়া জাতীয় ভাবে শিক্ষা-দানের সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে, ইংরাজের সৃষ্ট রাজনীতিক কুহেলিকা কখনই নষ্ট হইবে না, স্বদেশ-প্রেমের পবিত্র প্লাবনে সমাজের সমস্ত পাপ ধৌত হইবারও সুযোগ ঘটিবে না। যাঁহারা দেশের মঙ্গল কামনা

করেন, আপনাদের সন্তান-দিগকে প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য করিতে চাহেন, তাঁহারা কখনই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সর্ব্বপ্রকারে সাধ্যমত সহায়তা করিতে বিরত হইবেন না। (১)

---

(১) পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের প্রথম ছোটলাট স্যার ফুলারের পদত্যাগ উপলক্ষে বিগত ১৯০৬ সালে যে সকল সরকারি কাগজ পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার এক খানি পত্রে ভারত গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিয়াছেন যে, "ভারতীয় ছাত্রগণ যাহাতে রাজনীতিক চর্চ্চায় (অর্থাৎ দেশহিতকর অনুষ্ঠানে) আর পূর্ব্ববৎ যোগদান করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় বিধানের অন্যতম উদ্দেশ্য।" কেবল ভারতবর্ষেই যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে স্বদেশ-বিরোধী শিক্ষার প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিয়া এদেশীয় বালকগণের মানসিক বৃত্তিসমূহের অবনতির পথ প্রসারিত করিয়াছেন তাহা নহে, আয়ারল্যাণ্ডেও শিক্ষা সম্বন্ধে এই দুর্নীতিই অবলম্বিত হইয়াছে। বিগত ১৯০৬ সালের ২৮শে নবেম্বর তারিখে ডবলিন নগরের জাতীয় পরিষদে (National Council) বক্তৃতাকালে স্যার আর্থার গ্রিফিথ মহোদয় এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"University education in Ireland is regarded by the classes in Ireland as a means of washing away the original sin of Irish birth. It is founded on the inversion of Aristotle, as indeed the three systems of education in Ireland are. The young men who go to Trinity College are told by Aristotle that the end of education is to make men patriots; and by the professors of Trinity not to understand Aristotle literally. Education in Ireland encumbers the intellect, chills the fancy, debases the soul and enervates the body—it cuts off the Irishman from his tradition, and by denying him a country debases his soul, it stores his mind with lumber and nonsense, it destroyes his fancy by cutting him off from his tradition, and enervates his body by denying him physical culture."

ভারতবর্ষেরও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এই সকল দোষে দুষ্ট।

বিনিময়ে ক্ষতি।

সকলেই অবগত আছেন যে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রৌপ্যের মূল্য হ্রাস পাওয়া বিনিময়ের হার কমিয়া গিয়া ১৩ পেন্সে এক টাকা হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ের মূল্য ১৬ পেন্স স্থির করিয়া দেন। বিনিময়ের এই হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় গবর্ণমেণ্টের কিয়ৎ পরিমাণে অর্থ-স্বাচ্ছল্য ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় কৃষি ও শিল্প-জীবীদিগকে বৎসরে ২২ কোটি টাকারও অধিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে।

এই অভিনব ব্যবস্থায় ভারত গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৫ কোটি টাকার ব্যয়-লাঘব হইয়াছে। হোমচার্জ্জের জন্য তাঁহাদিগকে যে টাকা প্রতি বৎসর বিলাত পাঠাইতে হইত, তাহার পরিমাণ ৫ কোটি টাকা কমিয়া গিয়াছে। কারণ, পূর্ব্বে এদেশ হইতে এক টাকা পাঠাইলে বিলাতী কর্ত্তৃপক্ষ ১৩ পেন্সের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেন; নূতন ব্যবস্থার পর হইতে তাঁহারা এক টাকা পাইয়া ১৬ পেন্সের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন। এইরূপে ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম চার্জ্জের হিসাবে প্রতিবৎসর প্রায় ৫ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকিতেছে।

কিন্তু ইহা আমাদিগের পক্ষে আনন্দের বিষয় নহে। অন্য দিকে ক্ষতি না ঘটিয়া যদি আমাদিগের হোমচার্জ্জের পরিমাণ হ্রাস পাইত, তাহা হইলে আমরা ইহাতে আনন্দানুভব করিতে পারিতাম। কিন্তু হোম-চার্জ্জের ৫ কোটি টাকা কমাইতে গিয়া আমাদিগের ২২ কোটি টাকায় ঘা পড়িয়াছে। পাঠক অবগত আছেন, প্রতি বৎসর এদেশ হইতে প্রায় ১৪০ কোটি টাকার পণ্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এই পণ্যের মধ্যে কৃষিজ পণ্যই অধিক; সুতরাং বহির্বাণিজ্যের ক্ষতি-বৃদ্ধির সহিত আমাদিগের দেশের কৃষকদিগের শুভাশুভের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এখন বিনিময়ের হার ১৬ পেন্স নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় তাহাদিগের কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, দেখুন। মনে করুন, পূর্ব্বে ১৩ পেন্স মূল্যে বিদেশে আমাদের একটা মাল বিক্রীত হইত; এখনও ১৩ পেন্স মূল্যেই সেই মাল বিক্রীত হইতেছে। কিন্তু তখন ১৩ পেন্সের বিনিময়ে ভারতীয় কৃষক ১ টাকা পাইত, কিন্তু এখন ৸৴০ আনা মাত্র পাইতেছে। এইরূপে প্রতি টাকায় তিন আনা ক্ষতি হওয়ায় গোধূমাদির রপ্তানিতে আমাদের কৃষক-সম্প্রদায়ের গড়ে বৎসরে ২২ কোটি টাকার ক্ষতি হইতেছে।

রৌপ্যের মূল্য-হ্রাসের সহিত বিনিময়ের হার যেরূপ কমিতেছিল, যদি সেইরূপ কমিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে হয় ত এত দিনে টাকার দর ১১ পেন্সে দাঁড়াইত। তাহা হইলে আমরা ১৩ পেন্সের জিনিষ দিয়া প্রায় উনিশ আনা পাইতাম; পক্ষান্তরে

১৩ পেন্স মূল্যের বিলাতী জিনিষ ১৶৹ আনা দিয়া কিনিতে হইত বলিয়া শস্তা দেশীয় মালের কাট্‌তি বাড়িত। রৌপ্যের মূল্য-হ্রাসের সহিত বিনিময়ের হার যতই কমিত, বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য ততই বাড়িত, দেশীয় শিল্পিগণ প্রতিযোগিতা করিবার ততই সুবিধা পাইতেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ উচ্চহারে বিনিময়ের দর নির্দ্দিষ্ট ও স্থায়ী করিয়া দেওয়ায় দেশীয় কৃষি ও শিল্প-জীবীরা এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে; পরন্তু তাহাদিগের প্রভূত ক্ষতি ঘটিয়াছে। শুদ্ধ বহির্বাণিজ্যেই তাহাদিগের ২২ কোটি টাকা লোকসান হইতেছে। এতদ্ভিন্ন বিদেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পীদের যে অশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কে নির্দ্দেশ করিবে? ফলতঃ মুদ্রার এইরূপ কৃত্রিম মূল্য-নির্দ্দেশ কোনক্রমেই প্রকৃষ্ট অর্থ-নীতির অনুমোদিত নহে।

রাজপুরুষেরা বলেন, মুদ্রা-শাসনী ব্যবস্থার দ্বারা মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারিত করায় কৃষিজীবী প্রজার যে ক্ষতির সম্ভাবনা হইয়াছিল, বিদেশের বাজারে তাহাদের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় তাহা তিরোহিত হইয়াছে। পরন্তু তাহারা এক্ষণে পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক মূল্য লাভ করিতেছে, সুতরাং অভিযোগের কোনও কারণ নাই। আমরা এই যুক্তি নিতান্তই অসার বলিয়া মনে করি। কৃষি-জীবীদিগের ভাগ্যক্রমে যদি বিদেশের বাজারে তাহাদের মালের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা উহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিবার সুবিধা পাইবে, এরূপ ব্যবস্থা থাকাই উচিত ছিল। বিনিময়ের হার ১৬পেন্স নির্দ্দিষ্ট না করিলে এদেশের কৃষকদিগের যে আরও অধিক লাভ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া তাহাদের লভ্যাংশের কিয়দংশ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন, একথা কি অস্বীকার করা যায়? সকল দেশের কৃষিজীবীই শস্যের মূল্য-বৃদ্ধির সুবিধা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতেছে, কেবল ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের ভাগ্যেই তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ ঘটিতেছে না, ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? সেইরূপ ৷৷৶৹ মূল্যের রৌপ্যখণ্ড দিয়া প্রজার নিকট হইতে ষোল আনা আদায় করাও কি নীতি-সঙ্গত কার্য্য? বাজারে রৌপ্যের মূল্য হ্রাস হইয়াছে, অথচ আইনের মাহাত্ম্যে প্রজাপুঞ্জ তাহার সুফল-ভোগ করিতে পাইতেছে না, ইহা কিরূপ প্রজা-বাৎসল্য, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। (১)

লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছেন যে, এই বিনিময়-বিধানের জন্য গবর্ণমেণ্ট লাভের পৌণে দশ কোটি টাকা বিলাতে খাটাইবার সুবিধা পাইতেছেন। ইহাতে রাজকোষে বার্ষিক ২৯ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা আয় বাড়িয়াছে। বড়লাট বাহাদুরের এই

---

(১) গবর্ণমেণ্ট টাকশাল বন্ধ করায় এদেশে টাকার মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি ও রৌপ্যের মূল্য বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ফলে রৌপ্যনির্ম্মিত অলঙ্কারপত্রই যাহাদের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য, সেই সকল দরিদ্র লোকের বিশেষ ক্ষতি ঘটিয়াছে। রপ্তানির বাহুল্যে দেশের ধান্য চাউল দুর্ম্মূল্য হওয়া যাহারা রৌপ্যালঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিন-যাপনের চেষ্টা করিতেছে, তাহারা অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া অতি সামান্য মূল্য প্রাপ্ত হইতেছে। রৌপ্যের মূল্য হ্রাসে গবর্ণমেণ্ট সহায়তা না করিলে তাহারা নিশ্চয়ই অলঙ্কার বেচিয়া কিছু বেশী টাকা পাইত।

উক্তিতেও আমরা প্রীতিলাভ করিতে পারি নাই। দেশের লোকের বার্ষিক ২২ কোটী টাকা ক্ষতি করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে টাকা পাইয়াছেন, তাহা বিলাতে সুদে খাটান হইতেছে, অথচ এ দেশের কৃষকেরা উচ্চহারে সুদ দিয়াও টাকা ধার পায় না, এ দৃশ্য কি প্রীতিকর? (২)

গবর্ণমেণ্ট বিনিময়ের কৃত্রিম হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া, দেশীয় রৌপ্য মুদ্রার মূল্য কমাইয়া ভারতীয় পণ্য-উৎপাদনকারী কৃষি-শিল্পি সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। এই অনিষ্টের আংশিক প্রতিবিধান-কল্পে টাকশাল বন্ধ করা হইয়াছে। ফলে প্রতি বৎসরই প্রয়োজনের অপেক্ষা অল্প সংখ্যক টাকা মুদ্রিত হইতেছে; রৌপ্য শস্তা হওয়ায়, দেশে টাকা সুলভ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাজপুরুষেরা বিদেশে দেশীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়াছেন,—১৩ পেন্সের বিনিময়ে এক টাকার স্থলে ৶৵৹ পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং দেশের টাকশাল বন্ধ করিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য মুদ্রা দুর্ম্মূল্য ও দুর্লভ করিয়া তুলিয়াছেন। বাজারে প্রয়োজনমত টাকা না থাকায় ব্যবসায়ীদিগকে উচ্চ হারে সুদ দিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হইতেছে। যে সুবর্ণের বিনিময়ে পূর্ব্বে ২২ টাকা পাওয়া যাইত, সেই সুবর্ণের পরিবর্ত্তে এখন ১৫ টাকার অধিক পাওয়া যাইতেছে না। সভারিণ মুদ্রার পূর্ব্বের মূল্যের সহিত বর্ত্তমান মূল্যের তুলনা করিলেই পাঠক ইহা বুঝিতে পারিবেন।

কর্ত্তৃপক্ষের অবলম্বিত কৃত্রিম উপায়ে দেশীয় টাকার বাজারে এরূপ দ্বিবিধ বিপ্লব ঘটায় ভারতীয় পণ্যোৎপাদক সম্প্রদায়ের বার্ষিক ২২ কোটী টাকার ক্ষতি হইতেছে; পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ক্ষতির বিষয় এ দেশে কৃষক-সমাজের সম্পূর্ণ গোচর হয় নাই। কিন্তু শিল্পি-সমাজ এই ক্ষতির পরিণাম বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছে। বঙ্গীয় কয়লার ব্যবসায়ীদিগের কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহা মাননীয় মিঃ কেবল ১৯০৪ সালের বজেট বিচার-কালে ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাট বাহাদুরের সমক্ষে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।—

The trade in coal at the present moment presents a very curious spectacle. On the one hand collieries in Bengal are with few exceptions being worked on the barest margin or being closed altogether, while on the other hand coal from abroad is being delivered almost at our doors.

অর্থাৎ বঙ্গের অধিকাংশ কয়লার খনি, হয় একরূপ বিনা লাভে চলিতেছে, না হয় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে বিলাতি বা বিদেশী কয়লা অতি সস্তা দরে একেবারে আমাদের গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ যদি মুদ্রার

---

(২) বিনিময় বিধানের জন্য গবর্ণমেণ্টের লাভের পরিমাণ এক্ষণে ২০ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই টাকা শতকরা ২।০ টাকা সুদে বিলাতে খাটান হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রয়োজন হইলেই বিলাত হইতে ৩।০ টাকা সুদে আমাদের গবর্ণমেণ্ট টাকা ধার করিতেছেন! রাজপুরুষদিগের এরূপ প্রজাবাৎসল্য আর কোনও দেশে কি সম্ভবপর?

মূল্য-নির্দ্ধারণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে বৈদেশিক ব্যবসায়ীরা এক সভারিণ মূল্যের কয়লা এ দেশে ২২ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু স্বজাতি-বৎসল রাজার অনুগ্রহে তাহারা ঐ কয়লা এক্ষণে ১৫ টাকায় বিক্রয় করিতেছে। কাজেই দেশীয় কয়লার খনিওয়ালারা প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইবার অন্যান্য কারণও আছে। কিন্তু যদি টাকশাল বন্ধ না হইত, তাহা হইলে সভারিণের (সুবর্ণের) বিনিময়ে এখনকার অপেক্ষা নিশ্চিত অধিক টাকা পাওয়া যাইত। বঙ্গীয় কয়লা-ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের পণ্যের জন্য অধিকতর মূল্য পাইতেন।

অন্যান্য ব্যবসায়েরও দুর্গতি অল্প হয় নাই। প্রথমতঃ কার্পাস ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ১৮৯৮ সালে বোম্বাইয়ে ৮২টি কাপড়ের কল ছিল। এক্ষণে কমিয়া ৮০টী হইয়াছে। ঐ অব্দে সমগ্র ভারতে ১৮৫টী কাপড়ের কল ছিল; ১৯০০ সাল বাড়িয়া ১৯৩টী হয়। কিন্তু ১৯০৩ সালে কমিয়া ১৯২টী হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি কলের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা হীন হইয়াছে। কল কারখানা করিবার দিকে লোকের প্রবৃত্তি বাড়িয়াছে, কিন্তু কলের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা হীনতর হইয়াছে। রাজশক্তির প্রতিকূলতায় ব্যবসায় বাণিজ্যে লোকের লাভ কমিতেছে, কৃত্রিম মুদ্রার জন্য ও টাকশাল বন্ধ হওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে। নীলের টাকশালে অবস্থাও এইরূপে শোচনীয় হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় অবাধে টাকা তৈয়ার করিবার অনুমতি দান করিলে, দেশীয় ব্যবসায়-সমূহ বিনা আয়াসে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে—দেশীয় ব্যবসায়ীরা যেখানে এখন ৸৵০ পাইতেছে, সেখানে ১৲ টাকা পাইবে, যেখানে ১৫ টাকা পাইতেছে, সেখানে সহজেই ২২ টাকা পাইবে। মিঃ জে, এন, টাটা মহাশয় দেখাইয়াছেন, ১৮৯৫ সালের তুলনায় "ষ্টকের" কারবারে ব্যবসায়ীদিগের এক্ষণে শতকরা প্রায় ৫০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, বিলাতের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্‌গণের উপদেশ অনুসারেই মুদ্রার কৃত্রিম মূল্য অবধারিত হইয়াছে। এই কারণে তাঁহাদিগের ন্যায় বিজ্ঞ মহোদয়-গণের ভ্রম প্রদর্শনে অগ্রসর হওয়া আমাদিগের শোভা পায় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিলাতের প্রসিদ্ধ অর্থ-নীতি-বিদ্‌গণ কি স্বেচ্ছায় ও সহজে এই ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছিলেন? লর্ড ল্যান্সডাউনের আমলে ভারত গবর্ণমেণ্ট কি মুদ্রা-সমিতির সদস্যদিগকে জ্ঞাপন করেন নাই যে, মুদ্রার কৃত্রিম মূল্য নির্দ্দেশ না করিলে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টকে "দেউলিয়া" হইতে হইবে? এইরূপ ভয়-প্রদর্শনের পর যদি সমিতির সদস্যেরা কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় অনুমোদন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেজন্য আমরা তাঁহাদিগকে দায়ী করিতে পারি না। গবর্ণমেণ্টের আগ্রহাধিক্য ও অলীক আতঙ্কই এই অসীম ক্ষতিকর মুদ্রা শাসনী-ব্যবস্থার মূলীভূত কারণ।

এই তর্কের উত্তরে অর্থ সচিব স্যার এডওয়ার্ড ল মহোদয় বলেন, বহির্ব্বাণিজ্যের প্রসার ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই, বরং নানা দিকে বৃদ্ধি

পাইয়াছে। ১৮৯৫ সালে পাটের ব্যবসায়ের যে অবস্থা ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা দ্বিগুণ উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে দশ হাজার পাটের তাঁত দেশে চলিত, এক্ষণে বিশ হাজার তাঁত চলিতেছে। ১৯০০ হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসরে আমদানি অপেক্ষা ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি ৭২ কোটী টাকা বাড়িয়াছে। সুতরাং কৃত্রিম মুদ্রার জন্য ব্যবসায়ের অবনতি হইতেছে, একথা যথার্থ নহে।

অর্থসচিব মহোদয়ের এই উত্তরে আমরা সন্তুষ্ট নহি। এক ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর কুত্রাপি পাটের তেমন চাষ হয় না। অথচ পাশ্চাত্য দেশে সর্ব্বত্র পাটের আদর দিন দিন বাড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় এ দেশে পাটের ব্যবসায়ের উন্নতি অনিবার্য্য বলিয়া আমরা মনে করি। তার পর রপ্তানি বৃদ্ধির কথা। অর্থ-সচিব তিন বৎসরে ৭২ কোটী টাকার অধিক মাল রপ্তানি হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। (১) কিন্তু তিনি যদি একবার অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশের বাণিজ্য-বিস্তারের অনুপাতের বিষয় স্মরণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, এইরূপ আনন্দ প্রকাশে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হইত। পাঠক, একবার আমেরিকার বাণিজ্যবৃদ্ধির অনুপাতে দৃষ্টিপাত করুন, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ১৮৯৭ সালে আমেরিকার রপ্তানি পণ্যের মূল্য আমদানি অপেক্ষা ৬৩,৯০,০০,০০০ টাকা অধিক ছিল। ১৯০০ সালে রপ্তানির মূল্য ১১৭,০০,০০,০০০ টাকা ও ১৯০১ ২০৩,৭০,০০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অঙ্কের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের অঙ্কের তুলনা করাই বাহুল্য। (হিতবাদী ১৯০৩ সালের এপ্রিল হইতে উদ্ধৃত)।

---

(১) বিগত ১৮৯৯ সাল হইতে ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে আমদানি অপেক্ষা এদেশ হইতে বিদেশে ৫১ কোটি ৮৯ লক্ষ ৪৭৷৷০ হাজার টাকার অধিক মাল রপ্তানি হইয়াছে। তাহার পর ১৯০৩।৪ সাল হইতে ১৯০৬।৭ সাল পর্য্যন্ত গড়ে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ প্রতিবর্ষে ৬৬ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯৮৷৷০ হাজার টাকা অধিক হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিদেশী ক্রেতাদিগের নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত ৫ বৎসরে গড়ে প্রতিবর্ষে ২৫ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকার অধিক এবং শেষোক্ত তিন বৎসরে গড়ে প্রতিবর্ষে ৩৩ কোটি ৯০ লক্ষ ৩১।০ হাজার টাকার অধিক মূল্য পাই নাই। কারণ, বিলাতের ভারতসচিব মহাশয় হোমচার্জ্জের প্রাপ্য অর্থ আমাদের রপ্তানি মালের মূল্য হইতে কাটিয়া লইয়াছেন।

পরিশিষ্ট।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ।

সরকারী মন্তব্য।

গত ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই সিমলা হইতে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' ভারত গবর্ণমেণ্ট বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিষয়ে তাঁহাদের নিদারুণ সিদ্ধান্তের কথা দেশের জনসাধারণকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। সরকারী মন্তব্যের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল—

মুখবন্ধে গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, বহুদিন হইতে এই সুবিশাল বঙ্গ দেশের শাসন-কার্য্য-পরিচালনের অসুবিধা সম্বন্ধে নানা অভিযোগ শ্রবণ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশকে একজন স্বতন্ত্র ছোট লাটের অধীন করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। কারণ, একজন শাসন-কর্ত্তার উপর এত বড় দেশের শাসন-ভার থাকায় সুশাসনের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। আসামের চা প্রভৃতি ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধনের জন্যও ঐ প্রদেশটীকে স্বতন্ত্র শাসন-কর্ত্তার অধীন করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাদিগের মতামত জানিতে চাহেন। তাঁহাদের প্রকাশিত অভিমতের বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া ও তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানাদি কার্য্য যথোচিত ভাবে সমাধা করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আপনাদের পূর্ব্ব প্রস্তাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তদনুসারে ছোট নাগপুরের বহুলাংশ মধ্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার ও মান্দ্রাজ প্রদেশের কয়েকটী জেলা বঙ্গের অধীন করিবার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে জাতি-গত ও ভাষা-গত বৈষম্যের জন্য মান্দ্রাজের জেলাগুলি মান্দ্রাজ লাটের আপত্তি হেতু বঙ্গদেশে পরিগৃহীত হইল না। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া ছোটনাগপুরের অধিকাংশ স্থান বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভুক্ত রাখিতে হইল।

ইহার পর সরকারি রেজোলিউশনে (নির্দ্ধারণে) বঙ্গ-ভাষা-ভাষীদিগের বিচ্ছেদ-সাধনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন,—(১) পূর্ব্বে একবার তাঁহারা চট্টগ্রাম ও আসাম লইয়া একটী স্বতন্ত্র নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। (২) ইহার পর ১৯০৩ সালে গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করেন, তাহাতে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকেও আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা লিখিত হইয়াছিল; (৩) কিন্তু এই দুইটী জেলা গ্রহণ করিয়াও নূতন প্রদেশটীকে একজন ছোটলাটের অধীনতায় স্থাপনের যোগ্য বৃহৎ করিতে পারা গেল না। কাজেই রাজসাহী বিভাগকে নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা স্থির হইল। তখন বড় লাট বাহাদুর ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে বক্তৃতা-কালেই আভাস দিয়াছিলেন যে, বঙ্গ-বিভাগের তদানীন্তন প্রস্তাব অপেক্ষাও বৃহত্তর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার কর্ত্তৃপক্ষের সংকল্প আছে। সেই সময়ে লোকে যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

প্রথমে বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, রঙ্গপুর, পাবনা ও আসাম লইয়া একটি নূতন বিভাগ গঠন করিতে বলেন। কিন্তু ভারত-গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, ইহাতেও নূতন প্রদেশটি আশানুরূপ বড় হয় না। তাই তাঁহারা রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও কুচবিহার রাজ্য নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক বলিয়া স্থির করিলেন।

এই নূতন বিভাগ-কার্য্যটি বাঙ্গালী জাতির বংশ-গত, জাতি-গত, ভাষাগত ও ভৌগোলিক বিভাগ-গত সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আসামের চা-বাগানগুলিরও যাহাতে অধিকতর উন্নতি হয়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, নূতন প্রদেশের নাম "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" রাখা হইবে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজসাহী বিভাগ, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য ও আসাম এই নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ঢাকা এই নব প্রদেশের রাজধানী ও চট্টগ্রাম উহার দ্বিতীয় প্রধান নগর হইবে। এই প্রদেশের পরিমাণ ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল ও জন-সংখ্যা ৩ কোটী ১০ লক্ষ হইবে। ইহা-

দিগের মধ্যে ১ কোটী ৮০ লক্ষ মুসলমান ও ১ কোটী ৩০ লক্ষ হিন্দু। নূতন ছোট লাট বাহাদুরের একটী ব্যবস্থাপক সভা ও একটী বোর্ড অব রেবিনিউ থাকিবে। সেই বোর্ডে দুইজন মেম্বার থাকিবেন। নূতন প্রদেশ কলিকাতা হাইকোর্টেরই অধীন থাকিবে। অতঃপর পশ্চিম বঙ্গের পরিমাণ ১,৪১,৫৮০ বর্গ মাইল ও জন-সংখ্যা ৫ কোটী ৪০ লক্ষ—তন্মধ্যে ৪ কোটী ২০ লক্ষ হিন্দু হইবে।

জনসাধারণে এই প্রস্তাবে যে প্রতিবাদ করিয়াছে, গবর্ণর জেনারেল তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। এই প্রতিবাদের মূলে যে ভাবোচ্ছ্বাস বিদ্যমান, গবর্ণর জেনারেল তাহা উপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন না। দেশে দেশে, মানুষে মানুষে এত শীঘ্র ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া যায় যে, দেশ নূতন রকমে বিভক্ত করিলে ঐ ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখা দুরূহ হইয়া উঠে; এবং এইরূপ ঘনিষ্ঠতা বিচ্ছিন্ন হইলে তাহা বড়ই ক্লেশ-দায়ক ও সাধারণের অপ্রীতিকর হয়। কিন্তু এক প্রদেশের লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা বিচ্ছিন্ন হইলে আবার অবিলম্বেই নূতন প্রদেশবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠতা উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, এক্ষেত্রেও তাহাই হইবে।

উপসংহারে ভারত গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, এই বিভাগের ফলে বাঙ্গালী জাতির উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

৪॥০ কোটী বাঙ্গালীর প্রার্থনা বিফল হইল!

বঙ্গের ৪॥০ কোটি লোক এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত করিবার জন্য না করিয়াছে কি? এক বেলা না খাটিলে যাহার সমস্ত পরিবার অনাহারে থাকে, এমন দরিদ্র কৃষক স্বদেশ-রক্ষার জন্য অর্থ দিয়াছে, কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া রাজপুরুষদের নিকটে মনের ব্যথা জানাইবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে, যেখানে সভাসমিতি হইয়াছে, সেইখানেই উর্দ্ধশ্বাসে গমন করিয়াছে। প্রজা আশা করিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহাদের প্রাণের গভীর যাতনা উপলব্ধি করিয়া বঙ্গদেশকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিতে ক্ষান্ত হইবেন। কিন্তু প্রজার কাতর প্রার্থনায় লর্ড কর্জ্জন বা স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার কর্ণপাত করা উচিত মনে করিলেন না। পূর্ব্ববঙ্গের জমিদারগণ শত প্রলোভন, শত ভ্রুকুটী

দেখিয়াও বিচলিত বা ভীত হন নাই—তাঁহারা জননী জন্মভূমির দেহে ছুরিকাঘাত হইবে, ইহা কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা জন্ম-ভূমিকে অখণ্ড রাখিবার জন্য কুলি মজুরের ন্যায় দিবা-রাত্রি খাটিয়াছেন, দুই হস্তে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু রাজপুরুষেরা তাঁহাদের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না!

মান্দ্রাজের অন্তর্গত গঞ্জাম জেলা ও ভিজিগাপত্তমের দেশীয় রাজ্য-সমূহ, বঙ্গের অন্তর্গত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু মান্দ্রাজের জন-সাধারণ তাহাতে তীব্র প্রতিবাদ করেন। মান্দ্রাজের সহৃদয় গবর্ণর লর্ড এমথিল প্রজার হৃদয়ের ব্যথা বুঝিতে পারিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারত গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজের অঙ্গচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড কর্জ্জনের একান্ত আজ্ঞাবহ নহেন; সুতরাং লর্ড কর্জ্জন মান্দ্রাজের অঙ্গে ছুরি বিদ্ধ করিতে পারিলেন না।

ছোট নাগপুরের অনেক স্থান মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু ছোট নাগপুর কয়লা ও লোহার ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। কলিকাতার ইংরাজ বণিক্-সমাজ গভীর গর্জ্জনে বলিলেন, "ছোট নাগপুর বঙ্গের অঙ্গ-চ্যুত হইবে না।" লর্ড কর্জ্জন অমনি সে প্রস্তাব পরিহার করিলেন।

বঙ্গের প্রধান লোকেরা বঙ্গের ছোট লাটের নিকট গমন করিয়া বঙ্গদেশকে অক্ষত রাখিবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। ছোট লাট মুখে কত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন; যাহার যে আপত্তি আছে, তিনি তাহা স্বহস্তেই লিখিয়া লইয়াছিলেন; বঙ্গবাসীর মনের কথা বড় লাটকে জানাইতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলা আসামের সামিল করিতে লর্ড কর্জ্জনকে অনুরোধ করিলেন! ছোটলাট যদি আপত্তি করিতেন, তবে লর্ড কর্জ্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিতে কখনও সাহসী হইতেন না।

৪৷৷০ কোটি বাঙ্গালীর প্রার্থনা উপেক্ষিত হইল। কিন্তু জনকয়েক কয়লা-ব্যবসায়ী ইংরাজের আপত্তিতে লর্ড কর্জ্জন ছোট নাগপুর প্রদেশটি বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সাহসী হইলেন না।

বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। যাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে একত্র বাস করিতেছিল, পরস্পরের সুখ দুঃখের অংশী ছিল, পরস্পর প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মহাশক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতেছিল, লর্ড কর্জ্জনের এক খড়্গাঘাতে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, রাজসাহী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও বঙ্গের গৌরব-স্থল স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য নূতন প্রদেশের অন্তর্গত হইল! খাস বাঙ্গালায় কেবল ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, বর্দ্ধমান, হুগলি, হাবড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম জেলা ও কুচবিহার রাজ্য থাকিল।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর ভারত গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য-পত্রে বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের ন্যায় অষ্ট-কোটী জনপূর্ণ বিশাল দেশ একজন শাসন-কর্ত্তার অধীন থাকিলে শাসন-কার্য্যের বড় অসুবিধা হয়, একজন শাসন-কর্ত্তার পক্ষে এত বড় দেশ-শাসন করা বড়ই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। তাই বঙ্গদেশের বিভাগ করিয়া উহার একাংশ একজন নূতন শাসন-কর্ত্তার অধীন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গদেশের বিভাগ না করিয়া অন্যরূপে যদি শাসন-শৃঙ্খলা বিধান করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ কখনও বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ে পীড়াদান করিতেন না, একথা বলিতেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমরা মনে করিতে পারিতাম যে, কর্ত্তৃপক্ষ নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের প্রদর্শিত হেতুবাদ কি সত্য?

আমরা তর্কচ্ছলে না হয়, স্বীকার করিয়াই লইলাম যে, বঙ্গেশ্বরের গুরুভার লাঘব করিবার জন্য বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ৩ কোটী ১০ লক্ষ নর-নারীর শাসন-ভার অপরের হস্তে অর্পণ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ২ কোটী ৩৩৷৷০ লক্ষ বেহারী, ৪৯ লক্ষ ছোটনাগপুরী ও প্রায় ৭৫ লক্ষ উৎকলবাসীকে লইয়া একটী ৩৷৷০ কোটী জনপূর্ণ

প্রদেশের সৃষ্টি করা হইল না কেন? ৩ কোটী ১০ লক্ষ লোক লইয়া "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের" সৃষ্টি না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ৩॥০ কোটী জন-সমন্বিত "বেহার ও উড়িষ্যা" নামে নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিলেন না কেন? বৰ্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগকে পূর্ব্ব-বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সহিত পূর্ব্ববৎ সম্মিলিত রাখিয়া উহাকে "বঙ্গদেশ ও আসাম" নামে অভিহিত করিলে কি ক্ষতি হইত? যখন ভিজিগা-পত্তম ও গঞ্জাম প্রদেশকে ভাষা ও জাতি-গত সামঞ্জস্যের দোহাই দিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল না, যখন ছোটনাগপুরের পাঁচটি দেশীয় রাজ্য ভাষা-গত ঐক্যের জন্য মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইল, সম্বলপুর, বামড়া, কালাহাণ্ডি প্রভৃতি প্রদেশ উড়িষ্যা প্রদেশের সহিত সম্মিলিত করা হইল, তখন বঙ্গ-ভাষা-ভাষী লোকদিগকে একত্র ও একজন লাটের শাসনাধীন রাখা হইল না কেন? উত্তরে গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, That would make the province universally unpopular. অর্থাৎ সেরূপ ব্যবস্থা কাহারও (অর্থাৎ কোনও সিবিলিয়ানেরই) প্রীতিপ্রদ হইত না! সুতরাং বঙ্গের লক্ষ লক্ষ প্রজার মত পদ-দলিত হইল!

পাঠক ব্যাপারটা বুঝুন। বর্ত্তমান বঙ্গ-দেশের লোক-সংখ্যা প্রায় ৮ কোটী; ইহার মধ্যে ৪ কোটী ২৮ লক্ষ জনের মাতৃ-ভাষা বাঙ্গালা; ২ কোটী ৩৩॥০ লক্ষ জনের মাতৃভাষা বেহারী হিন্দী; অবশিষ্ট ৭৫ লক্ষ জন উড়িয়া ভাষায় কথা কহে। বড়লাট বাহাদুর ৪ কোটী ২৮ লক্ষ বঙ্গভাষা-ভাষীর মধ্যে ১ কোটী ৭২ লক্ষ বাঙ্গালীকে উড়িয়া ও বেহারী-দিগের সহিত রাখিয়া অবশিষ্ট ২ কোটী ৪৬ লক্ষ বাঙ্গালীকে আসাম-বাসীর সহিত সংমিলিত করিবার আদেশ করিয়াছেন। এই আদেশ অনুসারে, বাঙ্গালা যাহাদিগের মাতৃভাষা, এমন ১৪টি জেলার ও একটি দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদিগকে আসামীদের সহিত এবং দশটি জেলার ও একটি দেশীয় রাজ্যের লোককে উড়িয়া ও বেহারীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে হইল। সুতরাং পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে এতদিন যে সামান্য পার্থক্য ছিল, এবং যে পার্থক্য একত্র অবস্থান ও জ্ঞানের চর্চ্চা-হেতু দিন দিন হ্রাস পাইতেছিল, তাহা অতঃপর বৰ্দ্ধিত ও স্থায়ী হইবে, সন্দেহ নাই।

সেইরূপ এতদিন হিন্দু ও মুসলমান একত্র ছিল; তাহারা নূতন ব্যবস্থায় পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। পশ্চিম বঙ্গে ৪ কোটী ২০ লক্ষ হিন্দু ও ৯০ লক্ষ মুসলমান এবং পূর্ব্ব বঙ্গে ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু ও ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান হইল। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দু-প্রধান ও পূর্ব্ববঙ্গকে মুসলমান-প্রধান করিয়া তুলিলেন! ফলকথা, যে দিক্ দিয়াই দেখি, বাঙ্গালা প্রদেশকে বিভক্ত করা অপেক্ষা বাঙ্গালী জাতির ব্যবচ্ছেদ সাধন করাই কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং দেশের বিশালতায় বা জন-সংখ্যার আধিক্যে শাসনের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল,—একথা বলা অপেক্ষা বাঙ্গালী জাতির ঐক্য-বলই কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষুঃশূল হইয়াছিল, বলিতে হইবে। তাই, সুচতুর গবর্ণমেণ্ট বঙ্গ-বিভাগের নামে বঙ্গ-ভাষা-ভাষী একতা-সম্পন্ন বাঙ্গালী জাতিকে দ্বিখণ্ড করিলেন!

ভারত গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন,—ইদানীং বঙ্গেশ্বরের কার্য্য-ভার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। একথা যতদূর সত্য হউক, ইহা নিশ্চিত যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য বৃদ্ধি পায় নাই। বঙ্গের হাইকোর্ট কার্য্য-ভার বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কোনরূপ অভিযোগ করেন নাই, অন্ততঃ তাঁহারা দ্বিতীয় হাইকোর্ট-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী হন নাই। রেবিনিউ বোর্ড সমগ্র বঙ্গের রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য-পরিচালনে অশক্ত হইয়াছিলেন, এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায় নাই। শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টার মহোদয়ও শিক্ষা-বিভাগের কার্য্য-পরিচালন-বিষয়ে স্বীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন নাই। পুলিশের ইনস্পেক্টার জেনারেল মনুষ্যের সাধ্যাতীত কার্য্য করিতে হইতেছিল বলিয়াও অভিযোগ করেন নাই। ইনস্পেক্টর জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশনকে প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের নিকট স্বীয় কার্য্যের রিপোর্ট দাখিল করিতে হয় না বটে, কিন্তু তিনিও সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই। তদ্ভিন্ন কারাগার-সমূহের ইন্স্পেক্টার জেনারেল এবং হাসপাতাল-সমূহের ইন্স্পেক্টার জেনারেল-দিগের সম্বন্ধেও ঐ প্রকার কথা বলা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গীয় রাজপুরুষদিগের মধ্যে এক ছোটলাট ভিন্ন

আর কেহই কার্য্য-ভার বৃদ্ধির অভিযোগ করেন নাই! কিন্তু তাঁহার একজনের কার্য্য-ভার লঘু করিবার জন্য বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিবার প্রয়োজন কি? ছোটলাট বাহাদুরের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য একজন ডেপুটি গবর্ণর নিযুক্ত করিলেই ত কার্য্য চলিতে পারিত? সংপ্রতি বঙ্গদেশ যেরূপে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাতে শাসন-কার্য্যের জন্য বৎসরে অন্যূন ১২॥০ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় পড়িবে, কিন্তু একজন ডেপুটি গবর্ণর নিযুক্ত করিলে বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অধিক ব্যয় করিলেই নির্ব্বিঘ্নে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের ন্যায় বঙ্গদেশেও একজন গবর্ণর নিযুক্ত করিলে বর্ত্তমান ব্যবস্থার অপেক্ষা বৎসরে ৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা কম ব্যয়ে কার্য্য-সিদ্ধি হইতে পারিত। বঙ্গবাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট এই সকল প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু লর্ড কর্জ্জন ও ভারত-সচিব মিঃ ব্রডরিক তাহাদের কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া বঙ্গদেশের বিভাগ করিবারই আদেশ প্রচার করিলেন। তাঁহাদিগের এই প্রকার ব্যবহারের মর্ম্মানুধাবন করিলে সহজেই মনে হয় যে, শাসনকার্য্যের শৃঙ্খলা-বিধান বা ছোটলাটের কার্য্যভার-লাঘব বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য নহে; বাঙ্গালীকে বিভক্ত করিয়া তাহাদের শক্তি-খর্ব্ব করাই কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রেত ছিল।

অঙ্গচ্ছেদের পরিণাম।

এই বাঙ্গালী জাতির অঙ্গচ্ছেদের পরিণাম চিন্তা করিলে আমাদিগকে অবসন্ন হইতে হয়। প্রথমতঃ পশ্চিম বঙ্গের ক্ষতির কথাই বলি। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের ব্যবসায়ীদিগের সাহায্যে কলিকাতার বাণিজ্য আর পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিবে না। চট্টগ্রাম বাণিজ্য ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল হইলে কলিকাতার মারওয়াড়ী, মুসলমান ও বাঙ্গালী হিন্দু ব্যবসায়িগণের অবনতি আরম্ভ হইবে। নূতন প্রদেশে নূতন হাইকোর্ট হইলে কলিকাতার হাইকোর্টের জজদিগেরও সংখ্যা ও ক্ষমতা হ্রাস পাইবে। হাইকোর্টের ক্ষমতা-হ্রাসের সহিত শাসন-বিভাগের জুলুম বাড়িবে। কলিকাতা আর সমগ্র বাঙ্গালী জাতির বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সম্মিলন-ক্ষেত্র থাকিবে না। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের সম্মিলন অতঃপর নূতন প্রদেশের রাজধানীতেই হইবে। আমরাও তাঁহাদিগের

সাহচর্য্য ও সহায়তা হইতে ক্রমে বঞ্চিত হইব। ইহাতে বঙ্গ সাহিত্যের সামান্য ক্ষতি সংঘটিত হইবে না।

পূর্ব্ব-বঙ্গের জমিদারগণ কলিকাতা ছাড়িয়া নূতন প্রদেশের রাজধানীতে গিয়া বাস করিবেন। অনেক জমিদারের পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে—উভয়ত্রই জমিদারী আছে। তাঁহাদিগকে উভয় রাজধানীতে আবাস-স্থান নির্ম্মাণ করিতে হইবে, সরকারি চাঁদার খাতায় উভয় প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অর্থদান করিতে হইবে, বঙ্গের প্রায় অর্দ্ধেক লোক-সংখ্যা নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়ছে, কিন্তু বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয় তদনুপাতে হ্রাস পায় নাই। কাজেই রাজ-কার্য্য পরিচালনের ব্যয় আমাদিগকে পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বহন করিতে হইতেছে।

পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গবাসীদিগকেও এই সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, সেখানকার শাসন-ব্যয় অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গবাসীর অন্যান্য অসুবিধা ও ক্ষতিও সামান্য নহে। নূতন প্রদেশে একটা নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিতে, ছোট লাটের প্রাসাদ ও আফিস প্রভৃতি তৈয়ার করিতে ১৪।১৫ কোটী টাকার কম ব্যয় হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। এই ১৪ কোটী টাকা যে নূতন প্রদেশের লোকদিগের নিকট হইতেই আদায় করা হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ছোট লাট ও তাঁহার সেক্রেটারীদিগের বেতন ইত্যাদির জন্য বৎসরে ১২ লক্ষ টাকার কম কখনও ব্যয় হইবে না। সমস্ত বঙ্গের ৭৷৷০ কোটী লোকে এতদিন যে ব্যয় বহন করিত, নূতন প্রদেশের ৩ কোটী ১০ লক্ষ লোককে এখন সেই ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। এই ব্যয়ভারে কি পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসাম নিষ্পেষিত হইবে না?

নূতন প্রদেশে কলিকাতার ন্যায় মেডিকেল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পুষা কৃষি কলেজ এবং মিশনারী ও স্বাধীন কলেজসমূহের মত বিদ্যালয়-নির্ম্মাণ করা বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া অসম্ভব হইবে। সুতরাং নূতন প্রদেশবাসীর শিক্ষার অবনতি অনিবার্য্য। নূতন প্রদেশের ছোটলাটের জন্য সৈন্য রাখিতে হইবে, সুতরাং সৈন্যাবাস-নির্ম্মাণ করিতেও স্বতন্ত্র খরচ পড়িবে। ইহাতেও অনেক অর্থের প্রয়োজন হইবে। এই সকল কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয়িত হইলে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য রাজকোষ হইতে অধিক অর্থ ব্যয়

করা সম্ভবপর হইবে না। এতদ্ভিন্ন বঙ্গব্যবচ্ছেদের ফলে দেশে যে অশান্তি ও উৎপীড়নের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন।

ফলতঃ এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদেরে ফলে বাঙ্গালী জাতি বিভক্ত, দুর্ব্বল ও কর-ভারে প্রপীড়িত হইয়া ক্রমশঃ ধ্বংস-মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে। তাই আমরা বঙ্গ-বিভাগে এরূপ প্রাণপণে প্রতিবাদ করিয়াছি ও করিতেছি। শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশের ব্যবচ্ছেদ করা হয় নাই; বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানই রাজপুরুষদের উদ্দেশ্য।

রাজপুরুষদিগের কুটিলতা।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান"-পত্রের সম্পাদক একটী অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধের একস্থলে কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—

"Objects of the scheme are, briefly, first to destroy the collective power of Bengali people, secondly, to overthrow the political ascendency of Calcutta, and thirdly, to foster in East Bengal the growth of Mahomedan power which it is hoped will have the effect of keeping in check the rapidly growing strength of the enducated Hindu community."

অর্থাৎ "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, (১) বাঙ্গালী জাতির সমবেত শক্তিকে নষ্ট করা. (২) কলিকাতার রাজনীতিক প্রাধান্যের উচ্ছেদ-সাধন করা, (৩) পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান শক্তির পরিপুষ্টি সাধন করা। মুসলমান শক্তির পুষ্টি সাধিত হইলে তাহা শিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায়ের দ্রুত-বর্দ্ধন-শীল শক্তিকে বাধা দান করিবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন।"

পাঠক! "ওরিয়েন্টাল ডিপ্লোম্যাসী" বা প্রাচ্য কুটিলতার নিন্দাকারী লর্ড কর্জ্জনের বঙ্গ-বিভাগ প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা একজন এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সম্পাদকের মুখেই শুনিলেন? এখন একবার শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করুন। বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে যে সকল সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লর্ড কর্জ্জন একস্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

It cannot be for the lasting good of any country or any people that public opinion or what passes for it should be manufactured by a comparatively small number of people at a single centre and should be disseminated thence for universal adoption, all other views being discouraged or suppressed......From every point of view it appears to us desirable to encourage the growth of centres of independent opinion, local aspirations, local ideas and to preserve the growing intelligence and enterprise of Bengal from being cramped and stunted by the process of forcing it prematurely into a mould of rigid and sterile uniformity.

লর্ড কর্জ্জনের এই কৌশলময়ী উক্তির সরল বাঙ্গলায় অর্থ এই

যে,—কলিকাতার ন্যায় কোনও কেন্দ্র স্থানের স্বল্প-সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির মতানুসারে যদি সমগ্র বঙ্গের লোকে চলে, তবে তাহার ফল কখনই বঙ্গদেশের ও বাঙ্গলা জাতির পক্ষে শুভকর হইবে না। এক মতে সকলেই না চলিয়া সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের লোকে যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করে—যাহাতে এক-ভাষা-ভাষী লোকের মধ্যে নানা মুনির নানামত ঘটিবার সুযোগ বৃদ্ধি পায়, সকলেই স্ব স্ব প্রধান ভাবে চলে, সকলের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ একবিধ না হইয়া যাহাতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন। বঙ্গে অধুনা যেরূপ ঐক্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে সমাজে স্বতন্ত্র ভাবের ও মতের স্ফূর্ত্তি ঘটিতে পাইতেছে না। এরূপ ঐক্য কর্ত্তৃপক্ষ দূষণীয় বলিয়া মনে করেন।"

ইহা অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আর কি হইতে পারে? কিন্তু এখানেই রাজপুরুষদিগের ক্রূরতার শেষ হয় নাই। জাতীয় মহাসমিতির গত একবিংশ অধিবেশনের সভাপতি যথার্থই বলিয়াছেন,—"এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে লর্ড কর্জ্জন যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ধীর ও সংযতভাবে তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করা যায় না। পূর্ব্বে ক্ষুদ্রভাবে যে ব্যবচ্ছেদের কল্পনা হইয়াছিল, তাহা তিনি প্রকাশ করিলে দেশে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া তিনি তাঁহার শেষের সিদ্ধান্ত, সমগ্র পূর্ব্ব বঙ্গের ব্যবচ্ছেদের সঙ্কল্প, আদৌ প্রকাশ করিলেন না। এক বৎসরের অধিককাল এই বিষয়ে উচ্চ বাচ্য ছিল না; কিন্তু গোপনে গোপনে কার্য্য চলিতেছিল। জনরব উঠিল, ব্যবচ্ছেদের সংকল্প পরিত্যক্ত হইয়াছে। সে বিষয়ে লর্ড কর্জ্জনও কোনও প্রতিবাদ করিলেন না। শেষে ভারত-সচিবের অনুমোদন লাভ করিয়া সিমলা হইতে সহসা ব্যবচ্ছেদের কথা প্রকাশ করা হইল। পরে হঠাৎ তিনি পদত্যাগ করিলেন। ইহাতে লোকে ভাবিল, সে সম্বন্ধে আর কিছু হইবে না—কারণ তৎপূর্ব্বে ভারতসচিব পার্লামেণ্টে ব্যবচ্ছেদ সংক্রান্ত কাগজ-পত্র দাখিল করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন; সুতরাং পার্লামেণ্টে আলোচনার পূর্ব্বে কিছু হইবে না, ইহাই লোকে বুঝিল। বস্তুতঃ পদত্যাগ করিবার পর লর্ড মিণ্টোর উপর এই বিষয়ের বিবেচনা করিবার ভার অর্পণ করাই লর্ড কর্জ্জনের

উচিত ছিল। যুবরাজের ভারতে আগমনের সময় যাহাতে একটা সমগ্র প্রদেশের লোক শোকে মুহ্যমান না হয়, তাহা করাও তাঁহার উচিত ছিল। কিন্তু লর্ড কর্জ্জনের সে সুমতি হইল না। তিনি জেদের বশবর্ত্তী হইয়া গত ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ৩০শে আশ্বিন বঙ্গবাসীর মস্তকে বজ্রাঘাত করিলেন।"

মুসলমান সমাজের ক্ষতি।

লর্ড কর্জ্জনের এই ব্যবস্থায় মুসলমানদিগের কিছু সুবিধা হইল বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ, এত দিন সমগ্র বাঙ্গলার অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ মুসলমান ছিল। যদি বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট মুসলমানদিগের সামাজিক কোন রীতি নীতিতে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী—অর্থাৎ আড়াই কোটী বাঙ্গালী মুসলমান সেই কার্য্যের প্রতিবাদ করিত। সুতরাং আড়াই কোটী মুসলমান অধিবাসীর বিরক্তিকর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টকে একটু ইতস্ততঃ করিতে হইত। কিন্তু এখন পশ্চিম বঙ্গের ৫০লক্ষ মুসলমানকে বঙ্গেশ্বর গ্রাহ্যও করিবেন না। সাড়ে চারি কোটী অধিবাসীর মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ মুসলমান কোথায় নগণ্য হইয়া পড়িয়া থাকিবে।

যে কারণে পশ্চিম বঙ্গের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মুসলমানগণ অগ্রাহ্য হইবে, অবিকল সেই কারণে পূর্ব্ববঙ্গের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসীরা নগণ্য হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা অর্দ্ধেকের অপেক্ষা অল্প হওয়াতে রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিবেন না। ফলতঃ বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমানকে পৃথক্ করিয়া দেওয়াতে ক্ষমতা-প্রিয় রাজপুরুষদিগের যথেচ্ছাচার-প্রবৃত্তি পরিপূর্ণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইবে। কাহারও কাহারও ধারণা যে, বঙ্গদেশ ব্যবচ্ছিন্ন হওয়ায় মুসলমানদিগের পক্ষে ভালই হইয়াছে। কারণ, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইয়াছে, এবং সেই জন্য মুসলমানের পক্ষে রাজকার্য্য-লাভের কিছু সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু এখনও পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা অধিকই আছে। গবর্ণমেণ্ট মুসলমানকে সংখ্যার অনুপাতে চাকরি দিতে ইচ্ছা করিলে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ না করিয়াও তাহা দিতে পারিতেন।

মুসলমান সমাজের মধ্যে ইদানীং যে বিত্মাচর্চ্চার আদর হইতেছে, তাহা পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গেই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্ব বঙ্গে মুসলমানগণ সংখ্যায় অধিক হইলেও পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানগণ বিত্মা-চর্চ্চায় ও জ্ঞানানুশীলনে সমধিক আগ্রহ-সম্পন্ন। এক্ষণে পশ্চিম-বঙ্গ হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করাতে পূর্ব্ব-বঙ্গের মুসলমান সমাজে শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। সুতরাং অতঃপর মুসলমান সমাজের উন্নতির গতি অপেক্ষাকৃত মৃদু হইবে। শতাধিক বর্ষের চেষ্টায় পর পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানগণ বিদ্যাচর্চ্চার কিছু উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছেন; সেই শিক্ষিত মুসলমানদিগের সাহায্য লাভ করায় পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত মুসলমানদিগের উন্নতির পথ যতটুকু সুগম হইয়া আসিতেছিল, তাহা অতঃপর রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহে বহু কালের জন্য কণ্টকিত হইল। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানগণের উন্নতি-সাধনের জন্য আবার একশত বৎসর সময় লাগিবে।

শিক্ষিত মুসলমান-সমাজের মুখপত্র 'নবনূরে' (১৩১২ সালের আশ্বিন মাসের সংখ্যায়) মৌলবী একিন উদ্দীন আহম্মদ বি এ, মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে,—"বহুদিনের চেষ্টার পর সমস্ত বঙ্গদেশের মুসলমানগণ সংপ্রতি দুই এক বৎসর হইতে একমত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। রাজনীতিক পথে কি প্রকারে অগ্রসর হইবেন, তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা অল্পদিন হইল, নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন আবার গবর্ণমেণ্টের নূতন ব্যবস্থা হইল। নূতন প্রদেশে নূতন ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এখন মুসলমানকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাদের এত দিনের সমবেত চেষ্টা এক মুহূর্ত্তে চুরমার হইল। মুসলমানগণ যে প্রদেশেরই অধিবাসী হউক ও সংখ্যায় যতই হউক, উচ্চশিক্ষালাভ না করিলে তাহাদের কিছুতেই উন্নতি হইবে না। সেইজন্য মুসলমানের শিক্ষার উন্নতি যেস্থানে হইবে, সেই স্থানের সহিত মুসলমানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া উচিত। কিন্তু বহু দিনের ও বহু লোকের অসীম চেষ্টায় যে কলিকাতা মহানগরী উচ্চ শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র-স্থান হইয়াছে, বঙ্গবিভাগে সেই কলিকাতার সহিত অধিকাংশ মুসলমানের সংস্রবচ্ছেদ হইল। ইহাতে মুসলমানের সামান্য ক্ষতি হয় নাই।"

তাই এই আন্দোলনে বগুড়ার নবাব শ্রীযুক্ত আব্বাস সোভান চৌধুরী সাহেব, টাঙ্গাইলের জমিদার শ্রীযুক্ত আবদুল হালেম গজনবী, ব্যারিষ্টার মিঃ এ, রসুল, চট্টগ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী, ও শ্রীযুক্ত সিদ্দিক আহাম্মদ চৌধুরী, খাঁ বাহাদুর বদরুদ্দিন হায়দার, ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মৌলবী শামস্ উল হুদা এম এ, বি এল. ফরিদপুরের জমিদার মৌলবী আনারউদ্দীন খাঁ চৌধুরি ও চৌধুরি মহম্মদ আলিমজ্জমান বি এ, সীতাকুণ্ড মাদ্রাসার স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত মওলানা ওবারদল হক্, মৌলবী মনিরজ্জমা, মৌলবী কাজিম আলি, ময়মনসিংহের মৌলবী হামিদ উদ্দীন মহম্মদ, হবিগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত গোলাম মওলা চৌধুরী সাহেব প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেশমান্য মুসলমান যোগদান করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

প্রজার প্রতিবাদ।

ভারত গবর্ণমেণ্টের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-বিষয়ক আদেশের অন্যায্যতা প্রদর্শ-নের জন্য বঙ্গদেশের নানা স্থানে সভা-সমিতি হইয়াছে এবং এখনও হই-তেছে। গবর্ণমেণ্টের প্রথম প্রস্তাব শ্রবণ করিয়াই বঙ্গদেশে বিষম আন্দো-লন উপস্থিত হয়। প্রকৃতিপুঞ্জ ন্যূনাধিক ৬ শত বৃহতী সভার অধি-বেশন করিয়াছিল; প্রত্যেক সভায় দশ হাজার হইতে ৪০ হাজার পর্য্যন্ত লোক সমবেত হইয়াছিল! শুদ্ধ তাহাই নহে, দেশের রাজা, মহারাজ ও জমিদারেরা—যাঁহারা চিরকাল গবর্ণমেণ্টের হুকুম শিরোধার্য্য করিয়া ও গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত শূন্যগর্ভ উপাধি লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন, তাঁহারাও এবার প্রতিবাদের আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন; উত্তর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নাটোর ও দিনাজপুরের মহারাজ এবং কাকিনা, দিঘাপাতিয়া ও ডিমলার রাজারা এবং বগুড়ার নবাব বাহাদুর ঐ আদেশে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বিলাতে ভারতসচিব মহোদয়ের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিলেন! পশ্চিমবঙ্গ হইতে মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীও ভারত-সচিবের নিকট পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তার-যোগে আপনাদিগের অসন্তোষ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। এইরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, জমীদার হিন্দু মুসলমান প্রজা প্রভৃতি যাবতীয় অধিবাসী একযোগে বঙ্গ-

বিভাগ প্রস্তাবে আপত্তি জানাইয়াছেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ, ৺আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যে সকল মনীষী অঙ্গদেশে পূজার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কথাও কর্ণপাতের যোগ্য বলিয়া রাজপুরুষেরা বিবেচনা করেন নাই! ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের রেজোলিউশনে ব্যবচ্ছেদের আন্দোলনকে শূন্য-গর্ভ বা কৃত্রিম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হন নাই। তথাপি তাঁহারা ৪॥০ কোটী প্রজার কাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহাদের প্রথম উপেক্ষা প্রকাশের পরও আবার প্রকৃতিপুঞ্জ ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, জমীদার প্রজা সকলে মিলিয়া রাজার নিকটে অনুগ্রহ-ভিক্ষা করিয়া বলিয়াছেন,—"প্রভো! আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিও না" গত ১৯০৪ সালের ৭ই আগষ্ট কলিকাতার টাউন হলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় ২০ হাজার বঙ্গবাসী ও ৪ হাজার কলেজের ছাত্র উপস্থিত হইয়া সরকারি প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন। এই সভার অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত ইহাও স্থির হয় যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব পরিত্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বঙ্গবাসী কোনও বিলাতী জিনিস ব্যবহার করিবেন না। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তথাপি গবর্ণমেণ্ট সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। তাঁহারা ১লা সেপ্টেম্বর ঘোষণা করিলেন, ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গবিভাগ কার্য্য সম্পন্ন হইবে! ঘোষণানুসারে যথাসময়ে বঙ্গ-জননী দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছেন!

আমাদের কর্ত্তব্য।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? লর্ড কর্জ্জনের ব্যবহারে বাঙ্গালীর মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। পরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে, নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিলে, আর আমাদের চলিবে না। আত্ম-শক্তির উপর নিভর করিয়া আমাদিগকে কঠোর কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। নচেৎ আমা-দিগের ঘোর অধঃপতন ও সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। আমরা যে উপায় অব-লম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহাই আমাদিগের এখন একমাত্র

অনুসরণীয়। বিলাতী বস্ত্রাদি পণ্যদ্রব্য পরিহার-পূর্ব্বক আমাদিগের অভিযোগে ইংলণ্ডের জনসাধারণকে, কর্ণপাত করিতে বাধ্য করিতে হইবে। ইহাই আমাদের এখন একমাত্র কর্ত্তব্য। আমাদের ছোটলাট ও বড়লাট বাহাদুর মনে করিয়াছিলেন, বঙ্গ-বিভাগ সংক্রান্ত ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হইলেই এই কৃত্রিম আন্দোলনের নিবৃত্তি হইবে। এই বিশ্বাসেই তাঁহারা অতীব ক্ষিপ্রতার সহিত বঙ্গবিভাগ-বিষয়ক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা তাঁহারা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

লর্ড কর্জ্জন ও স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার যে ঘোষণা-পত্রকে স্বদেশী দ্রব্য-ব্যবহারবিষয়ক আন্দোলনের নিবৃত্তি-কারক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই ঘোষণা-পত্রই বঙ্গদেশে নূতন আন্দোলনের সূচনা করিয়াছে। আমরা লর্ড কর্জ্জনের এই ঘোষণা প্রচারের দিবসকে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটী স্মরণীয় দিবস বলিয়া মনে করি। ৪॥০ কোটী বাঙ্গালী প্রাণ-পণে একত্র থাকিতে চেষ্টা করিতেছে, আর সাম্রাজ্য-মদমত্ত রাজপুরুষেরা তাহাদিগকে রাজকীয় বজ্র দণ্ডের আঘাতে বিভক্ত করিতে-ছেন। বঙ্গদেশের ইতিহাসে এ ঘটনা যে অভূতপূর্ব্ব, তাহাতে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা বঙ্গদেশের বিচ্ছেদ সাধন; আমাদিগের চেষ্টা বাঙ্গালী জাতির ঐক্য-সংরক্ষণ। গবর্ণমেণ্ট রাজশক্তির বলে স্বীয় প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াছেন, আর আমরাও ৪॥০ কোটী বঙ্গসন্তান লর্ড কর্জ্জনের শেলাঘাত বক্ষে ধারণ করিয়া সম্মিলিত চেষ্টায় আমাদের জননী জন্মভূমির অঙ্গচ্ছেদ-নিবারণে কৃতসংকল্প হইয়াছি। গত ১লা নবেম্বর সমগ্র বঙ্গে প্রজার পক্ষ হইতে এই ঘোষণ প্রচারিত হইয়াছে—

যেহেতু সমগ্র বঙ্গবাসীর সমস্ত আপত্তির বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ড করাই স্থির করিলেন, সেই জন্য আমরা বাঙ্গালার অধিবাসিগণ এই বিভাগ-নীতির অশুভ ফল দূর করিবার জন্য সমগ্র জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের একাগ্র সম্মিলিত চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম, ইহাই অদ্য ঘোষণা করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

দেখা যাউক, ৪॥০ কোটী বাঙ্গালীর সংকল্প সিদ্ধ হয় কি না?

রাজপুরুষেরা আজ সাম্রাজ্য গর্ব্বে স্ফীত হইয়া আপনাদিগকে সর্ব্বশক্তিমান মনে করিতেছেন। ভারত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, অকর্ম্মণ্য ভারত-সচিব মিঃ ব্রডরিক ও জন মর্লি লর্ড কর্জ্জনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই কোটী কোটী প্রজার আবেদন, নিবেদন ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া তাহাদিগের বক্ষঃস্থলে শেলাঘাত করিবার প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেও হতাশ হই নাই। আমরা জানি, রাজপুরুষেরা যতই ক্ষমতাশালী হউন, তাঁহাদের উপরও কর্ত্তা আছেন। ভারত-সচিব ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মন্ত্রি-সমাজ আপনাদিগকে যতই শক্তিশালী বলিয়া বিবেচনা করুন, তাঁহাদিগের অবস্থা আমাদিগের অবিদিত নহে। বিলাতের জন-সমাজ ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রি-সমাজের বিরুদ্ধবাদী হওয়ায় তাঁহারা নিমেষ মধ্যে যে কোথায় উড়িয়া গিয়াছেন, তাহার স্থিরতা নাই। এখন সাম্রাজ্য-বাদের বিরোধী ঔদারনৈতিক দল ইংলণ্ডের রাজনীতি-চক্র পরিচালন করিতেছেন। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে ইহারা রক্ষণশীল দলের অপেক্ষাও অধিকতর কঠোরতা অবলম্বনে অগ্রসর হইয়াছেন। তথাপি আমরা নিরাশ হইতে পারি না। আমরা স্থাণুর ন্যায় অচল অটল থাকিলে, ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় কর্ত্তব্য পথ পরিত্যাগ না করিলে, বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যই হইবে; ইহাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

ফল কথা, রাজ-বংশের ন্যায় রাজ-পুরুষগণেরও উত্থান ও পতন আমরা চিরকালই দেখিয়া আসিয়াছি, আরও কত দেখিব! রাজ্যের সহিত রাজপুরুষগণের সম্বন্ধ যেরূপ ক্ষণিক, দেশের সহিত দেশ-বাসীর সম্বন্ধ সেরূপ ক্ষণিক নহে। সুতরাং আমাদিগের সংকল্পের দৃঢ়তা থাকিলে—আমরা কায়মনোবাক্য ও স্থায়িভাবে চেষ্টা করিতে পারিলে রাজপুরুষদিগের ক্ষণিক উদ্যম কতক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে? পক্ষান্তরে আমরা ইহাও জানি যে, ইংরাজ এদেশের রাজা হইলেও রাজ্যের অপেক্ষা বাণিজ্যের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি সমধিক। ভারতের শাসন-দণ্ডের পরিচালনা করিয়া তাঁহারা যেরূপ লাভবান্ হইয়া থাকেন, এদেশের বাণিজ্যে তাঁহাদিগের তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক লাভ হইয়া থাকে। এদেশে ইংরাজগণ স্বীয় রাজ-শক্তির সঙ্কোচ সন্দর্শন করিলে

যতটা বিচলিত না হন, বাণিজ্যের সঙ্কোচে তাঁহাদিগের তদপেক্ষা অধিকতর আতঙ্কের সঞ্চার হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় বাণিজ্যের জন্যই বিলাতের লোকের নিকট ভারতীয় সাম্রাজ্যের এত আদর। সে বাণিজ্যের যদি কোনরূপে ক্ষতি সাধিত হয়, ইংরাজের ব্যবসায় যদি ভারতে সঙ্কোচ-লাভ করে, তাহা হইলে ইংলণ্ডীয় জন-সমাজ নিশ্চিত বিচলিত হইয়া তাঁহাদের বাণিজ্য-পথের কণ্টক দূর করিবার জন্য সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদিগের গ্রাহক-স্থানীয় ভারতীয় প্রজার সন্তোষ-সাধনে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতীকার-স্বরূপ বিলাতী পণ্যের যথাসাধ্য পরিবর্জ্জন করিবার সংকল্প করিয়াছি। আমাদিগের বিশ্বাস, এ সংকল্প যদি আমরা অটল রাখিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের বাসনা নিশ্চিত পূর্ণ হইবে, "কাটা মুণ্ড কথা কহিবে, কাটা বাঙ্গালা জোড়া লাগিবে।" ইতোমধ্যেই আমরা যতটুকু দৃঢ়তা দেখাইয়াছি, (১) তাহাতেই বিলাতী বণিক্-সমাজের চমক্ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। রাজপুরুষেরাও ভীত হইয়া স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য কঠোর শাসন-নীতির অবলম্বন করিয়াছেন। ইংরাজের পক্ষে এই কঠোরতার কুফলও ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের জাতীয় ভাব রাজপুরুষদিগের যথেচ্ছাচারে দিন দিন পরিপুষ্ট হইতেছে। আমাদের জাতীয় ভাব বৃদ্ধির সহিত ইংরাজের শাসন যন্ত্র যে ক্রমশঃ অচল হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহা "ইংলিশম্যান" ও অন্যান্য এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্রের আর্ত্তনাদেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইতেছে। সুতরাং মুষ্টিমেয় ইংরাজের পক্ষে দীর্ঘকাল এরূপ কঠোর শাসন পরিচালন

---

(১) আমাদের বিলাতী পণ্য বর্জ্জন চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা দেখুন,—বিলাতী বস্ত্রের আমদানি—বঙ্গদেশে (কলিকাতায়) হইয়াছে—

১৯০৬ সালে ১৯,৪০,৩০,২০১ টাকা
১৯০৭ সালে ১৭,০৩,৩৪,১০৭ টাকা
২,৩৬,৯৬,০৯৪ টাকার কম

সেই সঙ্গে দেশীয় কলকারখানায় উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ কিরূপ বাড়িয়াছে তাহাও দেখুন—(ওজনে) ১৯০৪—০৫ সালে ৫৪,৯৫,২৯,০৬৫ পাউণ্ড। (৮২ পাউণ্ডে এক মণ)

১৯০৫—০৬ ,, ৫৬,৪৯,৯০,১৯০ ,,
১৯০৬—০৭ ,, ৭০,৮১,৩৯০৩৪ ,,

সম্ভবপর হইবে না। যদি আমরা প্রাণপণ চেষ্টায় যথাসম্ভব বিলাতী দ্রব্যের পরিহার করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমাদিগের আশা পূর্ণ হইবে, জননী জন্ম-ভূমির অঙ্গচ্ছেদ নিশ্চয় নিবারিত হইবে।

এতদুপলক্ষে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতিরূপে মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর মনোযোগ আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন—"অমঙ্গল হইতেও মঙ্গলের উদ্ভব হইয়া থাকে। বঙ্গে যে দুর্দ্দিন গিয়াছে এবং যাইতেছে, তাহার একটী শুভ ফল ইতোমধ্যেই নয়নগোচর হইতেছে। এই ব্যবচ্ছেদ-ব্যাপারে লোকের মনের ভাব যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে,তাহা আমাদিগের জাতীয় উন্নতির ইতিহাসে স্মরণীয় হইবে। ইংরাজ রাজত্বে এই প্রথম সর্ব্বশ্রেণীর ভারতবাসী জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে এক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া একযোগে একটী সাধারণের অহিতকর বিষয়ের প্রতিবাদ করিতেছেন। সমগ্র প্রদেশে প্রকৃত জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা হইয়াছে—সকলে ব্যক্তিগত স্বার্থ, বিদ্বেষ, কলহ বিসংবাদ প্রভৃতি (অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও) বিস্মৃত হইয়াছে। রাজপুরুষগণের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বঙ্গবাসী যেরূপ নির্ভীক ভাবে ও দৃঢ়তা সহকারে দণ্ডায়মান হইয়াছে,তাহাতে সমগ্র ভারতবাসী বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছেন। এরূপ আন্দোলনে সামান্য একটু বাড়াবাড়ি লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই। এই ব্যাপার উপলক্ষে এ দেশের প্রজাসাধারণ যে শক্তি লাভ করিল, তজ্জন্য বঙ্গবাসীর নিকট সমগ্র ভারতের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অবশ্য বঙ্গীয় নেতৃবৃন্দকে এবিষয়ে অসংখ্য বাধা বিঘ্ন অতিক্রমে করিতে হইবে—বরং প্রকৃত বাধা বিঘ্নের এই সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু আমি জানি যে, এই দায়িত্ব-গ্রহণে তাঁহাদিগের কেহই অসম্মতি প্রকাশ করিবেন না, এবং ইহার জন্য যে স্বার্থ-ত্যাগ আবশ্যক হইবে, সকলেই প্রফুল্ল চিত্তে তাহা করিবেন। সমগ্র ভারতবাসী বঙ্গীয় নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠ-পোষক-স্বরূপ রহিয়াছেন; এবিষয়ে বঙ্গবাসী অন্যান্য প্রদেশের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদিগের কোন দুর্নাম হইলে তাহাতে আমাদিগেরও দুর্নাম আছে। আর তাঁহাদিগেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁহাদিগেরই হস্তে এক্ষণে সমগ্র ভারতের সম্মান ন্যস্ত রহিয়াছে।"

১৯০১ সালের আদম-সুমারি।

বৃটিশ ভারতে জন-সংখ্যার তুলনা।

	১৮৯১ সালের গণনায়	১৯০১ সালের গণনায়
বঙ্গবিহার উড়িষ্যা	৭,১৩,৪৬,৯৬১	৭,৪৭,৪৪,৮৬৬
আসাম	৫৪,৭৭,৩০২	৬১,২৬,৩৪৩
বেরার	২৮,৯৭,৪৯১	২৭,৫৪,০১৬
বোম্বাই প্রদেশ	১,৮৮,৭৮,৩১৪	১,৮৫,৫৯,৫৬১
মধ্যপ্রদেশ	১,০৭,৮৪,২৯৪	৯৮,৭৬,৬৪৬
মান্দ্রাজ প্রদেশ	৩,৫৬,৩০,৪৪০	৩,৮২,০৯,৪৩৬
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮,৫৭,৫০৪	২১,২৫,৪৮০
পঞ্জাব	১,৯০,০৯,৩৪৩	২,০৩,৩০,৩৩৯
আগ্রা	৩,৪২,৫৩,৯৬০	৩,৭৮,৫৮,৭০৫
অযোধ্যা	১,২৬,৫০,৮৩১	১,২৮,৩,৩০৭৭
আজমীর মেরওয়াড়া	৫,৪২,৩৫৮	৪৭৬,৯১২
ব্রহ্মদেশ	৭৭২২০৫৩	১০৪৯০৬২৪
কুর্গ	১৭৩০৫৫	১৮০৬০৭

	মোট জন-সংখ্যা	তন্মধ্যে পল্লিগ্রাম-নিবাসী
বৃটিশ ভারতে	২৩,২০,৭২,৮৩২	২০,৯৭,৫৭,২৫০
তন্মধ্যে বেলুচিস্থান	৩,০৮,২৪৬	২,৬৮,২১৩

বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। খাস-বাঙ্গালা, উত্তর বঙ্গ, আসাম, ব্রহ্মদেশ, কুর্গ, বেলুচিস্থান, পঞ্জাব, আজমীর, রাজপুতনা, ও কাশ্মীরে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। কাশ্মীরে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের ৯ গুণ। বিগত ত্রিশ বৎসর হইতে বঙ্গে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। ইউরোপে সর্ব্বত্র পুরুষের সংখ্যা অল্প।

	সহরের সংখ্যা	পল্লির সংখ্যা
সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যে	২,১৪৮	৭,২৮,৬০৫
তন্মধ্যে বেলুচিস্থানে	৬	২,০৫৪
” ব্রহ্মদেশে	৫২	৬০,৩৯৪
” বঙ্গদেশে	১৩১	২২২,৬৬৪
” বোম্বাই প্রদেশে	৩৩১	৪০,৬৯৪
” মান্দ্রাজ প্রদেশে	২৫১	৫৯,৬০৭
” পঞ্জাব	২২৮	৪৩৬৬০

মুসলমানের সংখ্যা।

(From Financial and Commercial Statistics of British India—1907).

সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে	...	৬,২৪,২০,২৯১	সিন্ধু ...	...	২৪,৪৬,৪৮৯
ব্রহ্মদেশ ...	...	৩,৩৯,৪৪৬	বেলুচিস্থান ...	...	৭,৬৫,৩৭৮
পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম	...	১,৭৮,৬৮,৪৫২	বোম্বাই ...	...	২১,২০,৮০৬
পশ্চিমবঙ্গ ...	...	৯২,০৮,১৯১	মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	...	৫,১৯,৪৩২
আগ্রা অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশ		৬৯,৭৩,৭২৪	মান্দ্রাজ ও কুর্গ	...	২৭,৪৬,৫৮৫
আজমীর মেরওয়াড়া	...	৭২,০৩১	হায়দ্রাবাদ ...	...	১১,৫৫,৭৫০
পঞ্জাব ও সীমান্তে	...	১,৪১,৪১,১২২	অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে	...	৪০,৬২,৮৯৫

বৃটিশ ভারতে বালক ও যুবকের সংখ্যা।

৫বর্ষ হইতে	১০বর্ষ	১,৩৬,০৯,৮৯০	ভারত সাম্রাজ্যে
১০ ,, ,,	১৫	১,৪৭,২৭,১৩৪	১,৮৮,৮০,৬৫৯
১৫ ,, ,,	২০	১০০,০৫,৮৫৩	১,২৯,৪২,৩২২
২০ ,, ,,	২৫ *	৯১,০০৭৯২	১,১৬,৯৬,৬২০
২৫ ,, ,,	৩০	১,০৩,৮১,৪৩৬	১,৩২,২৩,৯৬৬

* এই বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী ; কিন্তু তাহার পর হইতেই কম।

সমগ্র ভারতে বিকলাঙ্গ লোকের সংখ্যা।

	পুরুষ	স্ত্রীলোক		পুরুষ	স্ত্রীলোক
পাগল	৪১,৩১৭	২৪,৮৮৮	অন্ধ	১,৮০,৭৬২	১,৭৩,৩৪২
কালা, বোবা	৯২,৬৫৫	৬০,৫১৪	কুষ্ঠরোগী	৭২,৪০৩	২৪,৯৩৭

বিকলাঙ্গ।

বৃটিশ-ভারতে মোট ৫,৮৪,৪৯৮ জন। দেশীয় রাজ্যে ৮৪,১৩৪ জন।
অনুপাত ৩৯৭ জনে ১ জন। অনুপাত ৭৩৯ জনে ১ জন।

পাগল।

বৃটিশ ভারতে ৫৮,৩০০ জন। দেশীয় রাজ্যে ৭,৯০৫ জন।
অনুপাত ৩,৯৮৩ জনে ১ জন। অনুপাত ৭,৮১৭ জনে ১ জন।

অন্ধ।

বৃটিশ-ভারতে ৩,১০,৬৬৫ জন। দেশীয় রাজ্যে ৪৩,৪৩৯ জন।
অনুপাত ৭৪৬ জনে ১ জন। অনুপাত ১,৪৩৬ জনে ১ জন।

প্লেগের প্রকোপও বৃটিশ ভারত অপেক্ষা দেশীয় রাজ্যে অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারতে মহর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

"অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধু-বিহীন, প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে পিতার ন্যায় পালন করেন ত? "—সভাপর্ব্ব।

সমগ্র ভারতে ভাষা অনুসারে জন-সংখ্যা।

বঙ্গ-ভাষা	৪,৪৬,২৪,০৪৮	কর্ণাটকী	১,০৩,৬৫,০৪৭
হিন্দী ভাষা	৬,০৩,৫৪,১৩৭	গুজরাটী	৯৯,২৮,৫০১
বেহারী	৩,৭০,৭৬,৯৯০	উড়িয়া	৯৬,৮৭,৪২০
রাজস্থানী	১,০৯,১৭,৭১২	ইংরাজী	২,৫২,৩৮৮
আন্ধ্র (তেলেগু)	২,০৬,৯৬,৮৭২	মালয়	৬০,২৯,৩০৪
মারাঠী	১,৮২,৩৭,৮৯৯	সিন্ধি	৩০,০৬,৩৯৫
পঞ্জাবী	১,৭০,৭০,৯৬১	সাওতালী	১৭,৯০,৫২১
তামিলী	১,৬৫,২৫,৫০০	আসামী	১৩,৫০,৮৪৬

বেহার ও রাজস্থান অঞ্চলে সাহিত্যের ভাষা হিন্দী।

দেশীয় খ্রীষ্টানের সংখ্যা।

	ইংরাজ শাসিত প্রদেশে		মিত্র ও করদ রাজ্যে
সমগ্র বৃটিশ ভারত	১,৬৭৫,৪২৩	একুনে	৯,৮৯,০২৫
বঙ্গদেশ	২,২৪,৭১০	বঙ্গদেশ	৩,০৪৩
আসাম	৩৩,৫৯৫	—	—
বোম্বাই	১,৭১.২১৪	বোম্বাই	১০,১০৫
মধ্য প্রদেশ ও বেবার	১৮,৯৭২	মধ্য ভারত	৩,৭১৫
মান্দ্রাজ	৯,৮৩,৮৮৮	মান্দ্রাজ	৯.০৬,৭৮৯
যুক্ত-প্রদেশ	৬৮,৮৪১	রাজপুতনা	১,৩৬৮
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	৫৩৩	মহীশূর	৩৯,৫৮৫
পঞ্জাব	৩৭,৬৯৫	হায়দ্রাবাদ	১৫,৩৫৭
ব্রহ্মদেশ	১,২৯,১৯১	বরোদা	৭,২৪৩
অন্যান্য প্রদেশ	৬,০৮২	অন্যান্য প্রদেশ	১,৫০৭

মোট দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা—২৬,৬৪,৩১৩ জন।

ভারত সাম্রাজ্যে ইউরোপীয়ের সংখ্যা—১,৬৯,৬৭৭ ইউরেশিয়ন বা ফিরিঙ্গী—৮৯,২৫১

বৃটিশ ভারতে মৃত্যু-সংখ্যা।

	গড়পড়তা হাজারকরা	মোট মৃত্যু।
১৮৮০ সালে	২৪ জন	৩৯,২৮,৬৩১ জন
১৯০১ ,,	২৯॥০জন	৬৫,৯৬,৩৭৭ ,,
১৯০২ ,,	৩১॥০জন	৭০,৬২,৪১৭ ,,
১৯০৩ ,,	৩৫ জন	৭৮,১৮,১৮৩ ,,

বন্য জন্তুর আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা।

১৮৭৯ সাল হইতে ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত বৃটিশ ভারতে হিংস্র পশুর আক্রমণে ৭২,৩৯৭ জন মনুষ্য এবং ১৭,৪০,৭৫৪টি গো-মহিষাদি নিহত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৯০২ সালে

২,৫৩৬ জন মনুষ্য ও ৮৩,৯৯৯টি গো-মহিষাদি পশু এবং ১৯০৩ সালে ২,৭৪৯ জন মনুষ্য ও ৮৬,২৩২টি গো-মহিষ হিংস্র জন্তুর কবলে পতিত হইয়াছে। ১৯০৪ সালে ২,১৫০ জন ভারতবাসী ও ৮৮,২০৬টি গো-মহিষ ব্যাঘ্রাদির হস্তে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। হিংস্র জন্তুর জন্য প্রতিবৎসর এইরূপ মনুষ্য ও গৃহপালিত পশুর অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি-সত্বেও রাজ-পুরুষেরা অস্ত্র আইনের কঠোরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছেন। অস্ত্র রাখিবার পাসের সংখ্যা দিন দিন কিরূপ কমান হইতেছে, দেখুন—

সাল	পাসের সংখ্যা	সাল	পাসের সংখ্যা
১৮৯৩	৬৯,৯৩১	১৯০০	৪৫,০৪৫
১৮৯৬	৫৮,৫৯১	১৯০১	৪১,২৪৯
১৮৯৮	৫২,৪৮১	১৯০২	৩৭,৯৩৪
১৮৯৯	৪৯,১২৩	১৯০৪	৩৭,৭২০

কৃষি প্রধানদেশে গো-মহিষাদির এরূপ অপঘাত মৃত্যু-নিবারণে রাজপুরুষদের অমনো-যোগ ঘোরতর নিন্দনীয়।

মদের দোকানের সংখ্যা ও আয়।

১৮৯৪।৫ সালে	৮০,৫২১	১৯০৩।৪ সালে	৯১,৩২৩
১৯০১।২ সালে	৮৪,৯২৫	১৯০৪।৫ সালে	৯১,১৩৮
১৯০২।৩ সালে	৮৬,৭৭৫	১৯০৫।৬ সালে	৮৯,৬৮৩

শেষোক্ত দুই সালে মদের দোকানের সংখ্যা কিছু কমিলেও মদের বিক্রয় বাড়িয়াছে। ১৯০৩।৪ সালে ৫ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার, ১৯০৪।৫ সালে ৫ কোটি ৭৬৷৷০ লক্ষ টাকার, এবং ১৯০৫।৬ সালে ৬ কোটি ২৫৸০ লক্ষ টাকার মদ বিক্রয় হইয়াছে।

শিক্ষা-বিষয়ক তালিকা।

সমগ্র ভারতে শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা।

(১৯০১ সালের আদম সুমারি মতে)

	মোট জন-সংখ্যা।	লিখিতে পড়িতে জানে।	যাহারা ইংরাজী জানে।
হিন্দু	১০,৫১,৬৩,৪৩২	৯৯,২২,২৭৬ জন	৬,৭৫,৪২৯ জন
মুসলমান	৩,১৮,৪৩,৫৬৫	১৯,২৭,১৫১ ,,	১,০১,৭১৮ ,,
শিখ	১২,৪১,৫৪৩	১,২১,৫২০ ,,	৬,৪৫৮ ,,
জৈন	৬,৯১,৭৮৭	৩,২৫,২৯৮ ,,	৯,২৮৩ ,,
বৌদ্ধ	৪৬,৮০,৩৮৪	১৮,৭৯,৮৭৯ ,,	১১,১২৬ ,,
পার্শী	৪৮,০৮৬	৩৬,৩৪৩ ,,	১৯,৫৯৬ ,,
খ্রীষ্টান	১৫,০৮,৩৭২	৪,৩৯,৬১৩ ,,	১,৯৪,৩৯৫ ,,
অন্যান্য সম্প্রদায়	৪২,৬৪,৯৩৭	৩৮,০০০ ,,	৩,৩১৪ ,,
একুন	১৪,৯৪,৪২,১০৬	১,৪৬,৯০,০৮০	১০,২১,৩১৯

শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা।

	মোট স্ত্রীলোকের সংখ্যা।	লিখিতে পড়িতে জানে।	যাহারা ইংরাজি জানে।
হিন্দু	১০,১৯,৪৫,৪৩৬	৪,৭৭,৩৮৭ জন	৯,৪৪২ জন
মুসলমান	২,৯৮,৪৯,১৪৪	৯১,০৫৯ ,,	১,৬৭৬ ,,
শিখ	৯,০০,৮২৩	৭,১১৫ ,,	৪১ ,,
জৈন	৬,৪২,২৪৯	১১,৪৫৫ ,,	৮১ ,,
বৌদ্ধ	৪৭,৯৬,৩৬৮	২,০৩,৬৩০ ,,	৪৭৪ ,,
পার্শী	৪৫ ৮৮৩	২৪,৬৬৯ ,,	৪,৪১১ ,,
খ্রীষ্টান	১৪,১০,৮৪৩	১,৭৮,০৩৪ ,,	৮৬,৮০৭ ,,
অন্যান্য সম্প্রদায়	৪৩,৩২,০৫৪	৩,৯৯২ ,,	৯৮০ ,,
একুন	১৪,৩৯,৭২,৮০০	৯,৯৬,৩৪১	১,০৩,৯১২

অখণ্ড বঙ্গে লেখাপড়া জানা পুরুষের সংখ্যা ৪০,৯৭,৬৭৪। স্ত্রীলোকের—২,০৯,৯০০।

সংবাদ-পত্রের সংখ্যা।

	১৮৮৭ সালে।	১৯০২।০৩ সালে	১৯০৫।০৬ সালে
অখণ্ড বঙ্গদেশে—	১২১	১৩৭	১৩৮
বোম্বাই প্রদেশে	২০২	১৪৮	১৬৩
মান্দ্রাজ প্রদেশে	৭৯	১১৯	১২৩
যুক্ত প্রদেশে	...	৭৯	১১২
পঞ্জাবে	৮৭	১৪৪	১৫০

বিদ্যালয়াদির সংখ্যা।

(১৯০৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত)

	১৮৯৬ খ্রীঃ	১৯০০ খ্রীঃ	১৯০৫ খ্রীঃ
গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত	১,২১০	১,০৮০	১৫০৬
মিউনিসিপাল ও লোক্যাল বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত	১৮,৪০৪	১৭,৬৯৫	২২,৭০৮
মিত্র বা করদ রাজ্যে	২,৭৩১	৩,৫৭৭	৩,০০৬
গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত	৬৩,৫৯৮	৬২,৯৬৯	৭৮,১৯২
গবর্ণমেণ্ট সাহায্য শূন্য ১৮৯৫ সালে	২৪,৬১০	১৯,৫৭৯	১৭,৪৫৩
প্রাইভেট ঐ	৪৪,৯৩২	৪২,৪৬০	৪২,৬০৪
		১,৪৭,৩৬০	১৬০৪৬৯

যাহারা ইংরাজী শিখিতেছে, তাহাদের সংখ্যা—৫,০৭, ৯৬৪

ঐ ঐ ১৯০৪।৫ সালে— ঐ ঐ ৫,১০, ২৯৭

স্কুল, কলেজ ও ছাত্রদিগের সংখ্যা।

(তুলনার সুবিধার জন্য পূর্ব্ববর্ষের হিসাব বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইল)

	পুরুষের জন্য		স্ত্রীলোকের জন্য		মোট	ছাত্র-সংখ্যা।
আর্টস্ কলেজ	(১৩৯)	১৩০	(১২)	১০	(১৯৭৫২)	১৯,২৩৩
ব্যবসায় সম্বন্ধী কলেজ	(৪৫)	৪৩	(২)	২	(৩৫১)	৬,৫,৮৮৯৩
সেকেণ্ডারি স্কুল	(৫,২৯৯)	৫,৩২৫	(৫১৮)	৫৪৪	(৬,৭৯.৭৬৯)	৬,৮৯,৫৮
প্রাইমারি স্কুল	(৯৮,০৭৭)	১,০০,৮৮১	(৮,৭৮৪)	৯,১১৯	(৩৬,৩০,১৫৫)	৩৮,০৯,২৫০
ট্রেনিং স্কুল	(২৫০)	৩০৮	(৬০)	৬৪	(৮,৫২১)	১০১০৬
শিল্প-শিক্ষার স্কুল	(১১০)	১৩৩			(৭১৯৭)	৭৬৮৭
বাণিজ্য-শিক্ষা বিষয়ক	(১১)	১৩			(৪৫০)	৬৫৩
কৃষি-শিক্ষা বিষয়ক (১৯০৩ সালে)	(৭)	৬			(৩০৯)	২৮৮
অন্যান্য বিদ্যালয়	(১১৮৬)	১২৫২			(৩১৩৮৪৮)	৩৭,৩৫৫

ধর্ম্ম অনুসারে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা।

	১৮৯২ সালে	১৯০৪ খৃঃ ৩১শে মার্চ্চ।	১৯০৬ খ্রীঃ ৩১ মার্চ্চ।
হিন্দু	২৬,৬১,১৩৬	৩২,২৬,৪৮০	৩৪৭০,৯৪১
মুসলমান	৮,৯৪,২৪১	১০,৭১,৫৩৯	১১,১৭,৬৬৬
বৌদ্ধ পার্শী আদি	২,৮৫,৫১৫	৪,০৭,৫৩৫	৪,৫৪,৪৪৮
দেশীয় খ্রীষ্টান	৯৮,৪২৩	১,৪৬,৮০২	১৬৮,৯৩৭
ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী	২৭,৫০০	৩১,৭২৭	৩১,৪৩৩

প্রদেশানুসারে ছাত্র-সংখ্যা।

প্রদেশের নাম	ছাত্র-সংখ্যা ১৯০৩খ্রীঃ	ছাত্র সংখ্যা ১৯০৫খ্রীঃ	ছাত্রীর সংখ্যা ১৯০৩ খ্রীঃ	ছাত্রী-সংখ্যা ১৯০৫ খ্রীঃ
পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম—	৯৯৯২১	৭,২০,১৯৯	৬,৩৫৯	৭২,৭৮৮
পশ্চিম বঙ্গদেশ—	১৭,৩০,৬১৪	১১,১৫,৯৭০	১,৬২,২৬০	১,১৬,৩০৮
যুক্ত প্রদেশ	৪,৭৬,৮৩৪	৫,৪৩,১৩০	২৬,০৪৮	৩৩,২০৬
পঞ্জাব	২,৪১,৮৫৪	২,৪২,৬২৪	২৯,৩৭৬	৩২,১২৩
মধ্য প্রদেশ	২,০৭,৯৯৬	২,০৭,০৪২	১১,৯৩৫	১৭,৬৭৫
বোম্বাই	৪,৯০,৪৩৮	৬,২৫,১৮০	৮৭,৯২২	১,১১,০২৯
মান্দ্রাজ	৭,৮৪,৬২১	৮,১৯,৫২৭	১,৩৯,১৩৯	১,৫৭,৪০৯
অন্যান্য প্রদেশ	৪,৩৬,২৯২	৩,৬৫,৪৬৮	৫২,৫০৫	৬৩৭১৭
ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে একুনে	৪৩,৬৮,২৬৯	৪৬,৩৯,১৪০	৫,১৫,৫৪৪	৬,০৪,২৮৫

অখণ্ড বঙ্গদেশে গ্রাজুয়েটের ও অণ্ডার গ্রাজুয়েটের সংখ্যা।

১৯০১।০২ সালে	২,৩৭৯	১৯০৪।০৫ সালে	১,৯৭৭
১৯০২।০৩ সালে	২,২২২	১৯০৫।০৬ সালে	১,৮৮১

সমগ্র ভারতে (১৯০৩।৪) ৮৭৯৪ (১৯০৪।৫) ৮৩৮৪

রেলের হিসাব।

	মাইল	আরোহীর সংখ্যা
১৮৫৩ সালে খোলা হয়	২০	——
১৮৭৩ সাল পর্য্যন্ত খোলা হয়	৫,৬৯৭	২,৪৯,৭৭০০
১৮৮০ ,, ,, ,, ,,	৯,১৬৭	৪,৯১,৫৫,৩৮০
১৮৮৫ ,, ,, ,, ,,	১২,৩৮৫	৮০৮৫৪৭৭৯
১৮৯০ ,, ,, ,, ,,	১৬,৯৮৪	১১,৪০,৮২ ২৪৬
১৮৯৫ ,, ,, ,, ,,	১৯,৭১৮	১৫,৩০,৮১,৪৭৭
১৮৯৯ ,, ,, ,, ,,	২৩,৭৮০	১৬,২৯,৪৪,৮৭৬
১৯০১।২ ,, ,, ,, ,,	২৫,৮৯৮	১৯,৬৬,৪৮,০০০
১৯০৩।৪ ,, ,, ,, ,,	২৭,৯০৪	২২,৭১,০০,০০০
১৯০৫।৬ সাল ,, ,, ,,	২৮,২৯৫	২৪,৮১,৫৭,০০০

১৯০৫ সালের শেষে রেল বিভাগে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর সংখ্যা—

ইউরোপীয়ের সংখ্যা	—৬,৫৩৫	দেশীয়ের সংখ্যা	৪,৩৬,৩৪৮
ইউরেশীয়ের ,,	৯,১৭৫	মোট সংখ্যা	৪,৫২,০৪৮

মামলা মোকদ্দমা।

বিগত ১৯০৫।৬ সালে ভারতের অধিবাসীদিগের মধ্যে কোন্ প্রদেশে প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে কতগুলি করিয়া মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহার তালিকা—

প্রদেশের নাম	দেওয়ানি মোকদ্দমা	ফৌজদারী মামলা
পশ্চিম বঙ্গদেশ	৮৬	৩০
পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম	১১৭	১৮
সীমান্ত প্রদেশ	৯৮	৫৬
মধ্যপ্রদেশ সমূহে	৭৯	২৯
বোম্বাই প্রদেশ	৭৭	৮১
মান্দ্রাজ প্রদেশ	৯২	৮০
যুক্ত প্রদেশ	৩৩	২৫
পঞ্জাব	৭৭	৫৩

দেশীয় রাজন্য-বৃন্দ।

দেশীয় নরপতিদিগের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৬৮০; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের অধিপতি—অনেকের রাজ্য ২।৪ খানি গ্রামেই সীমাবদ্ধ। খ্যাতি ও প্রতিপত্তিশালী নরপতিদিগের সংখ্যা ২১৩। তাঁহাদিগের মধ্যে ১০৫ জন মাত্র কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃত রাজগৌরবের অধিকারী। নিম্নে ৪৪ জন রাজার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তালিকার আকারে প্রকাশ করা হইল। এতদ্ভিন্ন ৩৫ জন ক্ষুদ্র রাজা ১১টি তোপের ও ২৬ জন ৯টি তোপের সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। ছোট বড় কোনও করদ রাজারই কোনও রাজশক্তির সহিত সন্ধি-বিগ্রহ করিবার অধিকার নাই। ভারতের বহির্ভূত কোনও রাজ্যে বা পরস্পরের রাজ্যে দূত রাখাও তাঁহাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন কোনও ইউরোপীয়কে তাঁহারা দরবারে স্থান-দান করিতে পারেন না। রাজ্য-শাসনে অমনোযোগী বা যথেচ্ছাচার বলিয়া সন্দেহ হইলে গবর্ণমেণ্ট যে কোনও রাজাকে নির্ব্বিচারে পদচ্যুত করিতে পারেন। অধিকাংশ বড় বড় দেশীয় রাজ্যেই আজ কাল পাশ্চাত্য আদর্শে, প্রধানতঃ কাউন্সিল বা ব্যবস্থাপক ও কার্য্যকরী সভার সাহায্যে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। বৃটিশ ভারতের বিধি-ব্যবস্থা দেশীয় রাজ্যে প্রচলিত নাই। তথায় অস্ত্র আইনও নাই। তত্রত্য বিচারালয় সমূহও বৃটিশ হাইকোর্টের অধীন নহে। কিন্তু পোলিটিক্যাল এজেণ্ট বা রেসিডেণ্ট নামধারী এক এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সকল দেশীয় রাজ্যেই অবস্থান করেন। তাঁহাদিগের শক্তি অসীম। দেশীয় রাজন্যদিগকে তাঁহাদিগের ভয়ে সর্ব্বদা কম্পিত থাকিতে হয়। করদ রাজ্য-সমূহের মোট বার্ষিক আয় ২২।০ কোটী টাকা। সৈন্য সংখ্যা ৮৫ হাজার। এতদ্ভিন্ন এই সকল রাজ্যে দেশীয় নরপতি-গণের ব্যয়ে ১৫ হাজার ইম্পিরিয়াল ট্রুপস (Imperial troops) নামক ভারত গবর্ণমেণ্টের খাস সৈন্য পরিপোষিত হইয়া থাকে। দেশীয় সৈন্য অপেক্ষা গবর্ণমেণ্ট সেনা উৎকৃষ্টতর অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত থাকে।

দেশীয় রাজগণের তালিকা।

সম্মান-চিহ্ন——২১ তোপ	রাজ্যের পরিমাণ বর্গ মাইল	লোক-সংখ্যা	রাজস্ব টাকা
বরোদার মহারাজ (গায়কোয়াড়) জি, সি, এস, আই,	৮,০৯৯	১৯,৫২, ৬৯২	১,২৩,০০০০০
হায়দ্রাবাদের নিজাম জি, সি, বি; জি, সি, এস, আই,	৮২,৬৯৮	১,১১,৪১,১৪২	৩,৬০,০০,০০০
মহীশূরের মহারাজ	২৯,৪৪৪	৫৫,৩৯,৩৯৯	১,৮৭,৮০,০০০

দেশীয় রাজগণের তালিকা।

	রাজ্যের পরিমাণ ও বর্গ মাইল	লোক সংখ্যা	রাজস্ব টাকা
———১৯ তোপ			
ভূপালের বেগম (কিংবা নবাব)	৬,৯৯৭	৬,৬৫,৯৬১	২৫,০৫,০০০
গোয়ালিয়রের মহারাজ জি, সি, এস, আই ; জি, সি, ভি, ও ; এ, ডি, সি,	২৯,০৪৭	২৯,৩৩,০০১	১,৩৭,৮৫,০০০
ইন্দোরের মহারাজ (হোলকার)	৯,৫০০	৮,৫০,৬৯০	৭৬,৫০,০০০
জম্বু এবং কাশ্মীরের মহারাজ জি, সি, এস আই,	৮০,৯০০	২৯,০৫,৫৭৮	৭৫,৯০,০০০
খিলাটের খাঁ জি, সি, আই, ঈ	৯০,০০০	৫,০৭,৪৭২	৭১,০৫,০০০
কোহ্লাপুরের রাজা জি, সি এস, আই ; জি, সি, ভি, ও ;	২,৮৫৫	৯,১০,০১১	৪৮,৪৫,০০০
মেওয়াড়ের মহারাণা (উদয়পুর) জি, সি, এস, আই,	১২,৭৫৩	১০,১৮,৮০৫	১৯,৯৫,০০০
ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ জি, সি, এস, আই ; জি, সি, আই ঈ ;	৬,৭৩০	২৯,৫১,০৩৮	৯৪,২০,০০০
———১৭ তোপ			
ভাওয়ালপুরের নবাব	১৫,০০০	৭,২০,৮৭৭	২৪,০০,০০০
ভরতপুরের মহারাজ	১,৯৮২	৬,২৬,৬৬৫	৩৬,৬০,০০০
বিকানিরের মহারাজ কে, সি, আই, ঈ ;	২৩,৩১১	৫,০৪,৬২৫	১৯,৯৫,০০০
বুন্দির মহারাও রাজা জি, সি, আই, ঈ ; কে, সি, এস, আই ;	২,২২০	১,৭১,২২৭	৭,৯৫,০০০
কোচিনের রাজা জি, সি, এস, আই ;	১,৩৬২	৮,১২,০২৭	২১,৪৫,০০০
জয়পুরের মহারাজ জি, সি, এস, আই ; জি, সি, আই, ঈ ;	১৫,৫৭৯	২৬,৫৮,৬৬৬	৬২,১০,০০০
কেরোলির মহারাজ জি, সি, আই, ঈ,	১,২৪২	১,৫৬,৭৮৬	৫,১০,০০০
কোটার মহারাজ কে, সি, এস, আই,	৫,৬৮৪	৫,৪৪,৮৭৯	২৮,২,০০০০
কচ্ছের রাও জি, সি, আই, ঈ,	৬,৫০০	৪,৮৮,০২২	৩০,৪৫,০০০
মারোয়াড়ের (যোধপুরের) মহারাজ	৩৪,৯৬৩	১৯,৩৫,৫৬৫	৪৯,৯৫,০০০

	রাজ্যের পরিমাণ বর্গ মাইল	লোক সংখ্যা	রাজস্ব টাকা
পাতিয়ালার মহারাজ	৫,৪১২	১৫,৯৬,৬৯২	৬১,৬৫,০০০
রেওয়ার মহারাজ জি, সি. এস, আই	১২,৬৭৬	১৩,২৫,৩০৭	১৮,০০,০০০
টঙ্কের নবাব জি, সি, আই, ঈ,	২,৫৫৩	২,৭৩,২০১	১৫,০০,০০০
———১৫ তোপ			
আলোয়ারের মহারাজ	৩,১৪১	৮,২৮,৪৮৭	৩০,০০,০০০
বাঁশওয়াড়ার মহারাওয়াল	১,৯৪৬	১,৬৫,৩৫০	১,৬৫,০০০
দতিয়ার মহারাজ কে, সি, এস, আই,	৯১২	১,৭৩,৭৫৯	৪,০৫,০০০
দেওয়াসের বড় তরফ	৪৪৬	৬২,৩১২	৬০,০০০
দেওয়াসের ছোট তরফ	৪৪০	৫৪,৯০৪	৬০,০০০
ধারা নগরীর রাজা	১,৭৩৯	১,৪২,৭১৫	৭,৬৫,০০০
ঢোলপুরের মহারাজ রাণা	১১৫৫	২,৭০,৯৭৩	৯,৯০,০০০
ডঙ্গরপুরের মহারাওয়াল	১,৪৪৭	১,০০,১০৩	১,৩৫,০০০
ইন্দরের মহারাজ জি, সি, এস. আই ; কে, সি, সি ; এ, ডি, সি	১,৯০০	১,৬৮,৫৫৭	৪,৯৫,০০০
জসলমিরের মহারাওয়াল	১৬,০৬২	৭৩,৩৭০	১,০৫,০০০
খয়েরপুরের মীর জি, সি, আই, ঈ,	৫,১০৯	১,৯৯,৩১৩	১২,৬০,০০০
কিষণগড়ের মহারাজ	৮৫৮	৯০,৯৭০	৫,৫৫,০০০
ওরছার মহারাজ জি, সি, আই, ঈ,	২,০৮০	৩,২১,৬৩৪	৯,০০,০০০
প্রতাপগড়ের মহারাওয়াল	৮৮৬	৫২,০২৫	১,৮০,০০০
সিকিমের মহারাজ	২,৮১৮	৫৯,০১৪	৬০,০০০
সিরোহির মহারাও জি, সি, আই, ; ঈ কে, সি, এস, আই,	১,৯৬৫	১,৫৪,৫৪৪	৩,৬০,০০০

——১৩ তোপ	রাজ্যের পরিমাণ বর্গ মাইল	লোক সংখ্যা	রাজস্ব টাকা
জাওরার নবাব	৬০৬	৮৪,১৮৫	৯,৬০,০০০
কুচবিহারের মহারাজ জি, সি, আই, ঈ ; সি, বি,	১,৩০৭	৫,৬৬,৯৭৪	২২,২০,০০০
রামপুরের নবাব	৮৯৩	৫,৩৩,২১২	৩১,৯৫,০০০
ত্রিপুরার রাজা	৪,০৮৬	১,৭৩,০২৫	৬,৬০,০০০

স্বাধীন হিন্দুরাজ্য—নেপাল।

নেপালের বর্ত্তমান স্বাধীন নরপতির নাম—মহারাজাধিরাজ পৃথিবী-বীর বিক্রম জঙ্গ বাহাদুর সাহেব বাহাদুর সমশের জঙ্গ। নেপাল রাজ্যের দৈর্ঘ্য ৫ শত মাইল, মোট পরিমাণ ৫৪ হাজার বর্গ মাইল, লোক-সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধ কোটি, রাজস্ব প্রায় দেড় কোটি মুদ্রা, সৈন্য সংখ্যা ৩৫ হাজার, তোপের সংখ্যা ১ হাজার, বৃটিশ-রাজ্যে সম্মানের তোপ ২১টি।

রেসিডেন্টদিগের ব্যবহার।

The *Times* of *India* regrets the growth of an un-English evil.—"The English Administration in India prides itself on its absolute uprightness, its absolute freeness from all unworthy taint. But curiously enough there is one Department of the State, and that a Department in which one would think that extra precautions against an infringement of the English moral code would be enforced, in which it is not only possible, but openly authorized to accept gratifications which are most absolutely and sternly tabooed in all other branches of His Majesty's Service. No long acquaintance with India is required to at once recognise this curious relaxation of principle in the political Department. John Company* paid his servants badly and allowed them to shake the pagoda tree, but the Government of His Majesty gives very handsome salaries to Political officers and yet allows to continue a system of perquisites—"Easements" is the official term—which would give even the easy conscience of John Company a glow of comparative virtue. Thus a Political officer in many parts of India not only draws a very handsome salary, but he also lives practically free at the expense of some Native Prince or other. Rides his horses, drives his carriages, uses his cook, shoots his big game, spends money right and left on "improvements" for his own luxury and convenience, and generally uses the resources of the Native prince in a manner quite foreign to the code that exists in any other branch of the Government service. The evil is patent, and it is intensely un-English." Nov. 1904.

বঙ্গে দেশীয় শিল্পজীবীদিগের অবস্থা-জ্ঞাপক তালিকা।

	কর্মক্ষম ব্যক্তি-দিগের সংখ্যা		পৈতৃক ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা		কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা		কৃষিমজুরের কার্য্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা		অন্যব্যবসায়ে রত লোকের সংখ্যা		মাদক দ্রব্য ও বরফ সোডার কারখানায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা		বিবিধকার্য্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা।	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
২। তাঁতী—														
খাস বাঙ্গালা	৬৬,৭২৭	১২,৩৫১	৩১,৯৫২	৩,৭৩৩	১৯,১৫২	২,০৪৫	৪,২২০	৮৬৫	৩১২	২০৭	১,৩৩৪	২,২৯১	৯,৭৫৭	৩,১৭০
বেহার	৯৫,০৫৫	৪৪,২৮৫	১২,৭০৪	২,৩৩৬	৫২,৫০১	২৪,৯৫২	১১,৪৯২	৭,৭৭৮	৬৫৩	৪৬৮	৭,৭০৭	৬,১০৫	৯,৯৯৫	২,৬৪৬
উড়িষ্যা	৫২,৬৬২	২১,৫৫৪	২৩,৬৫৪	১,৭৬৬	১৫,৫৬৫	৫৪৬	২,১৯২	৩৫৪	১৬০	৩৫	২৩৩	১ ৯০৯	১০,৮৫৮	১৬,৯৪৪
ছোটনাগপুর	১২,৫৫৫	৯,৯০৭	৬,৪১৪	২,৮৫৮	৩,৭৮৩	৩,৮৭০	৪৮৮	৭৬৮	২৫	২৪	৩৮৬	৬১৬	১,৪৫৯	১,৭৭১
মোট সংখ্যা	২,২৬,৯৯৯	৮৭,৮৯৭	৭৪,৭২৪	১০,৬৯৩	৯১,০০১	৫১,৪১৩	১৮,৩৯২	৯,৭৬৫	১,১৫০	৭৩৪	৯,৬৬০	১০,৯২১	৩২,০৬৯	২৪,৩৩১
২। জুগী—														
খাস বাঙ্গালা	৭৬,৭৩৮	১৩,৪৮০	৩৬,১৮৬	৮,৭৭৩	২৪,৭৩৯	১,২৪৫	২,৮১৩	৯৮	৬১০	৩১১	২,২০১	৯৭৮	১০,১৮৯	২,০৭৫
৩। চিক্ (তাঁতী)—														
ছোটনাগপুর	৫,৭৯৮	৩,৫০৩	১,৮৩৯	৬৯৭	১,৯৭০	১,২৪৪	১৪৮	৬৬৮	৩৭	৬	২৬	১১	১,৭৭৮	৮৭৭
৪। পান (তন্তুবায়)—														
খাস্ বাঙ্গালা	১,৪৪১	৭৩৬	৮৭	৮৯	৯১৮	২৪১	৪৪	৩৬	...	...	২০	২১	৩৭২	৩৪৯
উড়িষ্যা	১,০৮,১৫৯	৪৫১২৩	৭,৯০৬	৫০১	৫৬,১৬৪	১২,৫৫৪	২৭,১৪৫	৯,৪৮০	৪৫৭	২৯	৫৫	৭১০	১৬,৪০২	২১,৮৪৯
ছোটনাগপুর	২,৭৭১	১,৪৫২	৫১৪	৫৫	১,৬৭০	২১১	১০৬	১৮৮	১৩	১	...	১৮	৪৬৮	৯৭৯
মোট	১,১২,৩৭১	৪৭,৩১১	৭৮,৫০	৬৪৫	৫৮,৭৫২	১৩,০০৬	২৭,২৯৫	৯,৭০৪	৪৭০	৩০	৭৫	৭৪৯	১৭,২৭২	২৩,১৭৭

	কর্ম্মকর ব্যক্তি-দিগের সংখ্যা		পৈতৃক ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা		কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা		কুলিমজুরের কার্য্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা		অন্যব্যবসায়ে রত লোকের সংখ্যা		মাদক দ্রব্য ও বরফ তোলার কারখানায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা		বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা।	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
৫। জোলা—														
খাস বাঙ্গালা	১১৫,৬৪৩	৯,৩৭৬	৫৬,৭৮৭	৪,৬৮৭	৩৬,৪১২	৭৭৭	৭,৮৬২	২০৭	৮১৪	২৬৩	৯০৪	৯৩২	১২,৮৬৪	২,৫১০
বেহার	১৫০,৯৬৮	৭২,২৫৬	৪২,১৪৪	১৩,৬০৪	৭৫,৯৮৭	৩৬,১৬৫	১২,৪৩৬	১১,৪২২	১,৮৭৯	৪৬০	২,৩৬৩	১,৪৯৯	১৬,১৫৯	৯,১০৬
ছোটনাগপুর	৪৬,৪৯০	৩৪,১৫৩	৮,৮৬৫	৪,৫৫৮	৩০,৮১৩	২৫,১০৭	১,১৮৫	২,২৭০	৪৩	৭৫	৪১৩	১৬৬	৫,১৭১	১,৯৭৭
মোট	৩১৩,১০১	১,১৫,৭৮৫	১০৭,৭৯৬	২২,৮৪৯	১৪৩,২১২	৬২,০৪৯	২১,৪৮৩	১৩,৮৯৯	২,৭৩৬	৭৯৮	৩,৬৮০	১,৫৯৭	৩৪,১৯৪	১৩,৫৯৩
৬। মল্লিক (মুসলমান) :—														
খাস বাঙ্গালা	৩,১৭৪	২৩৪	১৮১	২	২,১০৫	৯৫	৪৫৯	৪০	৩৪	১	৭৭	৬৮	৩১৮	২৮
৭। ধুনিয়া (Cotton-cleaners) :—														
বেহার	৫৯,৭২৮	২৫,৯১০	৫,৪৭১	২,৩৬৭	৩৯,৭০৬	১৫,৭২৬	৬,০৩৮	৩,১৪৭	৮৩৫	৪৬০	৬২৬	১,১৬৮	৭,০৫২	৩,০৪২
ছোটনাগপুর	১,০৯৪	৮১৮	৬৬	৫৩	৫৫০	৫৪৩	১৩০	১৪০	৩২	৭	১১	৮	৩০৫	৬৭
মোট	৬০,৮২২	২৬,৭২৮	৫,৫৩৭	২,৪২০	৪০,২৫৬	১৬,২৬৯	৬,১৬৮	৩,২৮৭	৮৬৭	৪৬৭	৬৩৭	১,১৭৬	৭,৩৫৭	৩,১০৯
৮। কামার ও লোহার—														
খাস বাঙ্গালা	৫১,৪১৪	৮,২৮০	১৭,১৫৬	৩৯১	১৫,৮৬৭	২,১৩৩	২,৭৮৬	১,৪৫৬	৪৫৪	১৩০	৪৪৭	১,৪৭১	১৪,৭০৪	২,৬৯৯
বেহার	৬৫,৬৭০	৩০,২৮৭	১৫,১২৭	৭১৭	৩৫,২৩১	২৪,৩৯৭	৪,১৫২	২,৯৭৯	২০৩	৬৬	২২৯	৪৪৮	১০,৭২৮	১,৫৮০
উড়িষ্যা	১৪,৩৭৮	২,০৫৭	৬,৭৫৩	৪১	৫,৮৮১	৫৫১	৬৬৮	৩৫২	৩০	৭	৩৬	৩০৫	১,০১০	৮০১
ছোটনাগপুর	২৫,১৫৭	১১,২১৮	৭,৭৩৬	১,০৯০	৮,৪৭৯	৬,৬২৪	১,২০০	১,৬০১	৬৮	১২	৯৯	৩৮৬	৭,৫৪৫	১,৫০৫
মোট	১,৫৬,৬১৯	৫১,৮৪২	৪৬,৭৭২	২,২৩৯	৬৫,৪৫৮	৩৩,৮০৫	৮,৮৩৬	৬,৩৮৮	৭৫৫	২১৫	৮১১	২,৬১০	৩৩,৯৮৭	৬,৫৮৫

	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
৯। চূড়িহার (মুসলমান)—														
বেহার	৪,৩৬৬	৩,২৩৮	১,৫৬৭	৯৪২	১,৯১২	১০,৬১	৯৫	২৬৯	১৬	৫	১৪	৯	৭৫৩	৯৫২
ছোটনাগপুর	৩৩৯	২২০	১৭২	১৮১	৯১	৩২	...	...	...	...	১৭	...	৫৯	৭
মোট	৪,৭০৫	৩,৪৫৮	১,৭৪৮	১.১২৩	২,০০৩	১,০৯৩	৯৫	২৬৯	১৬	৫	৩১	৯	৮১২	৯৫৯
১০। চামার ও মুচি (হিন্দু)—														
বাঙ্গালা	৯২,১৮৭	১১,৯১১	৯,২২৮	৩১২	৩৩,৭৭৩	১,২৬৯	১৮,৯৯০	৩,৫২৭	২৬৬	৩৮৪	৫৭০	২,২৮৮	২৯,৫২০	...
বেহার	২,৪৯,৪০৪	১,৮১,১৬১	১৪,৩১১	২,৫৩৮	১,৬২,৩৭৯	১,২৩,৪১২	৩৮,৫৭৫	৩৯,২৭১	১,৪৪৭	৩৩৯	৪০২	১,৮৬২	৩২,১৬০	...
উড়িষ্যা	৪,০০৪	২,২০২	৭	৬	১,৬১৬	৪৪	৬৩১	১৭৪	৩	...	৪১০	১৭২	১,৩৩৭	...
ছোটনাগপুর	৩০,০৩২	২১,২১৩	৫,০৪৮	১,০০১	১৮,৫৪৮	১৮,৪১১	২,৯১৩	২,১৩৯	৪৮	১১	১৯৯	৬৭	৩,২৭৬	...
মোট	৩৭৬,০২৭	২১৮,৪৮৭	২৮,৫৯৩	৩,৮৫৭	২১৬,১১৬	১৪৩,১৮০	৬১,১০৯	৪৫,১১১	১,৯০৪	৭৩৪	২,০১১	৪,৩৮৯	৬৬,২৯৩	...
১১। কলু (হিন্দু)—														
খাস্ বাঙ্গালা	২৭,৩৩১	৯,৫৮৪	৯,০৩৪	৪,০২৯	১৪,১৯২	৩,৩৭০	১,৪৬২	৪৬১	৩৯	১৯	৯৩৬	১৩৮৯	...	...
১২। কুলু (মুসলমান)														
খাস্ বাঙ্গালা	২৪,১৩৪	২,৬৫১	১৩,৬২৫	১,৫৮৭	৪,৩৩১	১৯২	১১৩	৭৬	২	১৪	৫,০২৬	৭০৭	...	...
চাম্পারণ	৪১৪	৫৪	১৯৮	৪০	১৫০	...	২	১	...	১	...	...	...	...
মোট—	২৪,৫৪৮	২,৭০৫	১৩,৮২৩	১,৬২৭	৪,৪৮১	১৯২	১১৫	৭৭	২	১৫	৫,০২৬	৭২৪	...	...
১৩। লাহেরী—														
বেহার	৩,০৯৫	১,৯২৪	৭০২	৭১২	১,২০০	৫৭৮	১৪৭	১৯২	২	৫৮	৫	১৫	...	...

বঙ্গদেশের শিল্পজীবীদিগের অবস্থা-জ্ঞাপক এই তালিকাটি ১৯০১ সালের আদম-সুমারির বিবরণী হইতে সংকলিত হইল। বিগত ৭ বৎসরে অবশ্যই এই সকল সংখ্যার অল্পাধিক পরিমাণে তারতম্য ঘটিয়াছে। তথাপি আমাদের দেশের কত কর্ম্মক্ষম শিল্পী যে বৈদেশিক শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া পৈতৃক বৃত্তি-ত্যাগ-পূর্ব্বক জীবিকার্জ্জনের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়াছে, তাহা এই তালিকায় নেত্রপাত করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিহার প্রদেশে পৈতৃক ব্যবসায়-পরিত্যাগকারীর সংখ্যা বঙ্গদেশ অপেক্ষাও অধিক। ঐ অঞ্চলে শতকরা ৫ জনের অধিক গোয়ালা গো-পালন করে না। খাস বাঙ্গালায় মোট সংখ্যার দুই তৃতীয় অংশ গোয়ালা পৈতৃক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে। কাজেই গো-বংশের অবনতি অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গে জোলাদিগের অর্দ্ধাংশমাত্র বস্ত্র-বয়ন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে; বিহারে শতকরা ৭৫ জন জোলাকে পৈতৃক বৃত্তি ছাড়িতে হইয়াছে। চামারের অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয়। বিহারে শতকরা ৭ জন মাত্র চামার চর্ম্ম-ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। অবশিষ্ট সকলকেই হয় চাষ, না হয় কুলি মজুরি করিয়া দিনপাত করিতে হয়। বিহারে তাঁতিরও দুর্দ্দশা হইয়াছে।

সমগ্র ভারতে ১৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৩৪ জন পুরুষ ও ৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৫৯৪ জন রমণী বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা-সংগ্রহ করে। তদ্ভিন্ন ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৬৪ জন পুরুষ ও ২৬ হাজার ৩০৬ জন স্ত্রীলোক আংশিক ভাবে তাঁত চালাইয়া ও আংশিক ভাবে কৃষি-কর্ম্ম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। এই ২৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৮ জনের উপার্জ্জিত অর্থে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৫১৫ জন পোষিত হয়। ইহাও অবশ্যই ১৯০১ সালের হিসাব। বঙ্গের ন্যায় ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই শিল্পজীবীদিগের পৈতৃক বৃত্তির উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাই কৃষি-ক্ষেত্রে জন খাটিয়া যাহারা দিনপাত করে, তাহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। ১৮৯১ সালে তাহাদের সংখ্যা ১,৮৬,৭৩,২০৩ ছিল, ১৯০১ সালের আদম সুমারিতে বাড়িয়া ৩,৩৫,২২,৬৮২ হইয়াছে। যাহারা ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করে, তাহাদের সংখ্যা ১,০৩,৯৭৯ হইতে কমিয়া ৮৮,৭৯৭ হইয়াছে। বস্ত্র-পরিচ্ছদাদি-নির্ম্মাণকারীদের সংখ্যা ১,২৬,১১,৪৫৪ হইতে কমিয়া ১,১২,১৪,১৫৮ হইয়াছে। ফলকথা, সকল জাতিকেই দিন দিন পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্নের চেষ্টায় অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন স্থায়ী হইলে এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যই হইবে।

ভারতে দারিদ্র্য।

সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য চিকিৎসক স্যার ফ্রেডরিক্ ট্রিভস্ এসিয়া খণ্ড পরিভ্রমণান্তে The Other Side of the LAntern নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে ভারতবাসীর দারিদ্র্য-সম্বন্ধে বিবিধ মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই একটী এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—

India leaves on the mind an impression of poorness and melancholy. * * Sadder than the country are the common people of it. They are lean and weary-looking, their clothing is scanty, they all seem poor, and toiling for leave to live. * * They appear feeble and depressed."

মৃতদেহ-দাহের কথায় তিনি বলেন,—

"The amount of wood employed in this ghastly ceremony depends upon the wealth of the surviving relatives. It happens, therefore, that so little wood is often used for the very poor that the body is only partly consumed, and what is thrown into the river is more than ash.

"Poverty is always piteous. In India it is most piteous when the heart-broken man is unable to buy wood enough for the burning of his dead."

"That the famine," says Wallace in his book "The Wonderful Century," "at all events is almost chronic in India and is the direct result of governing in the interests of the ruling classes, instead of making the interests of the governed the first and the only object."

শ্বেতাঙ্গ-চরিত্র।

Fundamentally, says A de Quartrefages, the white, even when civilised, from the moral point of view is scarcely better than the negro, and too often by his conduct in the midst of inferior races has justified the argument opposed by a Mulagachy to a missionary, 'Your soldiers seduce all our women...you come to rob us of our land, pillage the country and make war against us ; and you wish to force your God upon us, saying that He forbids robbery, pillage and war !' Such is the criticism of a savage. The following is that of a European, M. Rose, giving his opinion of his own countrymen : 'The people are simple and confiding when we arrive, perfidious when we leave them. Once sober, brave and honest, we make them drunken, lazy and finally thieves. After having inoculated them with our vices we employ these vices as an argument for their destruction. However severe these conclusions may appear they are unfortunately true and the history of the relations of Europeans with the population they have encountered in America, at the cape and in Oceania justify them too fully."—*The Human Species pp. 461-62.*

ভারতে চিনির কারখানা।

গত ১৮৯৪ সালে ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ ২৬৪টি চিনির কারখানা ছিল। ১৯০০ সালে উহাদের সংখ্যা ২০৩ হইয়াছিল ; ১৯০৩।৪ সালে কমিয়া ২১টি হইয়াছে। বিট ও জাভা চিনির প্রসার বাড়িয়া দেশের শর্করা-ব্যবসায়ীদিগের কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা কি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে? বৈদেশিক শর্করা, হয় গো-শূকরাদি পশুর শোণিত, না হয় শ্মশান-ভূমি হইতে সংগৃহীত অস্থিময় অঙ্গার সহযোগে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। এই কারণে আজকাল কোনও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু মুসলমানই আর বৈদেশিক শর্করার ব্যবহার করেন না। যাঁহারা খাদ্যাখাদ্যের বিচার করা কুসংস্কার-মূলক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের ও বৈদেশিক শর্করা ব্যবহার করা অনুচিত। কারণ, প্রথমতঃ, উহা অস্বাস্থ্যকর বলিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, দ্বিতীয়তঃ, উহাতে স্বদেশীয় শর্করা-ব্যবসায়ীদিগের অনশন-মৃত্যু-জনিত পাপ স্পর্শ করে।

বৃটিশ ভারতে আমদানি পণ্যের মূল্য তালিকা।

(এই তালিকার সরকারি প্রয়োজনে আনীত দ্রব্যের হিসাব ধরা হয় নাই।)

পণ্যের নাম	১৯০৫।৬ সাল	১৯০৬।৭ সাল	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি	৯১,২৯,০০০	১,১৯,৮৭,০০০
কোরা কাপড়	১৮,৯৩,২৪,০০০	১৮,৭০,৭৪,০০০	স্পিরিট ও বিয়ার	৩,৪৩,৭৪,০০০	১,৫৮,৯২,০০০
ধোয়া ,,	৮,৪৭,৩৫,০০০	৭,৩৭,৯৫,০০০	হীরক ও মুক্তাদি	১,৩৪,১১,০০০	৯৩,৩৮,০০০
রঙ্গীন ,,	৯,৫৪,৭৬,০০০	৯,৫৫,৭৪,০০০	কাগজ ও পেষ্টবোর্ড	৭০,৪৯,০০০	৮০,১১,০০০
সূতা	৩,৪২,৫৪,০০০	৩,২২,৩২,০০০	ঔষধ দ্রব্য	৬৭,৪৯,০০০	৭৮,০১,০০০
অন্যান্য বস্ত্র	২,০৬,৪২,০০০	২,০৫,০০,০০০	রঞ্জনোপকরণ	৭৫,৭১,০০০	৭৪,৯৩,০০০
মোট কার্পাস পণ্য	৪২,৪৪,৩১,০০০	৪০,৯১,৭৫,০০০	তামাক চুরুট প্রভৃতি	৬৬,০৯,০০০	৬৯,৩৩,০০০
চিনি	৭,৭৭,৪৫,০০০	৮,৭৩,৮১,০০০	রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৬৮,৯২,০০০	৬৮,৭৬,০০০
লৌহ ও ইস্পাত	৬,৬৪,৩৯,০০০	৭,৫৫,৮০,০০০	স্বর্ণ-রৌপ্য	২০,৯২,১২,৮৯০	২৭,২০,০৯,৮৫৮
লৌহ-যন্ত্রাদি	৪,৯২,৫৬,০০০	৫,৭৯,৮৯,০০০	লবণ	৬৫,৭২,০০০	৬৬,৭৬,০০০
রেলের উপকরণ	১,৬২,২৬,০০০	৪,১৫,৭৮,০০০	দেশলাই	৫৮,৮৩,০০০	৬৩,১৩,০০০
লৌহময় পণ্য	২,২৬,৫৭,০০০	২,৬৬,০৫,০০০	রেশম	৭১,১৯,০০০	৫৬,৮০,০০০
খনিজ তৈল	২,২৩,৬০,০০০	২,৪২,৬৯,০০০	চিত্রোপকরণ	৪৯,২৫,০০০	৫৬,৭৫,০০০
খাদ্য দ্রব্য	২,৩৮,৫৬,০০০	২,৪২,৩৩,০০০	কয়লা	৩২,১২,০০০	৪৮,৬০,০০০
পরিচ্ছদাদি (পাদুকাসহ)	২,২১,৭৭,০০০	২,১১,২৩,০০০	কার্পাস	৫৪,০৩,০০০	৪৫,৮৯,০০০
পশমী জিনিস	২,৪২,৫৮,০০০	২,০৫,২২,০০০	মণিহারি	৩৭,৭০,০০০	৪০,৪০,০০০
রেশম পণ্য	১,৯০,১৫,০০০	১,৮২,৫০,০০০	ছাতা	১৯,৭৯,২৬৯	১৮,৮৫,৯৩৯
কাচ পণ্য	১,১২,৪৭,০০০	১,২১,১৪,০০০	ঐ উপকরণ	১৪,৩২,৬৫২	২৩,৬৩,৬৮৮
খেলনা	২৯,১১,৫৫৯	২৮,৬১,৭০৩	চীনা মাটির দ্রব্য	৩৩,৬০,৭৮১	৩৮,৯৯,৮২৪
সাবান	৩১,৯০,৮৯০	৩২,২৮,১৫৬	অন্যান্য পণ্যসহ মোট	১২৩,৯৮,৬৯,৪৯২	১৩৫,৫০,৭৯,০০০
চর্ম্ম-পণ্য	৩০,৬০,৮২০	৩২,৫৮,৬৮১	সরকারি প্রয়োজনে আনীত দ্রব্য	২,০২,৯০,০০০	৮,৯৩,৪৬,০০০

অখণ্ড বঙ্গে আমদানি মালের তালিকা।

পণ্যের নাম	১৯০৫।৬ সাল	১৯০৬।৭ সাল	কাগজ ও পেষ্টবোর্ড	১৫,৪৭,৯৫৭	১৮,৫৫,৫৩৯
কোরা কাপড়	১৩,৮৮,১১,৯৭২	১২,৭০,৫২,৩১৮	ওষধ দ্রব্য	২৪,৭৩,৭৬৮	২৪,৩৭,৯৪৬
ধোয়া ,,	২,৯৪,৩৯,১৪৮	২,২৫,৭৯,৮২৬	রঞ্জনোপকরণ	১১,৮৭,৭২৪	১৫,৪৯,৪৫১
রঙ্গীন ,,	২,৫৬,০৯,৫২৫	২,০৪,৮০,২৯৬	তামাক ও চুরুট	২,৩১,১১৯	৩,০৫,৫৫০
সূতা	১,০২,৬১,৯৫৪	৮৩,০৬,৯৫৫	সিগারেট প্রভৃতি	৩০,৪৩,৯৯৭	২৮,১৬,৫৪৮
অন্যান্য বস্ত্র	১,০২,৩৩,৭৭৭	৭৮,৫৯,৭৪৭	রাসায়নিক দ্রব্যাদি	২৫,৭৪,১৭৭	২৫,৪৬,৪৯৭
মোট কার্পাস পণ্য	২০,৪১,৯৪,৪২২	১৭,৭৯,৭২,৪৮৭	স্বর্ণ ও রৌপ্য	৬,০৫,৪৮,৪৩৬	৮,৫৪,৬১,৮৮৯
চিনি	২,৩৬,৩৫,০৯৩	২,৯৩,৩৪,৫৫১	হীরক মুক্তাদি	৫৬,৩৪,০৬২	৬,০৫,৪৮২
লৌহ ও ইস্পাত	৩,১৫,৬৬,৩০২	৩,৭৩,১০,১৬২	লবণ	৫৩,৩০,৪৬৫	৫২,৮২,৪৪০
লৌহ-যন্ত্রাদি	২,৩৪,৯৫,৩৩১	২,২৭,৭১,৬৩৯	চিত্রোপকরণ	১৯,০৫,১৩০	২২,৩৭,০৪৬
রেলের উপকরণ	৪০,৯২,০৪৫	১,৯১,৪৮,০১০	মণিহারি	১০,৩৩,২৮৫	১০,৯৩,৮৩০
লৌহময় পণ্য	৭৫,০৯,০৩১	৮৭,৬৩,৭৩০	ছাতা	২,১০,৭২৫	২,৭৫,৩৬৭
কেরোসিন তৈল	৭০,৯৭,৯৭১	৭১,২২,৬৫৮	ঐ উপকরণ	১২,৪১,৪১৩	২০,৬২,৭৮৮
খাদ্যদ্রব্য	৩৯,১৩,৭৮৮	৪১,৬৮,৮৮৮	খেলনা	৮,২৯,২৯৩	৮,০৬,৪৯৫
পরিচ্ছদাদি (পাদুকা সহ)	৫১,২২,৫২৭	৪২,৮৪,০৮০	সাবান	৬,৬৪,৪১২	৬,৯৪,৬৪৫
পশমী জিনিস	৬৪,১৮,৬৪১	৪৪,৭১,২৯৭	চর্ম্মপণ্য	৭,৪০,৩৩৫	৭,৪৪,৮০৯
রেশম পণ্য	১১,৩০,৭৫১	৯,৮৯,৭৯৭	চীনামাটীর বাসন	১২,৭৩,২৬৮	১৪,২২,৯৭৭
কাচ পণ্য	৩৩,৫৩,৫৪৪	৩৮,২৬,৩৭২	অন্যান্য পণ্যসহ মোট	৪১,৬০,০৫,৫৯৮	৪২,০০,৫৯৮,৫৪৪
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি	৩৯,৮৩,৬৩৭	৪৬,১৭,০১৯	সরকারী প্রয়োজনে আনীত	৩,৬১,৪৭,৮৩৪	৩,০০,২৫,৬৭১
সর্ব্বপ্রকার মদ্য	৫৪,৩৫,৯৭৯	৫০,৩৯,৭৩৬	বৈদেশিকপণ্যের পুনঃ রপ্তানি	২০,৫৬,০১২	২৪,২৪,৯৭৪

বাজী রাও।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

(মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের উৎকৃষ্ট মানচিত্র সহ)

যে মহাপুরুষের যত্নে বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেতু-হিমাচল স্বাধীন হিন্দুসাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী এই পুস্তকে অতীব চিত্তাকর্ষক-ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য-নীতি ও মহারাষ্ট্রীয়গণের যুদ্ধনীতি-সম্বন্ধে বিশদ ও কৌতূহলপ্রদ আলোচনা করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক আর নাই। ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট। দেশী কাপড়ে বাঁধান। মূল্য বার আনা।

নব্যভারত।—যে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বর্গীর অত্যাচার-কাহিনী এক সময়ে বিষবৎ প্রতীয়মান হইত, সেই দেশে বাজী রাওয়ের ন্যায় ন্যায়বান্ বীরের কাহিনী প্রচারিত হইলে বাস্তবিকই প্রভূত উপকার হয়। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালার বিশেষ উপকার করিলেন। গ্রন্থকার বহুদিন যাবৎ ঐতিহাসিক তত্ত্ব-নির্ণয়ে নিযুক্ত আছেন। আমরা রজনীকান্ত গুপ্তকে হারাইয়া গভীর শোকে নিমগ্ন; এই সময়ে গ্রন্থকারের এইরূপ প্রয়াসে বিশেষ পুলকিত।

প্রবাসী।—দেউস্কর মহাশয়ের এই পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে পেশওয়ে বাজী রাওয়ের জীবন-বৃত্তান্ত ব্যতীত তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাও অবগত হওয়া যায়। ইংরাজীতে যাহাকে System of Subsidiary Alliance বলে, মহারাষ্ট্র বীরগণই যে তাহার প্রবর্ত্তক, লেখক তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেকের এখনও ধারণা আছে, মারাঠাগণ কেবল লুটপাট করিতেই দক্ষ ছিলেন; দেশোন্নতি-কর সুশাসন প্রথার প্রবর্ত্তন বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন না। যদিও বাজী রাও জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহেই যাপন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার জীবনচরিত পাঠে এই ভ্রান্তি বহু পরিমাণে দূর হইবে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দু-প্রাধান্য স্থাপনই মরাঠাগণের লক্ষ্য ছিল। গ্রন্থকার স্বদেশ বা স্বজাতি-প্রীতি বশতঃ বাজী রাওয়ের কোন দোষ গোপন করেন নাই, দোষগুণ উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার লেখার প্রশংসা করা অনাবশ্যক।

রায় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বলেন—এই গ্রন্থকারের গ্রন্থপাঠে প্রতীতি হয়, তিনি বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্ বাড়াইতেছেন। দেউস্কর মহাশয় যেমন সুপণ্ডিত, তেমনই সুলেখক। তাঁহার (বাজী রাও ও মহামতি রানাডে) এই উভয় গ্রন্থেই দেশ-হিতৈষিতা, বিচার-ক্ষমতা ও লিপি-কৌশল প্রভৃতি বিবিধ গুণের পরিচয় আছে।

পরিশিষ্টাংশ ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।